'রিসালাতুল মুসতারশিদিন' গ্রন্থের অনুবাদ

ফিতনার যুগে মুক্তির পথ

মূল

ইমাম হারেস মুহাসেবি র.

(১৬৫-২৪৩ হিজরি)

তাহকিক

শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র.

[রিসালাতুল মুসতারশিদিন গ্রন্থের অনুবাদ]

ফিতনার যুগে মুক্তির পথ

মূল :
ইমাম আবু আবদুল্লাহ হারেস বিন আসাদ মুহাসেবি রহ.

টীকা ও বিশ্লেষণ :
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.

[রিসালাতুল মুসতারশিদিন গ্রন্থের অনুবাদ]

ফিতনার যুগে মুক্তির পথ

মূল

ইমাম আবু আবদুল্লাহ হারেস বিন আসাদ মুহাসেবি রহ.
(জন্ম: ১৬৫, মৃত্যু: ২৪৩)

টীকা ও বিশ্লেষণ

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.

অনুবাদ

যায়েদ আলতাফ
লেখক, গবেষক, অনুবাদক

সম্পাদক

মিশকাত আহমদ
সম্পাদক, মাকতাবাতুল হাসান

মাকতাবাতুন নূর

অর্পণ...

পিতৃসম শিক্ষকদের। মাথার উপর যাদের ছায়া এখনো আছে, আল্লাহ তাঁদের ছায়াকে আরও দীর্ঘায়িত করুন। যাদের ছায়া সরে গেছে, আল্লাহ তাঁদের কবরকে রহমতের শীতল বারিতে স্নাত রাখুন।

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা-এর উস্তাযুল হাদিস,
দারুল উলূম মিফতাহুল উলূম বাড্ডা, ঢাকা-এর শাইখুল হাদিস,
হযরত মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ দা. বা.-এর

অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

রিসালাতুল মুসতারশিদিন কিতাবটি প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন একটি আত্মশুদ্ধিমূলক কিতাব। কিতাবের লেখক জগদ্বিখ্যাত ইমাম আবু আবদুল্লাহ হারেস বিন আসাদ মুহাসেবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পার্শ্বটীকার কারণে কিতাবের গুরুত্ব আরও বেড়েছে, বিষয়বস্তু আয়ত্ব করা সহজসাধ্য হয়েছে।

প্রাচীন আরবি কিতাবের বাংলায়ন অনেক কষ্টের কাজ। শোকর যে, বাঙ্গালি পাঠকদের মাঝে এখন আরবি কিতাবের অনুবাদ পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ফলে দুর্লভ আরবি গ্রন্থগুলোও অনূদিত হচ্ছে। প্রাচীন এই কিতাবে দিনি ইলমের বহু মূল্যবান হীরে-জহরত গচ্ছিত আছে। পাঠকবৃন্দের নিকট কিতাবটি পড়ার পরামর্শ রাখছি।

বাংলায় এটিই কিতাবের প্রথম অনুবাদ। অনুবাদ আমি যদ্দুর দেখেছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে। বড় কথা হলো, এই কিতাব অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকাশক-অনুবাদক সবার প্রতি শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের দিনি খেদমতগুলো কবুল করুন। আমিন।

বিনীত বান্দা
আবু সাবের আব্দুল্লাহ
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা
৯/৯/১৪৪২হি.
২১/৪/২০২১ঈ.

প্রকাশকের অভিব্যক্তি

আমরা এক অস্থির ও কঠিন সময় পার করছি। যখন সমাজের প্রায় সবাই হারামে-হালালে শুধু ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাসিতা খরিদে ব্যস্ত। পার্থিব সুখ-শান্তিই আমাদের কাছে সব। যেন আমরা কোনোদিন মৃত্যুবরণ করব না। আমাদের আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে না।

পার্থিব জীবনের পিছে ছুটে, পাপ-পঙ্কিল এই সমাজে বাস করে আমাদের অন্তরগুলো দূষিত হয়ে পড়েছে। ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা অনেকেই এ থেকে উত্তরণ চাই। আত্মশুদ্ধি লাভ করতে চাই। পরিশুদ্ধ হতে চাই। মুক্তির দিশা পেতে চাই।

মানুষ অসুস্থ হলে ওষুধ সেবন করে। মানুষের দেহ যেমন অসুস্থ হয়, অন্তরও তেমন অসুস্থ হয়। দৈহিক অসুস্থতা সম্পর্কে আমরা কম-বেশি সবাই সচেতন হলেও আত্মিক অসুস্থতা সম্পর্কে আমরা প্রায় সবাই অসচেতন। অথচ অন্তরের এমন অনেক ব্যাধি রয়েছে, যেগুলো শারীরিক মরণব্যাধির চেয়েও মারাত্মক। কেননা শারীরিক ব্যাধি শুধু মানুষের ইহজীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে অন্তরের ব্যাধি মানুষের ইহ ও পরকাল দুটোই বিনষ্ট করে।

মানুষের অন্তরের সেসব ব্যাধির অব্যর্থ চিকিৎসাই *ফিতনার যুগে মুক্তির পথ* নামে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এটি ইসলামের স্বর্ণযুগে রচিত বিখ্যাত *রিসালাতুল মুসতারশিদীনের* অনুবাদ। গ্রন্থটি মাকতাবাতুন নূর থেকে প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। আশা করি গ্রন্থটি পাঠে মানুষ হেদায়াতের

সন্ধান লাভ করবে এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ইহ ও পরকালিন সফলতা অর্জন করবে। গ্রন্থটি পড়ে কেউ যদি সত্য পথের দিশা লাভ করে, গাফলতের ঘোর থেকে জেগে উঠে তবেই আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করব।

পরিশেষে, এ বইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। সুহৃদ পাঠকবর্গ বইটিতে কোনো ধরনের অসঙ্গতি বা ভুল-ত্রুটি লক্ষ করলে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা বইটিকে আমাদের সকলের হেদায়েতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

প্রকাশক
মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন
২১/০৪/২০২১

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

পাপের আঁধার সবদিকে ছড়িয়ে। ক্রমশ বিবেকবোধকে মৃত্যুর মুখে রেখে অন্ধকারে হাঁটছি ভুলপথে। পাপ ও পুণ্যের অমিমাংসিত দ্বন্দ্বের স্তর ছেড়ে আমরা কত দূর যে এগিয়েছি, আমাদের অনেকেরই সে কথা অজানা। রাব্বুল আলামিন আমাদের করুণা ও দয়া দিয়ে সৎপথে পরিচালিত করুন।

রিসালাতুল মুসতারশিদিন একটি কালজয়ি গ্রন্থ। কিতাবটির প্রথম যখন দেখা পাই তখন আমি উদ্দীপ্ত ছাত্রজীবনে। তখনই এটা নিয়ে কাজ করার তীব্র মানশা টের পাই মন-মননে। কারণ এর প্রতিটি কথা পাপী মনকেও ছুঁয়ে যায় তার অজান্তে। আবার এর ভূমিকা, প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করেছেন আরবের প্রথিতযশা হাদিসবিশারদ বিশ্বখ্যাত আলেমে দিন আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহিমাহুল্লাহ্। এ নামটির কারণেও রিসালার আবেদন মনকে অনেক বেশি ছুঁয়ে গিয়েছিল। তারপর কেটে গেছে বেশ কিছু বছর। কর্মজীবনে এসে বইটি আবার সামনে দেখতে পাই। তখন সেই একই আবেগ ও একই আবেদন নিয়ে বইটি চোখ ও বুকের মাঝে ঘোটন শুরু করে। এবার স্বস্তি কোথায় পাই?

অনুবাদ করে হয়ত কিছুটা দায়মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু রিসালার আবেদন আরও অনেক বেশি-এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাঠক পড়ামাত্র তা উপলব্ধি করবেন। মূল কিতাবটি আরবি ভাষায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কিতাবটির অনুবাদ হয়েছে। বাংলাভাষায় এটিই প্রথম অনুবাদ। বইটির গুরুত্ব ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমরা বইটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেই। যার ফল *ফিতনার যুগে মুক্তির পথ* নামে বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থটি। এটি আরবের বিখ্যাত প্রকাশনা *মাকতাবুল মাতবু-আতিল ইসলামিয়্যা* থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ অষ্টম সংস্করণের অনুবাদ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠক-পাঠিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে হেদায়াতের নুর দান করুন। আমিন।

যায়েদ আলতাফ
সাভার, ঢাকা।
২১ শা'বান, ১৪৪২ হিজরি মোতাবেক
০৫ এপ্রিল, ২০২১ ইং।

সূচিপত্র

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ وَاهِبِ النِّعَمِ ومُسْبِغِهَا، وَهَادِي الْأُمَمِ ومُسعِدِهَا، اَلَّذِيْ تَفَضَّلَ عَلَى عِبادِهِ الْمُؤمِنِيْنَ بِالْهِدَايَةِ وَالرَّشَادِ وأَكْرَمَهُمْ بِرِسَالَةِ نَبِيِّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعِبَادِ وَالْعُبَّادِ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ أَطَاعَهُ وَاتَّبَعَهُ، مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ وَعَلَى التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِيْمَانٍ وَإِحْسَانٍ وَعَلَى مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ فَكَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ تَكْرِيْمٌ وَ رِضْوَانٌ.

হামদ ও সালাতের পর, এই কথাগুলো আমি বিখ্যাত আবেদ, যাহেদ, সালেহ, উম্মাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ইমাম আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ প্রণীত রিসালাতুল মুসতারশিদিন-এর অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা স্বরূপ লিখছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহ, বইটির পূর্বের সংস্করণগুলো বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও পাঠক সমাদৃত হয়েছে। প্রথম সংস্করণটি তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক জনাব আলি আরসালান। তাঁর অনুবাদকর্মটি ১৯৬৩ সালে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া *রিসালাতুল মুসতারশিদিন* কিতাবটি ইতোমধ্যে আরব-অনারবের বিভিন্ন দিনি প্রতিষ্ঠানে নৈতিক চরিত্র-শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এর দ্বারা অসংখ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছেন। সমস্ত অনুগ্রহ মহান রাব্বুল আলামিনের।

প্রথম সংস্করণের পর যে সংস্করণগুলো প্রকাশিত হয়েছে, আমি সেগুলোর শেষে দশ পৃষ্ঠার ছোট্ট একটি রিসালা তথা পুস্তিকা সংযুক্ত করে দিয়েছিলাম। সেখানে দৈনন্দিন জীবন ও লেনদেন বিষয়ক ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আদব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল । তারপর এই সংস্করণে এসে যখন বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল, তখন তা বাদ দেওয়া হলো। বইটির সঙ্গে আর ছাপা হলো না । পরবর্তীতে অবশ্য আমি সে পুস্তিকাতে নানা বিষয় সংযোজন করেছি। এতে পুস্তিকার কলেবর খানিক বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা দশ থেকে বেড়ে পঞ্চাশ হয়েছে। তার নাম দিয়েছি *মিন-আদাবিল ইসলাম* । ১৪১২ হিজরিতে বৈরুত থেকে তা পূর্ণাঙ্গ বই হিসেবে ছাপানো হয়েছে।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল, রিসালাতুল মুসতারশিদিন-এর সঙ্গে *কাসিদাতু উনওয়ানিল হিকাম* নামে পরিচিত বিখ্যাত কবি আবুল ফাতাহ বুসতির কাসিদাটি (কবিতা) সংযুক্ত করে দিব। কাসিদাটির পঙক্তি সংখ্যা ৬৩। প্রথম পঙক্তিটির অর্থ হচ্ছে,

অতিরিক্ত পার্থিব উন্নতি লাভ করা ক্ষতির কারণ।
কল্যাণশূন্য যেকোনো লাভও ক্ষতির কারণ।

পরবর্তীতে অবশ্য আমি কাসিদাটি কবির জীবনীসহ পৃথকভাবে ১৪০৪ হিজরিতে বৈরুত থেকে প্রকাশ করেছি। তবে অষ্টম সংস্করণে এসে *রিসালাতুল মুসতারশিদিনের* কলেবর বড়ো হয়ে যাওয়ায় আমি তা এর সঙ্গে না ছেপে *মিন আদাবিল ইসলাম* রিসালার সঙ্গে এক খণ্ডে একত্রে প্রকাশ করেছি। ১৪১২ হিজরিতে এটি ছাপা হয়েছে।

ইতোপূর্বে রিসালাতুল মুসতারশিদিনের যে সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো দুটি হস্তলিখিত কপিনির্ভর। সেসব সংস্করণের ভূমিকায় আমি কপি দুটোর বর্ণনা দিয়েছি। তারপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে, এই সংস্করণে এসে আরও তিনটি হস্তলিখিত কপির সন্ধান পেলাম। এগুলোর সাহায্যে আলহামদুলিল্লাহ আমি পূর্বের কিছু ভুল সংশোধন, অপূর্ণাঙ্গ বিষয়কে পূর্ণরূপ দান এবং দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট বিষয়কে সহজ ও স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি। তাই বলা যায়, এবারের সংস্করণটি আলহামদুলিল্লাহ আরও নির্ভুল ও অধিক মূলানুগ হয়েছে। এতে বাক্যগুলো যেমন স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, তেমনি শব্দগুলো গ্রন্থকারের লিখিত শব্দের কাছাকাছি হয়েছে।

রিসালার বক্তব্যকে পাঠকদের কাছে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে, সর্বোপরি পাঠককে তা পাঠে আগ্রহী করে তুলতে, পূর্বের সংস্করণগুলোতে বেশকিছু টীকা সংযোজন করেছিলাম। নানা ব্যস্ততার পর যখন আল্লাহর রহমতে কিছুটা অবসর হলাম, তখন সংক্ষেপে ও দীর্ঘাকারে কিছু টীকা সংযোজন করলাম; যাতে পাঠক ও পথ-অনুসন্ধানী ব্যক্তিরা আরও উপকৃত হতে পারে। টীকা সংযোজনে গ্রন্থের পৃষ্ঠা-পরিমাণ যেমন বেড়েছে, তেমনি এর মানও বেড়েছে। আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমার এ অমলিন কাজটুকু কবুল করবেন। এর পাঠককে মূল গ্রন্থের মতোই উপকার দান করবেন এবং গ্রন্থটি পাঠে যারা উপকৃত হবে, আমাকে তাদের কল্যাণময় দোয়ার মাধ্যমে উপকৃত করবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, দ্রুত ডাকে সাড়া দানকারী।

হস্তলিখিত তিনটি কপির বর্ণনা

একটু আগেই বলা হয়েছে মূল রিসালাটি দুটি হস্তলিখিত কপির উপর নির্ভর করে প্রকাশ করেছিলাম। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে এই সংস্করণে এসে আমি তিনটি হস্তলিখিত কপির সন্ধান পেয়েছি এবং সেগুলোর সাহায্য নিয়েছি।

একটি হস্তলিখিত কপি সংগ্রহ করেছি আলজেরিয়া থেকে। আর দুটি তুরস্কের এক লাইব্রেরি থেকে। তিনটি কপির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো :

১- আলজেরিয়ান কপি : ১৪০৪ হিজরিতে আমি এটির সন্ধান পেয়েছিলাম। এ বছর আল ফিকরুল ইসলামি-এর ষোলতম কনফারেন্সে আমাকে আলজেরিয়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জনৈক বন্ধু তখন আমাকে রিসালার একটি কপি দিল, যা ১৪০১ হিজরিতে আলজেরিয়ার কনস্ট্যান্টাইন শহরের *দারুল বাআস* প্রকাশনী ছেপেছে। সে পূর্বেই অবগত হয়েছিল যে, আমি ইমাম মুহাসেবি রহমাতুল্লাহি আলাইহির *রিসালাতুল মুসতারশিদিন* ছেপেছি। তাই সে আমাকে এই কপি দিয়েছিল।

কপির নামটি ছিল রিসালাতুল মুসতারশিদ[১] (মুসতারশিদিন না)। কপিটি অধ্যাপক ডক্টর শারাফি আহমাদ রিফায়ির তাহকিক ও টীকা সম্বলিত ছিল। তিনি এর তাহকিক করেছেন ও এতে টীকা সংযোজন করেছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এ কপি পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম। ভূমিকা পড়ে জানতে পারলাম, আমি যে রিসালাটি হালব থেকে ছেপেছি আর বৈরুত থেকে যার একাধিক সংস্করণও প্রকাশ হয়েছে, তিনি তা বিলকুল জানেন না। না জানতে পারাটাই স্বাভাবিক। কারণ অন্যান্য দেশ থেকে আলজেরিয়ায় ইসলামি গ্রন্থসমূহ প্রবেশে সরকারিভাবে কিছু বাধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

তারপর আমি রিয়াদে ফিরে এলাম। এখানে আসার পর এক বন্ধুকে বললাম, আলজেরিয়ায় যে মূল হস্তলিখিত কপিটি দেখে রিসালাটি ছাপা হয়েছে, সেটির ছবি ফ্যাক্স করে পাঠাতে। সে তা ফ্যাক্স করে পাঠালো। আমি তার প্রতি বিশেষভাবেকৃতজ্ঞ। তার মাধ্যমে আমি মূল কপিটি হাতে পেয়ে গেলাম। তারপর সেটি যাচাই করতে গিয়ে দেখলাম যে, কপিটি খুবই দুর্বল। ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। বিভিন্ন জায়গায় ফেটে গেছে। কারণ তার বর্ণনা অনুযায়ী এটি অন্যান্য গ্রন্থের হস্তলিখিত কপির সঙ্গে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ছিল। আর এমনটি করা হয়েছিল, ফ্রান্সরা যখন আলজেরিয়ায় আগ্রাসন চালায়, দেশ দখল করে নেয়, তখন লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে এগুলো বাঁচানোর জন্য মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। যার ফলে এর ভেতর পানি ঢুকে গেছে। রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। শুধু অল্প কিছু শব্দ ও চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। বাকি সব মুছে গেছে।

কপিটি পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে, যে এটি পড়েছে, তার যেখানে যেখানে সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ মনে হয়েছে, সেখানে সে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করেছে। কোথাও অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য মনে হলে তা দূর করার জন্য সংযোজন করেছে। তার ধারণা ছিল, এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একজন পাঠককে রিসালাটি সহজে বুঝতে সাহায্য করবে, কিন্তু এভাবে আসল কপিটি হারিয়ে গেছে। এখন আর এই কপির উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না।

---

[১] এই নামটি তিনটি নামের মধ্যে একটি। আর এই তিনটি নাম ইমাম মুহাসেবির কোনো কোনো গ্রন্থে ও হস্তলিখিত কপিতে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় নামটি হচ্ছে রিসালাতুল ইরশাদ। অধিকাংশ গ্রন্থ ও হস্তলিখিত কপিতে উল্লিখিত নামটি হচ্ছে রিসালাতুল মুসতারশিদিন। এই নামটিই আমি গ্রহণ করেছি।

২৪ পৃষ্ঠার এই রিসালাটি মরক্কোর লিপিতে লেখা, কিন্তু কবে লেখা হয়েছে ও কে লিখেছে, তা লেখা নেই। আর আমিও এর মালিক ও মূল সম্পর্কে জানতে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, অধ্যাপক ডক্টর শারাফি এটির উপর কাজ করতে গিয়ে বেশ কষ্ট স্বীকার করেছেন। যেমন এটি পড়া, পরিমার্জন করা ও পরবর্তীতে তা ছাপানোর কাজে দীর্ঘ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। অসম্পূর্ণ বাক্যাংশগুলোকে ব্রাকেটের মাঝে তার বর্ধিত বাক্যাংশের সঙ্গে মিলিয়ে পূর্ণরূপ দান করতে অনেক শ্রম দিয়েছেন। আর এসব কিছু তিনি করেছেন, যাতে হেদায়েত প্রত্যাশী পাঠক তা পড়ে সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তার ধৈর্যের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

২-প্রথম তুর্কি কপি : এই কপিটি মাকতাবা শহিদ আলিতে ছিল। সিরিয়াল নং ৩৩১৯। মাত্র একুশ পৃষ্ঠার। প্রতি পৃষ্ঠায় লাইন সংখ্যা ১৯। এর লেখা সহিহ ও স্পষ্ট। আমি যে তিনটি হস্তলিখিত কপি নিয়ে এখন কথা বলছি, তন্মধ্যে এই কপিটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ। লেখা দেখে মনে হয়েছে, এটি হিজরি দশম শতাব্দীর। কপিটির শেষে লিপিকারের নিজের এই কথাটি লেখা ছিল,

> 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যে রিসালাতুল মুসতারশিদিন গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করা সম্পন্ন হল। দুরুদ ও সালাম সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের উপর। এই রিসালাটি লিপিবদ্ধের কাজ অধম বান্দা মুহাম্মাদ ইবনে সালমান হালবির হাতে ১৯-শে শাবান মোতাবেক ৩১-শে মে রোজ মঙ্গলবার সম্পন্ন হয়েছে।'

তারিখ এতটুকুই লেখা ছিল। পৃষ্ঠার উপর মুছে যাওয়া কিংবা কেটে যাওয়ার কোনো চিহ্ন ছিল না, যাতে মনে হবে আরও কিছু লেখা ছিল। দেখে মনে হচ্ছে, লিপিকার ইতোপূর্বে অন্যান্য রিসালায় পূর্ণ তারিখ লিখেছেন। কিন্তু এখানে শুধু এতটুকুই। কারণ এই কপির শেষ পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠার উপরে এই লেখাটি ছিল, (ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসিহত এবং আহলে তাহকিক ও দাবিদারদের মাঝে পার্থক্য : ইমাম মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ)।

সুতরাং এই রিসালাটি হচ্ছে রিসালাতুল মুসতারশিদিন। তুর্কি লাইব্রেরিতে এর সিরিয়াল নম্বর কত, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩-দ্বিতীয় তুর্কি কপি : এই কপিটি মূলত কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তা আমার জানা নেই। আমি এর লাইব্রেরির নাম জানি না। কারণ যে অধ্যাপককে আমি রিসালাটির একটি ভাল কপি পাঠাতে বলেছিলাম, তিনি লাইব্রেরি নাম ঠিকানা না লিখে তা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কপিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল সাতচল্লিশ। খুব ছোট। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ লাইন করে। সব পৃষ্ঠার হাতের লেখা একরকম। কপিটির শুরুতে লেখা, (এটি আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ প্রণীত রিসালাতুল মুসতারশিদিন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।)

এরপর কালি দিয়ে কিছু মুছে দেওয়া হয়েছে। আর তাতে লিখিত কথাটি এমনভাবে মুছে গেছে যে, তা আর পড়া যায় না। তারপর নিম্নোক্ত কথাটি রয়েছে: 'দুধ পানের দ্বারা দুধবংশ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ের ফায়েদা।' শায়খ শাবরামুল্লুসি এটিকে কবিতার ভাষায় এভাবে বলেছেন,

إِذَا أَرْضَعَتْ أُنْثَى لِطِفْلٍ بِدَرِّهَا قَدْ شَارَكَ الْإِرْضَاعَ فِيْ ذٰلِكَ النَّسَبِ.

'কোনো নারী যখন কোনো শিশুকে দুধ পান করায়, তখন এই দুধ পান করানোর দ্বারা দুধবংশ সাব্যস্ত হয়ে যায়।'

এই পঙক্তিটির পর আরও কিছু পঙক্তি আছ, যেগুলোর অধিকাংশ শব্দই মুছে গেছে। একটি পঙক্তিও ঠিকমতো পূর্ণরূপে পড়া যায় না।

এগুলো তো নুসখাটির শুরুতে আছে। আর শেষে নিম্নোক্ত কথাটি রয়েছে,

تَمَّتْ رِسَالَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى آلِهِ وِ صَحْبِهِ وَ سَلَّمْ.

আল্লাহ তায়ালার রহমত, মদদ ও তৌফিকে রিসালাতুল মুসতারশিদিনের কাজ সম্পন্ন হলো। দুরুদ ও সালাম সাইয়েদুনা খাতামুন নাবিয়্যিন ইমামুল মুরসালিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

এই কপিতে কোনো তারিখ ও লিপিকারের নাম লেখা ছিল না। এই শেষ কথাগুলোর পাশে খুব দুর্বলভাবে লেখা: (এর মালিক সাহিবুস যাল্লাতি আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাদারাতি, ১২৭৯ হিজরি।) এরপর অপরিচিত এক ভাষায় এই সংখ্যাগুলো লেখা (২৪৫২২)। হয়ত এই কপিটি হিজরি দশম অথবা এগারোতম শতকে লেখা। আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক অবগত।

তিনটি প্রতিলিপির বর্ণনা দিতে গিয়ে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে এতে মূল কপিটির প্রতি অধিক আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হবে। একজন বিশ্বাসী ও হেদায়েতপ্রত্যাশীর জন্য কথাগুলোর অবশ্য তেমন প্রয়োজন নেই। তবে তা জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জানার পিপাসা নিবারণ করবে। তাই লিখে দেওয়া হলো।

আমি পূর্বের সংস্করণটি এই তিনটি হস্তলিখিত কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি এবং কোন নুসখায় কী পরিবর্তন আছে সেটা বোঝানোর জন্য নিম্নোক্ত সংকেতগুলো ব্যবহার করেছি। যেমন,

টীকায় আলজেরিয়ার নুসখার প্রতি (ج) দিয়ে, তুরস্কের প্রথম নুসখার প্রতি (أ) দিয়ে, তুরস্কের দ্বিতীয় নুসখার প্রতি (ب) দিয়ে নির্দেশ করেছি।

তারপর দেখলাম, নুসখার ভিন্নতার নির্দেশনা দিয়ে টীকাগুলো ভরে গেছে। মনে হলো, এগুলো পাঠকের মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাবে, আলোচনার মূল বিষয় থেকে সে দূরে সরে যাবে। কেননা এই গ্রন্থের আলোচ্যবিষয় কোনো সূক্ষ্ম নিয়মকানুন অথবা ফিকহি বিষয় নয় যে, সামান্য একটি অক্ষর বা শব্দ পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। যার কারণে নুসখার ভিন্নতা লিখে দেওয়া জরুরি। যেমন উসুল ও ফিকহ শাস্ত্রে অক্ষর বা শব্দ পরিবর্তনের দ্বারা হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সেখানে লিখে দিতে হয়।

যেহেতু এই গ্রন্থের আলোচ্যবিষয় আত্মশুদ্ধি, ওয়াজ, নসিহত, তাখলিয়া ও তাহলিয়া (অর্থাৎ আত্মিক দোষগুলো বর্জন করে আত্মিক গুণাবলি অর্জন); তাই কপির ভিন্নতার কারণে অক্ষর বা শব্দ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। তখন আমি দ্বিতীয়বার চোখ বুলিয়েছি এবং বিভিন্ন কপির ভিন্নতার মাঝে যেটা সবচেয়ে গ্রহণীয় মনে হয়েছে, শুধু সেটা লিখে

দিয়েছি। আর যেটা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে ভুল, সেটা ফেলে দিয়েছি। তবে দুয়েকটি ব্যতিক্রম। আমি এমনটি করেছি; যাতে টীকায় নুসখার ভিন্নতার বিষয়গুলো পড়তে গিয়ে পাঠকের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, যেমন যদি এমনটি লেখা হত, (ج) কপিতে এমন আছে, (أ) কপিতে এমন আছে, (ب) কপিতে এমন আছে। মূল কপিতে এটি বাদ পড়ে গেছে ইত্যাদি, তাহলে তা পাঠকের মাথা খেয়ে ফেলতো। তার মনোযোগ নষ্ট করে দিত। আর তখন কিতাবটি পাঠে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হত।

এছাড়া অষ্টম সংস্করণে এসে মূল কিতাব শুরু হওয়ার আগে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে আলেম ও আল্লাহর অলিগণের প্রতি ছাত্র ও শিষ্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের মজলিসে বসা, তাঁদের ঘটনাবলি শ্রবণ করা, জীবনচরিত অধ্যয়ন করার ফযিলতের বিষয়টিও সুন্দররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আদব সংক্রান্ত আরও কিছু আলোচনা এসেছে। যেমন, জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় নেক বান্দাদের প্রতি আদব, মহান আল্লাহ ও প্রিয় নবিজির নাম উল্লেখের আদব, এমনিভাবে সাহাবা ও তাবেয়িনদের নাম নেওয়ার আদব। পাশাপাশি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের ফযিলত, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তাঁর সান্নিধ্যের প্রভাব, তারপর কথকের পরিচয় জেনে কথা শোনায় শ্রোতাহৃদয়ে যে প্রভাব পড়ে তা এবং ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে জ্ঞানার্জন করা, ইত্যাদি বিষয়ও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

তারপর তাসাউফ বিষয়ে ইমাম শাতেবির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, সুফিগণ কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী, তারা বিদআতি নন। তারপর ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযি রহিমাহুল্লাহ সুফিগণ সম্পর্কে যে প্রশংসাসূচক বক্তব্য দিয়েছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মুহাসেবি শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। সিরাতে মুসতাকিমের উপর অবিচল ছিলেন। ইলমের ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আইম্মায়ে কেরাম ও বড়ো বড়ো মুহাদ্দিস তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

তিনি হাদিস, উসুল, ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মানুষ যাদের অনুসরণ করে হেদায়েত লাভ করত, তিনি তাসাউফের সেসকল ইমামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অষ্টম সংস্করণে টীকার পরিমাণ এ কারণে বৃদ্ধি করা হয়েছে, আবাসে-প্রবাসে, কাছে-দূরে এমন অনেক পাঠক আছে যাদের জন্য কিছু বিষয় পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে হয়। তাই আমাকে বিভিন্ন ঘটনা ও উদাহরণ অধিক পরিমাণে উল্লেখ করতে হয়েছে; যাতে মূল বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং পাঠক তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মূল কিতাবের বক্তব্যের যে প্রভাব, তা পূর্ণরূপে অর্জিত হয়। সেই সঙ্গে মানুষ জানতে চায় ও বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করে এমন কিছু ফিকহি আলোচনাও এই কিতাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন একাকী কিংবা সম্মিলিতভাবে সশব্দে যিকির করা, রাতে কিংবা দিনে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা ইত্যাদি।

(বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে টীকায় আমরা যেগুলোকে মূল শিরোনাম হিসেবে বসিয়েছি) আরবিতে সেগুলোকে টীকার মধ্যে ছোট্ট করে পার্শ্ব শিরোনামরূপে বসানো হয়েছে। (এতে পাঠক আলোচনাটি পড়ার আগে সংক্ষেপে বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে জেনে নিতে পারবে, যা তাকে বিষয়টি পূর্ণরূপে বুঝতে ও পরবর্তীতে তা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। অবশ্য টীকায় শিরোনামগুলো এভাবে না দিলে বইটির কলেবর আরও বৃদ্ধি পেত। আর এসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার তৌফিক ও মদদে সম্ভব হয়েছে।

কোনো কোনো টীকায় সম্পূর্ণ ইলমি আলোচনা ছিল। ওয়াজ-নসিহত, আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা নয়। সেসব আলোচনার কোনোটা আবার দীর্ঘ ছিল। দীর্ঘ ইলমি আলোচনা পড়তে গিয়ে পাঠকে যেন রিসালার মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে না যায়, তাই আমি সেগুলো গ্রন্থের শেষে 'সম্পূরক অংশ' শিরোনোমের অধীনে তুলে ধরেছি। আগ্রহী পাঠকগণ চাইলে সেই অংশটুকু পড়ে নিতে পারেন।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে তৌফিক, যথার্থতা, গ্রহণযোগ্যতা ও সাহায্য কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অপ্রিয় হয়ে মানুষের কাছে প্রিয় হওয়া থেকে পানাহ চাই। আমি আপনার সন্তুষ্টির পথ থেকে দূরে থেকে মানুষকে আপনার সন্তুষ্টির পথ দেখানো এবং আপনার ভালোবাসা বঞ্চিত হয়ে মানুষকে আপনার প্রিয় বানানো থেকে পানাহ চাই।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মুত্তাকি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। যেদিন মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আমাকে আপনার ক্ষমা, সন্তুষ্টি ও আপনার নেক বান্দাদের মুখে আমার উত্তম আলোচনার মাধ্যমে সম্মানিত করুন।

وَصَلِّ اللّٰهُمَّ و سَلِّم عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ،

وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আপন প্রভুর ক্ষমার ভিখারী:

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

রিয়াদ. ১৫-ই সফর,

১৪১২ হিজরি, রোজ রবিবার।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ وَلِيِّ كُلِّ حَمْدٍ وَ ثَنَاءٍ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ نُجُوْمِ الْاِهْتِدَاءِ وَالْاِقْتِدَاءِ.

হামদ ও সানার পর, এটি আবু আবদুল্লাহ মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহর রিসালাতুল মুসতারশিদিন-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণটি ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ তা বেশ সমাদৃত হয়েছে।

এই সংস্করণটিতে আরও তাহকিক ও টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আইম্মায়ে সালাফের বিভিন্ন উদাহরণ ও ঘটনাবলি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে রিসালার উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে যে হেদায়েত ও পথনির্দেশনা কিংবা আদেশ-নিষেধ ছিল তা আরও প্রভাবমণ্ডিত হয়েছে। আশা করি এই সংস্করণটি আরও অধিক সমাদৃত হবে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে আমলি জিন্দেগি গঠনে আরও উৎসাহিত করবে এবং এর সুস্পষ্ট আদেশ নিষেধগুলো মানুষের চিন্তা-চেতনায় পবিত্র ছাপ ফেলবে। পবিত্র কুরআন এই পদ্ধতিটিকে আরও সুন্দররূপে তুলে ধরেছে এবং তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ.

এবং তাদের (অর্থাৎ, অতীত জাতিসমূহের) কাছে যেসব সংবাদ এসেছিল, তাতে যথেষ্ট সতর্কবাণী বিদ্যমান ছিল। (সুরা কামার, আয়াত নং ৪)

অন্তরে নেককার ব্যক্তিদের ঘটনার প্রভাব

ইমাম জুনায়েদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

اَلْحِكَايَاتُ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللهِ تعالى، يُثَبِّتُ اللهُ بها قُلُوْبَ أَوْلِيائه.

আত্মশুদ্ধি ও পথনির্দেশিকামূলক ঘটনাবলি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাহিনীস্বরূপ। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অলিদের অন্তর দৃঢ় করেন।

কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এ কথার কোনো প্রমাণ আছে? উত্তরে তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে শোনালেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.

> আর আমি আপনার কাছে বিগত নবি-রাসূলদের ঘটনাবলি বর্ণনা করে আপনার অন্তরকে দিনের উপর দৃঢ়, অবিচল রাখি। (সুরা হুদ, আয়াত নং ১২০)

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

اَلْحِكَايَاتُ عَنِ الْعُلَمَاءِ و مَحَاسِنِهِمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْفِقْهِ. لِأَنَّهَا آدَابُ الْقَوْمِ وَأَخْلَاقِهِمْ.

> আলেমগণের কর্ম ও কীর্তি এবং তাদের উত্তম গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা আমার নিকট ফিকহের মাসআলা আলোচনা করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। কারণ জাতির আচার-ব্যবহার ও চরিত্র গঠনের মূল উপাদান।

দলিল: পবিত্র কুরআনের বাণী,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ.

> তারা হলেন এমন লোক, যাদের আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন, সুতরাং তোমরা তাদের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করো। (সুরা আনআম: ৯০)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

তাদের ঘটনায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (সুরা ইউসুফ: ১১১)

মুহাম্মাদ ইবনে ইউনুস রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ما رَأَيْتُ أَنْفَعَ للقَلْبِ مِنْ ذِكْرِ الصّالحِينَ.

আমি পুণ্যবানদের আলোচনার চেয়ে অন্তরের জন্য উপকারী আর কিছু পাইনি।

প্রখ্যাত তাবেয়ি মালেক ইবনে দিনার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

الحِكَايَاتُ تُحَفُ الجَنَّةُ.

জান্নাত আত্মশুদ্ধি ও পথনির্দিশনামূলক ঘটনাবলি দ্বারা বেষ্টিত।

অপর একজন বলেন,

استَكْثِرُوا مِنَ الْحِكَايَاتِ فَإِنَّهَا دُرَرٌ. وَ رُبَّمَا كَانَتْ فِيْهَا الدَّرَّةُ الْيَتِيْمَةُ.

তোমরা নেক লোকদের ঘটনাবলি বেশি বেশি বর্ণনা করো। কেননা সেগুলোতে অনেক দুর্লভ রত্ন ও মণিমুক্তা থাকে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

عِنْدَ ذِكْرِ الصّالحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ.

নেককার লোকদের আলোচনার সময় আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।[২]

---

[২] ইমাম হাফেয ইবনুস সালাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু আমর ইসমাইল ইবনে নুজাইদের সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি আবু জাফর আহমদ ইবনে হামদান নিশাপুরি র.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, (তারা উভয়ে নেক বান্দা ছিলেন), আমি হাদিস কী নিয়তে লিখব? তখন তিনি বললেন, তোমরা কি বর্ণনা কর না, পুণ্যবান ও ভালো মানুষকে নিয়ে আলোচনার সময় রহমত নাযিল হয়?

আবু উমর বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু জাফর বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো শ্রেষ্ঠমানব ও সবচেয়ে পুণ্যবান। (সে হিসেবে তার হাদিস লেখার সময় তো সবচেয়ে বেশি রহমত নাযিল হওয়ার কথা)। (দেখুন *মারিফাতু আনওয়ায়ি ইলমিল হাদিস* : পৃষ্ঠা নং ২০৯)।

এমন একটি কথা আছে ইমাম সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহকৃত *তাদরিবুর রাবি*: পৃ.৩৪৪, প্রকার নং ২৮; ইমাম আবু দাউদকৃত *মাসায়িলুল ইমাম আহমদ* : পৃ. ২৮৩।

আমি যে উক্তিগুলো এখানে বর্ণনা করলাম, সেগুলোর অধিকাংশই নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতে আছে: হাফেয ইবনে আবদুল বার র., *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*: ১: ১২৭। আল্লামা কাজি ইয়াজ, *তারতিবুল মাদারিক*: ১:২৩। হাফেয সাখাবি, *আল-ইলান বিত তাওবিখ লিমান যাম্মা আহলাত তারিখ*: ২০ এবং দ্বিতীয় সংস্করণের পৃ.৪১। ইতিহাসবিদ মাক্কারি রহিমাহুল্লাহকৃত *আযহারুর রিয়াদ*, ১:৪৫। মুহাম্মদ ইবনে ইউনুসের উক্তিটি ইমাম ইবনুল জাওযি র. তার গ্রন্থ *সিফাতুস সাফওয়া*-এর ভূমিকায় (১:৪৫) উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম জুনাইদ র.-এর উক্তিটি আমি উপরোক্ত কোনো একটি গ্রন্থে পড়েছি। তাছাড়া আল্লামা ইবনুল জাওযি প্রণীত হস্তলিখিত *আল-লুকাত ফি হিকায়াতিস সালিহিন* গ্রন্থের ভূমিকাতেও কথাটি আছে। এই গ্রন্থে তিনি ইমাম মালেক ইবনে দিনারের উক্তিটিও উল্লেখ করেছেন।

মুহাদ্দিসগণের প্রিয় বিষয়: মজলিসে অলিদের ঘটনা বর্ণনা করা

পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ হাদিসের মজলিসের মাঝে কিংবা শেষে শ্রোতাদের অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন ও তাদের উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে নেক লোকদের ঘটনাবলি বর্ণনা করাকে মুস্তাহাব মন করতেন। ইমাম আবু সাদ সামআনি তার গ্রন্থ *আদাবুল ইমলা ওয়াল ইস্তিমলা*-এর ৭০ নং পৃষ্ঠায় ইমাম হাফেয সুলাইমান ইবনে হারব থেকে বর্ণনা করেন। সুলাইমান বলেন, আমরা হাম্মাদ ইবনে যায়েদের নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদের কিছু হাদিস বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, এবার জান্নাতের কিছু ফল নিয়ে নাও। তখন তিনি আমাদের কিছু ঘটনা বর্ণনা করে শোনালেন। আবু হামেদ আহমদ ইবনে মামা ইস্পাহানি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাকিকে বলতে শুনেছি, (উলামায়ে কেরাম ও অলিদের) ঘটনাবলি হলো শস্যদানা। এগুলো ছিটিয়ে হৃদয় শিকার করা হয়। আবদুর রহমান ইবনে আখি আসমায়ি বলেন, আমার চাচা আমাকে বলেন, তাকে রশিদ বলেছেন, তোমরা

এজন্য আমি অধিকাংশ উক্তি ও ঘটনাবলি বুজুর্গদের নামসহ উল্লেখ করেছি, যেন তাদের নাম উল্লেখের সময় রহমত নাযিল হয়। এমনিভাবে আমি তাদের নাম উল্লেখের সময় তাদের উত্তম ও মহান জীবনচরিতের কারণে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' অথবা 'রাদিআল্লাহু আনহু' শব্দটি ব্যবহার করেছি। ইমাম আবু মুহাম্মাদ তামিমি হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমরা আমাদের (ইলম ও আমল) দ্বারা উপকৃত হও, আমাদের নামও উল্লেখ করো, অথচ আমাদের জন্য রহমতের দোয়া করো না।' [৩]

অধিক পরিমাণে আলেম-সালাফের ঘটনাবলি বর্ণনা করো, কেননা এগুলো ছড়ানো মুক্তা। এগুলোতে অনেক অমূল্য রত্ন-মুক্তা থাকে।

আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদের উক্তি: لَتَأْخُذُوْا مِنْ أَبْزَارِ الْجَنَّةِ 'তোমরা জান্নাতের কিছু ফল নিয়ে নাও'। এখানে আরবি أبزار শব্দটি بِزْرٌ-এর বহুবচন। শব্দটিতে কাসরা (যের) দেওয়া আছে। তবে এটি নসব (যবর) দিয়ে بَزْرٌ পড়া অধিক সহিহ। بَزْرٌ অর্থ- খাদ্য সুস্বাদু করার মশলা। এখানে শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মজাদার ঘটনা যা মানুষকে কল্যাণের প্রতি আগ্রহী করে এবং অন্তরের বিরক্তি ও একঘেয়েমি ভাব দূর করে (উদ্দীপনা আনয়ন করে)। কেননা সৎ ও পুণ্যবান লোকদের ঘটনাবলি যেমন মজাদার ও সরস, তেমনি শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক হয়ে থাকে। এগুলোর মাঝে আমাদের ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণ নিহিত থাকে।

[৩] দেখুন আল্লামা কাজি ইয়াজকৃত, *আল-ইলমা*: পৃষ্ঠা নং ২২৭। তার পুত্র মুহাম্মদকৃত *আত-তারিফ বিল কাজি ইয়াজ*: ৮২। ইবনে রুশাইদকৃত, *ইফাদাতুন নাসিহ*: ১১৩। ডক্টর আবদুল আযিয আহওয়ানিকৃত, *কুতুবু বারামিযিল উলামা ফিল আন্দালুস*, যা মা'হাদুল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যা-এর প্রথম খণ্ডে আছে।

আবু মুহাম্মদ আত-তামিমির পুরো নাম হচ্ছে, আবু মুহাম্মদ রিজকুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আবদুল আযিয ইবনুল হারিস তামিমি হাম্বলি বাগদাদি। তিনি হাম্বলি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। ৩৯৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বহুত বড়ো আলেম, ফকিহ, বুযুর্গ, ওয়ায়েজ ও বিশুদ্ধভাষী ছিলেন। হাম্বলি মাযহাবের ফকিহদের জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহে তার দীর্ঘ জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যেমন ইবনে রজব হাম্বলি

রহিমাহুল্লাহকৃত *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ* গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৭৭-৮৫ নং পৃষ্ঠায় এবং উলাইমিকৃত *আল-মানহাযুল আহমদ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৪-১৭০ নং পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা আছে।

উস্তাযের সঙ্গে আদব রক্ষা করা

শ্রদ্ধার সঙ্গে মাশায়েখে কেরামের নাম উল্লেখ করা যে শিষ্যের দায়িত্ব, এ বিষয়টি হাম্বলি মাযহাবের শায়েখ ইমাম আবুল খাত্তাব মাহফুজ ইবনে আহমদ কালওয়াযির (মৃত্যু ৫১০ হিজরি) একটি কবিতার ভাষায় এভাবে বাঙময় হয়েছে,

أَنَا شَيْخٌ وِلِلْمَشَائِخِ بِالْآدَا   بِ عِلْمٌ يَخْفَى عَلَى الشُّبَّانِ

فَإِذَا مَا ذَكَرْتَنِيْ فَتَــأَدَّبْ   فَهُوَ قَرْضٌ يُرَدُّ بِالْمِـــيْزَانِ

অর্থ: আমি একজন উস্তায, আর উস্তাযের প্রতি আদবের বিষয়টি তরুণ শিষ্যদের অজানা। সুতরাং তুমি যখন আমার নাম নিবে, আদবের সঙ্গে নিবে। এটি ঋণ হিসেবে থাকবে, মিযানের পাল্লায় তা ওজন করে তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

কবিতা পঙক্তিটি হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা* গ্রন্থে (১:৩৮৪) তাঁর ছাত্র আহমদ ইবনে আবিল ওফা-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

তাযিমের সঙ্গে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাম নেওয়া

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিস লেখকের উচিত আল্লাহর নাম লেখার সময় 'আযযা ওয়া জাল্লা' কিংবা 'তাআলা' অথবা 'সুবহানাহু ওয়া তায়ালা' কিংবা 'তাবারাকা ওয়া তায়ালা' অথবা 'জাল্লা যিকরুহু' বা 'তাবারাকাসমুহু' অথবা 'জাল্লাত আযমাতুহু' ইত্যাদি লেখা।

অনুরূপভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখের সময় 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সংক্ষেপে না লিখে পূর্ণরূপে লেখা। সালাত ও সালাম দুটাই লেখা। শুধু দুরুদ বা শুধু সালাম না লেখা।

এমনিভাবে সাহাবিয়ে কেরামের নাম উল্লেখের সময় রাদিআল্লাহু আনহু লেখা, যদি সাহাবি কোনো সাহাবির পুত্র হয়, তখন রাদিআল্লাহু আনহুমা লেখা। উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখের সময় রাদিআল্লাহু আনহু ও রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখা মুস্তাহাব। মূল যে কিতাব থেকে বর্ণনা করছে সেখানে না থাকলেও এগুলো লিখতে হবে। কারণ এগুলো রেওয়ায়েতের অংশ নয়, বরং দোয়া বাক্য।

হাদিস পড়ার সময়, যে কিতাব থেকে পড়ছে সেখানে এই দোয়া বাক্যগুলোর উল্লেখ না থাকলেও পড়তে হবে। বারবার পড়তে হলেও বিরক্ত হওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে যে গাফেল হবে সে বিশাল কল্যাণ ও ফযিলত থেকে বঞ্চিত হবে।' (দেখুন ইমাম নববিকৃত *শারহু মুসলিম* নামক কিতাবের ভূমিকা: ১:৩৯)

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ তাঁর *আযকার* নামক কিতাবে আরও বলেন, "সাহাবি, তাবেয়িন ও তাদের পরবর্তী কোনো আলেম, আবেদ ও বুজুর্গ ব্যক্তির নাম নিলে 'রাদিআল্লাহু আনহু' কিংবা 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' ইত্যাদি বলা।

কোনো কোনো আলেম বলেন, 'রাদিআল্লাহু আনহু' বাক্যটি শুধু সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। অন্যদের নামের সময় রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতে হবে। এ কথাটি সহিহ নয়। এর সঙ্গে একমত পোষণ করা যায় না। বরং অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য অনুযায়ী বিশুদ্ধ কথা হলো সাহাবি ব্যতীত অন্য কারও নাম নিলেও 'রাদিআল্লাহু আনহু' বলা মুস্তাহাব। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহিমাহুল্লাহ প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তুলে ধরেন,

> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.
>
> অর্থ: নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের পুরস্কার হলো সদা বসন্তের জান্নাত, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। *আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।* এসব তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। (সুরা বায়্যিনাহ, আয়াত নং ৭-৮)।

এই আয়াতে প্রথমে সাধারণ নেক মুমিন বান্দাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, চাই সে সাহাবি হোক কিংবা না। তারপর তাদের জন্য রাদিআল্লাহু আনহু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

যদি উল্লিখিত ব্যক্তি সাহাবি পুত্র সাহাবি হন, তখন এভাবে বলতে হবে, ইবনে উমর রাদিআল্লাহু **আনহুমা**, অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, ইবনে জাফর, উসামা ইবনে জায়েদ ও তাঁদের মতো আরও যারা সাহাবিপুত্র সাহাবি আছেন, তাদের সকলের ক্ষেত্রে রাদিআল্লাহু **আনহুমা** বলতে হবে। এভাবে পিতা-পুত্র উভয়ের জন্য রহমতের দোয়া করা হবে।' (দেখুন *আযকার* গ্রন্থের ১০০ নং পৃষ্ঠায় *আসসালাতু আলান নাবিয়্যি ওয়া আলিহিম তাবআন লাহুম* অধ্যায়)।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য

সৎ ও পুণ্যবান আলেমের নাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে নিতে হবে। এটি শুধু ইলমের দাবিই নয়, ইলম অনুযায়ী আমলেরও আলামত। কেউ যেন এটাকে কথার দীর্ঘায়ন বা অপ্রয়োজনীয় কিছু মনে না করে। যেমন পাশ্চাত্যবিদ ও তাদের অনেক অনুসারীরা এটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। আপনি তাদের দেখবেন, মানুষ গণনার সংখ্যা যেভাবে সংক্ষেপে লিখে সেভাবে তারা আইম্মায়ে কেরামের নাম কেটে সংক্ষেপে লিখছে।

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এই সংক্ষেপন সালাফের রীতি বহির্ভূত এবং মানুষ স্বভাগতভাবে বড়োদের প্রতি, আলেম ও নেককার ব্যক্তিদের প্রতি যে আদবের অনুভূতি লালন করে তার বিপরীত।

সম্মানের সঙ্গে তাদের নাম নেওয়া অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে ও মর্যাদার বীজ বপন করে এবং কথা-কাজে তাদের আদর্শ অনুসরণ ও তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

শায়খ আবুল হাসান আলি নদভি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

> 'সুস্থ স্বভাব ও রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মহৎ ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত অধ্যয়ন করে ও তাদের আলোচনা করে। সে বিনম্র চিত্তে সে সকল মহান ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করে, যারা তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করেছে কিংবা দেশ ও জাতির হয়ে লড়াই করেছে, নিজের ইজ্জত আব্রু, সম্মান, দিন ও আকিদা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেছে।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর বুকে উন্নত রুচি ও মানসিকতাসম্পন্ন যেসব জাতি আছে, তারা তাদের বীরদের কীর্তিগাঁথাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে যথেষ্ট সচেতন। পশ্চিমা জাতিগুলো তো একজন অজ্ঞাত সেনাকেও যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তার রেখে যাওয়া কীর্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এভাবে তারা জাতির সামনে তাদের কীর্তি ও গৌরবগাঁথা তুলে ধরে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের অনুসরণে উজ্জীবিত করে।

আর আল্লাহর রাসুলের অনুসারী মুমিন বান্দাগণ তো সকল জাতি ও গোষ্ঠীর কীর্তিমান ও মহৎ ব্যক্তিদের চেয়ে ভালো কর্মের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিক হকদার। তাছাড়া নেক ও মহৎ কর্মের স্বীকৃতি দান, পূর্ববর্তীদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের অনুগ্রহ ও অবদানকে স্মরণ করা-এগুলো মুমিনদের গুণ। এ কথা মহান রাব্বুল আলামিন-ই আমাদের বলেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

আর পরবর্তীরা (দোয়ায়) বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ও পূর্ববর্তী ইমানদারদের ক্ষমা করুন! আর আমাদের অন্তরে ইমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা বিদ্বেষ রাখবেন না। প্রভু! আপনি অতি মমতাময়, দয়ালু। (সুরা হাশর, আয়াত নং ১০)

অপরদিকে কাফের ও জাহান্নামিদের স্বভাব হচ্ছে, তারা অকৃতজ্ঞ, অস্বীকারকারী, পূর্ববর্তীদের উপর অভিসম্পাত ও ঘৃণা বর্ষণকারী এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا.

যখনই কোনো দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা অপর দলকে অভিসম্পাত করবে। (সুরা আরাফ, আয়াত নং ৩৮)

মুহাদ্দিস শায়খ আইদারুস ইবনে উমর হাবশি আলাবি হাযরামি (১২৩৭-১৩১৪ হিজরি) কোনো শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জনের ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

আমাদের এক শায়খ বলেন, 'যাকে আল্লাহ তায়ালা উস্তাযদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করার তওফিক দান করেছেন, তার উচিত উস্তাযদেরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, তাঁদের ভালো গুণগুলোর আলোচনা করা, তাঁদের জ্ঞানের প্রচার করা এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির দোয়া করা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, একজন ছাত্র উস্তাযের কাছ থেকে যে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করে, তা তার পিতা থেকে বেশি। তাই উস্তাযের সম্মান সবসময় পিতার সমান, বরং পিতার চেয়ে অধিক। তার হক আবশ্যক। তার উপকার চিরস্থায়ী। তার অনুগ্রহ উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। তার হক আরও অধিক। তাই তার এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা কর্তব্য। তার উচিত আলেমগণ উস্তাযের সঙ্গে যেসব আদব বজায় রাখার কথা

বিভিন্ন জাতির মাঝে মুসলিম জাতির অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। নেক ও মহৎ কর্মের স্বীকৃতি দানকারী। মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। পূর্ববর্তীদের কীর্তির হেফাজতকারী ও তাদের জন্য বেশি বেশি রহমতের দোয়াকারী।' (নদভি রহিমাহুল্লাহর আলোচনাটি এখানে শেষ হল, আলোচনাটি তার পূর্বপুরুষ শায়খ আহমদ বিন ইরফান শহিদের জীবনীর উপর রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-ইমামুল্লাযি লাম ইওয়াফফা হাক্কাহু মিনাল-ইনসাফি ওয়াল ইতিরাফ :* ৬-৭ পৃষ্ঠায় আছে।)

আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গ্রন্থের শুরুতে এমন দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা এজন্য করেছি, আজকাল অনেকে পাশ্চাত্যবিদদের অনুসরণ করে কোনোরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার ব্যতীত বড়ো বড়ো আলেম, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও আইম্মায়ে কেরামের নাম নিয়ে থাকে। আমরা আশা করছি, আমাদের এ আলোচনার দ্বারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পরিবর্তন আসবে। তারা এমনভাবে বড়োদের নাম উল্লেখ করে থাকে, মনে হয় কোনো ছোটো বাচ্চা কিংবা সাধারণ মানুষ ও অপরিচিত ব্যক্তিদের নাম নিচ্ছে, যাদের মাঝে অগাধ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সমাহার ছিল না এবং পৃথিবীর মানুষও তাদের দ্বারা আলোকিত হয়নি।

বলেছেন, সেসব আদব বজায় রাখা।' (দেখুন, *উকুদুল লাআলি ফি আসানিদির রিজাল*: ২৯)

ইমাম মাক্কি ইবনে আবু তালেব কাইরুআনি রহিমাহুল্লাহ[৪] বলেন,

'চিরস্থায়ী প্রতিদান ও বিপুল সওয়াব লাভের আশায় গ্রন্থটি রচনার কাজ আমি দ্রুত করেছি। আল্লাহ তায়ালা লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্য গ্রন্থটিকে উপকারী সাব্যস্ত করুন। প্রত্যেক দিনদার ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে আমার এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছে কিংবা জ্ঞান অর্জন করেছে, তার কর্তব্য গ্রন্থকার, যিনি মেধা ও শ্রম দিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তার জন্য রহমতের দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আমি মনে করি এই বইটি রচনা করতে আমাকে যে শ্রম দিতে হয়েছে, যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, এর সবচেয়ে বড়ো ফযিলত হচ্ছে, কেউ আমার জন্য রহমতের দোয়া করবে, তা পড়ে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, কিংবা আমার উত্তম আলোচনা করবে। আমার এই ছোট্ট আশাটি যে পূরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার উপর রহম করুন।' [৫]

অধম আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহরও এই কামনা। আল্লাহ তায়ালা সদাচারকারীদের উত্তম বিনিময় দান করেন।

---

[৪] তিনি ৪৩৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। উপরিউক্ত আলোচনাটি তার *আল কাশফু আন উয়ুহিল কিরাআতিস সাবয়ি* নামক কিতাবের ভূমিকায় আছে।

[৫] ইমাম মাক্কি ইবেন আবি তালেব র. ৪৩৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

নেক লোকদের আলোচনার সময় উলামায়ে কেরামের আদব

সালাফগণ নেক লোকদের আলোচনার সময় তাদের প্রতি তাযিম ও শ্রদ্ধার কারণে আদবের সঙ্গে বসতেন। যদিও তারা সেখানে অনুপস্থিত। আমরা আদবের সঙ্গে বসতে না পারলেও অন্তত আমাদের উচিত, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করা, তাদের নাম বলা বা শোনার সময় রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলা।

ইমাম ইবনে মুফলিহ হাম্বলি রহিমাহুল্লাহকৃত তার *আল-ফুরু* নামক গ্রন্থে (১:১৯৫), হাফেয যাহাবি রহিমাহুল্লাহ *তাযকিরাতুল হুফফাজ* নামক গ্রন্থে (১:২১৩), হাফেয ইবনে হাজার *তাহযিবুত তাহযিব* নামক গ্রন্থে (১:১৩০) বলেন, আবু যুরআ রাযি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

'আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর নিকট ছিলাম, ইবরাহিম ইবনে তাহমান, যিনি একজন আলেম ও নেককার লোক ছিলেন। ১৬৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর সময় জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, তার মৃত্যুর পর তার মতো আর কাউকে পাওয়া যায়নি-তাঁর আলোচনা উঠলে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ সোজা হয়ে বসলেন, অসুস্থতার কারণে তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। ইমাম আহমাদ বলেন, নেক লোকদের আলোচনার সময় আমার হেলান দিয়ে বসে থাকা উচিত না। আবুল ওফা ইবনে আকিল রহিমাহুল্লাহ *ফুনুন* নামক গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, পিঠ সরিয়ে নিয়ে বললেন, নেক লোকদের আলোচনা চলাকালীন হেলান দিয়ে বসে থাকা উচিত না।'

নেক লোকের সাহচর্য ও তাদের আলোচনার ফযিলত

নেক লোকের সাহচর্য গ্রহণ করা কিংবা তাদের কথা শ্রবণ করা, অথবা তাদের থেকে হাদিস শ্রবণ করা, কিংবা তাদের জীবনী অধ্যয়ন করা-এগুলোর দ্বারা আত্মার অনাবিলতা ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়, আমল-আখলাক পরিশুদ্ধ হয়।

হাফেয কুরাশি রহিমাহুল্লাহ তাঁর *আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা* নামক গ্রন্থের শুরুতে (১:৩) বলেন, 'পবিত্র কুরআনের বাণী,

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبِ.

> শুনে রাখো; আল্লাহ তায়ালার যিকিরের দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।

এই আয়াতের তাফসিরে সালাফ তথা পূর্ববর্তী এক দল ইমাম বলেন, এখানে যিকির বা আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা। এজন্য যে, বিভিন্ন কারণে তারা এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা মুবারক দর্শন; দ্বিতীয়ত, তাঁদের ইলম। তৃতীয়ত, উত্তমরূপে রাসুলের অনুসরণ। এ ছাড়া আরও অন্যান্য কারণ রয়েছে।[৬]

---

[৬] সাহাবির পরিচয়, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্যের ফযিলত ও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এর প্রভাব

ইমাম ইবনে হাজাম যাহেরি রহিমাহুল্লাহ তাঁর *আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম* গ্রন্থে (৫:৮৯) সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সাহাবি হলেন তারা, যারা রাসুলের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যদিও তা এক মুহূর্তের জন্য হোক, তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনেছেন যদিও তা একটি মাত্র শব্দ হোক, কিংবা তাঁকে কিছু করতে দেখে তা মুখস্থ করে নিয়েছেন এবং তিনি সেসব মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত নন, যারা আজীবন মুনাফিক হিসেবে পরিচিত ছিল এবং মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ, অনুসরণীয়, মহান ও আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। তাদের ইজ্জত ও সম্মান করা, তাদের জন্য ইস্তেগফার করা, তাদের মহব্বত করা আমাদের জন্য ফরয। তাদের যে কারও মাত্র একটি খেজুর সদকা করা আমাদের কারও সমুদয় সম্পদ সদকা করার চেয়ে উত্তম। নবিজির সঙ্গে তাদের যে কারও একবার বসা আমাদের যে কারও সারাজীবন ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। আমাদের

কারও সারাজীবনের আমলও কোনো সাহাবির এক মুহূর্তের আমলের সমতুল্য নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

دَعُوْا لِيْ أَصْحَابِيْ فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نِصْفَهُ.

> তোমরা আমার সাহাবিদের সমালোচনা ছেড়ে দাও। যদি তোমাদের কারও উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, আর সে তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাহলে তা তাদের এক মুদ অথবা আধা মুদ পরিমাণ সদকার সওয়াবের সমপরিমাণ হবে না। (এক মুদ প্রায় আটশ গ্রাম) (আলোচনাটি শেষ হলো)

(আমাদের কারও সারাজীবন ইবাদত...) এই কথাটি ইবনে হাজাম যাহেরির *আল-ফিসাল* নামক গ্রন্থ থেকে (৪:২০১) নেওয়া হয়েছে।

ইবনে হাযাম যাহেরী যদিও যাহেরী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। সুফি ছিলেন না। তথাপি তিনি সাহাবায়ে কেরামের শ্রদ্ধা ও সম্মান সম্পর্কে দেখুন কত মূল্যবান কথা বলেছেন!

উলামায়ে কেরামের মত হল, রাসুলের সান্নিধ্যে এক মুহূর্ত থাকা, কিংবা এক নজর তাকে দেখা, অথবা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে একটি শব্দ হলেও শোনার দ্বারা যে কেউ সাহাবি হওয়ার মহাসৌভাগ্য লাভ করে। এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সমুচ্চ মর্তবার কারণে হয়ে থাকে। কেননা, নবিজির দর্শন লাভের দ্বারা নবুয়তের নুর মুমিনের অন্তরে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, এর ক্রিয়া ও প্রভাব তার মাঝে সারাজীবন থাকে। এর বরকতে সে আজীবন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে অবিচল থাকে।

এ কথার প্রমাণস্বরূপ নবিজির নিম্নোক্ত হাদিসটি তুলে ধরা হচ্ছে, যা মহান সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

> ‘ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে আমাকে দেখেছে এবং আমার উপর ইমান এনেছে, ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে আমাকে যে দেখেছে তাকে দেখেছে এবং আমার সাহাবিকে যে দেখেছে তাকে দেখেছে ও আমার প্রতি ইমান এনেছে। তাদের সবার জন্য আছে সুসংবাদ ও উত্তম ঠিকানা।’

বরকতের কারণে তাবেয়িগণও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে এই মর্যাদার অংশীদার। তাই তাদের আলোচনার দ্বারাও অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অনুরূপভাবে তাদের পরবর্তীতে কেয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করবে তাদের আলোচনার দ্বারাও।' (ইমাম কুরাশির আলোচনাটি এখানে শেষ হলো।)

(তবারানি এবং ইমাম হাকেম এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ইমাম সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ-এর কিতাব *জামে সগিরে* আছে, যা আল্লামা মুনাবি রহিমাহুল্লাহ ব্যাখ্যা করে *আত-তাইসির* নাম দিয়েছেন। (২:১১৯)

ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকি উসুলে ফিকহের কিতাব *আল ইবহায ফি শারহিল মিনহায*-এ (১:৯) বলেন, মুমিন অবস্থায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে এমন প্রত্যেককে সাহাবি বলে। নবিজির সান্নিধ্য সৌরভ ও তাঁর দর্শনের মর্তবার কারণে এ সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। কেননা আমরা জানি যে, নেক লোকদের দর্শন লাভের বিরাট প্রভাব আছে। তাহলে যিনি সমস্ত নেক লোকের সর্দার তাঁর দর্শন লাভের প্রভাব কেমন হতে পারে? এজন্য ইমান অবস্থায় কেউ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে তার মন আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল হয়ে যায়। আর তা এ কারণে যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে এমনিতেই তাঁর অন্তর গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। এর সঙ্গে যখন সে নবুয়তের মহান নুরের দেখা পেল, তখন তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং সর্বাঙ্গে তার প্রভাব প্রতিফলিত হল।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এত শতাব্দী পরে এসেও আমাদের কেউ যখন কোনো নেককার মুত্তাকি আলেমের সাক্ষাৎ লাভ করে, যদিও তা এক মুহূর্ত কিংবা কয়েক মিনিটের জন্য হোক, তাতে সে অন্তরের এমন খোরাক পেয়ে থাকে, যার স্বাদ সে আজীবন উপভোগ করে এবং যখনই সে সেই সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে, তা তাকে ভাল কাজে ও আল্লাহর আনুগত্যে উৎসাহ যোগায়। তাহলে এবার চিন্তা করে দেখুন, যিনি সমস্ত সৃষ্টি ও নবি রাসুলদের সর্দার, তাঁর দর্শনের ফযিলত ও বরকত কেমন হতে পারে! উত্তম সান্নিধ্যের ফযিলত বিষয়ক আলোচনাটি এখানে দীর্ঘ হয়ে গেল। সান্নিধ্য সৌরভের এ বিষয়টি আজকাল অনেকের ভেতর থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। কারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা ভ্রান্ত ও মনমগজ পঙ্কিলময় হয়ে যাচ্ছে। তাই তা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে।

মানুষের অন্তরসমূহকে সৎ লোকদের প্রতি ভালোবাসা, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ও আদর্শ গ্রহণের প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য তুমি দেখবে, আমি এই গ্রন্থের টীকাসমূহে উলামায়ে কেরাম, নেককার, ইবাদতগুজার, মুজাহিদ, দুনিয়াবিমুখ ও ধৈর্যশীলদের বিভিন্ন বাণী ও ঘটনাবলি (অধিক পরিমাণে) উল্লেখ করেছি। এগুলো একজন মুমিনের মাঝে তাদের আদর্শ, জীবন ও কর্মধারা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং নিজের দিনের ব্যাপারে, ত্যাগ ও কুরবানির ক্ষেত্রে, ধৈর্য ও বিপদাপদে তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। সর্বোপরি পূর্বসূরিদের যোগ্য উত্তরসূরি হওয়ার এক অভীপ্সা তার মাঝে জাগ্রত করে। যেমনটি নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিতে বলা হয়েছে:

وتَشَبَّهُوا إن لمْ تَكُونُوا مِثلَهُمْ　　إنَّ التشبُّهَ بالكرامِ فَلَاحُ

তাদের মতো হতে না পারলে অন্তত তাদের বেশ ধারণ করো। কারণ মহৎ লোকদের বেশ ধারণ করার মাঝেও সফলতা ও কামিয়াবি রয়েছে।

তিনটি বিষয়ের কারণে পার্থিব জীবনকে ভালোবাসা

জ্ঞানী ও নেক লোকদের বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে নেককারদের সাহচর্য লাভ করা কিংবা তাদের শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক ঘটনাবলি শোনা, অথবা তাদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা। তাদের নিকট পার্থিব জীবন শুধু এ কারণে পছন্দনীয় ছিল যে, তারা তাতে উত্তম গুণাবলিসমূহ অর্জন, নেক আমল বৃদ্ধি ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পার্থিব জীবনে তিনটি বিষয় না থাকলে আমি কখনোই দুনিয়ায় থাকতে চাইতাম না। ১- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা কিংবা জিহাদের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করা। ২- রাত জেগে ইবাদত করা। (অর্থাৎ, বিরাট প্রতিদান লাভের আশায় রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ও ইবাদত করা।) ৩-এমন লোকদের সাহচর্য লাভ করা, যারা ভাল খেজুরের বাছাইয়ের মতো ভাল কথা বাছাই করে।[৭]

---

[৭] শায়খ ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ ইলমের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'১০৮ নং ফযিলত হলো, অনেক ইমাম বলেছেন, ফরয নামাজের পর সর্বোত্তম আমল ইলম হাসিল করা। আর ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ-এরও শিষ্যগণ বলেছেন, তারও একই অভিমত। সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ-এরও একই অভিমত। হানাফিগণ ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাসেম বলেন, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ-এরও অনুরূপ অভিমত।

অপরদিকে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মতটি হচ্ছে, ফরয নামাজের পর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে ইলম অন্বেষণ করা। দ্বিতীয়: ফরয আমলসমূহের পর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে নফল নামাজ পড়া। তৃতীয়: জিহাদ।

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে জিহাদ, ইলম ও ইবাদত- এ তিনটি গুণের সমন্বয় ছিল

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ আরও বলেন,

'শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, নামাজ, ইলম ও জিহাদ- এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে প্রত্যেক ইমাম প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এগুলো সেই তিনটি বিষয়, যেগুলো সম্পর্কে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দুনিয়ার জীবনে তিনটি বিষয় না থাকলে আমি কখনোই দুনিয়ায় থাকতে চাইতাম না। ১. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা কিংবা জিহাদের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করা। ২. রাতে ইবাদতে কষ্ট করা। ৩. এমন লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করা, যারা ভাল কথা এভাবে বাছাই করে, যেভাবে ভাল খেজুর বাছাই করা হয়।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পছন্দের তিনটি বিষয়ের প্রথমটি জিহাদ। দ্বিতীয়টি কিয়ামুল লাইল (রাত জেগে নামাজ পড়া)। তৃতীয়টি ইলমের আলোচনা। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এই তিনটি গুণেরই একত্র সন্নিবেশ ছিল। আর পরবর্তীদের মাঝে যে কোনো একটি।' (দেখুন ইমাম ইবনুল কায়্যিম রচিত *মিফতাহু দারিস সাআদাহ:* ১২৯-১৩০ নং পৃষ্ঠা।)

রিসালাতুল মুসতারশিদিন-এর পাঠকের কাছে আমার প্রস্তাব থাকবে, সে যেন আমার *সাফাহাতুম মিন সাবরিল উলামা আলা শাদাইদিল ইলমি ওয়াত তাহসিল* কিতাবটিও পড়ে। এই কিতাবটি পড়লে সে উলামায়ে কেরামের ফযিলত এবং ইলম অর্জনে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা জানতে পারবে। তার মাঝে আলেমদের প্রতি

বক্তার পরিচয় জানার দ্বারা বক্তব্যের আবেদন বেড়ে যায়

তুমি এই গ্রন্থে দেখবে আমি প্রতিটি কথা রেফারেন্স ও যিনি বলেছেন তার নামসহ উল্লেখ করে দিয়েছি। কথাটি চাই যত সংক্ষেপ হোক কিংবা ছোট। কারণ রেফারেন্স ও কথকের নামসহ উল্লেখ করলে কথাটির মর্ম ও অর্থ পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। অন্তরে কথার প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায় কেবল বর্ণনাকারী ও বক্তার দৃঢ়তা, সততা, একনিষ্ঠতা, ধার্মিকতা, জ্ঞান, আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিমুখতা ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার কারণে। যেন বক্তার পরিচয় দ্বারা বক্তব্যের আবেদন ও মর্ম পূর্ণতা লাভ করে।

শায়খ আবু আমর জাহেয তার *আল-বুখালা* নামক গ্রন্থের ৬ নং পৃষ্ঠায় কোনো বক্তব্যকে বক্তার নামসহ উল্লেখের ফায়েদা এবং নামহীন উল্লেখের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে বলেন,

'এই গ্রন্থে কিছু কথা এমন আছে, যেগুলোর কথকের পরিচয় না জানলে কথাগুলোর সৌন্দর্য পূর্ণরূপে ফুটে উঠে না। শুধু তাই নয়, কোনো কথা ও বক্তব্যের সৌন্দর্যকে পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য সেগুলোর উপযুক্ত যারা, তাদের নাম উল্লেখ ও এর উপযুক্ত উৎসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিতে হয়। নাহয় কথার লাবণ্য ও সজীবতা অর্ধেক নষ্ট হয়ে যায়।

তুমি যদি ওয়াজ, নসিহত ও যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতামূলক কোনো কথা বলো-তারপর বলো, এটি বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানি, আমের ইবনে আবদ কায়েস আমবারি, মুআররিক ইযলি অথবা ইয়াযিদ রাকাশির কথা, যারা সকলেই দুনিয়াবিমুখ ও নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাহলে দেখবে কথাটির সৌন্দর্য কয়েকগুণ বেড়ে গেছে এবং কথকের নাম

ভালোবাসা ও মর্যাদার অনুভূতি সৃষ্টি হবে। সে তখন ইলম ও আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা পছন্দ করবে। আর এর মাঝে সমূহ কল্যাণ নিহিত আছে। পাঠক যেন অবশ্যই সেই কিতাবটির তৃতীয় সংস্করণটি পড়ে। অন্যান্য সংস্করণের চেয়ে এই সংস্কররণটি আরও বিশদ, পূর্ণাঙ্গ ও অধিক তথ্যবহুল হয়েছে।)

উল্লেখের কারণে কথাটির মান ও সজীবতা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। নাম উল্লেখ না করলে কথাটির আবেদন এত উচ্চ স্তরে পৌঁছত না।

অনুরূপভাবে ওয়াজ নসিহত বিষয়ক কোনো কথা বলে যদি তুমি বলো, এটি আবু কাব সুফি যিনি একজন কৌতুককার ছিলেন, কৌতুক বলে লোক হাসাতেন, তার কথা কিংবা কবি আবু নুআস, অথবা হুসাইন খলি-এর কথা, তাহলে ওয়াজ নসিহতমূলক সে কথাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে না। শুধু মূল কথাটির ভেতরে যে সৌন্দর্যটুকু সেটুকু থাকবে। আসল কথা হলো, এভাবে কথাটির আবেদন ও হক নষ্ট হয়ে যায়।' (আবু আমর জাহেজের আলোচনাটি শেষ হল)

সুতরাং এ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, বক্তব্যের সঙ্গে বক্তার নাম উল্লেখের দ্বারা বক্তব্যের মান, আবেদন ও প্রভাবে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এটি খুব স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত বিষয়।

শিক্ষণীয় ও প্রভাবমণ্ডিত ঘটনা নির্বাচনে আমার আগ্রহ

গ্রন্থে যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, আমি চেষ্টা করেছি সেগুলোতে যেন এমন মূল্যবান দিঙনির্দেশনা, পথনির্দেশক ও উত্তম আখলাকের কথা থাকে-ঘরে বাইরে, পরিবার ও সমাজে আমাদের মুসলিম যুবক-যুবতীদের যার ভীষণ প্রয়োজন। তাহলে তা তাদের সঙ্গে আবাসে সঙ্গী ও প্রবাসে পাথেয় স্বরূপ থাকবে। আর এগুলো অনিরাপদ পরিবেশে থাকা সহজ-সরল একজন ছাত্রেরও ভীষণ প্রয়োজন, যাকে সবদিক থেকে ধেয়ে আসা প্রলুব্ধকারী প্রতারণার মুকাবেলা করতে হয়। পাশাপাশি যার সমাজের সবকিছুতে মিশে বসবাস করতে হয়, সে যেন সমাজের স্রোত মুকাবেলা করতে পারে। নিজের ইমান-আকিদা দৃঢ় করা, চরিত্র গঠন করা, নষ্ট পরিবেশে নেক আমলের উপর বেড়ে উঠা এবং সালাফে সালেহিনের জীবনী থেকে শিক্ষা লাভ করে নিজেকে চতুর্দিক-বেষ্টন-করা আপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এগুলো অধ্যয়ন করা ভীষণ প্রয়োজন।

আর প্রবাসে থাকা একজন মুসলিম যুবকের জন্য আত্মার এই নির্ভেজাল খোরাকের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি, যাতে সে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা

এগুলো লাভ করতে পারে। এভাবে সে তার ব্যক্তিত্বকে বিজাতীয় সংস্কৃতির চমৎকারিত্বের সামনে গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে এবং মন্দাচার থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারবে, যেগুলো বাহ্যত সুন্দর ও আকর্ষণীয় হলেও আসলে ধ্বংসাত্মক। আর আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই গ্রন্থটিকে কবুল করেন, এর দ্বারা সবাইকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। প্রতিদান দিবসের দিন নেকির পাল্লায় রাখেন, (যেদিন আল্লাহ তায়ালা নবি ও তার সঙ্গে মুমিনদের অপদস্থ করবেন না। তাদের নুর তাদের সামনে ও ডান পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে, প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের নুরকে পূর্ণ করে দিন, আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।) (যেদিন আপনি মুমিন নর-নারীদের দেখবেন, তাদের সামনে ও ডান পাশে নুর ধাবিত হচ্ছে, (সেদিন তাদের বলা হবে) তোমাদের জন্য রয়েছে আজ এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে, যেখানে তোমরা চিরস্থায়ী থাকবে। আর সেটাই মহান সফলতা।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
বৈরুত, ১৯ জুমাদাল উলা, ১৩৯১ হিজরি।

শায়খ হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলুফের বাণী

প্রথম সংস্করণের জন্য মিসরের সাবেক মুফতি, মুহাক্কিকে কাবির, যুগের অন্যতম ইমাম, শায়খ হাসনাইন মাখলুফ এই বাণীটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। ১৪১০ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখানে তাঁর সেই বাণীটি তুলে ধরা হলো।

আমার ভাই ও বন্ধু অধ্যাপক, আল্লামা, মুহাক্কিক, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ-এর প্রতি,

হামদ ও সালাতের পর,

আপনার বরকতময় চিঠিটি পেয়েছি। চিঠিটি খুব উচ্চ মর্মসমৃদ্ধ। দোয়া করি, আল্লাহ যেন আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং আমাকে আপনার পূর্ণ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না করেন।

'রিসালাতুল মুসতারশিদিন' আমি পড়েছি আর শুধু স্বাদ অনুভব করেছি। আমার ভাল লেগেছে। আর আপনার টীকাগুলো পড়ে মনে হয়েছে, মূল গ্রন্থ থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য এগুলোর প্রয়োজন ছিল।

এতটুকু লিখতে গিয়ে কলম থেকে আরও কিছু কথা ঝরল। কিতাবের শুরুতে আমি তা লিখে রেখেছিলাম। আপনি চাইলে কথাগুলো ছেপে দিতে পারেন।

সেই কথাগুলো হলো

সালাম বা'দ, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আপনাকে ইমাম আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবির *রিসালাতুল মুসতারশিদিন* নামক কিতাবটি মূল্যবান তাহকিকের সঙ্গে ছাপানোর তৌফিক দিয়েছেন। এই তাহকিক রিসালাটির সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য যেমন বাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি আপনার গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম গবেষণার বিষয়টিও প্রকাশ করেছে। এতে কিতাবটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও উপকারী হয়েছে। ইলম ও আহলে ইলম এবং হারেস মুহাসেবির মতো মহান ইমামের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি আত্মার ভাল ও মন্দ কর্মের বিষয়ে উম্মাহর পথপ্রদর্শক, আত্মার ব্যাধি, আমল ও ইবাদত নষ্টের কারণ নিয়ে সর্বপ্রথম তিনি আলোচনা করেছেন।

তাসাউফের প্রকারভেদ

১-ত্রুটিহীন পরিচ্ছন্ন ইসলামি তাসাউফ

ইমাম মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তী মুখলিস সুফিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হাদিস, ফিকহ ও কালামশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তার রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। অধিকাংশই তাসাউফ, আত্মশুদ্ধি, দুনিয়াবিমুখতা ও মারেফতের বিষয়ে।

ইসলামি তাসাউফ হচ্ছে আত্মার জ্ঞানমূলক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের নাম। আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা, ভালোগুণ রোপন, মন্দগুণ সমূলে উৎপাটন, প্রবৃত্তির দমন এবং সবর, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও তাঁর আনুগত্য অনুশীলনের নাম।

ইসলামি তাসাউফ হচ্ছে নফসের মুজাহাদা, নফসের চাহিদাকে দমন, সূক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষণ, অন্তরকে গাফলত ও কুমন্ত্রণামুক্ত রাখা, আল্লাহর পথে অন্তরায় সবকিছু থেকে দূরে থাকা, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে গাইরুল্লার দিকে ধাবিতকারী সবকিছু থেকে দূরে থাকার নাম।

ইসলামি তাসাউফ হচ্ছে, আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর উপর দৃঢ় ইয়াকিন, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর মর্যাদার বিশ্বাস, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁর প্রতি অভিনিবেশ, তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে ডুবে থাকা, তাঁর শরিয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন না করা, শরিয়তের অনুসরণ করা এবং তিনি তাঁর অলি ও বন্ধুদের নিজ অনুগ্রহ ও বদান্যতায় বিশেষভাবে যেসব নেয়ামত দান করেছেন সেগুলো লাভ করার চেষ্টা করা।

মোটকথা, ইসলামি শাস্ত্র হিসেবে তাসাউফ সংকলন হওয়ার আগে ও পরে তাসাউফ সম্পর্কে শুধু এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট যে, তাসাউফ হচ্ছে ইলম ও হেকমত, নুর ও হেদায়েত, তারবিয়াত ও ইসলাহ, চিকিৎসা ও ব্যাধি থেকে সুরক্ষা, তাকওয়া তথা খোদাভীতি ও অবিচলতা, সবর ও জিহাদ এবং দুনিয়ার ফেতনা ও চাকচিক্য থেকে দূরে থাকার নাম।

আবু মুহাম্মাদ জারির তাসাউফের বর্ণনা দিতে গিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, তাসাউফ হচ্ছে সর্বপ্রকারের উত্তম চরিত্র গ্রহণ করা এবং মন্দ চরিত্র বর্জন করা। তিনি আরও বলেন, তাসাউফ হচ্ছে, অন্তরের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ এবং সর্বাবস্থায় আদব বজায় রাখা।

আদবের ব্যাপারে ইমাম কুশাইরি রহিমাহুল্লাহ তার *জিমাউ খিসালিল খাইরি* নামক রিসালায় বলেন, আদব হচ্ছে তাফাক্কুহ ফিদ দিনের তথা দিনের অন্তর্জ্ঞান, দুনিয়াবিমুখতা এবং আল্লাহ তায়ালার হক সম্পর্কে জানার নাম।

আবু নাসর সিরাজ বলেন, আদবের ক্ষেত্রে মানুষ তিন স্তরের:

১. **দুনিয়াদার:** তাদের নিকট আদব হচ্ছে শুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দর ভাষায় কথা বলা, বিভিন্ন কবিতা পঙক্তি, তথ্য ও তত্ত্ব মুখস্থ করে রাখা।

২. **দিনদার:** তাদের নিকট আদব হচ্ছে আত্মার পরিশীলন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সাধিত কর্মের সংশোধন, শরিয়তের আদেশ-নিষেধের সীমারেখার হেফাজত ও প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জনের নাম।

৩. **সুফি:** তাদের নিকট আদব হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করা। তার গোপন ভেদ সম্পর্কে জানা। আল্লাহর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা। সময়ের হেফাজত করা। স্বল্প চাহিদা পূরণ করা। অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা ও তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের স্থানে তাঁর প্রতি তাযিম ও সম্মান বজায় রাখা।

মোটকথা, তাসাউফ হচ্ছে শরিয়তের মূল, সারাংশ, শরিয়তের রূহ, ফলাফল ও হেকমত। হযরত জুনায়েদ বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের এই তাসাউফের জ্ঞান কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে কুরআন পড়েনি, হাদিস লিখেনি, তাসাউফের বিষয়ে সে অনুসরণযোগ্য নয়। তাকে অনুসরণ করা যাবে না। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ ছাড়া ইবাদতের অন্য কোনো রাস্তা নেই।

ইসলামি শরিয়তের জ্ঞানের এই বিশেষ প্রকারটিকে তাসাউফ ও ইলমে হাকিকত নামে প্রথম যুগেই নামকরণ করা হয়েছে-যেমনটি ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দামায় লিখেছেন। আর ইসলামি শরিয়তের জ্ঞানের আরেকটি প্রকার, যা ইবাদত ও মুআমালাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই প্রকারটিকে ফিকহ কিংবা ইলমে শরিয়ত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

কোনো কোনো সুফি একজন পরিপূর্ণ মুসলিমের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বৈষয়িক ও আত্মিক ব্যক্তিত্ব গঠনে ইসলামি শরিয়তের জ্ঞানের এই উভয় প্রকারের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেন, ফিকহবিহীন তাসাউফ বাতিল। আর তাসাউফবিহীন ফিকহও অকার্যকর। একজন মুসলিমের জন্য তাসাউফ ও ফিকহ হচ্ছে পাখির দুটি ডানার ন্যায়। পাখি যেমন শুধু একটি ডানার উপর ভর করে উড়তে পারে না, তেমনি একজন মুসলমানও তাসাউফ ও ফিকহের যে কোনো একটি ব্যতীত সফলতা লাভ করতে পারে না।

এটিই হচ্ছে ত্রুটিমুক্ত স্বচ্ছ তাসাউফ, যাতে কোনো বক্রতা ও বাড়াবাড়ি নেই। মূর্খতা ও বিদআত নেই৷। এই তাসাউফ সে সকল আলেমের তাসাউফ, যারা আল্লাহর মারেফত লাভকারী, ইবাদতগুজার, শরিয়তের সীমা রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং যারা সর্বদা শরিয়তের দৃঢ় অনুসারী ছিলেন। যেমন, আবু সাইদ হাসান বসরি (মৃত্যু ১১০ হিজরি), আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে আদহাম বলখি (মৃত্যু ১১৬ হিজরি), আবু সুলাইমান দাউদ ইবনে নুসাইর তায়ি (মৃত্যু ১৬৫ হিজরি), আবু আলি ফুযাইল ইবনে ইয়াজ খুরাসানি (মৃত্যু ১৮৭ হিজরি, মক্কায়), আবু মাহফুজ মারুফ ইবনে ফাইরুয কারখি (মৃত্যু ২০১ হিজরি, বাগদাদে)।

আরও আছেন বাগদাদের আবু নাসর বিশর বিন হারেস মারওয়াযি (মৃত্যু ২২৭ হিজরি), রিসালাতুল মুসতারশিদিনের মূল লেখক আবু আবদিল্লাহ হারেস বিন আসাদ মুহাসেবি বাসরি (মৃত্যু ২৪৩ হিজরি), আবুল ফায়েজ যুননুন মিসরি (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি), আবুল হাসান সারি বিন মুগাল্লিস সাকাতি, (মৃত্যু ২৫৭ হিজরি), আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন মুআয রাজি (মৃত্যু ২৫৮হিজরি, নিশাপুর), আবু সাইদ আহমাদ বিন ইসা খাররাজ বাগদাদি (মৃত্যু ২৭৭ হিজরি), আবু মুহাম্মাদ সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতারি (মৃত্যু ২৮৩ হিজরি), আবুল কাসেম জুনায়েদ বাগদাদি (মৃত্যু ২৯৭ হিজরি)।

এদের পরবর্তীরা হলেন, আবু মুহাম্মাদ রুআইম বিন আহমাদ বাগদাদি (মৃত্যু ৩০৩ হিজরি), আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাহল ইবনে আতা (মৃত্যু ৩০৯ হিজরি), আবু মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ জারিরি (মৃত্যু ৩১১ হিজরি), বিখ্যাত রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা প্রণেতা আবুল কাসেম

আবদুল কারিম ইবনে হাওয়াযিন কুশাইরি (মৃত্যু ৪৬৫ হিজরি), জগদ্বিখ্যাত ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন গ্রন্থকার হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ গাযালি (মৃত্যু ৫০৫ হিজরি)।

আরও আছেন আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদের জিলানি (মৃত্যু ৫৬১ হিজরি), আওয়ারিফুল মাআরিফ গ্রন্থকার আবু হাফস আমর ইবনে মুহাম্মাদ সোহরাওয়ার্দি (মৃত্যু ৬৩২ হিজরি), ইমাম আবুল হাসান শাযলি আলি ইবনে আবদুল্লাহ (মৃত্যু ৬৫২ হিজরি), আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে উমর মুরসি, (মৃত্যু ৬৮৬ হিজরি, মিশরের ইস্কান্দারিয়্যায়), আবুল ফযল আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারি (মৃত্যু ৭০৯ হিজরি), ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭৫১ হিজরি)।

আরও হলেন সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইবনে আলাবি হাদ্দাদ হাযরামি (মৃত্যু ১১৩২ হিজরি, হাযরামাউতে), শামসুদ্দিন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সালেম হিফনি (মৃত্যু ১১৮১ হিজরি, মিসরে), আবুল বারাকাত আহমাদ দারদির আদাবি মালেকি, (মৃত্যু ১২০১ হিজরি)। এ ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে আরও অনেকে, যারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে তাসাউফের ইমাম ছিলেন এবং এদের সংখ্যা অগণিত।[৮]

---

[৮] বড়োদের ভুল নিয়ে আলোচনা করার সময় তাদের ব্যক্তিত্বে আঘাত না করা

আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাফগণ যদিও পূণ্যবান ও মহৎ ছিলেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন, কিন্তু তারা কেউ নিজের সকল কথা ও কাজে ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তারাও আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। তাই তাদের মাঝে সামান্য কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদিস শরিফে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

প্রত্যেক বনি আদমেরই ভুল হয়ে থাকে। আর সর্বোত্তম ভুলকারী হচ্ছে যে তওবা করে নেয়।

এই ইমামগণ এবং তাদের মতো অন্যান্য ইমামগণের অনেক উত্তম, প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী রয়েছে। যদিও তাদের কেউ কেউ তাসাউফ বিষয়ে অনেক কঠোর ছিলেন

তাই ইজতিহাদ করতে গিয়ে কোনো ইমামের ভুল করে ফেলা কিংবা কোনো মত প্রদানের সময় তিনি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অথবা সে যুগের মাশায়েখে কেরামের চিন্তা-দর্শন অথবা অন্য কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে কোনো বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তিনি অবশ্যই বড়ো, কিন্তু তাই বলে তার ভুলকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। ভুলকে ভুলই বলতে হবে। তবে ভুল নিয়ে আলোচনা করার সময় তাঁর প্রতি আদব ও ইহতেরাম বজায় রাখতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি নবি নন। তাই তিনি মাছুমও নন। একমাত্র নবিগণ মাছুম, নিষ্পাপ। আর তিনি শরিয়তবিরোধী ও দিনের শত্রুও নন। তাই শত্রুকে মানুষ যেভাবে আক্রমণ করে, আমরা যেন সেভাবে আক্রমণ করে কথা না বলি)।

আইম্মায়ে কেরাম যেহেতু নবী নন, তাই তাদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক । ভুল থেকে তারা কেউ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নন।

ভুলের উৎস যাই হোক, আমরা ভুলকে ভুলই বলব। তবে ইসলামি আদব ও একজন আদর্শ মুসলিমের চরিত্র বজায় রেখে, ভদ্রতা ও নম্রতার সঙ্গে। অন্যের সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে। ভুলের কারণে তাঁর ব্যক্তিত্বে আঘাত করা যাবে না। কটাক্ষ করে কথা বলা যাবে না। কারণটা আগেই বলেছি, একমাত্র নবিগণ মাসুম, নিষ্পাপ। তারা ছাড়া আর কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নন।

বড়োদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে তাদের ব্যক্তিত্বে আঘাত করা ও অশালীনভাবে সমালোচনা করা নিজের ধ্বংস ডেকে আনা এবং মহাক্ষমতাশীল ও চিরক্ষমাশীল আল্লাহর হুকুমকে বর্জন করার নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

তাই এ ক্ষেত্রে মূল কথা হল, ভদ্রতা ও সম্মান বজায় রেখে বড়োদের ভুলের সমালোচনা করতে হবে। কখনো তাদের ব্যক্তিত্বে আঘাত করা যাবে না।

এবং তাদের সবার ইলম, চিন্তাধারা ও মেহনতের তরিকা একরকম ছিল না। এ ক্ষেত্রে তারা সবাই এক স্তরের ছিলেন না। তথাপি দিনের উসুল ও ফুরু' (মূল ও শাখানীতি), আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম, অন্তরের বিভিন্ন অবস্থা ও ভাব-ভাবনা, কুমন্ত্রণা ও তার প্রতিকার, ইসলামি শিষ্টাচার, দিনি মেজায ও নফসের মুজাহাদার উপর তারা অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।

আর এ সকল গ্রন্থ মূলত কুরআন-সুন্নাহ এবং ইমামগণের কথা, কাজ ও অবস্থাদির উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে।

এটাই প্রকৃত তাসাউফ, যা সংকলনযুগের আগে ও পরে গোটা পৃথিবীর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিকে আলোকিত করেছিল। যে সকল ইমামগণ সত্যিকার অর্থেই সুফি ছিলেন। আধ্যাত্মপথের পথিক ছিলেন। কথা-কাজে সত্যবাদী ছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম হারেস মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ অন্যতম।

২. নবউদ্ভাবিত মনগড়া তাসাউফ

এ ছাড়াও এক প্রকার তাসাউফ রয়েছে, যা ভেজাল মিশ্রিত। মনগড়া। এমন কিছু লোক তা উদ্ভাবন করেছে, যারা বাতেনি, সর্বেশ্বরবাদের আকিদায় বিশ্বাসী; কিন্তু সাধারণ মানুষকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করা, ধোঁকা দেওয়া ও পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা সুফিগণের বেশ ধারণ করেছে এবং দিনের মাঝে নিজেদের জঘন্য মতবাদ ও নাস্তিক্যতার প্রচলন ঘটিয়েছে। এরা না সুফি, আর না তাসাউফের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক রয়েছে। এরা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রবৃত্তি পূজার শিকার। আমরা ইতোপূর্বে তাসাউফের যে সকল ইমামগণের কথা উল্লেখ করলাম, তাঁরা সকলেই এদের সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদেরকে তাসাউফের ভ্রান্ত দাবিদার, যিন্দিক ও মুরতাদ মনে বলে আখ্যায়িত করেন।

অনেক ইমামগণ, যেমন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযি রহিমাহুল্লাহ তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং তাসাউফের ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরেছেন।

৩. বিকৃত তাসাউফ

তিন নম্বর প্রকার হচ্ছে মুহাররাফ তথা বিকৃত তাসাউফ। গুটিকতেক লোক আছে, যারা তাসাউফের ভ্রান্ত দাবিদার। বস্তুবাদি চিন্তা ও স্বার্থের কারণে তাসাউউফকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা বিদআতের অনুসারী। তারা বিভিন্ন গর্হিত রীতি-নীতি ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রকৃত তাসাউফ ও তাসাউফের ধারক-বাহক আহলে ইলমগণের এগুলোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

এই তৃতীয় শ্রেণির সুফিগণও তাসাউফের মিথ্যা দাবিদার। তারা সুফিগণের মাঝে অনুপ্রবেশকারী, বিদআতি, ফাসেক ও পাপাচারী।

আমরা যদি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই ও যারা প্রকৃত তাসাউফের অনুসারী তাদের প্রতি সুবিচার করতে চাই; তাহলে আমাদের কর্তব্য হলো, ভণ্ড সুফিদের পাপের বোঝা হকের অনুসারী সুফিগণের উপর না চাপানো এবং লাগামহীনভাবে তাসাউফ ও সুফিগণের সমালোচনা না করা, বরং প্রশংসা ও নিন্দা, উৎসাহ কিংবা সতর্ক, যার যা প্রাপ্য তা তাকে প্রদান করা এবং সে ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও অন্ধত্বের শিকার না হওয়া।[৯]

আলোচনা দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য, পাঠক যাতে এই রিসালার প্রণেতা ইমাম মুহাসেবি ও তার মতো অন্যান্য সুফিগণের ব্যাপারে জানতে পারে যে, তারা তাদের কথা, কাজে ও জ্ঞানে প্রকৃত সুফিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

[৯] কতিপয় ভণ্ড ও প্রতারক সুফি নাম ধারণ ও প্রকৃত সুফিগণের বিপরীত কাজ-কর্ম করায় সুফিগণ খারাপ-এমনটি ভাবা ঠিক না। যে অসৎ তার সঙ্গে সৎ ব্যক্তিরও সমালোচনা করা উচিত না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

একে অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না।

আল্লামা যামাখশারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কৃত *তাফসিরে কাশশাফের* টীকায় (১:২৬১) ইমাম ইবনুল মুনায়্যির ইস্কান্দারি রহিমাহুল্লাহ এ কথাটি বলেছেন।

ইমাম মুহাসেবির এই রিসালাটি পড়লেই পাঠক তা বুঝতে পারবে। এতে আত্মোন্নয়ন, আত্মশুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতির পরিশীলনের কথা রয়েছে। আর যারা মনোযোগ ও সূক্ষ্মবোধ নিয়ে তা পাঠ করবে, তাদের জন্য রয়েছে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পাশাপাশি মুহাক্কিক আলেম দিন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ ফকিহ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ-এর টীকা এর উপকারিতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে ইমাম মুহাসেবীর রেখে যাওয়া এই অমূল্য সম্পদ উম্মাহর সামনে তুলে ধরার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই গ্রন্থ ও গ্রন্থের টীকাগুলো দ্বারা উম্মাহকে উপকৃত করুন এবং গ্রন্থকার ও টীকাকারের আমলনামায় এর সওয়ার দান করুন।

হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ

মিসরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি
এবং জামাতে কিবারুল উলামার সদস্য।
কায়রো, ৩-ই জুমাদাল উখরা ১৩৮৯ হিজরি।

ইমাম শাতেবির সাক্ষ্যদান

ইমাম শাতেবি রহমাতুল্লাহি আলাইইহি এই ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করেন যে, যারা প্রকৃত সুফি, তারা মূলত কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী, বিদআতি নয় এবং তাসাউফের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে কথা বলা সাধারণত বিদআত নয়।

ফকিহ ও উসুলবিদ ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহর মূল্যবান গ্রন্থ *আল-ইতিসাম*-এ প্রায় দশ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রয়েছে। সেখানে তিনি গ্রহণযোগ্য সুফিগণকে যে মূর্খরা বিদআতি ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত বলে অপবাদ দিয়ে থাকে, বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে তিনি তা খণ্ডন করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, তাদের পথ ও মত কুরআন-সুন্নাহ সম্মত এবং কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি বিষয় বর্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত সত্য ও সত্যানুসারীদের প্রতি ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি এখানে সে বর্ণনার অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

ইমাম শাতেবি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্থ অনুচ্ছেদে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেন,

'অনুচ্ছেদ: চতুর্থ প্রকার: বিখ্যাত সুফিগণের পক্ষ থেকে বিদআত ও বিদআতিদের নিন্দা সংক্রান্ত আলোচনা,

ইতোপূর্বে আমরা বিদআতের নিন্দায় যেসব দলিল প্রমাণ কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহিনের উক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছি, যদিও তা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সামনের এই আলোচনাটুকু বিশেষভাবে তুলে ধরছি, কেননা অনেক মূর্খ লোক মনে করে সুফিগণ সুন্নতের অনুসরণে ছাড়ের মনোভাব রাখেন। পাশাপাশি নতুন নতুন আমল আবিষ্কার করেন এবং শরিয়তে যা আবশ্যক নয়, এমন অনেক কিছুকে তারা আবশ্যক বলেন ও করেন।

অথচ আহলে তাসাউফ এসব অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের তরিকার ভিত্তিই হলো সুন্নাহর অনুসরণ এবং যা সুন্নাহ পরিপন্থি, তা বর্জনের উপর। তাই সুফিগণের সর্দার, তাদের ভিত্তি এবং পথ ও মতের সংরক্ষক আবুল কাসেম কুশাইরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা বিদআতিদের থেকে নিজেদের পরিচয় আলাদাভাবে তুলে ধরার জন্যই আহলে তাসাউফ নাম গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুলের ইন্তেকালের পর ইসলামের মহান ব্যক্তিদের সাহাবি নামে ডাকা হত। সে সময় সাহাবি উপাধি যাদের ছিল, তারাই ছিল সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী। এর উপর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদের পরবর্তীদের তাবেয়িন নামে ডাকা হত। এই নামটি ছিল তাদের কাছে অনেক মর্যাদার। তাদের পরবর্তীদের বলা হত তাবে তাবেয়িন। তারপর মানুষের মাঝে ভেদ সৃষ্টি হল, মর্যাদার স্তরে পার্থক্য দেখা দিল। তখন যারা কঠোরভাবে দিন পালন করত, তাদের যাহেদ ও আবেদ নামে ডাকা হত।

তিনি বলেন, তারপর বিভিন্ন বিদআত প্রকাশ পেল। প্রত্যেক দল নিজেদের যাহেদ ও আবেদ বলে দাবি করল। তখন আহলে সুন্নতের বিশেষ ব্যক্তিগণ, যারা আল্লাহ তায়ালার হকসমূহের প্রতি লক্ষ রাখত এবং নিজেদের অন্তরকে গাফলত তথা উদাসিনতামুক্ত রাখত, তাদেরকে মানুষ 'আহলে তাসাউফ' নাম ডাকত।

এটি ইমাম শাতেবির আলোচনার সারাংশ। তিনি বলেন, এই উপাধি শুধু তাদের জন্য যারা সুন্নতের অনুসরণ করে ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকে। এতে মূর্খ ও তথাকথিত জ্ঞানীদের ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

যদি আল্লাহ তায়ালা সময়ে বরকত দান করেন, তার মদদ আমার সঙ্গে থাকে এবং সবকিছু আমার জন্য সহজ হয়, তাহলে প্রকৃত সুফিগণ যে সঠিক ও সত্যের পথে আছেন-এর প্রমাণস্বরূপ আমি সংক্ষেপে কিছু নমুনা পেশ করব। মূলত সুফিগণের তরিকায় বিভিন্ন খারাবি ও ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ এমন সব সুফিগণের পক্ষ থেকে হয়েছিল, যারা পৃথিবীতে সালাফে সালেহিনের অনেক পরে এসেছিল। তারা তাসাউফকে গ্রহণ করেছিল বে-শরা তথা শরিয়ত বহির্ভূত পদ্ধতিতে। প্রকৃত আহলে তাসাউফের উদ্দেশ্য বুঝতে তারা অক্ষম ছিল। প্রকৃত আহলে তাসাউফের নামে তারা এমন সব মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলত, যা তাদের থেকে বর্ণিত নয়। এই শেষ যুগে পরবর্তি এসব সুফিদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তাদের তরিকাকে এখন আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত শরিয়তের সঙ্গে মেলানো যায় না। এটাকে ভিন্ন এক শরিয়ত মনে হয়। এর চেয়ে বড়ো বিষয় হল, সুন্নত অনুসরণে তারা অবহেলা করে থাকে এবং মনগড়া ইবাদতকে সহিহ তরিকার ইবাদত বলে চালাতে থাকে। অথচ সুফিগণের তরিকা এসব বিকৃতি থেকে আলহামদুলিল্লাহ সম্পূর্ণ মুক্ত।

ফুযাইল ইবনে ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদআতির সঙ্গে যে বসবে, সে ইলম ও হেকমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করতে পারবে না। শায়খ যুননুন মিসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের মধ্যে ছয়টি কারণে খারাবি অনুপ্রবেশ করেছে। তন্মধ্যে পঞ্চম কারণটি হলো, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং রাসুলের সুন্নতকে ছুড়ে ফেলা। ষষ্ঠটি হলো, পূর্ববর্তীদের মহৎ গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়গুলো ভুলে গিয়ে তাদের ভুল-ত্রুটিগুলোকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা। ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাযি রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের সমস্ত মতবিরোধের ভিত্তি তিনটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রতিটির বিপরীত রয়েছে। যে মূল থেকে সরে যাবে সে মূলের বিপরীতে গিয়ে পতিত হবে। মূল বিষয় তিনটি হচ্ছে, ১. তাওহিদ। এর বিপরীত হচ্ছে শিরক। ২. সুন্নাহ। এর বিপরীত বিদআত। ৩. তাআত (আনুগত্য)। এর বিপরীত নাফরমানি বা অবাধ্য হওয়া।

আবুল হাসান ইবনে আলি জুযজানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, বান্দার সৌভাগ্যের আলামত হচ্ছে, তার জন্য আল্লাহর আনুগত্য করা সহজ হবে, সমস্ত কর্মে সে সুন্নতের অনুসরণ করবে, নেককারদের সান্নিধ্যে থাকবে, বন্ধুদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, অন্যের কল্যাণ ও হিতকামী হবে, মুসলমানদের বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে এবং সময়ের প্রতি লক্ষ রাখবে।

তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহকে পাওয়ার পথ কী? তিনি বললেন, আল্লাহকে পাওয়ার অনেক পথ। সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত পথ হচ্ছে, কথা-কাজ ও ইচ্ছায় দৃঢ়তার সঙ্গে সুন্নতের অনুসরণ করা। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সুন্নত অবলম্বনের তরিকা কী? তিনি বললেন, বিদআত বর্জন করা, প্রথম যুগের উলামায়ে কেরাম যেসব মাসআলায় একমত ছিলেন সেগুলো মানা এবং অনুসরণের পথকে আঁকড়ে ধরা।

আবুল হাসান ওয়াররাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সিদক' হচ্ছে দিনের পথে অবিচল থাকার এবং শরিয়তে সুন্নত অনুসরণের নাম। আল্লাহর মহব্বতের আলামত হচ্ছে, তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা। হযরত জুনায়েদ বাগদাদি র.-এর শাগরিদ আবু বকর ইবনে সাদান বলেন, আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে আমলে উদাসীনতা, নাফরমানি, বিদআত ও গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকা।

আবু উমর যাজ্জাজি ছিলেন জুনায়েদ বাগদাদি, সুফিয়ান সাওরি ও অন্যান্যদের শিষ্য। তিনি বলেন, জাহেলি যুগে মানুষ নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করত। নিজের কাছে যা ভাল মনে হত তাই করত। এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাদেরকে শরিয়তের অনুসারী বানালেন। তাই যার আকল সহিহ, সে তা পছন্দ করবে, যা শরিয়ত পছন্দ করে এবং তা অপছন্দ করবে, যা শরিয়ত অপছন্দ করে।

আবু ইয়াযিদ বিসতামি বলেন, আমি ত্রিশ বছর সাধনা করেছি। ইলম অর্জন এবং ইলম অনুযায়ী আমলের চেয়ে কঠিন কিছু পাইনি। যদি উলামায়ে কেরামের মাঝে ইখতেলাফ না থাকত, তাহলে আমি হতভাগা হয়ে যেতাম। কারণ তাওহিদ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে তাদের ইখতেলাফ রহমতস্বরূপ। আর ইলমের অনুসরণ তো সুন্নতেরই অনুসরণ, অন্য কিছুর নয়।

বর্ণিত আছে, একদিন তিনি বললেন, চলো, শহরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আল্লাহর অলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করের আসি। মানুষ যার কাছে আগমন করত। যাকে দুনিয়াত্যাগী মনে করত। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তার সঙ্গে গেলাম, লোকটি যখন ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করল, কেবলার দিকে থুতু ফেলল। এই দৃশ্য দেখে আবু ইয়াযিদ তার সঙ্গে সালাম-কালাম না করে ফিরে এলেন। বললেন, এই লোক তো রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ করে না। নিজেকে আল্লাহর অলি হিসেবে কীভাবে দাবি করে? সুন্নতের ব্যাপারেই তো তাকে নিরাপদ মনে করা যায় না। তিনি বলেন, তোমরা যদি কারামতের অধিকারী কাউকে হাওয়ায় ভাসতে দেখ, তবুও তাকে আল্লাহর অলি মনে করে ধোঁকা খেয়ো না। যতক্ষণ সে শরিয়তের আদেশ-নিষেধ, দণ্ডবিধি ও আদব পালনে কেমন-তা পরখ করে না নাও।

সাহল তুসতুরি বলেন, আমাদের (সুফিগণের) সাতটি উসুল : আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরা। ২. রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ করা। ৩. হালাল খাওয়া...। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, মহত্ব কী? তিনি বললেন, সুন্নতের অনুসরণ। আবু সুলাইমান দারানি র. বলেন, সুফিগণের কোনো সূক্ষ্ম বিষয় অন্তরে উদয় হলে আমি তা দুটি ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী তথা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যাচাই না করে গ্রহণ করি না।

আহমাদ ইবনে আবুল হুওয়ারি বলেন, সুন্নতের অনুসরণ ছাড়া কেউ কোনো আমল করলে তার সে আমল বাতিল।

আবুল কাসেম জুনায়েদ বলেন, যে রাসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, একমাত্র সে ছাড়া মানুষের সামনে ইবাদতের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ, রাসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া কারও পক্ষে কোনো ইবাদত করা সম্ভব নয়।) তিনি আরও বলেন, যে কুরআনের শিক্ষা লাভ করল না, হাদিস লিখল না, তাসাউফ বিষয়ে তার অনুসরণ করা যায় না। কারণ আমাদের এই তাসাউফ, অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের এই মাযহাব (পথ ও মত) কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা বাঁধা।

আবু উসমান হিরি বলেন, যে কথা ও কাজে নিজেকে সুন্নতের অনুসারী বানিয়ে নেয়, তার মুখ থেকে হেকমতের কথা বের হয়। আর যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসারী বানায়, তার মুখ থেকে বিদআতের কথা বের হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তোমরা রাসুলের অনুসরণ করো, তাহলে হেদায়েত পেয়ে যাবে।

আবুল হুসাইন নুরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, তুমি যদি কাউকে দেখ যে, সে এমন আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলছে, যা শরিয়ত বহির্ভূত, তাহলে তার কাছে ভিড়বে না। আবুল কাসেম নাসরাবাদি বলেন, তাসাউফের মূল হলো কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা, বিদআত ও নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা, মাশায়েখগণকে শ্রদ্ধা করা, মানুষের অপারগতার প্রতি খেয়াল রাখা, নিয়মিত ওযিফা আদায় এবং শরিয়তের ছাড় দেওয়া বিষয়ে ও অনর্থক বিষয়ে ব্যাখ্যায় লিপ্ত না হওয়া।

এ বিষয়ে তাদের আলোচনা অনেক দীর্ঘ। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন সুফির কথা আমরা এখানে তুলে ধরলাম, যাদের সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে যায়। তাদের সকলের কথা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বিদআত গুমরাহি। বিদআতের উপর আমল করা মানে পথভ্রষ্ট হওয়া। আর বিদআতের ব্যবহার মানুষকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এ পথে কখনো মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বিদআতি ব্যক্তি ধ্বংস থেকে নিরাপদ নয়। তাকে তার নফসের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া হয় এবং সে হেকমত লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়। আর তরিকতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সুফিগণ সকলেই শরিয়তের তাযিমের ব্যাপারে এক, সুন্নতের উপর অটল, সুন্নতের আদবের প্রতি যত্নবান এবং বিদআত ও আহলে বিদআত থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী।

এ কারণে আমরা সুফিগণের মাঝে এমন কাউকে পাই না, যার কোনো বাতিল ফেরকার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে অথবা সুন্নতের খেলাফ কিছুর প্রতি ঝুঁকে আছেন। বরং তারা অধিকাংশই হলেন আলেম, ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং দিনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আর যিনি এই স্তরের নন, তাকে অবশ্যই দিনি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হবে।

এই মাশায়েখগণ ছিলেন সত্যজ্ঞ, অন্তরের আবেগ-অনুভূতি, রুচিবোধ, বিশেষ অবস্থা ও তাওহিদের নিগূঢ় রহস্যের অধিকারী। তারা আমাদের কাছে সে সব লোকের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ, যারা নিজেদের তরিকতপন্থি বলে দাবি তো করে; কিন্তু তাদের তরিকা অনুসরণ করে না। বরং বিদআত, মনগড়া বিষয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর তাদের দ্ব্যর্থবোধক কথা, কাজকে, অথবা শরিয়ত বাতিল বলে আখ্যা দিয়েছে এমন বিষয়কে কোন কল্যাণের কারণে আঁকড়ে ধরে অথবা এ জাতীয় কোনকিছু করে শ্রদ্ধেয় শায়খদের নামে চালিয়ে দেয়।

তাই তাদের সাদৃশ গ্রহণকারী পরবর্তীদের তুমি দেখবে এমন কাজে লিপ্ত হচ্ছে যা সর্বসম্মতভাবে শরিয়তবিরোধী এবং এমন ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করে, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ের, যদি সেগুলো সঠিকও হয়, তথাপি বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকার কারণে সেগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না। আর তারা পূর্ববর্তীদের এমন কথা ও অবস্থাদি বর্জন করে, যা সুস্পষ্টরূপে সত্যকে তুলে ধরে এবং সঠিক অনুসরণের যোগ্য। এসব পরবর্তী লোকদের অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো, যে শরিয়তের সুস্পষ্ট বিষয় ছেড়ে অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করে।

আর তাসাউফের ভেদ ও সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে কথা বলা সাধারণভাবে বিদআত নয়, আবার তা যে সঠিক, সেটিও দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং বিষয়টি কয়েকভাগে বিভক্ত।

প্রথমে তাসাউফ শব্দের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যাতে যে বিষয়ে হুকুম আরোপ করা হবে, তা বুঝে আসে। কারণ পরবর্তীরা তাসাউফ শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তাতে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই আমরা সালাফের ব্যাখ্যা শুনব। সালাফের কথার সারাংশ হচ্ছে, পারিভাষিকভাবে তাসাউফ শব্দটির দুটি সংজ্ঞা।

১. اَلتَّخَلُّقُ بِكُلِّ خُلُقٍ سَنِيٍّ، وَالتَّجَرُّدُ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ دَنِيٍّ

যাবতীয় উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা।

২. إِنَّهُ الْفَنَاءُ عَنْ نَفْسِهِ وَالْبَقَاءُ لِرَبِّهِ،

নিজের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেঁচে থাকা।

সংজ্ঞা দুটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব, মূলত সংজ্ঞা দুটি নয়, একটিই। প্রথম সংজ্ঞায় তাসাউফের প্রাথমিক অবস্থাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় চূড়ান্ত অবস্থাকে। অবশ্য উভয়টিই বিশেষণ। তবে প্রথমটির জন্য সূফীগণের মাঝে আল্লাহ প্রেমের বিশেষ যে হালতের সৃষ্টি হয়, এমন কোনো অবস্থা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক নয়। দ্বিতীয়টির জন্য আবশ্যক। এটাকে আমরা অন্যভাবে ব্যক্ত করতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে প্রচেষ্টা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার ফলাফল। প্রথমটি মানুষের বাহ্যিক গুণ আর দ্বিতীয়টি অন্তরের। এ দুটোর সমষ্টিই হল তাসাউফ।

যখন তাসাউফ শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন আমাদের বোঝা উচিত, প্রথম অর্থের বিবেচনায় তাসাউফ নিয়ে আলোচনায় কোনো বিদআত নেই। কারণ, তা এমন অর্থ প্রদান করে থাকে, যার উপর আমলের ভিত্তি, যাতে নিহিত রয়েছে আমলে যুক্ত হওয়া ত্রুটি ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়ের বিশদ বিবরণ এবং তার খারাপ দিকগুলো সংশোধনের বিভিন্ন উপায়। আর এটাই সঠিক ফিকহ। এর মূলনীতিগুলো কুরআন-সুন্নায় স্পষ্ট। তাই এরূপ বিষয়কে বেদআত বলা যায় না। হ্যাঁ, ফিকহের শাখাগত বিষয়গুলো যেহেতু সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নয়, তাই সেগুলোকে বেদআত বলা যায়। যেমন বাইয়ে সলম, ইজারাহ ও জখমের পারিপার্শ্বিক মাসআলা, সাহু সেজদার মাসআলা, সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেওয়া, বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, এরূপ আরও অন্যান্য শাখাগত মাসআলা। তবে পরবর্তীতে উদ্ভাবিত শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে বেদআত শব্দ ব্যবহার করা উলামায়ে কেরামের শানের খেলাফ, যদিও মাসআলা সূক্ষ্ম হোক। অনুরূপভাবে যাহেরি ও বাতেনি, বাহ্যিক ও সুপ্ত আখলাকের সূক্ষ্ম পারিপার্শ্বিক দিকগুলোর ক্ষেত্রেও বেদআত শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত। কেননা এগুলোর ভিত্তিও শরয়ি মূলনীতির উপর।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তারপর ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তাসাউফকে উপরিউক্ত দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করেছেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট করেছেন, কোনটি বিদআত আর কোনটি বিদআত নয়। আলোচনা অনেক দীর্ঘ না হলে এখানে তা তুলে ধরতাম। কেউ চাইলে ইমাম শাতেবির কিতাব থেকে আলোচনাটি বিস্তারিত পড়ে নিতে পারে।

আমরা ইমাম শাতেবির যে আলোচনাটি এখানে তুলে ধরলাম, তাতে প্রকৃত তাসাউফ ও প্রকৃত সুফিগণের প্রশংসার বিষয়টি স্পষ্ট। এমন মহান ফকিহ, প্রখ্যাত উসুলবিদ ও প্রাজ্ঞ মুহাক্কিকের আলোচনার পর আসলে কোনো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য তাসাউফ কিংবা সুফিবাদের ঢালাওভাবে সমালোচনা করা অনুচিত। হ্যাঁ, কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে সালেহিনের তরিকার পরিপন্থি যেকোনো কাজ, দল ও মত অবশ্যই নিন্দাযোগ্য।

ইমাম শাতেবির আগে আরও বড়ো বড়ো ইমাম সুফিগণের প্রশংসা করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ তার তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতার উপর লেখা *মাদারিজুস সালিকিন* গ্রন্থে (৩:১২৯) বলেন, ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সুফিগণের সান্নিধ্য লাভ করেছি। আমি তাদের থেকে মাত্র দুটি কথা শিখেছি,

১. সময় হচ্ছে তরবারির ন্যায়। তুমি সময়কে কাটলে (কাজে লাগালে) তো ঠিক আছে। অন্যথায় সময় তোমাকে কেটে ফেলবে।

২. নফসকে যদি তুমি ভাল কাজে ব্যস্ত না রাখ, তাহলে সে তোমাকে খারাপ কাজে লিপ্ত করবে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, কী মর্মসমৃদ্ধ উপকারী কথা! কতটা উঁচু মনোবলের অধিকারী ও আত্মসচেতন ছিলেন তারা। যাদের কথা এত উঁচু স্তরের, তাদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ-এর প্রশংসাই যথেষ্ট।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلِيِّ كُلِّ خَيْرٍ وَهِدَايَةٍ، وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الدَّاعِي إِلٰى أَفْضَلِ طَرِيْقٍ وَ غَايَةٍ، وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ أَصْحَابِهِ مَصَابِيْحِ الْهُدٰى وَالدِّيْنِ، وَتَابِعِيْهِمُ السَّالِكِيْنَ نَهْجَهُمُ الْقَوِيْمَ بِإِحْسَانٍ.

হামদ ও সালাতের পর, বর্তমান যুগে মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন আত্মিক শুদ্ধি, দিন বোঝা ও দিনের উপর আমল করা। সালাফে সালেহিনের মাঝে এই গুণগুলো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাই তাদের সমাজ ছিল সুষ্ঠু, জীবনাচার ছিল বিশুদ্ধ, কল্যাণ ব্যাপক, অকল্যাণ স্বল্প। তারা ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণ অর্জন করেছিলেন।

আমাদের আইম্মায়ে সালাফগণ নিজেদের তীক্ষ্ণ মেধা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে জ্ঞানের এমন দীপ্তিময় কীর্তি রেখে গিয়েছেন, যা মূর্খ, দিকভ্রান্ত ও পথহারা মানবসমাজকে সরল পথের দিশা দান করে এবং তাদের সরল পথে ফিরিয়ে আনে।

তারা আমলের ফাযায়েল ও এর সঠিকরূপ, আত্মার শুদ্ধি ও স্বচ্ছতা বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। সেসব গ্রন্থাবলিতে তারা তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে উম্মাহকে একদিকে যেমন আত্মশুদ্ধির বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন, অপরদিকে আত্মার ব্যাধি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। উম্মাহর মুক্তি ও ধ্বংসের বিষয়গুলো অকৃত্রিম মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ বিষয়ে তারা এত অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন যে, পরবর্তীদের জন্য তারা কিছুই রেখে যাননি।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে আগত এমনই একজন মহামনীষী হলেন ইমাম আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবি। যিনি ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ, ওয়ায়েজ, ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম, উম্মাহ দরদি ও প্রাজ্ঞ দায়ি। তিনি তার জীবদ্দশায় অনবদ্য ও কালজয়ী বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাকে তাকওয়া, খোদাভীতির পাশাপাশি ইখলাস ও কলবের নূর দান করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাকে শ্রোতা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষুরধার লেখনীশক্তি দান করেছিলেন। তার তাকওয়া ও খোদাভীতি ছিল প্রবাদতুল্য। তাকওয়া শব্দটি তার অন্তর জুড়ে সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও ব্যাপ্ত ও প্রাণের চেয়েও অধিক প্রাণবন্ত ছিল। তার অন্তর দুনিয়ার মহব্বত থেকে একেবারে শূন্য ছিল। তিনি ওই ব্যক্তির মতো ছিলেন যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তার ও কবরের মাঝে কেবল এক মুহূর্তের ব্যবধান। তাই তিনি যখন মানুষকে নসিহত করতেন, তখন সেগুলো সরল বর্ণনায় মানুষের বোধের এত কাছাকাছি নিয়ে আসতেন যে, মনে হত যেন তিনি জান্নাত ও তার নায-নেয়ামত এবং জাহান্নাম ও তার মর্মন্তুদ আযাব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ী মালেক ইবনে দিনার রহিমাহুল্লাহ-এর কল্পনার সেই মানুষদের মতো, 'আমি যদি এমন কয়েকজন বন্ধু পেতাম, যাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিব, আর তারা ঘোষণা করতে থাকবে, লোকসকল! জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।'

ইমাম হারেস মুহাসেবী তার কোনো কোনো গ্রন্থে এত বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনার রীতি অবলম্বন করেছেন যে, এর পর অতিরিক্ত আর কোনো আলোচনার অবকাশ নেই। আর কোনো কোনো গ্রন্থে হেদায়েতপ্রত্যাশী ও সত্যান্বেষী পাঠকের গভীর মনোনিবেশের কথা চিন্তা করে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার রীতি অবলম্বন করেছেন।

রিসালাতুল মুসতারশিদিন নামে তিনি এই রিসালাটি রচনা করেছেন। এতে তিনি অত্যন্ত জ্ঞান ও মর্মসমৃদ্ধ বাক্যে মূল্যবান উপদেশ ও উত্তম দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। অকৃত্রিম ভালোবাসা ও গভীর মমতায় উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। জ্ঞানের দীপ্তিময় আলোয় তাদের সরল পথের দিশা দিয়েছেন। প্রতিটি বর্ণনা খুব সহজ সরল ও সাবলিল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে কেউ যদি এই রিসালা থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হতে চায়, তাহলে অবশ্যই ধীরস্থিরতার সঙ্গে বারবার পড়ার বিকল্প নেই। প্রতিটি বাক্য নিয়ে গভীর চিন্তা-ফিকির করতে হবে এবং তা আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে হবে।

আমার কাছে এই রিসালাটির হস্তলিখিত কপি ছিল। বহু বছর আগে আমি তা পেয়েছিলাম। সম্প্রতি তা পড়তে গিয়ে দেখলাম, রিসালাটিতে সত্যানুসন্ধানীদের জন্য সত্য পথের দিশা রয়েছে। হেদায়াতের বার্তা রয়েছে। তখন আমি মানুষের উপকারের স্বার্থে এটি প্রকাশ করে তাদের সামনে উপস্থাপন করার নিয়ত করলাম। মানুষ এটি পড়বে এবং গ্রন্থকারের ইখলাস ও সততা, সীমাহীন তাকওয়া ও ইলম এবং অকৃত্রিম উপদেশাবলি থেকে উপকৃত হবে।

আমার কাছে হস্তলিখিত যে কপিটি ছিল তার হস্তাক্ষর ছিল স্পষ্ট। লেখা সব বোঝা যেত। ভুল খুব কম ছিল। কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন করা ছিল। ছোটো সাইজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র তেত্রিশ। কোন তারিখে লেখা হয়েছে, তার উল্লেখ ছিল না। অবশ্য এটি পরবর্তীকালে লেখা হয়েছে। আমার ধারণা, হিজরি দশম শতাব্দির পর তা লেখা হয়েছে। লিপিকারের নামও উল্লেখ ছিল না। তবে তৃতীয় পৃষ্ঠায় কলমের মাথায় লেগে থাকা সামান্য কালি দিয়ে কিছু লেখা ছিল, তা উদ্ধার করলে এই বাক্যটি দাঁড়ায়।

كَتَبَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَاجِ إِسْمَاعِيْلُ،

আহমাদ ইবনুল হাজ ইসমাইল এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমি একদিন জানতে পারলাম, মিশরের কায়রোয় অবস্থিত মা'হাদু ইহইয়ায়িল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যা-তে এই রিসালার একটি হস্তলিখিত কপি আছে, যা ইস্কান্দারিয়্যা শহরের বালদিয়্যা লাইব্রেরিতে থাকা কপি থেকে ফটোকপি করা হয়েছে। সেখানে কপিটির নম্বর (৩০২৪/১৩)। আমি তখন সেই কপিটি ফটোকপি করালাম। দেখি তাতে মরক্কীয় হস্তলিপি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৪। শব্দগুলো খুব ঘন ঘন ও চিকন। অনেক শব্দে হরকত দেওয়া। তবে আমার কপির মতো এটাতে লিপিবদ্ধের তারিখ নেই, লিপিকারের নামও উল্লেখ করা নেই।

মা'হাদু ইহইয়ায়িল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যা-তে হস্তলিখিত গ্রন্থের যে তালিকা রয়েছে, সেখানে এর সূচি নং হল (১:১৬৪)। সেখানে লেখা আছে, এটি বারোতম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমি আমার ভাতিজা অধ্যাপক আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহর সহযোগিতায় এই কপিটির সঙ্গে আমার কপিটি মিলালাম। কিছু কিছু বাক্য ঠিক করতে এটা আমাকে বেশ সহযোগিতা করেছে। উভয় কপির কয়েক জায়গায় যে ভিন্নতা ছিল, তা আমি এই গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করে দিয়েছি। সেখানে *আন-নুসখাতুল মাগারিবিয়্যা* শব্দে এই কপিটির প্রতি ইঙ্গিত করেছি আর আমার কপিটি الأصل। শব্দে উল্লেখ করেছি। উভয় কপির মিল থাকলে বলেছি الأصلين। অর্থাৎ মূল কপি দুটিতে এরকম রয়েছে।

পাঠকের কাছে মূল কিতাবের বর্ণনাকে আরও অধিক স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলার জন্য এতে অনেকগুলো টীকা সংযোজন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো নম্বর ও সুরার নামসহ উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। হাদিসগুলোর তাহকিক করা হয়েছে। গ্রন্থকারের বিশদ জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এতে তার শ্রেষ্ঠত্ব জানা যাবে, ইতোপূর্বে তার *আত-তাওয়াহহুম* ও *আর-রিয়াআ* নামক গ্রন্থ দুটি ছাপানোর সময় তার এই হক আদায় করা হয়নি। এই গ্রন্থটি আমি উৎসর্গ করেছি আমার প্রয়াত ভাতিজা আবদুল হাদি আবু গুদ্দাহকে। খুব অল্প বয়সে প্রস্ফুটিত কলি হয়েই সে মহামহিমের কাছে চলে গেছে। জীবনের বিশটি বসন্তও সে কাটাতে পারেনি।

হে আল্লাহ, আপনি তাকে জান্নাতের মনোহর বাগানে সুখে রাখুন। তার যৌবনের উত্তম বদলা দান করুন এবং আমাদের ও তার জন্য উত্তম পরিণতি ও অধিক পুণ্যের ফয়সালা করুন। আমার এই কাজটিকে কবুল করুন। শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার দরবারেই এর প্রতিদান সংরক্ষিত রাখুন, আমি যেন এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি, যেদিন আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হব এবং যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি কোনো উপকারে আসবে না, তবে যে ত্রুটিমুক্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সেই রক্ষা পাবে।

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
হালব, জুমাদাল উলা, ১৩৮৪ হিজরি।

গ্রন্থকারের জীবনী

জন্ম, মৃত্যু ও বংশ পরিচয়

নাম আবু আবদুল্লাহ হারেস বিন আসাদ মুহাসেবি। জন্ম ইরাকের বসরা শহরে। বসবাস বাগদাদে। এই শহরেই তিনি পরলোক গমন করেন। যুগের ইমাম, আল্লাহর মারেফাত তথা পরিচয় লাভকারী মহান বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন। ইলম, তাকওয়া-পরহেজগারি, আধ্যাত্মিক সাধনা ও অন্তরের ভাল-মন্দ বিষয়ে যুগের অনুপম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার তুলনা শুধু তিনি নিজেই ছিলেন। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ছিলেন। ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতা বিষয়ে তার বয়ান ছিল চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অধিক পরিমাণে নিজের নফসের হিসেব নেওয়ায় মুহাসেবি নামে পরিচিতি লাভ **করেন**। তার জন্ম তারিখ সম্পর্কে জানা যায়নি। ২৪৩ হিজরিতে বাগদাদ শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন। তবে আমার প্রবল ধারণা তিনি ১৬৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কতিপয় শায়খের মৃত্যু তারিখ বিশ্লেষণ করে আমি তা বের করেছি।

ইতিহাসবিদ, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক ইবনে বাশকুয়াল (খালফ ইবনে আবদুল মালেক) আন্দালুসি, কুরতুবি (জন্ম: ৪৯৪, মৃত্যু: ৫৭৮) একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় তার জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। যেমনটি হাফেয সাখাবি তার *আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফি তারজামাতি শাইখিল ইসলাম হাফেয ইবনে হাজার* নামক গ্রন্থের শেষে একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে বাগদাদ থেকে ছাপা তার অপর গ্রন্থ *আল-ইলান বিত-তাওবিখ* গ্রন্থের ৩৭২ নং পৃষ্ঠাতেও উল্লেখ আছে।

হাদিস বর্ণনা এবং তার থেকে বর্ণনাকারীগণ

তিনি মুহাদ্দিস ইয়াযিদ ইবনে হারুন এবং তার সামসময়িকদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ-এর কাছেও পড়েছেন। এ তথ্যটি আবু মানসুর আবদুল কাহের তামিমি বাগদাদি *উসুলুদ দিন* গ্রন্থের ৩০৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।[১০]

তার থেকে হাদিস বর্ণনাকারীগণ হলেন,

আবুল আব্বাস ইবনে মাসরুক।
আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আবদুল জাব্বার সুফি।
শায়খ ইমাম জুনাইদ। তার সঙ্গে তার কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে।
ইসমাইল ইবনে ইসহাক সিররাজ।
আবু আলি হুসাইন ইবনে খাইরান।
আহমাদ ইবনে কাসেম ইবনে নসর।
আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাইমুন প্রমুখ।

ইবাদত, ইলম ও অধিক গ্রন্থ রচনা

তিনি একজন ইবাদতগুজার, দুনিয়াবিমুখ সুফি, ফকিহ, উসুলবিদ, যুক্তিবাদি, ক্রন্দন উদ্রেককারী বক্তা ও মুহাদ্দিস ছিলেন। আল্লাহ তাকে বিশুদ্ধ ও আকর্ষণীয় বর্ণনাশক্তি এবং অন্তরের স্বচ্ছতা দান করেছিলেন। তিনি যখন উৎসাহব্যঞ্জক কিংবা ভীতি জাগানিয়া কোনো ঘটনা বর্ণনা করতেন, শ্রোতার

---

১০. হাফেয ইবনুস সালাহ র. হারেস মুহাসেবির ইমাম শাফেয়ি র.-এর কাছে পড়ার বিষয়ে আপত্তি করেছেন। ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি *(তাবাকাতুস শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা,* ২: ২৭৫ গ্রন্থে) মুহাসেবি সম্পর্কে ইবনুস সালাহ র. থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি একমত পোষণ করেছেন ও তা গ্রহণ করেছেন। শায়খ ইবনুস সালাহ এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে শায়খ হারেস মুহাসেবি ইমাম শাফেয়ি র.-এর সামসময়িক ও তার মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইমাম শাফেয়ি র.-এর কাছে পড়েননি এবং তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎও হয়নি। দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথাটিই আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছে। আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, তাই এখানে আর সেসব দলিল প্রমাণ তুলে ধরছি না।

কাছে মনে হত যেন সে তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তা অনুভব করছে। অর্থাৎ, বাস্তব অনুভূতি জাগ্রত হত। তার আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার আগেই শ্রোতার অন্তর আস্থা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। তিনি শুধু কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বলতেন।

তুমি তার লেখা পড়লে সাক্ষ্য দিবে যে, তার লেখনী অন্তরের যাবতীয় দ্বিধা-সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে দূর করে দেয় এবং ভীতি সঞ্চারক বিষয়ে অন্তরে সত্যতা, বিশ্বাস ও চাক্ষুস অনুভূতি সৃষ্টি করে। তুমি নীরবে যখন তা পড়বে, তোমার দু চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে। দেখবে দিলের কী তড়প এবং অন্তরের কী ব্যথা নিয়ে তিনি উম্মাহকে জাহান্নামের ভয়ংকর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তা থেকে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। সন্তানের ভীষণ আযাবে গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত পিতা যেমন তাকে দীর্ঘ সময় নিয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন, তেমনি তিনি অনেক সময় আলোচনা দীর্ঘ করেন, যাতে পাঠকের ভেতর তার অবচেতন মনে লেখকের সঙ্গে চিন্তা ও ভাবের ঐক্য গড়ে উঠে এবং সে তার আহ্বানের সাড়া দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকে। [১১]

---

[১১] এ কথার সত্যতা পাঠক তুমি *আর-রিআয়া* এবং *আত-তাওয়াহহুম* গ্রন্থদ্বয়ে লক্ষ করবে। আমি মনে করি গ্রন্থ দুটি তোমার অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এতে তোমার অন্তর নরম হবে, চক্ষু সজল হবে এবং তুমি নিজের অবস্থা ও আখেরাত সম্পর্কে অনেক অজানা জ্ঞান লাভ করবে।

মনে হয়, *আত-তাওয়াহহুম* গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে শায়খ হারেস মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ-কে শায়খ ইবরাহিম ইবনে আদহাম, যিনি বহুত বড়ো আল্লাহর ওলি, প্রসিদ্ধ ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন, তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। তার মৃত্যু ১৬২ হিজরিতে। এমনটি মনে হওয়ার কারণ, মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনায় প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে কেয়ামত ও তার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে ইবরাহিম ইবনে আদহামের আলোচনার সঙ্গে মুহাসেরিব *আত-তাওয়াহহুম* গ্রন্থের আলোচনার অনেক মিল আছে।

হাফেয ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ শায়খ ইবরাহিম ইবনে আদহামের জীবনী আলোচনায় বলেন, ইবরাহিম ইবনে আদহামের সঙ্গী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র.

শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ সময়ের ব্যাপারে অনেক যত্নবান ছিলেন। প্রতিটি মুহূর্ত কল্যাণের কাজে ব্যয় করতেন। হিতোপদেশ দান কিংবা লেখালেখি অথবা ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের আশায় প্রতিটি নিঃশ্বাস তিনি কল্যাণকর কাজে ও আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করতেন।

এ কারণে তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। শায়খ তাজুদ্দিন সুবকি *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল* কুবরা গ্রন্থে (২:৩৭) তার জীবনী আলোচনায় লিখেন, তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দু'শ। বেশিরভাগই দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, তাসাউফ ও আল্লাহ প্রেমে বিলীন হওয়ার বিষয়ে। অনেকগুলো আছে দিনের মৌলিক বিষয়াদি, মুতাযিলা, রাফেজি, কাদরিয়্যা ও অন্যান্য বাতিল ফেরকার ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের খণ্ডনে। কিছু গ্রন্থ আছে ফিকহ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো অনেক উপকারী। বিশেষ করে তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির বিষয়ে তিনি যেসব গ্রন্থ লিখেছেন, যারা পরবর্তীকালে এ বিষয়ে কলম ধরেছেন, তারা এ গ্রন্থগুলোকে তাদের জন্য আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এমনকি ইমাম আবু হামেদ গাযালি র. এর মতো জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিও।

বলেন, ইবরাহিম একজন গুণী মানুষ ছিলেন। তার ও আল্লাহর মাঝে বিশেষ ও গোপন সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে কখনো নিজের তাসবিহাত ও আমল প্রকাশ করতে দেখিনি।

ইবরাহিম বলতেন, আমাদের মনযিল তো আমাদের সামনে। আর আমাদের জীবন তো মৃত্যুর পরে শুরু হবে। আমাদের ঠিকানা হয় জান্নাতে, না হয় জাহান্নামে। কল্পনা কর যে, মালাকুল মউত তার সঙ্গীদের নিয়ে তোমার জান কবয করতে এসেছেন। তোমার তখন কী অবস্থা হবে? তারপর কবরের ভীতিকর পরিবেশ ও মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার সময়টি কল্পনা কর, দেখ তখন তোমার কী অবস্থা? কেয়ামত ও তার ভয়াবহতার বিষয়টিও কল্পনা কর। ভেবে দেখ সেদিন তোমার কী অবস্থা হবে? এ কথাগুলো বলে তিনি ভীষণ জোরে এক চিৎকার দিতেন। তারপর বেহুশ হয়ে পড়তেন। (*আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া:* ১:১৩৫- ১৪০)

বড়োদের প্রশংসাসূচক মন্তব্য

শায়খ ইমাম জাহেদ কাওসারি র. বলেন, ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ-এর উপর ইমাম মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ -এর অনেক প্রভাব রয়েছে। ইমাম মুহাসেবি *আর-রিআয়াহ* নামক গ্রন্থে আত্মিক ব্যাধি ও তার কারণ এবং চিকিৎসা বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ তার *ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে তারই সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন।

আল্লামা মুনাবি রহিমাহুল্লাহ ইমাম মুহাসেবির জীবনীতে বলেন, আবু মানসুর আবদুল কাহের তামিমি বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ফিকহ, তাসাউফ, হাদিস ও কালাম শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। অপর এক আলেম বলেন, তার মূল্যবান ও উপকারী গ্রন্থগুলোর সংখ্যা দশের মতো। তাসাউফ শাস্ত্রে তার *আর-রিআয়াহ* গ্রন্থটিই যথেষ্ট। এ বিষয়ে যারা পরবর্তীকালে কলম ধরেছেন, তাদের জন্য তার গ্রন্থগুলো মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে বলেন, মুহাসেবি তাসাউফ শাস্ত্রে উম্মতের ইমাম। আত্মিক ব্যাধি, ইবাদত ও আমল নষ্টকারী বিষয়ে যারা আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার সমস্ত কথা হুবহু নকলের উপযুক্ত। *(আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফি তারাজিমিস সাদাতিস সুফিয়্যা* : ১: ২১৮)।[১২]

ফকিহ, উসুলবিদ, সমালোচক ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ তার *আল-ইতিসাম* গ্রন্থের (১:২৮৪) চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বলেন, হারেস মুহাসেবি বড়ো মাপের সুফি ও অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার *আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ* গ্রন্থে (২:৫৮৪) মুদাল হাদিস সম্পর্কে আলোচনার অধ্যায়ে বলেন, হারেস মুহাসেবি হাদিস ও কালাম শাস্ত্রের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত।

---

[১২] ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ ইমাম মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ-এর যে তারিফ করেছেন, তা শায়খ ইবনে আব্বাদ নাফজি *শারহুল হিকাম* গ্রন্থে এই শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন, (সমস্ত গুনাহ, উদাসীনতা ও প্রবৃত্তি পূজার মূলে হল আত্মতুষ্টি।) সেই গ্রন্থ দেখে আমি *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যা* গ্রন্থে ভুল করে যে হাবরুল উম্মাহ লেখা হয়েছে, তা সঠিক করে খাইরুল উম্মাহ লিখে দিয়েছি।

তারপর তিনি হাফেয খতিবে বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ-এর *আল কিফায়াহ* গ্রন্থের বক্তব্যকে খণ্ডন করে *ফাহমুস সুনান* গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন তা হুবহু নকল করে বলেন,

তাকে উসুলে ফিকহের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। উসুলে ফিকহের গ্রন্থগুলোতে কিছু উসুলে তার নাম পাওয়া যায়। যেমনটি তুমি পাবে তাকিউদ্দিন ফুতুহি হাম্বলি র.কৃত *আল-কাওকাবুল মুনির ফি শারহি মুখতাসারিত তাহরির* গ্রন্থের (২:২৭৩) ইজমা-এর আলোচনায়। ইবনে হাজামের *ইহকাম-ফি উসুলিল আহকাম* গ্রন্থেও (১:১১৯) পাবে। আরও পাবে শাওকানির *ইরশাদুল ফুহুল ইলা ইলমিল উসুল* গ্রন্থের (পৃষ্ঠা নং ৪৬ এবং ১:২০৭) পরিমার্জিত সংস্করণে সুন্নাহ-এর আলোচনায় : দ্বিতীয় প্রকার : আল-আহাদ, আর তা এমন খবর যা নিজে নিজে নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয় না।

তাসাউফ বিষয়ে তার রচনাপদ্ধতি

গ্রন্থ রচনায় তার পদ্ধতি ছিল অভিনব। হাফেয আবু নুআইম তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হারেস মুহাসেবি আমার ঘরে এসে বলতেন, চলুন, মরুভূমির দিকে যাই। তখন আমি তাকে বলতাম, আপনি আমাকে নির্জনবাস থেকে বের করে কামনাবস্তু দর্শন ও অন্যান্য বিপদাপদের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? তখন তিনি বলতেন, ভয়ের কিছু নেই, আমার সঙ্গে চলুন। আমি তার সঙ্গে বের হতাম, মনে হত রাস্তা সবকিছু থেকে মুক্ত। অপছন্দনীয় কোনো কিছু আমাদের নজরে আসত না। বসার স্থানে পৌঁছে আমরা যখন বসতাম, তখন তিনি বলতেন, প্রশ্ন করুন (যা জানতে চান)। আমি তাকে বলতাম, আপনাকে প্রশ্ন করার মতো আমার কিছু নেই। তিনি আমাকে বলতেন, আপনার মনে যা আসে সে বিষয়ে প্রশ্ন করুন। তারপর তিনি আমার সামনে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরতেন, যাতে আমি তাকে সেসব প্রশ্ন করি। তখন তিনি আমাকে সেগুলোর উত্তর দিতেন; কিন্তু ঘরে গিয়ে সেগুলো লিখে রাখতেন। এভাবে তা একটি গ্রন্থ হয়ে যেত। (*হিলয়াতুল আউলিয়া* : ১০:৭৪)

আপনি যদি তার ইলমি ও ফিকহি মর্তবা সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে *তাফসিরে কুরতুবিতে* ইমাম কুরতুবি নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসিরে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তা অবশ্যই পড়ে নিন। আলোচনাটি যেমন উপভোগ্য, তেমনি উপকারী। এর মাধ্যমে ইমাম মুহাসেবির ইলমি ও ফিকহি মর্তবা কত উঁচু ছিল, তা জানা যায়।

মুহাদ্দিসগণের অভিমত

শায়খ মুহাসেবি তাসাউফ, আত্মার ব্যাধি ও আত্মশুদ্ধি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এবং তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে সূচনা করেছিলেন। আর এই যুগটি নববি যুগের খুব নিকটবর্তী ছিল। তাই মানুষের মাঝে হাদিস বর্ণনা ও মুখস্থ করা, হাদিসের জন্য দূরদূরান্ত সফর করা-মোটকথা হাদিস নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা ছিল প্রবল। কেউ এ পথ রেখে, ইলম অর্জনের জন্য অন্য কোনো পথ অবলম্বন করলে, হাদিস ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করলে, সে ফকিহ হোক কিংবা ওয়ায়েজ, অথবা কালামশাস্ত্রবিদ- মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতেন।

এর উদাহরণ এই যে, হাফেয যাহাবি র. *মিযানুল ইতিদালে* (৪:৩০২) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক তার এক সামসময়িকের (হিশাম ইবনে আম্মার দিমাশকি) সমালোচনা এবং তার ব্যাপারে কঠিন হুকুম আরোপের কথা উল্লেখ করেন। তারপর তিনি বলেন, ইতিহাসের প্রতি যুগেই সামসময়িক উলামায়ে কেরাম একে অপরের সম্পর্কে নিজস্ব ইজতেহাদ ও বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী মন্তব্য করেছেন। তাই আল্লাহর রাসুল ছাড়া (আর কারও সব কথা ধর্তব্য নয়) প্রত্যেকেরই গ্রহণীয় কথা যেমন রয়েছে, তেমনি অগ্রহণীয় কথাও রয়েছে।

এ কারণে শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাসেবি সামসময়িক সেসব মুহাদ্দিসিনে কেরামের কঠিন সমালোচনার শিকার হয়েছেন, যারা সনদ ও মতনসহ শুধু হাদিস বর্ণনা করাকেই পূর্ণ ইলম মনে করতেন এবং হাদিস থেকে মাসআলা বের করা ও হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করানোকে হাদিসের ইলম থেকে বের হয়ে যাওয়া মনে করতেন। এ সকল মুহাদ্দিসিনে কেরাম যখন শুনতেন যে, কোনো আলেম কোনো মাসআলা নিয়ে গবেষণা কিংবা ইজতেহাদ করে মতপ্রদান করেছেন, অথবা কোনো কালামশাস্ত্রবিদ আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কে কথা বলেছেন, কিংবা কোনো নসিহতকারী ওয়ায়েজ আত্মার ব্যাধি খুঁজে বের করে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন-তখন তারা ক্রোধান্বিত

হতেন, তার সে কাজের বিরোধিতা করতেন এবং তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিতে যা সঠিক মনে হয়, তা বলে তাকে দোষারোপ করতেন।[১৩]

---

১৩ ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহকৃত *মানাকিবুশ শাফেয়ি* (২:৪৬) এবং ইয়াকুত আল-হামাবিকৃত *মুজামুল উদাবা* গ্রন্থে (১৭: ২৯৯) ইমাম শাফেয়ি র.-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনায় এসেছে, মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ জুবাইরি বলেন, মুহাম্মদ. বিন ইদরিস শাফেয়ি র. একবার আমার সামনে হুযাইলের কিছু কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করলেন, তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মুহাদ্দিসগণের সামনে এগুলো আবৃত্তি করো না। কারণ তারা তা সহ্য করতে পারবে না। আমি তখন বললাম, তারা এর চেয়ে আরও কম জিনিসও সহ্য করতে পারে না। তারা তো হাদিসকে অধ্যায়ভিত্তিক লিপিবদ্ধ করার কথাও সহ্য করতে পারে না। কিংবা হাদিস, ফিকহ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের কথা কেউ লিপিবদ্ধ করে শুনলে তারা তাও সহ্য করতে পারে না।

প্রমাণস্বরূপ কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি

১. খুরাসানের বিখ্যাত আলেম মহান ইমাম আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. (মৃত্যু ১৮১ হিজরি)-এর জীবনী আলোচনায় এসেছে, আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারি র.বলেন, আবু উসামা -অর্থাৎ, হাম্মাদ ইবনে উসামা, যিনি নিজেও একজন ইমাম, হাফেযে হাদিস এবং প্রমাণস্বরূপ ছিলেন- আমি তাকে বলতে শুনেছি, তুরতুসে আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি হাদিস পড়াচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি হাদিস সংকলন করতে গিয়ে যেভাবে সেগুলোকে অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন, আমার তা পছন্দ না। আমি আমার শায়খদেরকে এমন করতে দেখিনি।

এটি একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদিসের মত, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের শায়খ, যাহেদ ও আবেদগণের ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র.-এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যাপারে। তিনি কী করেছিলেন, তিনি হাদিসগুলোকে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে অধ্যায়ভিত্তিক সংকলন করেছিলেন। তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমাম মুহাসেবি র.-এর ব্যাপারে তাদের মত আরও কঠিন থেকে কঠিন ছিল। আর ইমাম আবু হানিফা র. সম্পর্কে তারা আরও তিক্ত ও কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। (আবু নুআইমকৃত হিলয়াতুল আউলিয়া: ৮:১৬৫)

২. ফকিহ মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ইমাম আবু সাওর ইবরাহিম ইবনে খালেদ বাগদাদি র.। মৃত্যু ২৪০ হিজরি। তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনায় এসেছে, আবু আ'য়ান বলেন, আমি তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ র.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, আমি পঞ্চাশ বছর ধরে তাকে হাদিস পড়তে ও পড়াতে দেখছি। আর তিনি আমার নিকট সুফিয়ান সাওরি র.-এর সমপর্যায়ের ইমাম। জনৈক ব্যক্তি কোনো মাসআলা সম্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ফুকাহায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করো। আবু সাওরকে জিজ্ঞাসা করো। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন, আমি আবু সাওরের জানাজা পড়ে ফিরলে, আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিলে? আমি বললাম, আবু সাওরের জানাজা পড়ে এলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তিনি (অনেক বড়ো মাপের) ফকিহ ছিলেন। আমি সবসময় তার সম্পর্কে ভাল কথাই শুনেছি। তবে আমার তার একটি বিষয় পছন্দ হয়নি যে, তার ছাত্ররা তার কথা কিতাবে লিখছে।

এই যদি হয় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য তার সমযুগের ফকিহ মুহাদ্দিস সম্পর্কে, যার ব্যাপারে তিনি নিজে সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে, পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি তাকে হাদিসের খেদমতে নিয়োজিত দেখেছেন এবং যিনি একজন ফকিহ ও মর্যাদার দিক থেকে সুফিয়ান সাওরির স্তরের। তাহলে হারেস মুহাসেবি র. সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাতে মোটেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। (দেখুন হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহকৃত *তাহযিবুত তাহযিব*: ১: ১৮১)।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম এবং ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই-এর কিতাবসমূহ পড়তে নিষেধ করতেন। যেহেতু সেসব গ্রন্থে ফিকহি মাসআলা সম্পর্কে তাদের ইজতিহাদকৃত ফয়সালা ও ব্যক্তিগত মতামত থাকত।

হাফেয ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ-এর কথা নকল করেন, ইমাম আহমদ উসমান ইবনে সাইদকে বলেছিলেন, তুমি আবু উবাইদ, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই, সুফিয়ান, শাফেয়ি এবং ইমাম মালেকের কিতাবসমূহ পড়বে না, বরং 'আসল' পড়বে।

সালামা ইবনে শাবিব ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট জানতে চেয়ে বললেন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম ইমাম শাফেয়ির কিতাব লিখে রাখে, বিষয়টি কেমন? তিনি বললেন, আমি তাদের এমনটি করা জায়েয মনে করি না। ফকিহ আবু সাওরের কিতাবসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ নতুন সৃষ্টি বিদআত। গ্রন্থাকারে বিন্যাস তার অপছন্দ ছিল। তিনি বলতেন, তোমরা শুধু হাদিস পড়বে।

তার কোনো কথা কিংবা মত অথবা ফতোয়া কেউ লিখে রাখুক-তিনি তা অপছন্দ করতেন। (হাফেয ইবনুল জাওযিকৃত *মানাকিবুল ইমাম আহমদ*, অধ্যায় নং ২৮ ও ২৯। পৃষ্ঠা নং ২৪৯ থেকে ২৫১।)

ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ যদি এমন বড়ো ইমামদের গ্রন্থ রচনা ও তাতে নিজেদের ইজতিহাদকৃত মাসআলা লিপিবদ্ধ করা অপছন্দ করেন, তাহলে যেসব গ্রন্থে মানুষের অন্তরের চিন্তা-ভাবনা, ঝোঁক-প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তা কীভাবে পছন্দ করবেন?

কিন্তু ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ-এর গ্রন্থ রচনার বিরোধিতাকে মানুষ আমলে নেয়নি, যেমনিভাবে আমলে নেয়নি তার মুখনিসৃত বাণী, ফতোয়া ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা সংক্রান্ত তার নিষেধকে। বরং গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে এবং তার ফতোয়া, মাসায়েল ও মালফুযাত-ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। শায়খ ইবনু কায়্যিমিল জাওযি রহিমাহুল্লাহ তার *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন* গ্রন্থের শুরুতে (১: ২৮) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি *কায়েদা ফিল জারহি ওয়াত তাদিল* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং ৫৪) ইমাম ইবনু দাকিকিল ইদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সমালোচনার সময় লক্ষ রাখা উচিত, অনেক সুফি ও মুহাদ্দিসগণের মাঝে সৃষ্ট মতবিরোধ, যার ফলে তারা পরস্পর সমালোচনা করেছেন, যেমন কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম হারেস মুহাসেবি র.-এর সমালোচনা করেছেন।

অর্থাৎ, যিনি তার সমালোচনা করেছেন তার কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এজন্য যে, তা সুফি ও মুহাদ্দিসগণের মাঝে পরস্পরকে অপছন্দ করার কারণে হয়েছে।

এই অপছন্দ পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও বিদ্যমান ছিল। বরং বলতে দ্বিধা নেই, বর্তমানেও তা আছে। আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফিফ মুহাম্মদ ইবনে খফিফ সিরাজি, যিনি একজন সুফি, ফকিহ ও শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, মৃত্যু ৩৭১ হিজরিতে, তার জীবনীতে এসেছে,

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সিরাজি বলেন, আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফিফ একদিন ইবনে মাকতুম এবং তার কয়েকজন সাথীকে দেখলেন তারা -জ্ঞানের- কিছু লিখছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হচ্ছে? তারা উত্তরে যা লিখছিল তার কথা বলল। তখন তিনি বললেন, কিছু শেখার চেষ্টা করো, আর

জারহ ওয়া তাদিল গ্রন্থে এ জাতীয় ঘটনা প্রচুর রয়েছে।[১৪]

ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ শায়খ মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ-এর জীবনীতে বলেন, মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আল্লাহর মারেফাত লাভকারী সত্যবাদী বুজুর্গ ছিলেন। উলামায়ে কেরাম তাসাউফ বিষয়ে তার কোনো কোনো কথা ও গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। (*মিযানুল ইতিদাল* : ১ : ১৯৯-২০০)।

তাই আমরা মোটেও বিস্মিত হই না, যখন দেখি হাফেজে হাদিস ইমাম আবু যুরআ রাযি র. তার চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শায়খ মুহাসেবির গ্রন্থ ও তরিকার সমালোচনা করছেন। খতিব বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ তারিখে বাগদাদে (৮ : ২১৫) নিজের সনদে সাইদ ইবনে আমর বারদায়ির সূত্রে বলেন,

---

সুফিদের কথা শুনে ধোঁকা খেয়ো না। আমি আমার জামার পকেটে কালি রাখি। সেলোয়ারের ভেতর কাগজ লুকিয়ে রাখি। তারপর ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে গোপনে উলামায়ে কেরামের নিকট গমন করি। সুফিগণ যখন আমার ব্যাপারে জানতে পারত, তখন তারা আমার সঙ্গে বিবাদে জড়াত, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলত, তুমি কামিয়াব হতে পারবে না। তারপর একসময় নিজেরাই (আমার ইলমের কারণে) আমার প্রয়োজন অনুভব করল। (দেখুন হাফেয ইবনে আসাকিরকৃত *তাবয়িনু কিযবিল মুফতারি*, পৃষ্ঠা নং ১৯১)।

আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়ারিস সিরাজি, অতঃপর মারওয়াজি। তিনি হাফেযে হাদিস, সুফি ও পর্যটক ছিলেন। মৃত্যু ৪৮৫ হিজরি। তার জীবনীতে এসেছে, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ফাশানি বলেন, আমি জিহাদকালীন যখন আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহর নিকট হাদিস পড়ার জন্য গমন করতাম, তখন তিনি আমাকে নিয়ে মরুভূমির দিকে যেতেন। তারপর বলতেন, এখন পড়। সুফিগণ যারা হাদিস নিয়ে মগ্ন থাকত, তাদের প্রতি বিরক্তি বোধ করত আর বলত, এরা এসে আমাদের সময়গুলো নষ্ট করে। (দেখুন হাফেয যাহাবি র.কৃত *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, ৪:১২১৬)।

[১৪] এর প্রমাণ ও উদাহরণ আমার *মাসআলাতু খালকিল কুরআন ওয়া আসারুহা ফি সুফুফির রুওয়াত ওয়াল মুহাদ্দিসিন ওয়া কুতুবিল জারহি ওয়াত তাদিল* নামক রিসালায় দেখুন। কিংবা শায়খ থানভি র.-এর কিতাব *কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস* গ্রন্থের ৩৬১-৩৮০ পৃষ্ঠায় আমার যে টীকা আছে তা দেখুন।

আমি আবু যুরআকে দেখেছি, তাকে হারেস মুহাসেবি ও তার গ্রন্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে বললেন, এ সমস্ত গ্রন্থ থেকে দূরে থাকবে। এ কারণে যে, এগুলোতে বিদআত ও গুমরাহি রয়েছে। শুধু হাদিস পড়বে। হাদিসই তোমার সকল প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেবে।

তাকে বলা হল, তার কিতাবে তো শিক্ষণীয় কথা থাকে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন থেকে যে শিক্ষা লাভ করতে পারবে না, তার জন্য এসব কিতাবেও কোনো শিক্ষা থাকবে না। তোমরা কি ইমাম মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আওযায়ি ও পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমামদের নফসের কুমন্ত্রণা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে কোনো কিতাব লেখার কথা শুনেছ? এই সুফিগণ হচ্ছে মুহাদ্দিসিনে কেরামের বিরোধী। তারা কখনো আমার কাছে হারেস মুহাসেবির কিতাব নিয়ে আসে, কখনো আবদুর রহিম দাইবুলির, কখনো হাতেম আসামের। আবার কখনো শাকিক বালখির। মানুষ কত দ্রুত বিদআতের দিকে ধাবিত হচ্ছে!

ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট বিদআতের প্রকার

হাফেয ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারিতে (১৩:২১২) ইতিসাম অধ্যায়ে রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ অনুচ্ছেদে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ-এর উক্তি,

সবচেয়ে উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব, উত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ, নিকৃষ্ট বিষয় হলো নবউদ্ভাবিত বিষয়। আর তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে। তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

এই উক্তির ব্যাখ্যায় তিনি লিখেন যে, ইমাম শাফেয়ি র. বলেন, বিদআত দু প্রকার: ১. প্রশংসনীয় বিদআত। ২. নিন্দনীয় বিদআত। যা সুন্নতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তা প্রশংসনীয়। আর যা সুন্নতের বিপরীত হবে তা নিন্দনীয়।

আবু নুআইম ইবরাহিম ইবনে জুনায়েদ-এর সনদে ইমাম শাফেয়ি র. থেকে তার এ ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ থেকে ইমাম বাইহাকি বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, নবউদ্ভাবিত বিষয়সমূহ দু প্রকার। যা কুরআন, সুন্নাহ কিংবা সাহাবায়ে কেরামের উক্তি, অথবা ইজমার পরিপন্থি হবে তা গুমরাহি, নিন্দনীয়। আর যা পরিপন্থি হবে না, তা নিন্দনীয় নয়। (প্রশংসনীয়)।

নবউদ্ভাবিত ভালো কাজ যেমন, ১. হাদিস সংকলন। ২.কুরআন তাফসির। ৩. কিয়াসের ভিত্তিতে প্রমাণিত মাসআলা-মাসায়েল, ৪. ও তাসাউফ সংক্রান্ত বিষয় সংকলন।

হাদিস সংকলনের বিষয়টি হযরত উমর, আবু মুসা আশআরিসহ এক দল উলামায়ে কেরাম অপছন্দ করেছেন। অবশ্য অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর অনুমতি দিয়েছেন।

আর কুরআন তাফসিরের বিষয়টি এক দল তাবেয়ি অপছন্দ করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম শাবিও রয়েছেন।

তৃতীয়টি ইমাম আহমদসহ একদল আলেম অপছন্দ করতেন। আর চতুর্থ বিষয়টি তো ইমাম আহমদের কাছে ভীষণ অপছন্দের ছিল।

ইমাম আবু যুরআ ও ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমার হারেস মুহাসেবির মত ও পথকে অপছন্দের আরও একটি কারণ

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু যুরআ, ইমাম আহমদ ও অন্যান্যদের হারেস মুহাসেবির কর্মপন্থাকে অপছন্দ করার অপর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। আমরা যে কারণ উল্লেখ করেছি তা ছাড়া।

তিনি তার গ্রন্থ *জামিউল উলুম ওয়াল হিকামের* ২২৩ নং পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন,

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ

অর্থ: নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো, যদিও লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দিয়ে দেয়।

তারপর এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমামগণ যেসব সুফিয়ায়ে কেরাম নফসের কুমন্ত্রণা ও চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে কথা বলেন, তাদের নিন্দা করেছেন। কারণ তাদের কথার কোনো শরয়ি দলিল থাকে না। শুধু ব্যক্তিগত মত ও রুচির ভিত্তিতে সেগুলো বলা হয়ে থাকে। এমনিভাবে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ কুরআন-হাদিসের দলিল ছাড়া শুধু কিয়াসের ভিত্তিতে হালাল-হারামের মাসআলা প্রদান করাকে অপছন্দ করতেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ* গ্রন্থের ২১ নং অধ্যায়ের ১৭৯ নং পৃষ্ঠায় ইসহাক ইবনে হাইয়া আমাশ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তাকে নফসের কুমন্ত্রণা ও ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িনগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেননি। তারপর ইবনুল জাওযি ২৩ নং অধ্যায়ের ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম আহমদ র. সুন্নতের প্রতি ভীষণ ভালোবাসা ও বিদআতের প্রতি চরম ঘৃণা থাকার কারণে অনেক প্রিয় আলেমগণের ব্যাপারেও কথা বলতেন, যখন তারা সুন্নতের পরিপন্থি কোনো কাজ করত। দিনি কল্যাণকামনার উদ্দেশ্যেই তিনি এসব বলতেন।

ইমাম আহমদ র. যে মুহাসেবি থেকে মানুষকে দূরে থাকতে বলতেন ও সতর্ক করতেন, শায়খ ইবনে তাইমিয়ার নিকট তার কারণ শুধু এটাই ছিল যে, ইমাম মুহাসেবি কিছু বিষয়ে কালাম শাস্ত্রের মত গ্রহণ করেছিলেন। আর এ মতগুলো ছিল ইবনে কুল্লাব বাসরির সৃষ্ট। এমন নয় যে, তিনি শুধু তাসাউফ, আখলাক ও আত্মশুদ্ধির বিষয়ে কথা বলেছেন। কারণ এগুলো তো অনেক আলেমগণের আগ্রহের বিষয়। একজন আমলদার আলেম তো তার আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম ও লেখনির মাধ্যমে এসব বিষয়ের প্রতিই আহ্বান করে থাকেন।

মাজমাউল ফাতওয়া গ্রন্থে (১২: ৩৬৬-৩৬৮) ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ-এর শেষ বয়সের দিকে আবু মুহাম্মাদ আবুদল্লাহ ইবনে সাইদ ইবনে কুল্লাব বাসরির উদ্ভব ঘটেছিল। তার খুব আলোচনা হত। তিনি জাহমিয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য ফেরকার আকিদা খণ্ডনে কিছু কিতাব লিখেছিলেন। আলোচনাকারী কালাম শাস্ত্রবিদ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার সিফাত নিয়ে আলোচনা করতেন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এবং মুহাদ্দিসিনে কেরামের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু তার মাঝে বিদআতের কিছু ছাপ ছিল। যেমন তিনি মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে তো তাঁর সত্তাগত সাব্যস্ত করতেন, কিন্তু ঐচ্ছিক কর্মগুলোকে তাঁর সত্তাগত সাব্যস্ত করতেন না। ইমাম হারেস মুহাসেবি, আবুল আব্বাস কালানসি ও অন্যান্যগণ তার অনুসারী ছিলেন।

আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তার এই মতের বিরোধী ছিলেন। ইবনে কুল্লাবের নবউদ্ভাবিত এই আকিদা থেকে তারা নিজেরাও দূরে থাকতেন, অন্যদেরকেও দূরে থাকতে বলতেন। মূলত এই কুল্লাবের কারণেই ইমাম আহমদ হারেস মুহাসেবি থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন। হারেস মুহাসেবি যেহেতু দর্শন ও আল্লাহ তায়ালার সিফাত নিয়ে আলোচনা করতেন তাই তিনি তাকে বর্জন করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য ইমামগণের নিকট হারেস মুহাসেবির মর্যাদা

শায়খ ইবনে তাইমিয়া তার রিসালা আত-তাদাম্মুরিয়্যার ২০৪ নং পৃষ্ঠায় হারেস মুহাসেবির প্রশংসা করেছেন।

তিনি আল-ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যাতুল কুবরা নামক তার অপর এক গ্রন্থের ২৬৬ নং পৃষ্ঠায় হারেস মুহাসেবির উল্লেখ এভাবে করেন,

قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَارِثُ بْنُ أَسَدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْمُحَاسِبِيُّ فِيْ كِتَابِهِ 'فَهْمُ الْقُرْآنِ' ...

ইমাম আবু আবদিল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ ইবনে ইসমাইল মুহাসেবি তার কিতাব ফাহমুল কুরআনে বলেন,...। তারপর শায়খ ইবনে তাইমিয়া তাসলিম (সন্তুষ্টি) ও ইসতেহসান-বিষয়ে ইমাম মুহাসেবি থেকে চার পৃষ্ঠারও অধিক আলোচনা তুলে ধরেন।

শায়খ জুনায়েদ বাগদাদির শায়খ সারিয়্যু সাকাতি ইমাম মুহাসেবির আদব, ইলম ও তাসাউফের প্রশংসা করতেন এবং জুনায়েদ বাগদাদিকে তার কাছ থেকে সেগুলো শেখার কথা বলতেন। তবে আকিদা শাস্ত্রে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন। ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, জুনায়েদ বাগদাদি বলেন, আমার শায়খ সারিয়্যু সাকাতি একদিন আমাকে বললেন, আমার কাছ থেকে যাওয়ার পর তুমি কার কাছে গিয়ে বস? বললাম, মুহাসেবি। তখন তিনি বললেন, খুব ভাল। তার কাছ থেকে ইলম ও আদব শিখবে, তবে আকিদা বিষয়ে দর্শনশাস্ত্রবিদদের খণ্ডনে তিনি যে মত দিয়েছেন সেগুলো বর্জন করবে। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ১-৩৭-৩৮)

ইমাম আহমদ র.-এর মুহাসেবির সমালোচনার ব্যাখ্যা

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ* গ্রন্থে বলেন, পবিত্র কুরআন বিষয়ে ইমাম আহমাদ র. যেসব নতুন কথা অপছন্দ করতেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা আওয়াজ ছাড়া কথা বলেন। তিনি এই নতুন দর্শনটি অপছন্দ করেন এবং এর বক্তাকে বিদআতি আখ্যা দেন। বলা হয়ে থাকে, এ কারণে ইমাম আহমদ হারেস মুহাসেবিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া বলেন, ইমাম আহমদ র.-এর হারেস মুহাসেবি থেকে মানুষকে দূরে থাকতে বলার কারণ এটি। উলামায়ে কেরাম বলেন, পরবর্তীকালে মুহাসেবি তার এই দর্শন ও আকিদা থেকে তওবা করে ফিরে আসেন এবং জ্ঞানে-গুণে ও দুনিয়াবিমুখতায় খ্যাতি লাভ করেন। (আল্লামা ফুতুহিকৃত *শারহুল কাওকাবিল মুনির*, ২/১০৭)। মুহাসেবি সম্পর্কে এই কথাটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ-এর তাকে অপছন্দ করার কারণ হচ্ছে, শরয়ি দলিলবিহীন বিষয়ে তার ব্যাপ্ত হওয়া।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর বক্তব্য

এ আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে, মুহাসেবির দর্শনশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করার কারণেই ইমাম আহমদ তার ঘোর সমালোচক ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নোক্ত আলোচনা তুলে ধরছি। এর মাধ্যমে বিষয়টি আরও জোরালোভাবে প্রমাণিত হবে।

১. *তারিখে বাগদাদ*-এ (৮ : ২১৪) খতিব বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমদ হারেস মুহাসেবিকে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে তার চিন্তা-গবেষণা ও এ বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থসমূহের কারণে অপছন্দ করতেন এবং মানুষকে তার থেকে ফিরিয়ে রাখতেন।

আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সে যুগে প্রত্যেক বড়ো আলেমকেই দর্শনশাস্ত্রের মুখোমুখি হতে হত। আর মুহাসেবি এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তাই পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে তাকেও এ বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অথচ তিনি দর্শন ও যুক্তিতর্ক শাস্ত্রের আলেম ছিলেন না। তিনি এর মাধ্যমে মুতাযিলাদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদার মুকাবেলা করে সেগুলোকে খণ্ডন করেছেন, এতে সমস্যার কি হয়েছে?

২. দর্শনশাস্ত্রের নিন্দায় পূর্ববর্তী ইমামগণের মত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, কালাম শাস্ত্রবিদরা কখনো সফল হতে পারে না। কালাম শাস্ত্র নিয়ে যেই লিপ্ত হয়েছে, তুমি দেখবে তার অন্তরে খাঁদ রয়েছে। ইমাম আহমদ এদের ঘোরতর সমালোচনা করেছেন। এ কারণে হারেস মুহাসেবির তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতা থাকা সত্ত্বেও শুধু ভ্রান্ত আকিদার খণ্ডনে বই লেখার কারণে ইমাম আহমদ তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাকে বলেন, তোমার ধ্বংস হোক! তোমাকে তো প্রথমে ভ্রান্ত আকিদার কথা উল্লেখ করে তারপর তা খণ্ডন করতে হয়, এভাবে কি তুমি মানুষকে এ সকল ভ্রান্ত ও সংশয়মূলক বিষয় পড়তে ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে প্ররোচিত করছ না? আর এটা তাদের এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মত প্রদানের দিকে আহ্বান করে।

৩. শায়খ তাজুদ্দিন ইবনুস সুবকি রহিমাহুল্লাহ বলেন, জেনে রাখুন, ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ ইলমে কালাম বিষয়ে আলোচনাকারীদের ঘোর সমালোচক ছিলেন। কারণ তার আশঙ্কা ছিল, এটা মানুষকে অনুচিত বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর সন্দেহাতিতভাবেই প্রয়োজন ছাড়া এ বিষয়ে কথা না বলা উত্তম। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা বিদআত। আর হারেস মুহাসেবি যেহেতু ইলমে কালামের বিষয়ে কথা বলেছিলেন, তাই আবুল কাসেম নাসরাবাদি বলেন, আমি শুনেছি, আহমদ ইবনে হাম্বল তাকে এ কারণে পরিত্যাগ করেছিলেন। (তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ : ২য় খণ্ড)।

আবদুল ফাত্তাহ বলেন, যুগে যুগে ও দেশে দেশে উলামায়ে কেরামের মাঝে এমন ইজতেহাদি মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। একজন একটি কথাকে সঠিক মনে করেন তো অপরজন ভুল মনে করেন। এজন্য তারা একটি কিংবা দুটি প্রতিদান লাভ করে থাকেন।

খতিব বাগদাদি ও অন্যান্যদের বর্ণনা অনুযায়ী হারেস মুহাসেবি কালামশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন, তাই ইমাম আহমদ তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ ইমাম আহমদের কথা শুনে হারেস মুহাসেবির প্রতি কঠোর হয়ে উঠে। তখন হারেস মুহাসেবি বাগদাদের একটি বাড়িতে আত্মগোপন করেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চারজন ছাড়া আর কেউ তার জানাজা পড়েনি। এ বর্ণনাটির সত্যতা প্রমাণ করা দুরূহ এবং তা সন্দেহপূর্ণ। হাফেয যাহাবি *মিযানুল ইতেদালে* (১:১৯৯) বলেন, এ বর্ণনাটির সনদ বিচ্ছিন্ন।

আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকির নসিহত : পূর্ববর্তীযুগের ইমামগণের আলোচনার সময় আদব বজায় রাখা

আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি র.-কে যখন ইমাম হারেস মুহাসেবি ও ইমাম আহমদের মাঝের মতভেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি এত সুন্দর ও যথার্থ একটি কথা বলেছেন যে, আবদুল হাই লাখনভি র. সেটিকে হাদিস বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা যাচাইয়ের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে দেন এবং তার 'আর-রাফউ ওয়াত তাকমিল ফিল জারহি ওয়াত তাদিল' গ্রন্থটি এর মাধ্যমেই শেষ করেন।

'আল্লামা সুবকি *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা* নামক গ্রন্থে ইমাম মুহাসেবি ও ইমাম আহমদের মাঝে পারস্পরিক দূরত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর বলেন, হেদায়েত প্রত্যাশীর উচিত আইম্মায়ে সালাফের সঙ্গে আদব বজায় রাখা এবং তারা একে অন্যের ব্যাপারে যে সমালোচনা করেছেন, সেগুলোর প্রতি মনোযোগ না দেওয়া। তবে কারও বিরুদ্ধে যদি সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে যদি তা ব্যাখ্যা করা যায় কিংবা তার ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করা যায়, তাহলে আমাদের অবশ্যই তা করতে হবে। অন্যথায় এড়িয়ে যেতে হবে। কারণ তোমার সৃষ্টি এসব কাজের উদ্দেশ্যে হয়নি।

তাই অর্থহীন কাজে লিপ্ত না হয়ে তুমি অর্থপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করবে। আর আমার মতে, একজন তালেবে ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত কামিয়াবির পথে থাকে যতক্ষণ সে আইম্মায়ে সালাফের পারস্পরিক মতভেদের পিছনে না পড়ে এবং একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য না দেয়।

তাই সাবধান! সাবধান! আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরি কিংবা ইমাম মালেক ও ইবনে আবি যিব, অথবা আহমদ ইবনে সালেহ ও ইমাম নাসায়ি, কিংবা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম হারেস মুহাসেবির মাঝে, এমনিভাবে শায়খ ইজযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম এবং শায়খ তাকিউদ্দিন ইবনুস সালাহ-এর মাঝে যা ঘটেছে তার প্রতি মনোযোগী হবে না। এসবের পিছনে পড়লে আমার আশঙ্কা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে, কারণ তারা হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহর ইমাম। তাদের প্রতিটি কথার এমন অনেক অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে, যার কোনোটা অনেক সময় বোঝা যায় না। তাই আমরা শুধু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকব এবং তাদের পারস্পরিক বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করব। যেমনটি সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতভেদের ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি।

হারেস মুহাসেবির মজলিসে ইমাম আহমদের উপস্থিত হওয়া এবং তাঁর প্রশংসা করা

খতিবে বাগদাদি সহিহ সনদে বর্ণনা করেন এবং ইবনুল জাওযি *মানাকিবুল ইমাম আহমদ* গ্রন্থের ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় (২৩ তম পরিচ্ছেদে) তার সূত্রে ইসমাইল ইবনে ইসহাক সিররাজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমাকে বললেন, আমি শুনেছি হারেস মুহাসেবি আপনার কাছে অনেক আসা-যাওয়া করে, যদি তুমি তাকে তোমার ঘরে আনতে, আর আমিও উপস্থিত হতাম, তারপর তুমি আমাকে ঘরের এমন এক জায়গায় বসাতে, যাতে সে আমাকে দেখতে না পায়, আর আমিও তার কথা শুনতে পারি। এভাবে কি সম্ভব? আমি বললাম, আবু আবদুল্লাহ, (অবশ্যই সম্ভব।) আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই হবে। আমার খুব খুশি লাগল যে, ইমাম আহমদ নিজে থেকে এ প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন আমি হারেসের কাছে গিয়ে বললাম, আজ রাতে যদি আপনি আমাদের ঘরে তাশরিফ আনতেন। আপনার সঙ্গীদেরও সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

তখন তিনি বললেন, ইসমাইল, তারা তো সংখ্যায় অনেক। তাই তাদের মেহমানদারির জন্য তুমি শুধু তেল ও খেজুরের ব্যবস্থা করো। আর কোনো ইন্তেজাম করো না। সম্ভব হলে তেল-খেজুর একটু বেশি করে আয়োজন করো। আমি তাই করলাম।

আমি আবু আবদুল্লাহকে (ইমাম আহমদকে) গিয়ে সব বললাম। তিনি মাগরিবের পর চলে এলেন। এক কক্ষে গিয়ে গোপনে বসে থাকলেন। তারপর মাগরিবের পর তিনি যে ওজিফা পড়তেন, সেগুলো পড়ে শেষ করলেন। এর মাঝে হারেস তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিল। তারপর তারা এশার নামাজ আদায় করলেন। এশার নামাজের পর আর কোনো নামাজ না পড়ে তারা হারেসের সামনে চুপচাপ বসে পড়ল। মধ্যরাত পর্যন্ত তারা সবাই এভাবেই বসে রইল। তখন একজন কথা শুরু করে হারেসকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। ইমাম হারেস কথা বলা শুরু করলেন। সবাই এমন মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল, মনে হচ্ছিল তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। কেউ কাঁদছিল আর কেউ চিৎকার করছিল। আর তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন।

তখন আমি উপরের কক্ষে গেলাম, আবু আবদুল্লাহর-আহমদ ইবনে হাম্বলের অবস্থা দেখার জন্য। দেখলাম তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়েছেন। আমি ফিরে এলাম। সকাল পর্যন্ত তারা সেই অবস্থায় ছিল। সকালে সবাই উঠে চলে গেল। আমি দ্বিতীয়বার আবু আবদুল্লাহর নিকট গেলাম। বললাম, আপনি এদের কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, জানি না আমি কখনো এদের মতো লোক দেখেছি কিনা আর অন্তরের ভাল-মন্দ ও সূক্ষ্ম অবস্থা বর্ণনায় এই ব্যক্তির মতো আলোচনা শুনেছি কিনা। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমি যতটুকু জানলাম, তাতে আমি তাদের সংশ্রব অবলম্বন করা তোমার জন্য সমীচীন মনে করি না। তারপর তিনি উঠে চলে গেলেন। [১৫]

---

[১৫] ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বল উপস্থিত হলেন। হারেস মুহাসেবির কথা শুনে কাঁদলেন। তারপর বললেন, এখানে এসে ভাল লাগেনি। তিনি মূলত তার ভেতরে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় কেঁদেছিলেন। (*সাইদুল খাতির:* পৃষ্ঠা নং ১০০, অনুচ্ছেদ নং ৬০)

শায়খ তাজুদ্দিন সুবকি রহিমাহুল্লাহ *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যা* গ্রন্থে (২: ৪০) বলেন, ''ইমাম আহমদ তাকে তাদের সুহবত থেকে এ কারণে নিষেধ করেছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সে সুফিগণের উচ্চ মাকাম সম্পর্কে অবগত নয়। কারণ সুফিগণ দিনের এমন সরু পথ দিয়ে অতিক্রম করেন, যে পথ দিয়ে সকলের পক্ষে গমন করা সম্ভব নয় এবং তাসাউফের পথিকের ব্যাপারে এ আশঙ্কা থেকে যায় যে, সে এর যথাযথ হক আদায় করতে পারবে না।''

হাফেয ইবনে হাজারের বক্তব্যও অনুরূপ। (দেখুন *তাহযিবুত তাহযিব*: ২:১৩৬)

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, ইমাম আহমদের সুফিগণের সুহবত গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করার যে কারণ ব্যাখ্যা করা হলো, তা আমার নিকট দুর্বল। শীঘ্রই আমি এর সঠিক কারণ বর্ণনা করব।

ইমাম ইবনে মুফলিহ হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ তার *আল-ফুরু* (৫:৩১৫) নামক গ্রন্থে এই ঘটনাটির শেষে ইমাম আহমদের এ কথাটি উল্লেখ করেন, জানি না, আমি কখনো তাদের মতো মানুষ দেখেছি কি না। তারপর ইবনে মুফলিহ বলেন, ইমাম আহমদ র. মানসুর ইবনে আম্মারের কথা শুনতে ও লিখতে নিষেধ করেছিলেন। আবুল হুসাইন এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, যাতে সে এসব আলোচনা শুনে কুরআন-হাদিস থেকে গাফেল হয়ে না যায়।

হাফেয ইবনে কাসির *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে (১০:৩৩০) ইমাম আহমদের জীবন বৃত্তান্তে এই ঘটনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, ইমাম বাইহাকি-*মানাকিবুল ইমাম আহমদ* গ্রন্থে-বলেন, হতে পারে ইমাম আহমদ তাদের সঙ্গে তার সংশ্রব এ কারণে অপছন্দ করছিলেন যে, হারেস ইবনে

ইবনুল জাওযি *আল-কুসসাস ওয়াল মুযাকিরিন* গ্রন্থের ১২০ নং পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, ইমাম আহমদ হাদিসের কঠিন অনুসরণের কারণে নবউদ্ভাবিত সবকিছুকে অপছন্দ করতেন। যদিও তা সঠিক হত। আর ইমাম হারেস অন্তরের ভাল-মন্দ অবস্থা বর্ণনায় এমন আলোচনা করতেন, যা আইম্মায়ে সালাফ থেকে বর্ণিত হয়নি। আর কখনো কখনো ইলমে কালাম বিষয়েও তিনি ডুবে যেতেন। ইমাম আহমদ মনে করতেন যে, এসব বিষয়ে মনোযোগী হওয়া মানুষকে কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সামনে এর আলোচনা আসবে।

আসাদ যদিও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন; কিন্তু ইলমুল কালামের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল। আর ইমাম আহমদ তা অপছন্দ করতেন। কিংবা তিনি ইসমাইল ইবনে ইসহাকের জন্য তাদের সাহচর্য এই জন্য অপছন্দ করেছিলেন, সুফিগণের তরিকা, দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার উপর চলা তার পক্ষে সম্ভব না।

আমার অভিমত হল (ইবনে কাসির), ইমাম আহমদের সুফিগণের সাহচর্য অপছন্দ করার কারণ, তাদের কৃচ্ছ্রতা ও সাধনা এত কঠিন ছিল, যা শরিয়ত অনুমোদন করে না। এ জন্য আবু যুরআ রাযি হারিস ইবনে আসাদের কিতাব *আর-রিআয়া* সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি বিদআত। এক ব্যক্তি তার নিকট কিতাবটি নিয়ে আসলে তিনি বললেন, তুমি মালিক, ছাওরি, আওযাই ও লাইছ-এর আদর্শ অনুসরণ করে চল এবং এটি পরিহার করো। কেননা, তা বিদআত।

আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, আমার অভিমত হল, ইমাম আহমাদ যদিও সুফিগণ কল্যাণের উপর রয়েছে বলে মনে করতেন, তথাপি তিনি ইসমাইল ইবনে ইসহাককে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তিনি নিজের ও সঙ্গীদের তরিকাকে অধিক হক ও হেদায়েত লাভে সহায়ক বলে মনে করতেন।

আমার এ অভিমতের সমর্থন আমি ইমাম আবু মুহাম্মাদ তামিমি হাম্বলির বক্তব্যে পেয়েছি, যা তিনি একটি মুকাদ্দামায় বলেছেন। মুকাদ্দামাটি ইবনে আবু ইয়ালাকৃত *তাবাকাতুল হানাবিলা* গ্রন্থের (২:২৭৯) দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ছাপানো হয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, ইমাম আহমদ র. অন্তরের ভাব-ভাবনা, কুমন্ত্রণা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, মূল নির্দেশ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করা। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুরিদ কাকে বলে? তিনি বললেন, যে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলে এবং তাঁর ইচ্ছার সামনে নিজের সব ইচ্ছা ও চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দেয়। এটি মুরিদের পরিচয়ের একটি উদাহরণ। তবে মুরিদের এটাই একমাত্র পরিচয় নয়। আরও পরিচয় আছে।

ইমাম আহমদ সুফিগণকে তাযিম ও সম্মান করতেন, একদিন সুফিদের নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখন কেউ তাকে বলল, তারা মসজিদে মজলিস করে। তখন তিনি বললেন, ইলম তাদেরকে মজলিস করতে বাধ্য করে।

ইবনুল জাওযি র. *আল-কুসসাস ওয়াল মুযাককিরিন* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং১২০-১২১) এই ঘটনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, ইমাম আহমাদ হাদিসের কঠিন অনুসরণের কারণে নবউদ্ভাবিত সবকিছুকে অপছন্দ করতেন। যদিও তা সঠিক হত। আর ইমাম হারেস অন্তরের ভাল-মন্দ অবস্থা বর্ণনায় এমন আলোচনা করতেন, যা আইম্মায়ে সালাফ থেকে বর্ণিত হয়নি। আর কখনো কখনো ইলমে কালাম বিষয়েও তিনি ডুবে যেতেন। ইমাম আহমাদ মনে করতেন যে, এসব বিষয়ে মনোযোগী হওয়া মানুষকে কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

পূর্বে ইবনুল জাওযিকৃত *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ* গ্রন্থের একটি বর্ণনা গিয়েছে যে, ইমাম আহমাদ আবু সাওর, আবু উবায়েদ, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই, সুফিয়ান সাওরি, মালেক ও শাফেয়ি র.-এর মতো মহান ইমামগণের কিতাবও পড়তে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা শুধু কুরআন ও হাদিস পড়বে।

মানুষ কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাবে, এই ভয়ে যেখানে তিনি বড়ো বড়ো ইমামগণের রচিত ফেকাহর গ্রন্থসমূহ পড়া ঠিক মনে করতেন না, সেখানে অন্তরের ভাবনা-চিন্তা ও নফসের কুমন্ত্রণা বিষয়ে রচিত কিতাবসমূহ পড়াকে তিনি আরও ঠিক মনে করবেন না। এটা তো বলাই বাহুল্য। এ কথাটি পূর্বেও বলা হয়েছে।

এ সমস্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেবে যখন আমরা ইসমাইল ইবনে ইসহাকের ঘটনাটিকে সঠিক বলে মনে করব। কারণ, এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে। এজন্য ইমাম যাহাবি র. *মিযানুল ইতিদালে* ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, এই ঘটনার সনদ সহিহ। তবে ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। আমার অন্তর তা সঠিক বলে মনে করে না। ইমাম আহমাদের মতো ব্যক্তি থেকে এমন কিছু ঘটা আমি অসম্ভব বলে মনে করি।

পূর্বে আমরা যে সকল ইমামগণের কথা উল্লেখ করেছি, যেমন ইবনে তাইমিয়া, ইবনে রজব হাম্বলি, খতিবে বাগদাদি, তাজুস সুবকি এবং ইবনে কাসির-এদের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় তোমার সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ইমাম আহমাদ হারেস মুহাসেবির সমালোচনা এজন্য করেছেন যে, তিনি ইলমুল কালাম নিয়ে আলোচনা করতেন। হ্যাঁ, তার ইবাদত বন্দেগি নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। বরং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া সহ অন্যান্য ইমামগণ ইবাদত বন্দেগির প্রতি তাঁর আগ্রহের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

এছাড়া আরেকটি বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ইমাম মুহাসেবির সমালোচনা করেছেন। তিনি নিজেই সমালোচকদের এ সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি তার রচিত গ্রন্থসমূহে দুর্বল ও মওজু হাদিসের উল্লেখ করতেন। সেগুলোর উপর নির্ভর করে উসুল বানিয়ে নিতেন।

শায়খ আবু বকর ইবনুল আরাবি যদিও তাকে সম্মান করতেন, তার উত্তম প্রশংসা করতেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি তার সমালোচনা না করে থাকতে পারেননি। তিনি তার *আরিযাতুল আহওয়াযি শারহু সুনানিত তিরমিযি* গ্রন্থে (৫:২০১)

الحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ.

'হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট।'

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

'আর এ বিষয়ে আলোচনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও সম্মানিত আলেম হচ্ছেন হারেস ইবনে আসাদ। তিনি যেসব হাদিসকে উসুল বানিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হাদিস আতিয়্যা সাদি থেকে বর্ণিত। হাদিসটি হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَبْلُغُ العَبْدُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَتْرُكَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ مَخَافَةً مَّا بِهِ بَأْسٌ.

বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ সে গুনাহ থাকতে পারে এই আশঙ্কায় গুনাহমুক্ত জিনিস বর্জন না করবে।[১৬]

এটি এবং এ জাতীয় আরও অন্যান্য হাদিস, যেগুলো নিয়ে মুহাসেবি অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, অনেক কথা পুনরুক্ত করেছেন, কিছু নতুন বর্ণনাও এনেছেন। তবে ভাল হত দুর্বল হাদিসের সঙ্গে তার যদি কোনো সম্পর্ক না থাকত এবং তিনি যদি সেগুলোকে উসুল না বানাতেন !

হাদিসশাস্ত্রবিদগণ জানলে হয়ত এগুলো নিয়ে হাসবেন। অথচ তিনি হাদিস শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম ইবনু আবি শাইবা ও তার মতো অন্যান্যদের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের একটি কথাকে আমরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। তিনি বলেন, 'তাকওয়া তথা খোদাভীতি বিষয়ে দুর্বল হাদিস বর্ণনা করা জায়েয আছে।'

কিন্তু ইমাম বুখারি র. সহিহ হাদিস ছাড়া অন্য কোনো হাদিস দিয়ে দিন ও অন্তরের আমল প্রমাণিত হওয়া সঠিক মনে করতেন না।[১৭] আমাদেরও

---

[১৬] *সুনানে তিরমিযি:* ৫:২৭৮। ইমাম তিরমিযি বলেন, এই হাদিসটি হাসান গরিব। একমাত্র এই সনদে আমরা তা পেয়েছি।

[১৭] আমার অভিমত হল, শরিয়তের বিধান ও হালাল-হারাম সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারির কথাটিই মূল যে, সহিহ হাদিস ছাড়া অন্য হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আমলের ফাযায়েল বর্ণনায় ইমাম বুখারিসহ অধিকাংশ আইম্মায়ে সালাফের অভিমত হল, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে দুর্বল হাদিসের উপর আমল করা জায়েয আছে। ইমাম বুখারি র. তার *আল-আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে এ নীতিই গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি আমি ব্যাখ্যা করেছি এবং গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণও করেছি। আল্লামা আবদুল হাই লাখনভি প্রণীত *যাফারুল আমানি ফি শারহি মুখতাসারিস সায়্যিদ শরিফ জুরজানি* গ্রন্থের দীর্ঘ টীকায় (পৃষ্ঠা নং ১৮২-১৮৬) তুমি সেই আলোচনাটি পাবে।

অভিমত তাই।[১৮] (তখন ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারি-উভয়ের বক্তব্যের মাঝে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান হবে?) যদি আমরা ইমাম আহমাদ র.-এর মত অবলম্বন করি তাহলে বলতে হবে, দুর্বল হাদিসকে শুধু এমন নসিহতের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবে, যা অন্তরকে বিগলিত করে। কিন্তু উসুলের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।' (শায়খ ইবনে আরাবির আলোচনাটি শেষ হলো।)

ইমাম মুহাসেবিকে নিয়ে সমালোচনার এসব কারণ তার গ্রন্থসমূহেই রয়েছে। এগুলো থেকে তার মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। 'রিসালাতুল মুসতারশিদিন' নামে তার এই যে ছোট্ট রিসালা, এতেও কিছু দুর্বল ও জাল হাদিস রয়েছে। গ্রন্থের যথাস্থানে সেগুলোর তাহকিক করা হয়েছে।

ইমাম মুহাসেবি র.-এর এই সমস্যাটি আরও অনেক ইমামের মাঝে ছিল। যেমন, *কুতুল কুলুব* গ্রন্থে শায়খ আবু তালেব মাক্কি, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে ইমাম আবু হামেদ গাযালি র. এবং আরও অন্যান্য যারা তাসাউফ ও নফসের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফেয ইবনুল জাওযি র. *কিতাবুল কুসসাস ওয়াল মুযাককিরিন* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং ১০২) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি সেখানে বলেন, নসিহত ও হিতোপদেশমূলক গ্রন্থ যারা লিখেছেন, তাদের মধ্যে আছেন হারেস মুহাসেবি, আবু তালেব মাক্কি, আবু হামেদ গাযালি। তারা তাদের গ্রন্থে অজ্ঞাতসারে অনেক ভ্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আর মুহাসেবি যেসব ইসরাইলি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, সেগুলো বেশিরভাগই এমন, আমাদেরকে যা বিশ্বাস করতে বলা হয়নি। আবার অবিশ্বাসও নয়। তবে শিক্ষা ও উপদেশ লাভের জন্য তা বর্ণনা করা জায়েয আছে।

---

[১৮] আমি বলেছি, আমলের ফাযায়েল ও অন্যান্য (যেমন নসিহত) ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ও তার উস্তাদবৃন্দসহ অধিকাংশ আইম্মায়ে সালাফের অভিমত হল, দুর্বল হাদিসের উপর আমল করা জায়েয আছে। যেমনটি আবদুল হাই লাখনভি র. তার নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে স্পষ্ট করেছেন। ১. *আল-আজবিয়াতুল ফাযিলা লিল-আসইলাতিল আশারাতিল কামিলা*, পৃষ্ঠা নং ৩৬-৫৯ এবং ২. *যাফারুল আমানি ফি শারহি মুখতাসারিস সায়্যিদ শরিফ জুরজানি*, পৃষ্ঠা নং ১৮১-১৯২। এ দুটি গ্রন্থের উপর আমার টীকা সংযোজন করা আছে।

ইমাম মুহাসেবির ত্রুটিমুক্ত স্বচ্ছ তাসাউফ

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাসেবি র.-এর তাসাউফের একটি উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি রয়েছে। তিনি তার গ্রন্থে যে তাসাউফের কথা তুলে ধরেছেন, তাতে কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজের প্রতি নিজের জ্ঞান ও বোধশক্তি অনুযায়ী লক্ষ রেখেছেন। আমার জানামতে, আমি তার গ্রন্থসমূহে তাসাউফ নিয়ে দার্শনিকদের মতো মনগড়া কোনো আলোচনা পাইনি। তার তাসাউফের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইলম ও আমলকে শুদ্ধ করা, অন্তরে সার্বক্ষণিক আল্লাহর ধ্যান সৃষ্টি, আত্মশুদ্ধি ও আত্মাকে যাবতীয় ময়লা ও দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, তার কথা ও লেখা কোনো না কোনো আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে হয়ে থাকে।[১৯] আর এটি একটি শরয়ি তরিকা, যা অবশ্যই প্রশংসা ও প্রতিদানের উপযুক্ত।

ইমাম মুহাসেবি ও তার গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের প্রশংসাসূচক মন্তব্য

একাধিক ইমামগণ ইমাম মুহাসেবির দূরদৃষ্টিতা, নসিহত, আধ্যাত্মিক সাধনা, খোদাভীতি ও ইলমের প্রশংসা করেছেন। তন্মধ্যে সে যুগে মালেকি মাযহাবের ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক সিকলি। মৃত্যু ৪৬৬ হিজরি। ইমাম আবুল আব্বাস ওনশারিশি র. বলেন, শায়খ আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক সিকলিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষ কি কি কিতাব পড়বে? তখন তিনি উত্তর দিলেন,

---

[১৯] ইমাম মালেক র. বলেন, আকায়েদ শাস্ত্র তথা ইলমুল কালাম পড়া-পড়ানো, সবকিছুই আমার নিকট অপছন্দনীয়। মদিনাবাসী এখনো তাকদির বিষয়ে আলোচনা পছন্দ করে না। এমনিভাবে জাহমিয়্যা ও অন্যান্য মতবাদ নিয়ে আলোচনাও তাদের অপছন্দ। (আকিদা নয়),আমলের সাথে সম্পর্কিত বিষয় আমার পছন্দ। আর আল্লাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা আমার নিকট অধিক শ্রেয়। কারণ মদিনাবাসী আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া কথা বলা অপছন্দ করেন। (আল্লামা কাজি ইয়াজকৃত তারতিবুল মাদারিক : ৩:১৭১)।

যে মানুষের ইমাম এবং মাসআলা-মাসায়েল ও ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কেউ হতে যাচ্ছে, তার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো, শাখাগত মাসআলাসমূহ অধ্যয়ন করা এবং অধিক প্রয়োজনীয় মাসাআলাসমূহে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া। পাশাপাশি তাকে অবশ্যই মুয়াত্তা ও বুখারির মতো হাদিসের সহিহ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে। যদি তার মাঝে এসব গ্রন্থ বোঝার যোগ্যতা থাকে।

আর যে সাধারণ লোকদের ইমাম নয়, সে সহজ কিছু মাসআলা জানবে আর অধিকাংশ সময় ফিকহ, আদব, আমলের ফাযায়েল ইত্যাদি বিষয়ক সহিহ হাদিস, যেগুলো পড়ার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সেগুলো পড়বে। প্রত্যেকেরই উচিত নিজের স্তর নির্ণয় করে আমার এই নসিহতের উপর আমল করা।

আর ইমাম মুহাসেবির গ্রন্থসমূহ আহলে ইলম ও সাধারণ, উভয় শ্রেণির মানুষ পড়তে পারে। কারণ, সেগুলোতে আমলের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ এবং সিদক ও ইখলাস (সততা ও নিষ্ঠা)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি তার এই গ্রন্থগুলোতে হাদিস, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদি কল্যাণকর বিষয় রয়েছে। এই গ্রন্থগুলো পড়া থেকে যারা মানুষকে নিষেধ করে, তারা প্রত্যেকে মূর্খ এবং এগুলোর স্তর ও পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ।

ভাষা ও সাহিত্য

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাসেবি, তিনি প্রথম শ্রেণির বিশুদ্ধ ও সাবলীলভাষী ছিলেন। চমৎকার শব্দ চয়ন করতেন। তার কলম ছিল গতিময়। বর্ণনা আকর্ষণীয়। ভাষা ছিল উচ্চমানসম্পন্ন, সজীব, বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট। তার এই গ্রন্থে এবং আত-তাওয়াহহুম ও আর রিআয়া নামক আরও দুটি গ্রন্থে এমন কিছু বাক্য ও বাক্যাংশ রয়েছে যা বারবার পড়তে ও শুনতে মন চায়। এগুলোতে যেমন রয়েছে বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম চিত্রায়ন তেমনি শব্দের মজবুত বুনন। কথাগুলোর অর্থ অন্তরের গভীরে রেখাপাত করে এবং কর্ণের খোরাক যোগায়।

আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ আবু আবদুল্লাহ ছিলেন স্বর্ণযুগের মানুষ। তিনি একদিকে যেমন জাহেয ও তার সমকালীন বিখ্যাত বাগ্মী ও সাহিত্যিকদের পেয়েছিলেন। অন্যদিকে তেমন মারুফ কারখি, সারিয়্যি সাকাতি,

বিশর হাফি-এর মতো বিখ্যাত যাহেদ, আবেদ ও বুজুর্গদের পেয়েছিলেন। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তিনি একই সঙ্গে সুলেখক ও বাগ্মী এবং রুহানি শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তার আলোচনা দীর্ঘ হলে তাতে অনর্থক কিছু থাকত না, আর সংক্ষিপ্ত হলে তাতে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও ভুল কিছু থাকত না।

তার জীবনের কতিপয় ঘটনা

১. ইবনে যফার মাগরিবি তার গ্রন্থ *আনবাউ নুজাবাইল আবনা* গ্রন্থের ১৪৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম হারেস মুহাসেবি শৈশবে একবার শিশু-কিশোরদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা খেলাধুলায় রত ছিল। তাদের নিকটেই এক খেজুর বিক্রেতার বাড়ি ছিল। হারেস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখছিল। তখন বাড়ির মালিক কিছু খেজুর নিয়ে বের হল। হারেসকে খেজুর খেতে বলল। হারেস বলল, কোত্থেকে সংগ্রহ করেছো? লোকটি বলল, আমি মাত্র এক লোকের কাছে খেজুর বিক্রি করেছি। তখন তার কিছু খেজুর পড়ে গিয়েছিল। এগুলো সেই খেজুর। হারেস বলল, তুমি কি তাকে চিন? সে বলল, হাঁ। তখন হারেস খেলাধুলায় রত বাচ্চাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, এই লোকটি কি মুসলমান? তারা বলল, হাঁ। উত্তর শুনে সে লোকটির কাছ থেকে চলে গেল।

খেজুর বিক্রেতা তার পেছন পেছন গিয়ে তাকে ধরে বলল, আমার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, এটা না বলে তুমি আমার কাছ থেকে যেতে পারবে না। তখন সে বলল, জনাব, আপনি মুসলমান হয়ে থাকলে খেজুরের মালিককে খুঁজে বের করুন, যাতে আপনি দায়িত্বমুক্ত হতে পারেন। আপনি তাকে এভাবে তালাশ করবেন, যেভাবে প্রচণ্ড পিপাসায় পানি তালাশ করেন। জনাব, আশ্চর্য, আপনি মুসলমান হয়ে মুসলমানের সন্তানদের হারাম খাওয়াচ্ছেন?! তখন লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো দুনিয়া লাভের জন্য ব্যবসা করিনি।

২. ইমাম কুশাইরি র. *রিসালায়* (পৃষ্ঠা নং১৫), ইবনে খাল্লিকান *ওফায়াতে* (১:১২৬), ইবনে হাজার *তাহযিবুত তাহযিবে* (২:১৩৫) বলেন, জুনায়েদ বাগদাদি র. বলেন, ইমাম মুহাসেবি মৃত্যুর সময় এক ষষ্ঠমাংশ দিরহাম, অর্থাৎ, এক পয়সাও রেখে যাননি। তার পিতা সত্তর হাজার দিরহাম রেখে গিয়েছিলেন;

কিন্তু তিনি তা থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি। এক পাইও না। কারণ তার পিতা কাদরিয়্যা মতবাদের ছিলেন। তাই তিনি তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তাকওয়ার পরিপন্থি মনে করেছিলেন।

২. হাফেয আবু নুআইম, খতিবে বাগদাদি, শায়খ কুশাইরি, তাজুস সুবকিসহ অন্যান্য ইমমাগণ বর্ণনা করেছেন, ইমাম হারেস মুহাসেবির ছাত্র জুনায়েদ বাগদাদি বলেন, তিনি ভীষণ অভাব ও দুরবস্থার মাঝে থাকতেন। একদিন তিনি আমার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি দরজায় বসা ছিলাম। তার চেহারা দেখে মনে হল, তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমি তাকে বললাম, চাচাজান! আপনি যদি আমাদের ঘরে সামান্য মেহমানদারি গ্রহণ করতেন? তিনি বললেন, তুমি চাইলে করতে পার? আমি বললাম, জি অবশ্যই। আমি খুবই খুশি হব এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। তখন আমি ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার সঙ্গে প্রবেশ করলেন। তারপর আমি দ্রুত আমার চাচার ঘরে গেলাম। তার ঘরটি আরও বড়ো ছিল। সেখানে সবসময় ভাল খাবার থাকত, আমাদের ঘরের খাবার সেরকম হত না। তাই আমি অনেক প্রকার খাবার নিয়ে এলাম। তার সামনে রাখলাম। তিনি হাত বাড়িয়ে একটি লোকমা নিয়ে মুখে দিলেন। আমি দেখলাম যে, তিনি তা মুখের ভেতর ঘুরাচ্ছেন, কিন্তু চাবাচ্ছেন না। অর্থাৎ, চাবাতে পারছেন না। হঠাৎ তিনি দ্রুত উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। কোনো কথা বললেন না।

পরদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, চাচাজান, আপনি তো গতকাল আমার খুশিকে বিষাদে পরিণত করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, বৎস, ক্ষুধা প্রচণ্ড ছিল। তাই আমি খুব চেষ্টা করেছি তুমি যে খাবার দিয়েছ তা খাওয়ার, কিন্তু আমার এবং আল্লাহর মাঝে একটি আলামত আছে। যখন খাবার সন্দেহযুক্ত হওয়ায় পছন্দনীয় না হয়, তখন তা নাকের কাছে নেওয়া মাত্রই আমি এমন গন্ধ পাই, যে আমার ভিতর তা আর গ্রহণ করে না। এজন্য আমি কাল সেই লোকমাটি তোমার ঘরের বারান্দায় ফেলে দিয়ে বের হয়ে এসেছি।

কুশাইরির বর্ণনায় অতিরিক্ত এ অংশটুকুও আছে, তারপর আমি তাকে বললাম, আজকে আবার আসুন? তিনি বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তার সামনে ঘরে থাকা কয়েক টুকরো শুকনো রুটি পেশ করলাম। তিনি খেয়ে বললেন, তুমি যদি কোনো ফকিরের সামনে কিছু পেশ করো, তাহলে এমন (হালাল) কিছু পেশ করবে।

৪. ইমাম শারানি *তাবাকাতুল কুবরা* নামক গ্রন্থে (১:৬৪) এবং আল্লামা মুনাবি *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ* (১:২১৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইমাম মুহাসেবি নিজের সম্পর্কে আলোচনায় বলেন, মারেফাতের উপর আমি একটি গ্রন্থ রচনা করলাম, যা আমার খুব পছন্দ হল। একদিন আমি কিতাবটি হাতে নিয়ে মুগ্ধতার দৃষ্টিতে দেখছিলাম। তখন জীর্ণ পোষাক পরিহিত এক যুবক আমার নিকট এল। আমাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আবদুল্লাহ, আল্লাহর পরিচয় লাভ করা কি মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালার দাবি, নাকি আল্লাহর উপর মানুষের দাবি? তখন আমি বললাম, মানুষের উপর আল্লাহর দাবি। যুবক বলল, তাহলে তো তিনিই উপযুক্ত মানুষের কাছে নিজের পরিচয় ও স্বরূপ তুলে ধরতে। আমি পাল্টা আরেকটি উত্তরে বললাম, বরং আল্লাহর উপর মানুষের হক। তখন সে আপত্তি করে বলল, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ। তিনি কারও উপর জুলুম করেন না। (অর্থাৎ নিজের পরিচয় ও স্বরূপ যথাযথভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ না করে তিনি মানুষের উপর জুলুম করতে পারেন না।) তারপর যুবক আমাকে সালাম দিয়ে চলে গেল। হারেস বলেন, তখন আমি কিতাবটি নিয়ে পানিতে ফেলে দিলাম। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো মারেফাতের বিষয়ে কথা বলব না।[২০]

---

[২০] শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. বলেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শায়খ মুহাসেবির গ্রন্থের যে কপি তার কাছে ছিল, সেটি নষ্ট করার আগে এর আরও কয়েকটি কপি করা হয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, তার জীবন বৃত্তান্ত আলোচনাকারীগণ গ্রন্থটিকে তার রচিত গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবির জনৈক শায়খের জীবনীতে পাওয়া যায় তিনি গ্রন্থটি পড়েছিলেন। যেমনটি তিনি তার গ্রন্থ *রুহুল কুদুস ফি মুহাসাবাতিন নাফসের* ৭২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি ১৩৮৪ হিজরিতে দিমাশক থেকে ছাপা হয়েছে। আর মুহাসেবির এই গ্রন্থটি *কিতাবুল মারিফা* এবং *কিতাবু শারহিল মারিফা* নামে পরিচিত। ১৪১৩ হিজরিতে বাইরুতের অধ্যাপক সালেহ আহমদ শামি-এর তাহকিকে দারুল কলম থেকে এটি ছাপা হয়।

৫. আবু নাসর সিররাজ তুসি তার *আল-লুমা'* নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং ৪৯৫) উল্লেখ করেন, আবু হামজা সুফি হারেস মুহাসেবির বাড়িতে গেল। হারেসের বাড়িটি সুন্দর ও কাপড় পরিষ্কার ছিল। বাড়িতে একটি বকরি ছিল। ভীষণ জোরে জোরে ডাকত। সে তখন জোরে ডাক দিলে আবু হামজা আওয়াজ করে বলল, লাব্বাইক ইয়া সায়্যিদি। হারেস এতে ক্রুদ্ধ হল। একটি ছুরি নিয়ে বলল, তুমি এ অবস্থা থেকে তওবা না করলে আমি তোমাকে জবাই করে দিতাম।

৬. ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরি রহিমাহুল্লাহ তার রিসালায় (পৃষ্ঠা নং ১৫) মুহাসেবির জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উস্তাদ আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফিফ বলেন, তোমরা কেবল আমাদের পাঁচজন শায়খের অনুসরণ করবে। আর বাকিদের অবস্থা তাদের উপর ছেড়ে দিবে। পাঁচজন হল, হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবি, জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ, আবু মুহাম্মাদ রুআইম, আবুল আব্বাস ইবনে আতা, আমর ইবনে উসমান মাক্কি র.। কারণ তারা সকলেই শরিয়ত ও তরিকতের অধিকারী ছিলেন।

৭. খতিবে বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ *তারিখে বাগদাদে* (৮:২১৫), ইবনুস সুবকি *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ* (২: ৩৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেন, কাযি হুসাইন ইবনে ইসমাইল মাহামিলি থেকে বর্ণিত, আবু বকর ইবনে হারুন মুজাদ্দার বলেন, আমি জাফর ইবনে আবু সাওরকে বলতে শুনেছি, আমি হারেস মুহাসেবির মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন, যদি আমি আমি পছন্দনীয় কিছু দেখতে পাই, তাহলে হাসব। আর যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখি, তাহলে আমার চেহারা দেখেই তোমরা তা বুঝতে পারবে। মুজাদ্দার বলেন, তিনি মুচকি হাসলেন, তারপর তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহম করুন এবং তাকে মর্যাদার উঁচু স্থান দান করুন। তিনি এমনভাবে হাসতে হাসতে আপন রবের নিকট গমন করেন, যেমন বাড়ি থেকে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি বাড়িতে আগমন করে এবং অনুগত ক্রীতদাস তার মনিবের নিকট ফিরে আসে। আল্লাহ তায়ালা ইল্লিয়্যিনে তার মর্যাদা সুউচ্চ করুন। আবুল হাসান হারাবির বর্ণনা অনুযায়ী বাগদাদের দারুস সালামে তাকে দাফন করা হয়, যেমনটি হারাবির *আল-ইরশাদাত ইলা মারিফাতিয যিয়ারাত* গ্রন্থের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে। তার কবরটি এখনও রয়েছে। কবরের নিকট একটি মসজিদ রয়েছে, যা মসজিদে মুহাসেবি নামে পরিচিত।

ইমাম মুহাসেবির বাণী

১. প্রতিটি জিনিসের একটি মূল বস্তু রয়েছে। মানুষের মূল বস্তু হলো তার আকল। আর আকলের মূল বস্তু হলো তাওফিক। ভিন্নভাবে বললে আকলের মূলবস্তু হল সবর।
২. এই উম্মতের উত্তম ব্যক্তি তারা, যাদের আখেরাত তাদের দুনিয়াকে ভুলিয়ে দেয় না, আর দুনিয়া আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় না।
৩. উত্তম আখলাক হচ্ছে কষ্ট সহ্য করা, রাগ কম করা, চেহারাকে প্রসন্ন রাখা এবং উত্তম কথা বলা।
৪. যে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না। সে যেন নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া কামনা করে।
৫. প্রত্যেক যাহেদ ততটুকু দুনিয়াবিমুখ হতে পারে, যতটুকু সে আল্লাহর মারেফাত লাভ করেছে। আর মারেফাত প্রজ্ঞা অনুযায়ী লাভ হয়ে থাকে। আর প্রজ্ঞা লাভ হয় ইমানের শক্তির পরিমাণ অনুযায়ী।
৬. অত্যাচারী ব্যক্তি লজ্জিত হয়, যদিও মানুষ তার প্রশংসা করে। আর মজলুম নিরাপদ থাকে যদিও মানুষ তার নিন্দা করে। যে অল্পেতুষ্ট, সে ক্ষুধার্ত থাকলেও ধনী; আর যে লোভী, সে ধনী হলেও দরিদ্র।
৭. যে তার ভিতরকে মুরাকাবা ও ইখলাসের মাধ্যমে ঠিক করে নেয়, আল্লাহ তার বাহিরকে মুজাহাদা ও সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমে ঠিক করে দেন।
৮. কোনো বান্দা সৎ হলে, আল্লাহ তায়ালা তার সৎকর্মের দ্বারা অন্যকে সৎ বানিয়ে দেন। আর কোনো বান্দা অসৎ

হলে, আল্লাহ তায়ালা তার অসৎকর্মের দ্বারা অন্যকে অসৎ বানিয়ে দেন।

৯. দাসত্বের গুণ হলো, নিজেকে কোনো কিছুর মালিক মনে না করা এবং এটা মনে করা যে, নিজের লাভ-ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা তার নেই।

১০. ইখলাস হচ্ছে, সৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় বিষয় থেকে পৃথক করা। আর নফস হচ্ছে প্রথম সৃষ্টি।

১১. যে তার ভেতর সুন্দরের চেষ্টা করে, আল্লাহ তার বাহ্যিক বিষয়াবলি সুন্দর করে দেন। আর যে ভেতর সুন্দরের পাশাপাশি বাহ্যিক বিষয়াবলি সুন্দরের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর যারা আমার রাহে চেষ্টা-সাধনা করে, যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথের দিশা দান করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন। (সুরা আনকাবুত ৬৯)।

রচনাবলি

আমরা পূর্বে বলেছি, ইমাম মুহাসেবি র. বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে যেগুলো পরিচিত এবং এখনো যেগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে,

১. আর-রিআয়া লি হুকুকিল্লাহ।
ইউরোপে ছাপা হয়েছে। এরপর তারিখবিহীন মিশর থেকে ছাপা হয়েছে।
২. আত-তাওয়াহহুম।
১৩৫৭ হিজরিতে মিশর থেকে, তারপর হালব থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
৩. রিসালাতুল মুসতারশিদিন।
এই কিতাবটি এখন তোমার হাতে আছে। এটি কিতাবটির অষ্টম সংস্করণ। প্রথম দুটি সংস্করণের অনুবাদ তুর্কি ভাষায় হয়েছে। অনুবাদক ছিলেন অধ্যাপক আলি আরসালান, যিনি ইস্তাম্বুলের ফতোয়া বিভাগের খতিব ছিলেন। কিতাবটি সেখানে ১৯৬৮ সালে ছাপানো হয়।
৪. রিসালাতুল ওসায়া।
৫. আ-দা-বুন নুফুস।
৬. শারহুল মারিফা।
৭. বাদউ মান আনাবা ইলাল্লাহ।
৮. আল-মাসাইলু ফিয যুহদ ওয়া গাইরিহী।
৯. আল-মাসাইলু ফি আমালিল কুলুবি ওয়াল জাওয়ারিহি।
১০. আল-মাকাসিব ওয়ালওরাউ ওয়াশশুবহাতু ওয়া বায়ানু ...।
১১. মাহিয়াতুল আকলি ওয়া মা'নাহু ওয়াখতিলাফিন নাস ফিহি।

এই আটটি গ্রন্থ মিশরের কায়রো থেকে ১৯৬৯ সালে কিংবা তার কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

১২. আল-বা'ছু ওয়ান নুশুর।

১৩. কিতাবুন ফিদদিমা।

১৪. কিতাবুন ফিত তাফাক্কুর ওয়াল ইতিবার।

১৫. রিসালাতুল মুরাকাবা।

১৬. আত-তানবিহু আলা আমালিল কুলুব ফিদ দালালা আলা ওয়াহদানিয়্যাতিল্লাহ।

১৭. কিতাবুল আযমাতি।

১৮. আল-কাসদু ওয়ার রুজুউ ইলাল্লাহ।

১৯. কিতাবুন নাসাইহ।

২০. মুখতাসারু কিতাবি ফাহমিস সালাত।

২১. কিতাবুর রেযা। ইমাম মুহাসেবি *আল-মাসাইল ফি আমালিল কুলুব* গ্রন্থের ১৪৭ নং পৃষ্ঠায় এই কিতাবটির কথা উল্লেখ করেছেন।

২২. ফাহমুল কুরআন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এই গ্রন্থ থেকে তার *মাজমুউল ফাতাওয়া* গ্রন্থের ৫৫৭ নং পৃষ্ঠায় এবং *আল-ফাতওয়াল হামাবিয়্যাতিল কুবরা* নামক গ্রন্থের ২৬৬-২৭০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

২৩. ফাহমুস সুনান। এই গ্রন্থ থেকে হাফেয ইবনে হাজার তার *আন-নুকাত আলা কিতাবি মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ* গ্রন্থের মুদাল হাদিসের আলোচনায় (২:৫৮৪) এবং ইমাম সুয়ুতি র. *আল-ইতকান* গ্রন্থের (১:১৬৮) ১৮তম প্রকারে বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে, সবগুলোর নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালা ইমাম মুহাসেবির প্রতি রহম করুন, তাকে মাগফেরাত দান করুন এবং আপন সন্তুষ্টি দ্বারা তাকে সম্মানিত করুন।

রিসালাতুল মুসতারশিদিন

শায়খ আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الاَوَّلِ الْقَدِيْمِ،[২১] الْوَاحِدِ الْجَلِيْلِ، الَّذِيْ لَيْسَ لَهٗ شَبِيْهٌ وَ لَا نَظِيْرٌ، أَحْمَدُهٗ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهٗ وَ يَبْلُغُ مَدَى نَعمَائِهِ.[২২]

وأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، شَهَادَةَ عَالِمٍ بِرُبُوْبِيَّتِهِ، عَارِفٍ بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَ أَشْهَدُ : أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اِصْطَفَاهُ لِوَحْيِهِ وَ خَتَمَ بِهِ أَنْبِيَاءَهٗ، وَ جَعَلَهٗ حُجَّةً عَلَى جَمِيْعِ خَلْقِهِ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি প্রথম ও আদি, একক, মহান, যার কোনো সদৃশ ও দৃষ্টান্ত নেই। আমি তাঁর নেয়ামত ও শান্তি-সুখসম প্রশংসা করছি। আর আমি তাঁর প্রভুত্ব ও একত্ববাদের জ্ঞান লাভকারী ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

---

[২১] এখানে আল্লাহ তায়ালার সিফাত হিসেবে اَلْقَدِيْمُ (আদি) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে 'সম্পূরক অংশ' শিরোনামে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

[২২] حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمه و يَبلُغُ مَدَى نَعمَائِه... গ্রন্থের শেষে শিরোনামে 'সম্পূরক অংশ' শিরোনামে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাকে নিজের ওহির জন্য নির্বাচন করেছেন, তাঁর মাধ্যমে নবিগণের আগমন ধারা সমাপ্ত করেছেন এবং তাকে সমস্ত মাখলুকের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ বানিয়েছেন; যাতে যার ধ্বংস হওয়ার, সে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ধ্বংস হয়। আর যার জীবিত থাকার, সে-ও সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই জীবিত থাকে। আর আল্লাহ সবকিছুর শ্রোতা ও সবকিছুর জ্ঞাতা। (সুরা আনফাল, আয়াত নং ৪২)।

জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইলমে নববীর সুধা পান করানোর জন্য তাঁর মুমিন বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কিছু জ্ঞানী বান্দাদের নির্বাচন করেছেন যারা তাঁর ও তাঁর হুকুম সম্পর্কে অবগত। তিনি তাদের বিশ্বস্ত; উত্তম চরিত্রবান এবং মুত্তাকি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الاَلْبَابِ. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.

কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে। (তাদের পরিচয় হল) যারা আল্লাহ তায়ালার সাথেকৃত ওয়াদা পূর্ণ করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না এবং আল্লাহ তাদের যেসকল সম্পর্ক রক্ষা করতে বলেছেন, সেগুলো রক্ষা করে এবং তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, আর ভয় করে হিসাব-কিতাব মন্দ হওয়াকে। (সুরা রাদ, আয়াত নং ১৯,২০,২১)

আল্লাহ যার বক্ষকে ইমানের জন্য উন্মোচিত করেছেন, বিশ্বাস যার অন্তরের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে এবং যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, সে শরিয়তের অনুসরণ করার জন্য জ্ঞানীদের পথ আঁকড়ে ধরে। যে শরিয়ত কুরআন-সুন্নাহ

ও হেদায়েতপ্রাপ্ত আইম্মায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর এটাই সিরাতে মুস্তাকিম (সরল পথ)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের এ পথের দিকে আহ্বান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে নবি! তাদের আরও বলো, এটা আমার সিরাতে মুস্তাকিম (সরল সঠিক পথ)। সুতরাং এর অনুসরণ করো, অন্য কোনো পথের অনুসরণ করো না; অন্যথায় তা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। হে মানুষ! এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের গুরুত্বের সঙ্গে আদেশ করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। (সুরা আনআম, আয়াত নং ১৫৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَنْ بَعْدِيْ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

তোমরা আমার ইন্তেকালের পর আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের মত ও পথকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে নেবে এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে।[২৩]

---

[২৩] এটি ইরবাজ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের অংশবিশেষ। নিম্নোক্ত কিতাবগুলোতে হাদিসটি আছে, *মুসনাদে ইমাম আহমদ* : ৪/১২৬-১২৭, *আবু দাউদ* : ৪/২০১, *তিরমিযি* : ১০/১৪৩। *ইবনে মাজাহ* : ১/১৫। ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। ইমাম নববির *আরবায়িন* নামক গ্রন্থে হাদিসটি ২৮ নং-এ উল্লেখ আছে।

ইমাম আহমদ এবং তার শিষ্য ইমাম আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে সম্পূর্ণ হাদিসটি তুলে ধরা হলো।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيْنَ فتمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٌ)

ইরবাজ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের নামাজ পড়ালেন। তারপর আমাদের দিকে মুখ করে আমাদের এমন গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করলেন, যাতে সকলের চোখ অশ্রু ঝরঝর হলো এবং ভয়ে সকলের অন্তর ভীত হল।

এক সাহাবি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ মনে হচ্ছে এটি বিদায়কালীন উপদেশ; সুতরাং আপনি আমাদের কী অসিয়ত করছেন? নবিজি তখন বললেন,

আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি এবং তাঁর নির্দেশ শুনে তা শিরোধার্য করে নেওয়ার আদেশ করছি, যদিও কোনো হাবশি গোলাম তোমাদের শাসক হয়। আর তোমাদের মধ্যে আমার ইন্তেকালের পর যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমার সুন্নত এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করা। তোমরা তা আঁকড়ে ধরো এবং দাঁত দিয়ে শক্তভাবে তা ধরে রাখো। দিনি ব্যাপারে নবসৃষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ প্রতিটি নবসৃষ্ট বিষয় বিদআত আর প্রতিটি বিদআতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।

ইমাম হারেস মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

আল্লাহ তায়ালার কিতাব কুরআনের ক্ষেত্রে আবশ্যক হল, এর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমল করা, এতে যেসব আযাবের হুমকি এসেছে সেগুলোকে ভয় পাওয়া ও যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া, মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর প্রতি ইমান রাখা এবং এতে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা ও উদাহরণ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা।

তাহলে তুমি মূর্খতার যাবতীয় অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের দীপ্তিময় আলো এবং সন্দেহের আযাব থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাসের প্রশান্তি লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

> আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের বন্ধু, তিনি তাদের যাবতীয় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন। (সুরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৭)[২৪]

---

[২৪] **আত্মশুদ্ধি কোনো শায়খের হাতে বায়আত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়**

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাসেবির উপরিউক্ত কথা থেকে বুঝে আসে যে, হেদায়েত লাভ, আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধন কোনো শায়েখের হাতে বায়আত গ্রহণ করে তাঁর সান্নিধ্যে থাকার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং পবিত্র কুরআন-হাদিসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে ও পূর্ববর্তীগণ যে পদ্ধতিতে আমল করেছেন, সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং হেদায়েতপ্রত্যাশী কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদিন ও সালাফে সালেহিনের জীবনচরিতের উপর বিশুদ্ধ ইলম অনুযায়ী আমল করে, তাহলে সে অবশ্যই হেদায়েতের পথ অবলম্বন করবে এবং মহান আল্লাহর অভিমুখী হবে। কারণ কুরআন ও হাদিসের মাঝে মহান আল্লাহ হেদায়েত এবং রুহ ও আত্মার পরিশুদ্ধি রেখেছেন। এ সংক্রান্ত অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.

নিশ্চয় কুরআন সঠিক পথের দিশা দান করে এবং যে সকল মুমিন নেক আমল করে তাদের বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ দান করে। (সুরা ইসরা, আয়াত নং ৯)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

যদি আমি কুরআনকে কোনো পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তোমরা পাহাড়কে আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখতে। (সুরা হাশর, আয়াত নং ২১)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ.

তিনি ওই সত্তা যিনি নিরক্ষর জাতির মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনান এবং তাদের পরিশুদ্ধ করেন। (সুরা জুমুআহ, আয়াত নং ২)

আল্লাহর রাসুলের কথা, কাজ ও সমর্থনের (এক কথায় তাঁর হাদিস ও সুন্নাহর) মাধ্যমে মানুষকে তাঁর পরিশুদ্ধকরণের কাজটি কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এগুলো পূর্বে যেমন পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক ছিল, তেমনি পরবর্তীকালেও থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ, এখনও তা পূর্ণরূপে সংকলিত ও সংরক্ষিত আছে।

আর গ্রন্থকার এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহের একটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مَنْ بَعْدِيْ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

তোমরা আমার ইন্তেকালের পর আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের তরিকাকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে নেবে এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

আরেকটি হাদিস হচ্ছে,

تركتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وسُنَّتِيْ،

আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে গেলাম, যার উপর আমল করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহর কুরআন এবং আমার সুন্নত (হাদিস)।

আরেকটি হাদিস হচ্ছে,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

আমার সুন্নতের প্রতি যে অনাগ্রহী থাকবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেন, 'যারা মনে করে, শুধু কুরআন-হাদিস পড়ে অন্তরের যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসা নিজেই করা সম্ভব, তাদের ধারণা ভুল। এর প্রমাণ, রাসুলের সাহাবিগণ শুধু কুরআন পড়ে নিজেদের আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা করতে সক্ষম হননি।'

এটি খুব মারাত্মক কথা। এর দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কালাম অর্থহীন ও অনর্থক সাব্যস্ত করা হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেদায়েতের পর ভ্রষ্টতা এবং সরল পথ লাভের পর তা ভুলে যাওয়া থেকে হেফাজত করুন।

চরিত্রগঠন ও ইলম অর্জনে একজন শায়খ গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম শাতেবির ইবনে আব্বাদ নাফযিকে প্রশ্ন করা

মুওয়াফাকাত ও *আল-ইতিসাম*-এর মতো মূল্যবান গ্রন্থ এবং আরও অন্যান্য বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা, স্পেনের শহর গ্রানাডার অধিবাসী ফকিহ, উসুলবিদ, মুহাদ্দিস ও বিতার্কিক ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুসা শাতেবি (মৃত্যু: ৭৯০ হিজরি) তৎকালিন যুগের আধ্যাত্মিক গুরু, ফাস শহরের কারাবিয়্যিন মসজিদের খতিব আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ নাফযি (মৃত্যু: ৭৯২)-এর বরাবর একটি চিঠি লিখেন।

চিঠিতে তিনি গ্রানাডায় উদ্ভূত একটি মাসআলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, যা নিয়ে সেখানকার উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ চরমে উঠেছিল। মাসআলাটি হলো, আল্লাহকে পেতে চাইলে কি তরিকত ও তারবিয়াতের কোনো শায়খের সুহবত গ্রহণ আবশ্যক নাকি তরিকতের শায়খ ছাড়া শুধু আহলে ইলমের কাছ থেকে ইলম হাসিলের মাধ্যমে তরিকতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব?

তখন শায়খ ইবনে আব্বাদ নাফযি র. একজন মুখলিস আলেমের ন্যায় যথার্থ উত্তর প্রদান করেন, যা তার *রাসায়েলে সুগরা* গ্রন্থের ১০৬ ও ১২৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা আছে। উত্তরে তিনি যা বলেন তার সারসংক্ষেপ হলো, 'তরিকতের (আধ্যাত্মিকতার) লাইনে শায়খ বা মুরব্বি দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. তালিম ও তারবিয়াতি (দীক্ষা) মুরব্বি।

২. শুধু তালিমি মুরব্বি (শিক্ষাগুরু); তারবিয়াত বা দীক্ষার নয়।

আধ্যাত্মিকতার পথ গ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য তারবিয়াতের শায়খ গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। এটা শুধু তার ক্ষেত্রে প্রয়োজন, যে স্থূলবুদ্ধির এবং যার নফস অবাধ্য ও হঠকারী; কিন্তু বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও যার নফস অনুগত, তার তারবিয়াতি মুরব্বির প্রয়োজন নেই। শুধু তালিমি মুরব্বি থাকাই যথেষ্ট। তবে উত্তম হলো কোনো তারবিয়াতি মুরব্বির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। আর তালিমি মুরব্বি প্রত্যেক তরিকা ও আধ্যাত্মিক পন্থা অনুসরণকারীর জন্য আবশ্যক।

তারবিয়াতি মুরব্বি কাদের জন্য আবশ্যক, সে কথা তো আমরা উল্লেখ করলাম। (অর্থাৎ, যারা স্থূলবুদ্ধির এবং যাদের নফস অবাধ্য ও হঠকারী।) আর এ বিষয়টি সুস্পষ্টও। কারণ তাদের নফসে অবাধ্যতার অনেক ভারী পর্দা পড়ে থাকে। কোনো শায়খ ও মুরব্বি ছাড়া যে পর্দা সরানো সম্ভব নয়। তাদের অবস্থা হলো জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মতো, যার রোগ সারানোর জন্য প্রয়োজন কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের, যিনি অব্যর্থ ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে তাদের রোগ সারিয়ে তুলতে পারবেন।

আর যারা বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও যাদের নফস অনুগত তাদের জন্য তারবিয়াতি মুরব্বির সুহবত গ্রহণ ততটা আবশ্যকীয় নয়। কারণ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি পর্যাপ্ত ও নফস অনুগত। তালিমি মুরব্বির দিকনির্দেশনা দ্বারা তাদের সেসব কর্ম সঠিক হয়ে যায়, যা অন্যদের হয় না। তারা আল্লাহর অনুগ্রহে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কখনো আধ্যাত্মিকতার পথ অনুসরণ করতে চাইলে তাদের কোনো ক্ষতির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা থাকে না।

নিজের জন্য কোনো তারবিয়াতের শায়খ আবশ্যক করে নেওয়া মুতাআখখিরিন (পরবর্তী) সুফি উলামায়ে কেরামের অনুসৃত পন্থা। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম শুধু তালিমি মুরব্বির সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন। তাদের লিখিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারি। যেমন ইমাম হারেস মুহাসেবি, আবু তালেব মাক্কি ও অন্যান্য পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম। তারা তারবিয়াতি মুরব্বির কথা অতটা জোর দিয়ে বলেননি, যতটা গুরুত্বের সঙ্গে মুতাআখখিরিন (পরবর্তী) উলামায়ে কেরাম বলেছেন। যদিও পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম তাসাউফের উসুল ও ফুরু (মূল ও পারিপার্শ্বিক নীতি) এবং পূর্বাপর যাবতীয় নীতি সম্পর্কে তাদের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (এ ব্যাপারে তারা গভীর জ্ঞান রাখতেন।) বিশেষ করে আবু তালেব মাক্কি তাসাউফের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তারা তাদের গ্রন্থাদিতে তারবিয়াতি মুরব্বির কথা উল্লেখ করেননি, তাই বোঝা যায়, তরিকত ও আধ্যাত্মিকতার পথ গ্রহণের জন্য তা আবশ্যক ও জরুরি নয়।

অধিকাংশ তরিকাপন্থি এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। এটি প্রথম যুগের সালাফদের অবস্থার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু তাদের কারও সম্পর্কে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি (বর্তমান যুগের মতো) তারবিয়াতি মুরব্বি গ্রহণ করেছেন। ইলম অর্জনের জন্য ছাত্র তার উস্তাযের সঙ্গে যে সম্পর্ক বজায় রাখে, তালিমি মুরব্বির সঙ্গে তারা তা বজায় রাখতেন। তাদের অবস্থা ছিল ইলম অর্জন এবং সাহচর্য গ্রহণ ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যতা বজায় রাখার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন।

আর এসবের (ইমান ও কুফর, ইলমের নুর ও মূর্খতার অন্ধকারের) মাঝে পার্থক্য কেবল আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভকারী জ্ঞানীরা করতে পারেন, যারা সুস্পষ্ট বিষয়ের উপর আমল করেন এবং যাবতীয় সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الحَرَامُ بَيِّنٌ وَ بَيْنَ ذٰلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ

অর্থ : হালাল বিষয়গুলো সুস্পষ্ট এবং হারাম বিষয়গুলোও সুস্পষ্ট।[২৫] এ দুয়ের মাঝে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে যা বর্জন করা গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম।[২৬]

পারস্পরিক সাক্ষাতের দ্বারা তাদের এসব অর্জিত হত। এর বিরাট প্রভাব ছিল, যা তারা নিজেদের ভেতরে ও বাহিরে অনুভব করতেন। এ কারণে দেখা যায়, তারা আউলিয়া ও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের যিয়ারত লাভের মর্যাদা হাসিলের জন্য দেশে দেশে সফর করেছেন।

সুফিদের গ্রন্থাদি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যও তালিমি মুরব্বি তথা আহলে ইলমের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এসব গ্রন্থ থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হতে হলে গ্রন্থকার ইলম ও মারেফাতের অধিকারী অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি কি-না তা জানা থাকতে হবে। আর এটা জানার জন্যও নির্ভরযোগ্য কোনো শায়খ কিংবা বিশ্বস্ত কোনো সূত্র লাগবে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু যদি বাহ্যত শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়, তাহলে তো হলোই। অন্যথায় কোনো আহলে ইলমের শরণাপন্ন হতে হবে, যিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবেন। সুতরাং তালিমি মুরব্বির প্রয়োজন আবশ্যক।

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন যে, শায়খ ইবনে আব্বাদের এ আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, তরিকতের শায়খের সুহবত ও তার হাতে বায়আত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সবার ক্ষেত্রে নেই। তবে তালিমি মুরব্বির প্রয়োজনীয়তা সবার ক্ষেত্রে।

[২৫] হারাম সম্পদের ছড়াছড়ির মাঝেও হালালের সন্ধান পাওয়া সম্ভব

ইমাম গাযালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মূর্খ ব্যক্তি মনে করে, হালাল দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। হালাল পর্যন্ত পৌঁছার সমস্ত পথ রুদ্ধ। এখন হালাল বলতে একমাত্র নদীর পানি ও কারও মালিকানাধীন নয় এমন জমিনের উদ্ভিদ আছে। এছাড়া আর সমস্ত মাল অসাধু মানুষ লেনদেনে অনিয়ম করে নষ্ট করে ফেলেছে।

অথচ বাস্তব অবস্থা এরূপ নয়, বরং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যা হালাল তা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট এবং যা হারাম তাও সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝে কিছু সন্দেহপূর্ণ বস্তু রয়েছে। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, অবস্থা যতই পরিবর্তন হোক না কেন, হালাল-হারাম ও সন্দেহপূর্ণ-এ তিনটি বস্তু পাশাপাশি থাকে। এগুলোর অস্তিত্ব সবসময় বিদ্যমান থাকবে। (সুতরাং হালাল হারিয়ে যায়নি।) যা হারিয়ে গেছে তা হলো হালাল ও হালাল উপার্জনের পন্থা বিষয়ক জ্ঞান। (*ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫:২০। আল্লামা মুনাবিকৃত *ফাইযুল কাদির*, ৩:৪২৪-৪২৫।)

আমি (শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ) বলি, হালাল-হারাম ও সন্দিগ্ধ, এই তিনটি বিষয়ের অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। তবে হারামের পরিমাণ কম কিংবা বেশি হতে পারে। বর্তমানে দিনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, দিনি বিষয়ক জ্ঞানের স্বল্পতা, মানুষের বেশিরভাগ লেনদেনে সুদ ও অন্যান্য হারাম বিষয় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার ফলে হারামের পরিমাণ বেড়ে গেছে।

হারামের ব্যাপক প্রসার ঘটার কারণে সম্পূর্ণরূপে ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করা ঠিক নয়

এ অবস্থা সত্ত্বেও ইমাম গাযালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিনে* (৫:৪৬) বলেন, কেউ যদি জেনে থাকে যে, দুনিয়ার সমুদয় সম্পদে নিশ্চিতভাবে হারাম মিশে গেছে, তাহলেও তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করা আবশ্যক নয়। কারণ এর দ্বারা সংকট তৈরি হবে। শরিয়ত এমন কোনো হুকুম প্রদান করে না, যার দ্বারা পৃথিবীতে সংকট তৈরি হয়। এ ঘটনা তো জানাই যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যখন একটি বর্ম চুরি হয়ে গিয়েছিল এবং একজন ব্যক্তি গণিমতের সম্পদে খেয়ানত করে একটি জুব্বা নিয়েছিল, তখন দুনিয়াতে বর্ম ও জুব্বা ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেননি। চুরি হওয়া অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সমগ্র পৃথিবী থেকে তো হারাম বিলুপ্ত হওয়া তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর মানবকুল সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত, নিষ্পাপ, মাসুম হয়ে যাবে। আর তা অসম্ভব। তাই পৃথিবীর কোথাও এমন শর্তারোপ করা হয়নি এবং কোনো দেশেও নয়। তবে নির্দিষ্ট কিছু লোক যদি হারামের ভয়ে ক্রয়-বিক্রয় বর্জনের নিয়ত করে, তাহলে তারা তা করতে পারে। আর এমন ভয় ওয়াসওয়াসাপ্রবণ লোকদের মধ্যে থাকে। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোনো হুকুম বর্ণিত হয়নি এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকেও নয়। কোনো যুগে কোনো জাতির প্রত্যেকে সম্পূর্ণ হারাম থেকে মুক্ত ছিল, এমনটি কল্পনাও করা যায় না। (ইবনে তাইমিয়াকৃত *রিসালাতুল হালাল ওয়াল হারাম*)

২৬ এটি হাদিসের অংশবিশেষ যা ইমাম আহমদ, বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ (৩৯৮৪), দারেমি ও অন্যান্যরা নোমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। উপরিউক্ত হাদিসের শব্দগুলো তিরমিযি শরিফে বর্ণিত হাদিসের।

'আর সেগুলো বর্জন করা গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম' এই কথাটি বাহ্যত হাদিসের অংশ মনে হয়, কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি। কোনো বর্ণনায় এই অংশটি পাইনি। এই জন্য আমরা বাক্যটিকে উদ্ধৃত কমার ('-') বাইরে উল্লেখ করেছি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তিরমিযি শরিফে বর্ণিত পূর্ণ হাদিসটি হলো,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلاَلِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.

হালাল ও হারাম স্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে। অনেক মানুষ জানে না তা কি হালালের অন্তর্ভুক্ত না হারাম? সুতরাং নিজের দিন ও সম্ভ্রম রক্ষায় যে তা বর্জন করবে, সে নিরাপদ থাকবে, আর যে তাতে লিপ্ত হবে, আশঙ্কা আছে সে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন সংরক্ষিত চারণভূমির পাশ দিয়ে যে রাখাল পশু চরায়, তার পশু সে চারণভূমির ভেতরে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা আছে। শুনে রাখো, প্রত্যেক শাসকের একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। শুনে রাখো, আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হচ্ছে তার হারামকৃত বিষয়সমূহ।) অর্থাৎ, তার নাফরমানিসমূহ।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত এই অংশটুকু আছে,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

> জেনে রাখো, দেহের মধ্যে একখণ্ড মাংসপিণ্ড আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সারা দেহও সুস্থ থাকে। যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সারা দেহও নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, সেই মাংসপিণ্ডটি হচ্ছে অন্তর।

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইবনুল মুনাইয়ির সহিহ বুখারির উপর তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই বর্ণনার স্থানে বলেন, সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে যে জড়াবে সে হারামে নিপতিত হবে।

তিনি বলেন, তার শায়খ আবুল কাসেম ইবনে মানসুর কাববারি ইস্কান্দারি, যিনি অনেক বড়ো বুজুর্গ ও দুনিয়াবিমুখ আলেম ছিলেন। তিনি বলতেন, মুবাহ (নাজায়েয নয় এমন বিষয়) হচ্ছে বান্দা ও মাকরুহের মাঝে ঘাটি স্বরূপ। অধিক পরিমাণে মুবাহ বিষয়ে কেউ লিপ্ত হলে, একসময় সে সেই ঘাটি পার হয়ে মাকরুহের দিকে ধাবিত হয়। আর মাকরুহ হচ্ছে বান্দা ও হারাম বস্তুর মাঝে ঘাটিস্বরূপ। অধিক পরিমাণে কেউ মাকরুহে লিপ্ত হলে, একসময় সে সেই ঘাটি পার হয়ে হারামের দিকে ধাবিত হয়।

হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারিতে এই হাদিসটি উল্লেখ করে লিখেন, গুনাহ থেকে বাঁচার এটি একটি উত্তম পন্থা। ইবনে হিব্বানের একটি বর্ণনা-ইমাম মুসলিম শুধু যার সনদটি উল্লেখ করেছেন-এ কথাটি সমর্থন করে। সেখানে অতিরিক্ত এই কথাটিও আছে, তোমরা তোমাদের ও হারামের মাঝে হালাল দিয়ে একটি আড়াল তৈরি করে রাখো। যে এমনটি করলো, সে নিজের দিন ও সম্ভ্রম রক্ষা করল। আর যে তা না করবে, সে নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে পশুপাল চরানো রাখালের ন্যায়, আশঙ্কা আছে সে তাতে ঢুকে পড়বে।

তারপর হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ উপরিউক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এমন হালাল সাধারণত যা করার দ্বারা মাকরুহ কিংবা হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা পরিহার করা উচিত। যেমন, অতিরিক্ত বৈধ বস্তু গ্রহণও মানুষের মাঝে অধিক সম্পদ উপার্জনের নেশা তৈরি করে। আর এই নেশা তাকে অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জনের দিকে ধাবিত করে কিংবা তার মাঝে অহংকার সৃষ্টি করে। সবচেয়ে কম যে ক্ষতিটা করে তা হচ্ছে তাকে ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি সুস্পষ্ট একটি বিষয়। এক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। যেমন-বিচক্ষণ

আলেম। একজন বিচক্ষণ আলেম শরিয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবগত থাকায় হারাম থেকে মুক্ত থাকে। তবে অধিক পরিমাণে বৈধ ও মাকরুহ কাজ করতে থাকলে, তারও হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অন্যান্যদের যেহেতু শরিয়তের হুকুম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকে না, তাই তারা অধিকাংশই এসব সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা বিভিন্ন হয়ে থাকে।

আর এ কথা তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে, কেউ অধিক পরিমাণে মাকরুহে লিপ্ত হতে থাকলে একসময় তার মাঝে হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়ানোর সাহস তৈরী হয়ে যায়; কিংবা অভ্যাসবশত কোনো মাকরুহ কাজ করতে করতে হঠাৎ ওই জাতীয় কোনো হারাম কাজ সে করে বসে। হয়ত সে তা সন্দেহবশত করে। মূলত মাকরুহ কাজ করতে করতে একসময় অন্তর তাকওয়ার নুরশূন্য হয়ে অন্ধকার হয়ে যায়। তখন নিজের কাছে অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও সে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তীদের তাকওয়ার নমুনা

আল্লামা কাসতালানি রহিমাহুল্লাহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ইরশাদুস সারি*-তে এই হাদিসের আলোচনায় (১/১৯১) বলেন, আল্লাহর শপথ! যে জিনিস হালাল হওয়ার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত নও, তা বর্জন করো যেভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকার খেজুর হওয়ার আশঙ্কায় তা বর্জন করেছিলেন। আর সর্বোচ্চ তাকওয়া হলো হারামের আশঙ্কায় হালালকেও বর্জন করা। যেমন, ইবরাহিম ইবনে আদহাম পারিশ্রমিক এ কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, কাজ পূর্ণরূপে করেছেন কিনা-তা নিয়ে তার সন্দেহ ছিল। অথচ তিনি তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন।

বিশর হাফির বোন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা রাতে ঘরের ছাদে সুতা কাটি। তখন-বাগদাদে-তাহেরের হেরেমের প্রহরীরা আমাদের পাশ দিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তাদের হাতে থাকা মশালের আলো আমাদের উপর এসে পড়ে। সেই আলোয় তখন আমরা যে সুতা কাটি তা জায়েয হয় কিনা? ইমাম আহমদ বললেন, আল্লাহ তোমাকে অনুগ্রহ করুন, তুমি কে? জবাব দিলেন, বিশর হাফির বোন। এ কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন, প্রকৃত তাকওয়ার রৌশনি তোমার ঘর থেকেই আসে। তাই তুমি সেই আলোয় সুতা কেটো না।

আমাদের এই যুগে–বিংশ শতাব্দিতে- মক্কায় বাদিআ ইজিয়া নামে এক মহিলা আছেন। ত্রিশ বছর যাবৎ কবিলায়ে বাজিলা থেকে যেসব ফলমূল ও গোশত আসে তা তিনি খান না। কারণ সেই গোত্রের লোকদের ব্যাপারে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, তারা মেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তার পিতা নুরুদ্দিন মদিনার কোনো ফল খেতেন না। এজন্য যে, তারা সবাই যাকাত দেয় না। যে হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ে অলসতা করবে, সে লজ্জিত হবে। আর যে অধিক মুত্তাকি, কেয়ামতের দিন পুলসিরাত সে সবচেয়ে দ্রুত পার হবে।

খতিবে বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ *তারিখে বাগদাদে* (৫:১১৫) হাফেয ইবনে উকদাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তার পিতা মুহাম্মদ ইবনে সাইদ- উকবাহ ছিল যার উপাধি- ইবাদতগুজার মুত্তাকি ছিলেন। একবার তার কিছু দিনার আবু যর খাযযারের গৃহের দরজার কাছে পড়ে যায়। তিনি একজন খেজুর বিক্রেতাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, তাকে সেগুলো উঠিয়ে দেবেন। উকবাহ বললেন, আমি দিনারগুলো সেখানে পেলাম। তারপর আমার ভাবনায় এলো, (এগুলোই কি আমার সেই দিনার?) দুনিয়াতে কি আমার দিনার ছাড়া অন্য কারও দিনার নেই? তখন আমি খেজুর বিক্রেতাকে বললাম, আমার কাছে তোমার যে দিনার প্রাপ্য আছে, তা করয হিসেবে থাকুক। (আমি পরবর্তী সময়ে তা আদায় করে দেব)। তারপর আমি দিনারগুলো সেখানে রেখে চলে এলাম।

এমনই আরেকটি ঘটনা ইমাম আবু ইসহাক সিরাজির। যিনি সে যুগে শাফেয়ি মাযহাবের বড়ো আলেম ছিলেন। *আল-মুহাযযাব ফিল মাযহাব* গ্রন্থের লেখক। খুব দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু তাকওয়া পরহেযগারি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। একদিন তিনি মসজিদে আগমন করলেন, সেখানে বসে কিছু খাওয়ার জন্য। হঠাৎ রাস্তায় ভুলে ফেলে আসা দিনারের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেলেন, কিন্তু দিনারটি যখন পেলেন, সেটি না উঠিয়ে সেখানে রেখে এলেন। স্পর্শও করলেন না। মনে মনে বললেন, হয়ত অন্য কারও দিনার পড়ে আছে, আমার নয়। (ইমাম নববিকৃত *তাহযিবুল আসমা*,২/১৭৩)।

রিসালায়ে কুশাইরিয়্যায় আল্লাহর ভয়ের অনুচ্ছেদটি দেখুন। সেখানে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর একটি কিতাব আছে আল্লাহর ভয়ের উপর। নাম: *কিতাবুল ওয়ারা*। খুব মূল্যবান একটি কিতাব, পূর্ববর্তী নেককারদের খোদাভীতির অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন সেখানে বর্ণিত হয়েছে। পাঠকের কাছে মনে হবে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তারপর জান্নাতিদের দেখে দেখে তাদের ঘটনা বর্ণনা করছেন। আপনার গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা উচিত। নিঃসন্দেহে অনেক উপকৃত হবেন।

ইমাম হারেস মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, নিয়তের বিষয়ে গভীর চিন্তা-ফিকির করবে।[২৭] তুমি কি চাচ্ছ, তোমার ইচ্ছা কী, সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হবে। কারণ, প্রকৃত প্রতিদান নিয়তের মাধ্যমে লাভ হয়।[২৮] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[২৭] নিয়তের পরিচয়

কোনো কিছুর ইচ্ছা ও কোনো কাজ করা বা না করার প্রতিজ্ঞা করাকে নিয়ত বলে। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন* নামক গ্রন্থে (৪/১৯৯) বলেন, নিয়ত সকল বিষয়ের মূল ও ভিত্তি। এর উপর ভিত্তি করে সকল কাজ সম্পাদিত হয়। কারণ তা কাজের রুহ ও পরিচালক। যে কোনো কাজ নিয়তের অনুগামী। তাই নিয়ত সহিহ হলে আমল সহিহ হয়। তা সহিহ না হলে আমলও সহিহ হয় না। নিয়তের দ্বারা বান্দা তাওফিকপ্রাপ্ত হয়। নিয়ত ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিয়ত অনুযায়ী দুনিয়া আখেরাতে বান্দার মর্যাদা ভিন্ন হয়।

[২৮] ভাল ও মন্দ কাজের নিয়তের লাভক্ষতি

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ভাল কাজের নিয়ত মুসলিম বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার অনেক বড়ো একটি নেয়ামত। যেহেতু বান্দাকে নিয়তের প্রতিদান দেওয়া হবে, তাই বেশি বেশি ভাল কাজের নিয়ত করে সে প্রতিদানকে আরও বাড়িয়ে নিতে পারে এবং সেসব নেক আমলের সওয়াবও তার আমলনামায় যোগ করতে পারে, যা সে করেনি; কিন্তু করার নিয়ত করেছিল, সম্ভব হলে অবশ্যই করত-এমন দৃঢ় ইচ্ছাও তার ছিল।

সালাফে সালেহিনের মধ্যে আবু সফওয়ান বলেন যে, নিয়ত করা থেকে শরীর কখনো দুর্বল হয় না। (*হিলয়াতুল আউলিয়া* :৭: ৫৪)।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আমার আব্বাকে একদিন বললাম, আব্বাজান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, বৎস! ভালো কাজের নিয়ত করো। কারণ যতক্ষণ ভালো কাজের নিয়ত করতে থাকবে, ততক্ষণ ভালো ও কল্যাণের মাঝে থাকবে। (ইবনুল জাওযি র. *মানাকিবুল ইমাম আহমদ* নামক গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। পৃষ্ঠা নং ২০০।

ইবরাহিম নাখয়ি বলেন, তাবেয়ি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ নাখয়ি নিয়ত ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। এমনকি তিনি পানিও নিয়তসহ পান করতেন। (ইমাম আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন *আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল* :১:৭৩।)

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...»

নিশ্চয় সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।[২৯]

ইমাম মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করো এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকো। কারণ, প্রকৃত মুসলিম তো সেই ব্যক্তি,

---

অনুরূপভাবে খারাপ ও মন্দ কাজের নিয়তের কারণে মানুষকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। আর তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কারণ যেমন- অক্ষমতা, লজ্জা, মানুষের ভয় অথবা উপায়-উপকরণ না থাকা, ইত্যাদি কারণে) যদি নাও করে তথাপি তাকে তা বাস্তবায়নের ইচ্ছার কারণে শাস্তি পেতে হবে। (আল্লাহর ভয়ে বর্জন করলে ভিন্ন কথা।)

সুতরাং নিয়তকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করো। নিজের চিন্তা-ভাবনাকে সুন্দর করো। আর আল্লাহ তায়ালার নিকটে উত্তম প্রতিদান লাভের প্রত্যাশা রাখো।

[২৯] এই হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম তাদের কিতাবে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। মূল কপিতে দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে যে إِنَّما শব্দটি আছে তা নেই। মরক্কোর কপিতে উভয় বাক্যের শুরু থেকেই إِنَّما শব্দটি পড়ে গেছে।

কাজের শুরুতে সালাফদের নিয়তের কথা স্মরণ রাখা

নিয়তের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও নিয়তকে খাঁটি করার বিষয়ে পূর্ববর্তীদের অনেক উক্তি আছে। ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন, আমলকারী ব্যক্তির নিকট দীর্ঘ সময় সাধনা ও পরিশ্রমের কাজ করার চেয়ে নিয়ত খাঁটি করা বেশি কঠিন।

সুফিয়ান সাওরি বলেন, আমি নিয়তের চেয়ে কষ্টকর কিছু খুঁজে পাইনি। কারণ এর ক্ষতি আমার উপরই এসে বর্তায়।

নাফে ইবনে জুবাইরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি জানাজায় যাবেন না? তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমি নিয়ত করে নিই। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, চলো। ঘটনাটি হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি *জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম* গ্রন্থের ৯ নং পৃষ্ঠায় ইবনু আবিদ দুনিয়ার *কিতাবুল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাত* গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছেন।

যার রসনা ও হাত থেকে অপরাপর মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুমিন তো সেই ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে। ৩০

---

৩০ (... প্রকৃত মুসলমান...নিরাপদ থাকে)-ব্রাকেটের ভেতরের এই তরজমাটি রাসুলের একটি হাদিসের। হাদিসের শব্দগুলো এরূপ,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ بَوَائِقَهُ.

হাদিসটির ব্যাখ্যায় শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন, হাদিসে ব্যবহৃত اَلْبَوَائِقُ শব্দটি بَائِقَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ: অনিষ্ট, অবিচার, বিপদ। হাদিসটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন। *মুসনাদে আহমদ, নাসায়ি, তিরমিযি শরিফ, মুসতাদরাকে হাকেম* ও *সহিহ ইবনে হিব্বানে* হাদিসের শব্দগুলো হচ্ছে,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

জামে সগিরেও হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। *জামে সগিরের* ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুনাবি *ফাইযুল কাদিরে* (৬:২৭০) বলেন, হাকেমের বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাটিও আছে,

وَالْمُجَاهِدُ: مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللهِ، وَ الْمُهَاجِرَ: مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوْبَ.

> আর প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে আল্লাহর আনুগত্যে (অবিচল থাকতে) নফসের সঙ্গে লড়াই করে। প্রকৃত মুহাজির (ত্যাগকারী) সে যে গুনাহ ত্যাগ করে।

রিসালাতুল মুসতারশিদিন গ্রন্থের অধিকাংশ কপিতে'الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ' আন-নাস (মানুষ) শব্দটি এসেছে। একটি কপিতে الْمُسْلِمُوْنَ শব্দটি এসেছে। এই শব্দটির সঙ্গে হাদিসের মিল থাকায় আমি তা বহাল রেখে হাদিসের অনুরূপ করে দিয়েছি। উদ্দেশ্য ও অর্থ অবশ্য উভয়টার একই। হাদিসের পরবর্তী وَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ النَّاسُ অংশটি পড়লে তা বুঝে আসে।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> اتَّقِ اللهَ بِطَاعَتِهِ وَأَطِعِ اللهَ بِتَقْوَاهُ وَلْتَخِفَّ يَدَاكَ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِسَانَكَ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ.

> আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করো। আর তাকওয়ার মাধ্যমে তার আনুগত্য করো। মুসলমানদের রক্ত ঝরানো থেকে তোমার হাত, তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে পেট ও তাদের মান-মর্যাদায় আঘাত করা থেকে তোমার মুখ সংযত রাখো।

প্রতিটি চিন্তার ক্ষেত্রে নফসের হিসাব গ্রহণ করবে।[৩১]

---

[৩১] অন্তরের চিন্তা-ভাবনাসমূহের প্রকার

শায়খ আবু তালেব মাক্কি রহিমাহুল্লাহ তার কিতাব *কুতুল কুলুবে* (১:১২৬) বলেন, চিন্তা-ভাবনাসমূহ কয়েক প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের আলাদা নাম আছে:

১. অন্তরে ভাল কোনো কাজের চিন্তা আসাকে 'ইলহাম' বলে।
২. মন্দ কাজের চিন্তাকে 'ওয়াসওয়াসা' বলে।
৩. কোনো ভয় জাগলে সেটাকে 'হাসসাস' বলে।
৪. ভালো কোনো কাজের ইচ্ছাকে 'নিয়ত' বলে।
৫. জায়েয কোনো কাজ বাস্তবায়নের ইচ্ছা ও আগ্রহকে 'উমনিয়্যা' ও 'আমাল' বলে।
৬. আখেরাত, আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের কথা মনে হওয়াকে 'তাযকির' ও 'তাফকির' বলে।
৭. গায়েবি কোনো বস্তুকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করাকে 'মুশাহাদা' বলে।
৮. আয়-রোজগার ও জীবন-জীবিকা নিয়ে চিন্তা করাকে 'হাম্ম' বলে।
৯. অভ্যাসবশত কোনো জৈবিক চাহিদা কিংবা প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়াকে 'লামাম' বলে।

আর সবগুলোর সমষ্টিকে একসঙ্গে খাওয়াতির বলে।

অন্তরের চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে ইমাম ইবনুল জাওযির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ অন্তরের চিন্তা-ভাবনার বিষয়ে খুবই চমৎকার, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। যথার্থ ও প্রকৃত একটি আলোচনা! তোমার উচিত তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করা, বোঝা ও মুখস্থ করে নেওয়া। আলোচনাটি যদিও দীর্ঘ, তবে আমি এই আশায় তা এখানে তুলে ধরছি যে, তুমি তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাফিকির করবে। এতে তোমার দিন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত আছে।

মন্দ চিন্তা-ভাবনার প্রতিকার

ফাওয়ায়েদ নামক গ্রন্থে (পৃ. ৩১, ১৭১-১৭৪) তিনি বলেন, অন্তরে কোনো কুচিন্তা এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করো। যদি তা না করো, তাহলে তা শাহওয়াতে পরিণত হবে। সুতরাং তুমি এর সঙ্গে লড়াই করো (এবং এটাকে দমন করার চেষ্টা করো)। দমন না করলে একসময় তা দৃঢ় ইচ্ছায় রূপান্তরিত হবে। তখনও দমন না করলে কর্মে পরিণত হবে। এরপরও না পারলে, অভ্যাসে পরিণত হবে। আর তখন তা থেকে বের হওয়া তোমার জন্য কঠিন হবে।

একটি বিষয় খুব ভালোভাবে জেনে রাখো যে, যে কোনো ঐচ্ছিক কাজের সূচনা চিন্তা-ভাবনা থেকে হয়। চিন্তা-ভাবনা থেকে আসে কল্পনা। কল্পনা থেকে ইচ্ছা। আর ইচ্ছা থেকে বাস্তবায়ন, সংঘটন। এই সংঘটন বারবার হতে থাকলে একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর এসবকিছুর মূলে যেহেতু চিন্তা-ভাবনা, তাই তা ঠিক হলে সব ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হলে সব নষ্ট।

অন্তরের চিন্তা-ভাবনার সংশোধনের জন্য এগুলোর যিনি স্রষ্টা তাঁর ধ্যান ও স্মরণ সবসময় অন্তরে জাগ্রত রাখা, তাঁর অভিমুখী হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কথা ভাবা। কারণ, সমস্ত কল্যাণ ও সফলতা তাঁর মহান সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমস্ত হেদায়েত তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করার মাঝেই বান্দার সকল সুরক্ষা। তাঁর থেকে দূরে সরে যাওয়া ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাঝে বান্দার সকল ক্ষতি ও ভ্রষ্টতা।

জেনে রাখো যে, ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা মানুষকে কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। আর এই ভাবনা তাঁর মাঝে স্মরণ সৃষ্টি করে। স্মরণ থেকে জাগ্রত হয় ইচ্ছা। ইচ্ছা থেকে হয় বাস্তবায়ন, যা দৃঢ় হয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণাকে নির্মূল করতে চাইলে অঙ্কুরেই নির্মূল করতে হবে। পূর্ণরূপ ধারণ করে শক্তিশালী হয়ে গেলে তা নির্মূল করা কঠিন।

এ কথা তো সুস্পষ্ট, মানুষ তার চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেলতে ও নিঃশেষ করে দিতে পারে না। এই ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়নি। প্রতি মুহূর্তেই সে কিছু না কিছু ভাবতে থাকে। কোনো না কোনো চিন্তা তার মনে চলতে থাকে। তবে সুস্থ বিবেক ও ইমানি শক্তি মানুষকে উত্তম ও সুন্দর সুন্দর চিন্তা গ্রহণ, সেগুলোর দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ এবং মন্দ চিন্তা বর্জন ও ঘৃণা করতে সাহায্য করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের নফসকে অনবরত ঘুরতে থাকা জাঁতাকল এর মতো সৃষ্টি করেছেন, যা সবসময় কোনো না কোনো কিছু পিষতে থাকে। তাতে কোনো শস্য দানা দিলে সে সেটা পিষে ফেলবে আর যদি মাটি কিংবা নুড়ি পাথর দেওয়া হয় তাহলেও সে তা পিষে ফেলবে।

নফসে আম্মারার অনুসরণের মন্দ প্রভাব

মানুষের মনের মধ্যে ঘুরতে থাকা বিভিন্ন চিন্তাভাবনা জাঁতাকলে রাখা সেই শস্য দানার মতো। আর এই জাঁতাকলের কোনো অবসর নেই। এতে অবশ্যই কিছু না কিছু রাখতে হবে। কিছু মানুষ আছে যাদের জাঁতা শস্যদানা পিষে, যা গুঁড়ো হয়ে বের হয়ে অপরের উপকার ও কল্যাণ সাধন করে। তবে অধিকাংশ মানুষই জাঁতায় বালু, মাটি, কঙ্কর ইত্যাদি অনুপকারী জিনিস পিষে থাকে। তারপর যখন সেগুলো দিয়ে খামির ও রুটি তৈরির সময় আসে তখন বাস্তবতা বুঝে আসে। (সে তখন বুঝতে পারে আসলে সে কী পিষেছে।)'' (ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা রহিমাহুল্লাহর আলোচনাটি এখানে শেষ হলো।)

শায়খ রশিদ রেজা র. বলেন, যে নফসে আম্মারার (মন্দ কাজের আদেশ দানকারী নফসের) অনুসরণ করে, সে অশ্লীলতা ও পাপাচারের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায় এবং কখনো কখনো কুফুরির মতো জঘন্য গুনাহের কাজকে সঠিক মনে করে। তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে খাহেশাত নিয়ে কোনো সুন্দরী নারীকে দেখতে থাকে। তারপর তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে তার কাছে গিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা করে। এভাবে তারা একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তারপর একদিন তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ইমাম মুহাসেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রতিটি নিঃশ্বাসে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণে রাখো। উমর রা. বলেন,

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا وَزِنُوْهَا قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرَضِ الْاَكْبَرِ يَوْمَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.

(কেয়ামতের দিন) তোমাদের হিসাব গ্রহণ করার আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো। তোমাদের (আমল মিজানের পাল্লায়) ওজন করার আগে তোমরা নিজেরা ওজন করে দেখো।[৩২] আর মহাসমাবেশে

জনৈক আরব কবি বলেন,

فَلَمَّا رَأَتْنِيْ رَأْرَأَتْ ثُمَّ أَقْبَلَتْ   تُهَازِلُنِيْ وَالْهَزْلُ دَاعِيَةُ الْعُهْرِ

সে যখন আমাকে দেখে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে। তারপর কাছে এসে আমার সঙ্গে দুষ্টুমিতে মেতে উঠে। এই দুষ্টুমিই আমাদের ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করে। (তাফসিরুল মানার, ৯:৫৪৭)

সুরা আরাফের নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে তিনি এই আলোচনা তুলে ধরেন:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ.

নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। (সূরা আরাফ : ২০১)

[৩২] ১. কারণ, আজ নিজেদের হিসাব নিজেরা গ্রহণ করা কাল কেয়ামতের দিনের হিসাবের চেয়ে অনেক সহজ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাটি (টীকার এই কাথাটি সহ) আল্লামা ইবনুল জাওযির *কিতাবুল কুসসাস ওয়াল মুযাক্কিরিন*-এ বর্ণিত হয়েছে। পৃষ্ঠা নং ৪৩। *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*-এর আলজেরিয়ান যে কপিটি আছে সেখানে বাক্যটি এভাবে এসেছে, قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا عَلَيْكُمْ। আমাদের এই কপিতে শুধু قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا আছে। عَلَيْكُمْ শব্দটি নেই। (অর্থ একই)।

(আল্লাহর সামনে) উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যেদিন তোমাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না।[৩৩]

---

[৩৩] *তিরমিযি শরিফে* কেয়ামতের দিবসের বর্ণনা অধ্যায়ে ২৮২:৯ নং হাদিসের টীকায় উমর রা. এর কথাটি এভাবে এসেছে:

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

অর্থ: উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগেই তোমরা নিজেদের হিসাব নাও এবং কেয়ামতের দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করো আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের হিসাব গ্রহণ করে কেয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ হবে।

তারপর ইমাম তিরমিযি বলেন,

وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لاَ يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ

মাইমুন ইবনে মেহরান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হিসাব না নিবে, যেভাবে সে তার ব্যবসায় শরিকের কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয় যে, সে খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়-চোপড় কোথা থেকে কত মূল্যে সংগ্রহ করেছে।

মুমিনের অবস্থা বর্ণনায় হাসান বসরি রহ.

ইমাম হাসান বসরি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুমিন তার নফসের তত্ত্বাবধায়ক। সে আল্লাহর জন্য নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করবে আর কেয়ামতের দিন তাদের হিসাব সহজ হবে, যারা দুনিয়াতে নিজেদের হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর কেয়ামতের দিন তাদের হিসাব কঠিন হবে, যারা নিজেদের কোনো হিসাব গ্রহণ করেনি।

মুমিন কোনো কিছু দেখে যখন মুগ্ধ হয় তখন সে তাকে সম্বোধন করে বলে আল্লাহর কসম আমি তোমাকে পছন্দ করি এবং তোমাকে আমার প্রয়োজন; কিন্তু আল্লাহর কসম তোমাকে পাওয়ার আমার কাছে কোনো রাস্তা নেই। অর্থাৎ, জিনিসটি হালাল কি না এই সন্দেহের কারণে সে-তা গ্রহণ করতে পারে না। আমার এবং তোমার মাঝে অনেকগুলো অন্তরায় এসে গেছে। আর যদি তার দ্বারা (গুনাহ জাতীয়) অপছন্দনীয় কিছু হয়ে যায়, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের নফসকে সম্বোধন করে বলে, আমার এমনটি করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। এর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আল্লাহর কসম! আমার কাছে এ ব্যাপারে কোনো ওজর নেই। আল্লাহর কসম! আমি ভবিষ্যতে কখনো এমন কাজ করবো না।

মুমিন তো পৃথিবীতে এক বন্দি ব্যক্তির ন্যায়, যে সবসময় নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় থাকে। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত সে কোনো কিছুতে নিরাপদ বোধ করে না। সে জানে যে তার কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ঘুমানোর পূর্বে বুজুর্গদের নফসের হিসাব নেওয়া

আল্লামা মুনাবি রহিমাহুল্লাহ *ফাইযুল কাদিরে* বলেন, শায়খ ইবনে আরাবি বলেন, আমাদের শায়খগণ সারাদিন যেসব কথা বলতেন ও কাজ করতেন, সেগুলো একটি খাতায় টুকে রাখতেন। এশার পর সেই খাতা নিয়ে বসতেন। নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করতেন। সারাদিনের কথা ও কাজের প্রতি নজর বুলাতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। যদি ইস্তেগফার করার মতো কোনো কাজ হত তাহলে ইস্তেগফার করে নিতেন। যদি তওবা করার মতো কোনো কাজ হত তওবা করে নিতেন। শোকর আদায়ের মতো কোনো কাজ হলে শোকর আদায় করতেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন। আমরা তখন তাদের চেয়ে আরেকটি কাজ বাড়িয়ে করতে শুরু করলাম, সেটি হচ্ছে অন্তরের চিন্তা-ভাবনা। আমরা আমাদের অন্তরের চিন্তা-ভাবনাগুলো ও নিজে নিজে যেসব কথা বলতাম সেগুলো লিখে রাখতাম এবং সে অনুযায়ী নফসের হিসাব গ্রহণ করতাম।

ইমাম মুহাসেবি র. বলেন, দিনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। যাবতীয় বিষয়ে তাঁর কাছে আশা রাখো।[৩৪] বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করো।[৩৫]

---

[৩৪] **যারা গোপনে আল্লাহকে ডাকে, তারা তাঁর নৈকট্য লাভ করে**

আল্লাহ তায়ালা এমন এক সত্তা যাকে তুমি যখন ইচ্ছা চুপিসারে ডাকতে পারো। যার কাছে তুমি তোমার যা ইচ্ছা তা প্রার্থনা করতে পারো। কেউ জানে না, তোমার এমন গোপন কথাও তুমি তাঁর সঙ্গে বলতে পারো। তিনি তাঁর হেকমত ও দয়ার মাধ্যমে যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তোমার ডাকে সাড়া দেবেন।

তিনি মহা প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি অনুগ্রহ-বদান্যতা ও মহানুভবতা নিয়ে ইরশাদ করেন, 'বান্দা তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো'। এর জন্য তিনি কোনো সময় কিংবা মাধ্যম কিংবা কোনো স্থান-কাল নির্দিষ্ট করেননি। (অর্থাৎ, যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে, যে কারও মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তিনি ডাকে সাড়া দিতে পারেন।) তাঁর দরজা সব সময় খোলা। সেখানে না কোনো প্রহরী আছে, আর না কোনো দারোয়ান। যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই আশা করা যায়। যদি তুমি মনে মনে তাঁর কাছে কিছু চাও, তাহলেও তিনি তোমার ডাকে সাড়া দেবেন। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে কোনো কিছু আশা করো না।

[৩৫] **বিপদ যত কঠিন হয়, মুক্তি তত দ্রুত হয়**

(অন্ধকার যত গাঢ় হয়, ভোর তত নিকটে আসে।) তাই কখনো ধারণা করো না বিপদের ছায়া কোনোদিন কাটবে না। প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। জেনে রেখো, মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে। সংকট ও কঠিন সময়ের পর সুসময় আসে। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে নবি আপনি ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দান করুন। আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেননি, হে নবি, আপনি ধৈর্যধারণকারীদের সান্ত্বনা দান করুন। তিনি বলেছেন, সুসংবাদ দান করুন। অর্থাৎ, মুক্তি কিংবা প্রতিদান, অথবা সাহায্য কিংবা সহজতার সুসংবাদ।

এক হাবশি বাঁদির বিপদমুক্তির ঘটনা

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

কোনো আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিল। কিন্তু সে তাদের সঙ্গেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি মেয়ে গলায় লাল চামড়ার উপর মূল্যবান পাথর খচিত হার পরে বাইরে গেল। সে হারটা হয়ত নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল, অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তখন একটা চিল তা পড়ে থাকা অবস্থায় গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে, অতঃপর গোত্রের লোকেরা বেশ খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো; কিন্তু তারা তা পেল না। তখন তারা আমার উপর এর দোষ চাপাল। সে বলেছে, তারা আমাকে তল্লাশি করতে শুরু করলো, এমন কি আমার লজ্জাস্থানেও। দাসীটি বলেছে, আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে সেই অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলাম, এমন সময় চিলটি উড়ে যেতে যেতে হারটি ফেলে দিল। সে বলেছে, তাদের সামনেই তা পড়লো। তখন আমি বললাম, তোমরা তো এর জন্যই আমার উপর দোষ চাপিয়েছিলে। তোমরা আমার সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলে অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হার! সে বলেছে, অতঃপর সে রাসুলুল্লালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। আয়েশা রা. বলেন, তার জন্য মসজিদে (নববিতে) একটা তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেওয়া হয়েছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, সে (দাসীটি) আমার নিকট আসত আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলত। সে আমার নিকট যখনই বসত তখনই বলত,

(وَيَومُ الوِشَاحِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا * اَلاَ اِنَّهُ مِن بَلدَةِ الكُفرِ اَنجَانِي)

"সেই হারের দিনটি আমার প্রতিপালকের আশ্চর্য ঘটনা বিশেষ। জেনে রাখুন, সে ঘটনাটি আমাকে কুফরের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছে।"

আয়েশা রা. বলেন, আমি তাকে বললাম, কী ব্যাপার, তুমি আমার নিকট বসলেই যে এ কথাটা বলে থাক? 'আয়েশা রা. বলেন, সে তখন আমার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। (সহিহ বুখারি: ১:৫৩৩)

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শুধু নিজের গুনাহকে ভয় করো। একমাত্র আপন রবের কাছে আশা রাখো।[৩৬] যে জানে না, সে যেন জানার

---

[৩৬] খোলা দরজা রেখে বন্ধ দরজার দিকে ধাবিত না হওয়া

কত মূল্যবান একটি কথা! কত উত্তম একটি কাজ!

মুহাদ্দিস, দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুজার, নেককার আহমদ ইবনে আবু গালেব ইবনে তাললাবাহ বাগদাদি। মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি। তার জীবন বৃত্তান্তে এসেছে, তিনি অনেক নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মানুষ দোয়ার জন্য তার কাছে আসত। একবার এক লোক তার কাছে এসে বলল, অমুক বিষয়ে আপনি অমুকের নিকট আমার জন্য একটু সুপারিশ করে দিন। তখন তিনি বললেন, ভাই! আমার সঙ্গে চলো। আমরা প্রথমে দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি। কারণ, আমি খোলা দরজা ছেড়ে বন্ধ দরজার দিকে যেতে চাই না। (ইবনুল জাওযিকৃত *মানাকিবুল ইমাম আহমদ*: পৃ.৬৪০) এবং ইবনে রজব হাম্বলিকৃত *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা*: ১ম খন্ড, পৃ. ২২৪। সুতরাং তুমি খোলা দরজা ছেড়ে বন্ধ দরজার দিকে ছুটো না। তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তার কাছে দোয়া করো। কারণ তিনি তোমার খুবই নিকটে এবং দ্রুত ডাকে সাড়া দানকারী, তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী।

বাদশাও আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী

আল্লামা ইবনুল জাওযি তার প্রণীত *লুকাত ফি হিকায়াতিস সালেহিন* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহিম ফেহরি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক বাদশার নিকট এসে দেখল যে, তিনি সিজদায় পড়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছেন। তখন তিনি বললেন, এই লোক নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী। কীভাবে আমার প্রয়োজন তার কাছ থেকে পূরণ করব? কেন আমি প্রয়োজনের কথা সেই মহান সত্তার দরবারে উপস্থাপন করছি না, যার কাছে সকল প্রয়োজন পূরণ হয়। তিনি বলেন, বাদশা তার এই কথা শুনে ফেলেন। তিনি সিজদা শেষ করে বললেন, লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো! তাকে নিয়ে আসা হলে বললেন, তাকে ১০ হাজার আশরাফি দাও! আর বললেন, আমি সিজদায় পড়ে যাঁর কাছে প্রার্থনা করছিলাম এবং তুমি যাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছিলে, এই আশরাফি তিনি তোমাকে দান করেছেন।

জন্য প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ না করে। আর কাউকে যদি তার না-জানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, সে যেন 'জানি না' বলতে লজ্জাবোধ না করে।'[৩৭]

---

[৩৭] জ্ঞানার্জনের জন্য জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা না করা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইলমের মূল ভিত্তি তিনটি:

এক. আল্লাহ তায়ালার কালাম, **দুই.** রাসুলের হাদিস ও **তিন.** কোনো বিষয় না জানলে 'জানি না' বলতে পারা।

(আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে দারা কুতনি *গারাইবু মালিক* নামক গ্রন্থে ও খতিবে বাগদাদি *আসমাউম মান রাওয়া আন মালিক* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে ভিন্ন শব্দে *আবু দাউদ* কিতাবুল ফারায়েজের শুরুতে (৩/১৬৪) এবং *ইবনে মাজাহ সুনানের* মুকাদ্দামা, ৮ম বাব, পৃ. ২১ বর্ণনা করেছেন। তবে অর্থ একই।)

হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, মাওকুফভাবে এর সনদটি হাসান। আল্লামা মুনাবি ইমাম সুয়ূতিকৃত *জামে সগিরের* ব্যাখ্যা গ্রন্থ *ফায়জুল কাদিরে* (৪/৩৮৭-৩৮৮) এ কথাটি নকল করেছেন।)

না-জানা বিষয়ে 'জানি না' বলাতেই সম্মান

আল্লামা মুনাবি তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এই হাদিসটি থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, যখন কোনো আলেমকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর বিষয়টি তার জানা না থাকে, তখন তার একথা বলা উচিত, আমি জানি না কিংবা এটি আমার তাহকিকে নেই অথবা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। মূর্খদের ধারণা, 'জানি না' বললে মর্যাদা কমে যায়। ব্যাপারটি আসলে তেমন নয়। কারণ, একজন বিজ্ঞ আলেমেরও কোনো মাসআলা অজানা থাকা, তার জন্য ক্ষতির বিষয় নয়। বরং 'জানি না' কথাটি তার মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কারণ, এতে বোঝা যায় যে, তিনি অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, মুত্তাকি, পরহেযগার ও দিনের ক্ষেত্রে মজবুত। তার অন্তর পবিত্র। জ্ঞান পরিপূর্ণ ও নিয়ত খাঁটি।

কিন্তু যে স্বল্পজ্ঞ, দুর্বল দিনদার, 'জানি না' বলতে তার সম্মানে লাগে। কারণ, তার ভেতরে এই ভয় কাজ করে যে, এ কথা বললে, সে প্রশ্নকারীর কাছে অপমানিত হবে। অথচ সে সমস্ত জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর কাছে অপমানিত হওয়ার

ভয় করছে না। এটি সম্পূর্ণ মূর্খতা এবং দিনের ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচায়ক। 'আমি জানি না, আমার জানা নেই' এ কথাটি চার ইমাম, চার খলিফা, এমন কী জিবরাইল আলাইহিস সালাম থেকেও বর্ণিত আছে। যেমনটি *'পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম জায়গা আল্লাহর ঘর মসজিদ'*-এই হাদিসে এসেছে।

তারপর ইমাম মুনাবি এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্যদের উক্তি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ার্দি তার মূল্যবান গ্রন্থ *আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দিন*-এর ৮২ নং পৃষ্ঠায় বলেন, সমস্ত বিষয়ের ইলম অর্জন করা যেহেতু কারও পক্ষে সম্ভব নয়; তাই কোনো কিছু অজানা থাকা স্বাভাবিক। এতে লজ্জার কিছু নেই। সুতরাং না জানলে 'জানি না' বলতে লজ্জাবোধ করো না। (ইমাম যাবিদি, *শারহুল ইহইয়া* ১/৩৯৪)

অর্ধেক ইলম 'জানি-না' বলতে পারায়

ইমাম গাযালি *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে (১/৬৯) বলেন, ইমাম শাবি বলেন, 'আমি জানি না' কথাটি হচ্ছে অর্ধেক ইলম। না-জানা বিষয়ে কেউ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ থাকে; তার সওয়াব ওই ব্যক্তির চেয়ে কম নয় যে জানা থাকায় সঠিক উত্তর বলে দেয়। কারণ না জানার কথা স্বীকার করা নফসের জন্যে খুবই কঠিন। আবু তালেব মাক্কি *কুতুল কুলুব* নামক গ্রন্থে বলেন, আল্লাহর ভয়ে না জানা বিষয়ে চুপ থাকা নেকি লাভের আশায় জানা থাকায় সঠিক উত্তর দানের মতোই উত্তম।

না জানা বিষয় জানতে

ইবনে আবদুল বার *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি* গ্রন্থে (২/৫৫) জনৈক আহলে ইলম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জানি না বলা শেখো। জানি বলা শেখো না। কারণ, তুমি যখন বলবে জানি না, তখন তারা তোমাকে শিখিয়ে দেবে, যাতে তুমি জানতে পার। আর তুমি যখন বলবে জানি, তখন লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে মূর্খ বানিয়ে ছাড়বে।

ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহি *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন* নামক গ্রন্থে (৪:২১৮) এবং আবু খাইসামা নাসাই *কিতাবুল ইলমে* (পৃ. ১২০) উল্লেখ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইলম হচ্ছে যে জানে না তার এই কথা বলা, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইমাম মুহাসেবি বলেন, খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, দেহের জন্য মাথা যেমন, ইমানের জন্য সবর তেমন[৩৮]। মাথা যখন কেটে ফেলা হয়, তখন সমস্ত দেহের মৃত্যু ঘটে। মান-সম্মানে আঘাতমূলক কথা শুনে যদি ক্রুদ্ধ হও, তাহলে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তা অত্যন্ত উদার মনোবলের পরিচায়ক। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

مَنْ خَافَ اللهَ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ وَمَنِ اتَّقَاهُ لَمْ يَصْنَعْ مَا يُرِيْدُ وَلَوْلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكَانَ غَيْرَ مَا تَرَوْنَ.

যে আল্লাহকে ভয় করে, সে যেন নিজের রাগ না মেটায়। যে আল্লাহকে ভয় করে, সে যেন যাচ্ছে তাই না করে।[৩৯]

ইবরাহিম নাখয়ি আমের শাবিকে-যিনি তৎকালিন যুগে তাবেয়িদের মাঝে অনেক বড়ো ইমাম ছিলেন-একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমার জানা নেই। নাখয়ি এমন উত্তর শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ! ইনিই প্রকৃত আলেম। তাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে জানা না থাকায় তিনি বলেন, আমার জানা নেই।

[৩৮] *মুসনাদে ফেরদাউসে* দাইলামি এটি বর্ণনা করেছেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, ...الصبر من এটি যয়িফ হাদিস।

বাইহাকি *শুআবুল ইমানে* এটি হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি হিসেবে মওকুফভাবে বর্ণনা করেন। যেমনটি আল্লামা মুনাবির ব্যাখ্যাকৃত *জামে সগিরে* আছে: ৪/২৩৪। সেখানে হাদিসের শেষাংশটি এমন فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ مَاتَ الْجَسَدُ। (মাথা কেটে ফেললে পুরো দেহের মৃত্যু ঘটে।)

[৩৯] এভাবেও বর্ণিত আছে যে, মুত্তাকি ব্যক্তির জবানে লাগাম পরানো থাকে। সে যা ইচ্ছা তা বলে না। দেখুন ইমাম আবু যায়েদ কায়রাওয়ানিকৃত *জামে* নামক কিতাবের ১৬৯ নং পৃষ্ঠা।

রিসালাতুল মুসতারশিদিনের আলজেরীয় কপিতে উপরের বাক্যটি এভাবে আছে,

وَمَنْ أَطَاعَ لَمْ يَصْنَعْ إِلَّا مَا يُرِيْدُهُ مِنْهُ.

'যে আল্লাহর আনুগত্য করে, সে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু করে না'।

যদি মানুষের মাঝে আখেরাতের ভয় না থাকত, তাহলে দুনিয়ার চিত্র তোমরা অন্যরকম দেখতে। (অর্থাৎ, যার যা-ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে সমস্ত পৃথিবীতে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত।)

নিজের চিন্তা-ভাবনার প্রতি লক্ষ রাখো। অন্যের দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও।[৪০] একটি কথা আছে,

---

[৪০] **কাজি ইয়ায এবং জনৈক গিবতকারী**

সুফিয়ান ইবনে হুসাইন ওয়াসেতি বলেন, আমি বসরার কাজি ইয়াস ইবনে মুআবিয়া মুযানির নিকট-তিনি একজন তাবেয়ি ও প্রবাদতুল্য মেধার অধিকারী ছিলেন- এক ব্যক্তির মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। তখন তিনি আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সিন্ধু, হিন্দুস্তান, তুরস্ক? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমার কাছ থেকে রোমক, সিন্ধী, হিন্দুস্তানি ও তুর্কিরা নিরাপদ থেকে গেল। আর তোমার মুসলিম ভাই নিরাপদ থাকতে পারল না? সুফিয়ান বলেন, এরপর থেকে আমি কখনো অন্যের দোষ দেখিনি এবং কারও গিবতও করিনি।

ঘটনাটি হাফেয ইবনে কাসির *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে কাজি ইয়াজের জীবনবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। (৯/৩৩৬)

ইমাম ইবনে ওহাবের গিবতের প্রতিকার স্বরূপ দিরহাম সদকা করা

মুহাদ্দিস, ফকিহ, আবেদ, যাহেদ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব আলকুরাশি মিসরি, যিনি ইমাম মালেক, লাইস, সুফিয়ান সাওরি ও অন্যান্যদের শিষ্য ছিলেন। ১৯৭ হিজরিতে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তার জীবন বৃত্তান্ত আলোচনায় এসেছে, 'ইবনে ওহাব বলেন, আমি কারও গিবত করলে নিজের উপর একদিন রোযা রাখা আবশ্যক করে নিয়েছিলাম। কিন্তু (শাস্তি হিসেবে) একসময় তা আমার কাছে সহজ মনে হল। তখন আমি আমার দ্বারা কারও গিবত হলে দিরহাম সদকা করা শুরু করলাম। এটি যখন আমার কাছে কঠিন লাগল, আমি গিবত করা ছেড়ে দিলাম।' (দেখুন আল্লামা কাজি ইয়াজের *তারতিবুল মাদারিক* : ৩/২৪০)

কারও মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তার চোখে মানুষের এমন দোষ ধরা পড়ে যা তার নিজের মাঝে রয়েছে। কিংবা সে যে খারাপ কাজ করে তা অন্য কাউকে করতে দেখলে তাকে ঘৃণা করে। অথবা সে তার সঙ্গীকে কষ্ট দেয়। কিংবা মানুষের ব্যাপারে অনর্থক কথা বলে।

নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে তা ব্যবহার করো[৪১] এবং আল্লাহর কাছে তাকদিরের পরিবর্তনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করো।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَفْرَحْ بِالْغِنَى وَلَا تَقْنَطْ بِالْفَقْرِ وَلَا تَحْزَنْ بِالْبَلَاءِ وَلَا تَفْرَحْ بِالرَّخَاءِ فَإِنَّ الذَّهَبَ يُجَرَّبُ بِالنَّارِ.

> হে আদম সন্তান, সচ্ছলতায় উৎফুল্ল হয়ো না, দারিদ্র্যে হতাশ হয়ো না। বিপদ-আপদে দুঃখ করো না,[৪২] সুখ-

---

[৪১] অর্থাৎ, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ো না। কারণ জ্ঞান-বুদ্ধির নির্দিষ্ট কিছু সীমা আছে যেখানে গিয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি অন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তোমার কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহ যে সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে বলেছেন সেগুলো গ্রহণ করার পর সকল বিষয়ে নিজেকে তাঁর সামনে সঁপে দেওয়া এবং পরিণামে তিনি তোমার জন্য প্রাপ্তি বা বঞ্চনা যা-ই লিখে রেখেছেন, সেক্ষেত্রেও সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে ন্যস্ত করা। কারণ তিনি তোমার প্রতি তোমার চেয়ে অধিক দয়াশীল এবং তোমার ভালো-মন্দের বিষয়ে তোমার চেয়ে অধিক অবগত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের পাঁচটি আয়াতে এই একই কথা পুনরায় বলেছেন, 'আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।'

[৪২] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ভাল কিংবা মন্দ যে অবস্থায় আমার সকাল হোক আমি পরোয়া করি না। কারণ, আমি যা ভালো কিংবা খারাপ মনে করছি, তাতে আমার জন্য কোনো কল্যাণ রয়েছে কিনা তা আমি জানি না।

(ইমাম আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন *আল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল* ১:১৪৯।)

স্বাচ্ছন্দ্যে অত্যধিক আনন্দিত হয়ো না। কারণ স্বর্ণকে আগুনে পুড়িয়েই পরখ করা হয়।[৪৩]

---

[৪৩] সুখ-দুঃখ উভয়টিই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তবে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে নেয়ামত ও সুখ দিয়ে যে পরীক্ষা করেন, সে পরীক্ষাটি বান্দার জন্য অধিক কঠিন হয়ে থাকে।

অর্থাৎ, আগুনে পুড়িয়ে স্বর্ণ কতটুকু ভেজাল বা খাঁটি তা পরীক্ষা করা হয়। *কামুস* প্রণেতা আল্লামা ফিরোজাবাদি বলেন, বান্দা শুকরিয়া আদায় করে কিনা, এটা দেখার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে নেয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কখনো বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন সে সবর করে কিনা দেখার জন্য। সুতরাং তাঁর দান করা কিংবা না করা, দুটোই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তাই কোনো মুসিবতে পড়লে সবর করা আর অনুগ্রহ ও নেয়ামত লাভ করলে শোকর আদায় করা।

মনে রাখতে হবে, ধৈর্যধারণ শুকরিয়া আদায়ের চেয়ে সহজ। তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নেয়ামত দানের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে যে পরীক্ষা করেন, সে পরীক্ষাটি আসলে কঠিন পরীক্ষা। এজন্য উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিপদ-আপদের মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা করা হলে আমরা ধৈর্যধারণ করতাম আর খুশি ও আনন্দ দ্বারা পরীক্ষা করা হলে আমরা ধৈর্যধারণ করতাম না। আলি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, পার্থিব জীবনে যাকে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে, অথচ তার জানা নেই, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করছেন, তাহলে তো সে (শয়তানের) প্রতারণার শিকার হলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তোমাদের ভালো ও মন্দের মাধ্যমে পরীক্ষা করব এবং আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

মানুষের জীবনে আসা আটটি অবস্থা

খুব ভালোভাবে জেনে রাখো যে, মানুষের জীবন সমসময় অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না। কারও অবস্থা সবসময় একরকম থাকে না। বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। জীবনে সুখ-শান্তি ও সফলতা যেমন থাকে, তেমনি থাকে দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতা। মানুষকে দুনিয়ার জীবনে আটটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তিতে কবি সেই আটটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

ثَمَانِيَةٌ تَجْرِيْ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ   وَلَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ يَلْقَى الثَّمَانِيَةَ

سُرُوْرٌ وَحُزْنٌ، وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ   وَعُسْرٌ وَيُسْرٌ، ثُمَّ سُقْمٌ وَعَافِيَةٌ

প্রতিটি মানুষের জীবনে আটটি অবস্থা আসে, তাকে অবশ্যই সেগুলোর মুখোমুখি হতে হয়- সুখ, দুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদ, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, অসুস্থতা এবং সুস্থতা।

নিশ্চয় নেক বান্দাকে বিপদ-আপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।[৪৪] তাই নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন না দিলে, খাহেশাত বর্জন না করলে এবং বিপদাপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ না করলে তুমি কখনো কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পারবে না।

জ্ঞানীগণ বলেন: সর্বদা এক অবস্থায় থাকা অসম্ভব

[৪৪] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। তারপরও তিনি তোমাদের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন, যেভাবে তোমরা স্বর্ণকে আগুনে পুড়িয়ে পরীক্ষা করে থাকো। তোমাদের কেউ কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খাঁটি সোনা হয়ে বের হয়। সে ওই ব্যক্তির মতো যাকে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গুনাহ থেকে মুক্তি দান করেন। আর কেউ স্বর্ণ হয়ে তো বের হয়, তবে তার মাঝে কিছু খাদ থেকে যায়। তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো যার মাঝে কিছু সন্দেহের বীজ থেকে যায়। (অর্থাৎ, কিছু গুনাহ থেকে যায়)। আর কেউ কেউ আগুনের ভাটি থেকে ভেজালে পূর্ণ কালো স্বর্ণ হয়ে বের হয়। তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো যে সম্পূর্ণ ফেতনার শিকার। (*মুসতাদরাকে হাকেম,* ৪:৩১৪।

ইমাম হাকেম বলেন, এটি সহিহ সনদের হাদিস, তবে ইমাম বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবি হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

জান্নাতি ও জাহান্নামিদের জন্য হাদিয়া

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ *ফাওয়ায়েদ* নামক গ্রন্থের ৩২ নং পৃষ্ঠায় বলেন: আল্লাহ তায়ালা যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, হাদিয়াস্বরূপ তার কাছে বিভিন্ন বালা-মুসিবত আসতে থাকে। আর যাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, হাদিয়াস্বরূপ তার কাছে খাহেশাতের বস্তু আসতে থাকে।

সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা সবই মেহমান

ইমাম আবুল ওফা ইবনে আকিল *ফুনুন* নামক গ্রন্থে বলেন, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত হচ্ছে মেহমান। শোকর তাঁর মেহমানদারি। বিপদাপদও মেহমান। সবর তাঁর মেহমানদারি। সুতরাং তুমি চেষ্টা করবে মেহমানরা যেন তোমার মেহমানদারিতে খুশি হয় এবং বিদায় নেওয়ার সময় তোমার উত্তম চিন্তা ও কর্মের সাক্ষী হয়।

বিপদাপদের ইতিবাচক দিক

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুমিন বান্দাদের উপর আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদ আপতিত করেন। তখন তারা তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়। একনিষ্ঠভাবে তাঁর হুকুম পালন করে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। শুধু তাঁর কাছে আশা করে। তাদের অন্তরগুলো তখন তাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকে। এভাবে তারা আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহমুখিতা এবং শিরকবিহীন ইমানের মিষ্টতা ও ইমানের স্বাদ লাভ করে। আর এগুলো অসুস্থতা, ভয়, অভাব-অনটন কিংবা জান-মালের ক্ষতি-ইত্যাদি বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়ার চেয়ে কতই না বিরাট নেয়ামত! বিপদাপদের সময় খাঁটি মুমিনরা যে নেয়ামত লাভ করে, তা এত বিরাট যে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। প্রত্যেক মুমিন তার ইমান অনুযায়ী এই নেয়ামত লাভ করে থাকে।

বিপদাপদ বান্দাকে পরীক্ষার জন্য আগুনের চুল্লিস্বরূপ-এর সুফলও সে ভোগ করবে

শায়খ আবদুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হে বৎস, বিপদ তোমাকে ধ্বংস করার জন্য আসেনি। বরং বিপদাপদ এসেছে তোমার ধৈর্য ও ইমানকে পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং বিপদ হচ্ছে চুল্লিস্বরূপ, যেখানে কামার তার লোহা পুড়িয়ে লোহার জং দূর করে। এই আগুনে পুড়ে তুমি হয় খাঁটি সোনা হয়ে বের হবে কিংবা খাদ বা ময়লা হয়ে বের হবে। যেমনটি কবি বলেন,

سَبَكْنَاهُ وَ نَحْسَبُهُ لُجَيْنًا فَأَبْدَى الْكِيْرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيْدِ

আমরা তাকে খাঁটি রূপা মনে করে আগুনে দিয়েছিলাম। আগুনে পোড়ার পর দেখা গেল তা নিম্নমানের লোহা।

জেনে রাখো, যদি বালা-মুসিবত না থাকতো, তাহলে বান্ধা অহংকারী, উদ্ধত ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যেত। বালা-মুসিবতের মাধ্যমে বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা এসব মন্দ স্বভাব থেকে রক্ষা করেন এবং তার ভেতরে যেসব নাপাকি আছে তা থেকে পবিত্র করেন।

ফরয বিধানগুলো আদায়ে সচেষ্ট হও। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> ارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ.

> আল্লাহ তায়ালার বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকো, দেখবে তুমি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছো। আর তিনি তোমার জন্য যা

সেই সত্তা কতইনা দয়ালু যিনি বিপদাপদের মাধ্যমে বান্দার প্রতি রহম করেন এবং নেয়ামত দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। কবি বলেন,

> قَدْ يُنْعِمُ اللهُ بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ ﴿﴾ وَيَبْتَلِي اللهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنِّعَمِ

> বিপদ বড়ো হলেও কখনো কখনো আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে নেয়ামত দান করেন আর কোনো কোনো কওমকে নেয়ামত দ্বারা পরীক্ষা করেন।

তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকা সবচেয়ে বড়ো ইবাদত

আবুল ওফা ইবনে উকাইল বলেন, ভালো করে জেনে রাখো যে, সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ইবাদত এবং কঠিন ও কষ্টকর ইবাদত। এদিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সতর্ক করেছেন। কোনো কোনো কাজের পরিণতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হয়তো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করবে অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করবে অথচ তা তোমাদের জন্য মন্দ। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না। (ইবনে মুফলিহ হাম্বলিকৃত *আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ,* ২: ১৯৩, ২০০, ২০৪)

কিছু হারাম করেছেন, তা থেকে দূরে থাকো, সবচেয়ে মুত্তাকি হতে পারবে।[৪৫]

---

[৪৫] যে হারাম থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাকে হালাল রিযিক দান করেন

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে হালালের মাঝে হারাম থেকে বেঁচে থাকার পর্যাপ্ত উপকরণ রেখেছেন। আল্লাহর অসংখ্য বান্দা রয়েছেন যারা আল্লাহর ভয়ে হারাম থেকে বেঁচে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে হালাল রিযিক দান করেন। আর হারাম ও হালাল গ্রহণের মাঝে ব্যবধান কেবল এক মুহূর্তের, একটি দিন কিংবা কিছু সময়ের। শায়খ আতাউল্লাহ ইস্কান্দারি র. কী সত্য কথাই না বলেছেন! বান্দা আল্লাহর সঙ্গে নগদ মুআমালা করবে আর তিনি তার প্রতিদান বাকিতে প্রদান করবেন-আল্লাহ তায়ালা এমন নন। আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ এ থেকে পবিত্র। একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনুন, এটি শুনলে আপনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দানের চিত্র অবলোকন করতে পারবেন। সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আলি ইবনে আবদুল্লাহ দিমাশকি। মৃত্যু ৮১৫ হিজরি। তিনি লিখেন, বাদশা বদরুদ্দিন ইউসুফ মাহমানদার ইবনে আমির সাইফুদ্দিন আবুল মাআলি ইবনু রামাহ, যিনি মাহমানদারুল আরব নামে পরিচিত, তিনি বলেন, কায়রোর গভর্নর আমির সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ শারজি আমাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

'একবার মিশরে আমি এক ব্যক্তির নিকট মেহমান হয়েছিলাম। তিনি আমাদের মেহমানদারি করলেন এবং আমাদের খুব সম্মান করলেন। তার গায়ের রং ছিল তামাটে বর্ণের। তিনি একজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন। তার সন্তানরা যখন এলো, দেখলাম তারা সবাই খুব সুন্দর, ফর্সা। তখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কি আপনার সন্তান? এরা ফর্সা আর আপনি কালো!? তখন তিনি বললেন, তার আম্মা ফিরিঙ্গি (ফ্রেঞ্চ)। বাদশা নাসির সালাহুদ্দিনের জমানায় আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন আমি তাকে পেয়েছিলাম। আমরা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তাকে কীভাবে পেলেন? তখন তিনি বললেন, এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমি বললাম আমাদেরকে ঘটনাটি শোনান।

তখন তিনি বললেন, আমরা এই শহরে কাতানের সুতার চাষ করেছিলাম। এই সুতা কাটতে এবং পরিষ্কার করতে আমাদের ৫০০ দিনার খরচ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন আমার সে টাকা উঠছিল না। কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিল, এগুলো শামে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করো। তাই আমি শামে নিয়ে গেলাম, কিন্তু সেখানেও ৫০০ দিনারের বেশি মূল্য পাওয়া যাচ্ছিল না। লোকেরা বলল, তাড়াহুড়া না করে বাকিতে বিক্রি করো। এতে হয়ত তোমার পরিশ্রমের টাকা উঠে আসবে। তখন আমি ছয় মাসের জন্য কিছু বাকিতে বিক্রি করে দিলাম। আর কিছু আমার কাছে রেখে দিলাম। একটি দোকান ভাড়া নিলাম। ছয় মাস কখন শেষ হবে এই অপেক্ষা করছি। আর ধীরে ধীরে বিক্রি করছি। এভাবে আমি দোকান চালাতে লাগলাম। একদিন কী হল, আমার সামনে দিয়ে একজন সৈনিকের স্ত্রী গেল। ফিরিঙ্গি নারী। ফিরিঙ্গি নারীরা বাজারে পর্দা ছাড়া ঘুরত। সে আমার দোকানে এল কাতান কেনার জন্য। আমি তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তার কাছে কাতান বিক্রি করলাম। কিন্তু দাম কম রাখলাম। সে চলে গেল। কিছুদিন পর সে আবার আমার দোকানে এলো। আমি তার কাছে কাতান বিক্রি করলাম। এবার দাম আরও কম রাখলাম। এভাবে সে কয়েক দিন আমার কাছে আসতে আসতে বুঝে ফেলল যে, আমি তাকে ভালোবাসি। তখন আমি তার সঙ্গে আসা বৃদ্ধা মহিলাকে বললাম, আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। আপনি আমার জন্য কিছু একটা করুন। বৃদ্ধা মহিলা বিষয়টি তাকে জানালো। কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে আমাদের তিনজনের মধ্যে একটি চুক্তি নির্ধারিত হল যে, আমি তাকে ৫০ টি শামি দিনার দেব। বিনিময়ে সে আমার কাছে আসবে। তিনি বলেন, তারপর আমি ৫০ টি শামি দিনার ওজন করে বৃদ্ধা মহিলার কাছে দিলাম। বৃদ্ধা বলল, আপনি জায়গা প্রস্তুত করুন। আমরা রাতে আপনার কাছে আসব।

তখন আমি গিয়ে আমার সাধ্যমত তার মেহমানদারির জন্য খাবার-পানি ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করলাম। আমার বাড়িটি ছিল সমুদ্রের তীরে। গ্রীষ্মকাল ছিল। তাই আমি ছাদের উপর বিছানা পাতলাম। যথাসময়ে সে চলে আসলো। একসঙ্গে খাবার-দাবার সেরে নিলাম। রাত গভীর হয়ে এলো। আমরা খোলা আকাশের নিচে শুয়ে পড়লাম। চারদিকে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল। আকাশের তারকাগুলো যেন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। তখন আমার মন আমাকে বলল মুসাফির হয়েও তোমার কি আল্লাহকে লজ্জা হয় না?

এভাবে খোলা আকাশের নিচে সমুদ্রের তীরে তুমি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছো, তাও এক খ্রিস্টান নারীর সাথে? তোমার উপর তো ইহকালিন ও পরকালিন জাহান্নামের আযাব অবধারিত হয়ে যাচ্ছে। আমি তখন মনে মনে তওবা করে বললাম, হে আল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আপনাকে লজ্জা করে এবং আপনার শাস্তির ভয়ে আজ রাতে আমি এই খ্রিস্টান নারী থেকে নিজেকে পবিত্র রাখলাম। তারপর ভোর পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে থাকলাম।

ভোরে সে ঘুম থেকে উঠল এবং রাগ করে চলে গেল। আমি আমার দোকানে গেলাম। আজ আবার সেই নারী বৃদ্ধা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে রাগী চেহারা করে আমার পাশ দিয়ে গেল। তাকে দেখতে তখন চাঁদের মত লাগছিল। আমি আবার তার প্রেমে পড়লাম। মনে মনে বললাম, তুমি এমন কোন আল্লাহর অলি যে এই নারীকে হাতছাড়া করছো? তুমি কি জুনায়েদ বাগদাদি নাকি সারিয়্য সাকাতি? তারপর আমি আবার বৃদ্ধার পিছু পিছু গিয়ে বললাম, দয়া করে আবার আরেকটি রাতের ব্যবস্থা করুন। তখন সে হযরত ইসা মাসিহের কসম খেয়ে বলল, না। সম্ভব নয়। তবে এবার ১০০ দিনার লাগবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। তারপর আমি আমার দোকানে গিয়ে ওজন করে ১০০ দিনার দিয়ে দিলাম। সে দ্বিতীয়বারের মতো রাতে আমার কাছে এলো। আমার আবার প্রথম দিনের মতো অবস্থা হলো। আমি তার কাছ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখলাম এবং আল্লাহর ভয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। প্রথম দিনের মতো সে আজও ভোরে উঠে চলে গেল এবং আমিও আমার দোকানে চলে এলাম। একদিন সে আমার দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে কথা বলল। আমি আবার তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তখন বলল, ইসা মাসিহের কসম! ৫০০ দিনারের কমে তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না। ৫০০ দিনার দিয়ে মিলিত হও নাহয় আফসোস করতে করতে মারা যাও। আমি রাজি হয়ে গেলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম প্রয়োজন হলে দোকানের সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে হলেও আমি তার সঙ্গে মিলিত হব। যদি আমার জান কুরবান করতে হয় তাতেও আমার কোনো পরোয়া নেই।

আমি এসব চিন্তা করছিলাম। এমন সময় বাজারে ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, হে মুসলমানগণ, আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝের চুক্তির মেয়াদ শেষ। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত আমরা এখানকার মুসলমানদের সময় দিচ্ছি যাতে তারা তাদের সবকিছু গুছিয়ে তাদের দেশে ফিরে যায়। তখন তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি দ্রুত ব্যবসাপাতি গুটিয়ে নিলাম। পাওনা টাকা উসুল করে সেখান থেকে চলে এলাম।

আমি কিছু ভাল পণ্য সংগ্রহ করলাম। তারপর আক্কা শহর ছেড়ে এলাম। কিন্তু আমার মন তখনো সেই ফিরিঙ্গি নারীর জন্য অস্থির ছিল।

আমি দামেশকে চলে এসে এখানকার বাজারে সেই পণ্যগুলো ভালো দামে বিক্রি করলাম। সন্ধি চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যবসা খুব লাভজনক হল। আল্লাহ তায়ালা খুব সুন্দর উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমার উপর অনুগ্রহ করলেন। আমি এখানে দাসী ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক ব্যস্ততা আমাকে সেই ফ্রেঞ্চ নারীর কথা ভুলিয়ে দিতে লাগলো। আর আমি ব্যবসায় ভালভাবে ডুবে গেলাম।

দেখতে দেখতে তিন বছর চলে গেল। ইতোমধ্যে হিত্তিনের ঘটনা সংঘটিত হল। বাদশা নাসির আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্র উপকূলের অনেকগুলো শহর জয় করে নিলেন। একদিন তার জন্য আমার কাছে একটি দাসি চাওয়া হলো। তখন আমার কাছে সুন্দরী একটি দাসী ছিল। আমি তাকে ১০০ দিনার দিয়ে ক্রয় করেছিলাম। বাদশার লোকেরা আমাকে ৯০ দিনার পরিশোধ করলো। সেদিন কোষাগারে না থাকায় দশ দিনার বাকি রয়ে গেল। কারণ তিনি সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছিলেন। এ ব্যাপারে তারা বাদশার সঙ্গে পরামর্শ করল। তখন বাদশা বললেন, তাকে বাইতুল মাল (সরকারি কোষাগার)-এ নিয়ে যাও। সেখানে যে সমস্ত ফ্রেঞ্চ নারীরা বন্দি আছে তাদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে ১০ দিনারের পরিবর্তে তাকে নিয়ে যেতে বল। তখন আমি বাইতুল মালে এসে সেই ফিরিঙ্গি নারীকে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললাম। আমি তাকে দেখিয়ে বললাম, আমাকে এই নারীকে দিন। আমি তাকে নিয়ে বাড়ি এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? সে বলল, না। আমি বললাম, আমি তোমার সেই আশেক যার সঙ্গে তোমার এমন এমন মুহূর্ত কেটেছিল। তুমি আমার কাছ থেকে এত এত স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছিলে এবং পরবর্তীতে তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ৫০০ দিনার দাবি করেছিলে। অথচ আমি এখন তোমাকে মাত্র ১০ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলাম। তখন সে বলল, আপনি আপনার হাত বাড়ান, আমি কালেমা পড়ব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। এভাবে সে ইসলাম গ্রহণ করল। সে খুব ভাল একজন মুসলিম নারীতে পরিণত হয়েছিল।

আমি তাকে কসম দিয়েছিলাম যে, বিবাহ না করে আমি তাকে স্পর্শ করব না। আমি কাজি সাদ্দাদের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তিনি খুব বিস্মিত হলেন। আমাদের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। সেই রাতে আমাদের মিলন হলো। সে গর্ভধারণ করলো।

এই ঘটনার কয়েক মাস পর রোমক বাদশার দূত কয়েদিদের নিতে এলো। তাদের সঙ্গে বাদশার একটি চুক্তি হলো। চুক্তির ভিত্তিতে যে সমস্ত নারী-পুরুষ বন্দি ছিল তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো। কেবল আমার কাছে থাকা সে রয়ে গেল। তখন তারা তার সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল। তার অনেক খোঁজাখুঁজি করল; কিন্তু পেল না। ইত্যবসরে কেউ একজন তাদের সংবাদ দিয়ে দিয়েছিল যে, সে আমার কাছে আছে। তখন তারা আমার কাছে তাকে ফেরত চাইল। বাধ্য হয়ে আমি বাদশার দরবারে হাজির হলাম। আমি তখন খুব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাঝে ছিলাম। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার কী হয়েছে? কী সমস্যা বলুন, আমি বললাম বাদশার দূত এসেছে। সকল বন্দিদের নিয়ে গেছে। আমার কাছে তোমাকে ফেরত চেয়েছে। তখন সে বলল, কোনো সমস্যা নেই। আপনি আমাকে বাদশার কাছে নিয়ে চলুন। তিনি বলেন, আমি তাকে নিয়ে বাদশা নাসিরের দরবারে উপস্থিত হলাম। তার দূত তখন তার ডান পাশে উপবিষ্ট ছিল। আমি বললাম, এই সেই নারী, যে আমার কাছে ছিল। তখন বাদশা এবং দূত তাকে বললেন, তুমি কি তোমার দেশে ফিরে যাবে নাকি তোমার স্বামীর কাছে থাকবে? তোমাকে এবং অন্যদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তখন সে বাদশাকে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং গর্ভধারণ করেছি। এই যে আপনারা আমার পেটের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আর কোনো ফিরিঙ্গির কাছে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো ফিরিঙ্গি আমাকে ভোগ করতে পারবে না।

তখন দূত তাকে ইচ্ছাধিকার দিয়ে বলল, এই মুসলমান তোমার কাছে বেশি প্রিয় নাকি তোমার সেই সৈনিক স্বামী? সে তখন বলল, আমার যা বলার ছিল, একটু আগে আমি তা বাদশাকে বলেছি। দূত তখন তার সঙ্গে থাকা অন্যান্য ফিরিঙ্গিদের বলল, তোমরা তার কথা শুনে রাখো। তারপর দূত আমাকে বলল, আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যান। তখন আমি তাকে নিয়ে চলে এলাম। একটু পর তিনি আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তার মা তার জন্য আমার কাছে কিছু আমানত পাঠিয়েছে। আর বলেছে, আমার মেয়েটি বন্দি আছে। বন্দি অবস্থায় সে হয়ত কাপড়-চোপড়ের অভাবে খুব কষ্ট করছে। নোংরা ও ময়লা অবস্থায় আছে। তাই আমি চাই, এই বাক্সটি নিয়ে তুমি

তিনি যেসব বিধান তোমার উপর ফরজ করেছেন সেগুলো যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করো, তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ তথা ইবাদতগুজার বান্দায় পরিণত হবে।[৪৬] যে তোমার প্রতি দয়াশীল তার বিরুদ্ধে এমন কারও কাছে অভিযোগ করো না, যে তোমার প্রতি দয়াশীল নয়।

তাকে দেবে। তিনি বলেন, তখন আমি বাক্সটি নিয়ে বাড়ি এলাম। বাড়ি এসে বাক্সটি খুলে দেখলাম, আমার কাছ থেকে নেওয়া তার সেই পোশাকটি তাতে রাখা আছে। সাথে দেখলাম, সেই যে আমি তাকে দুটি পুটলি দিয়েছিলাম, যার একটিতে ছিল ৫০ দিনার আর অপরটিতে ১০০ দিনার। আমি তাকে যেভাবে দিয়েছিলাম সেগুলো সেভাবেই আছে।

এই হলো আমার ঘটনা। আর তোমরা যে বাচ্চাগুলো দেখছো এগুলো তারই সন্তান। সে এখনো জীবিত আছে আর এই খাবার সে-ই প্রস্তুত করেছে। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, এই ঘটনা এবং এ জাতীয় অন্যান্য ঘটনা থেকে একটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে নিজেকে হারাম থেকে পবিত্র রাখে, আল্লাহ তাকে হালাল রিযিক দান করেন। আমাদের মহান রব তো এমন, বান্দা তাঁর সঙ্গে নগদ মুআমালা করলে, তিনি তা নিজের কাছে রেখে দেন এবং পরবর্তীতে তাকে তার প্রতিদান দান করেন। (দেখুন *মাতালিউল বুদু-র ফি মানাযিলিস সুরূর*: ১:২০৭।)

[৪৬] **নিজের অবস্থান ও স্তর অনুযায়ী দিনি দায়িত্ব পালন করা**

আল্লামা ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা র. বলেন, প্রত্যেক বান্দার উপর তার অবস্থান ও স্তর অনুযায়ী আল্লাহর বন্দেগি করা আবশ্যক। আর এ বন্দেগি দ্বারা সাধারণ ইবাদত উদ্দেশ্য নয়, যেগুলো সবার উপর ফরয, আবশ্যক।

যেমন, একজন আলেমের দায়িত্ব হলো নবিজির সুন্নত ও দিনি ইলমের প্রচার-প্রসার করা। অথচ যে আলেম নয়, জাহেল, তার উপর এমন দায়িত্ব নেই। দিনি ইলমের প্রচার-প্রসার করতে গিয়ে কোনো আলেম কষ্টের সম্মুখীন হলে তার উচিত সবর ও ধৈর্যধারণ করা।

একজন শাসকের দায়িত্ব হলো, হক প্রতিষ্ঠা করা, মানুষকে হকের অনুসারী বানানো। এক্ষেত্রে যেসব বিপদ আসবে, সেগুলো ধৈর্যের সঙ্গে মুকাবেলা করা এবং সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। কিন্তু একজন মুফতির উপর এসব দায়িত্ব নেই।

ধনীর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, ধন-সম্পদের বিধানগুলো পালন করা। সম্পদের হক আদায় করা। গরিব এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে সক্ষম ব্যক্তির উপর আল্লাহ তায়ালার বিধান হলো মুখ ও হাত দ্বারা সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। অক্ষম ব্যক্তির উপর এমন বিধান আরোপ করা হয়নি।

একদিন ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাদিআল্লাহু আনহু জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বিষয়ে বয়ান করলেন। তখন এক মহিলা তাকে বলল, এসব দায়িত্ব আমাদের থেকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমাদের উপর যদিও হাত দিয়ে তরবারি চালানো, জবানকে ব্যবহার করা আবশ্যক নয়, কিন্তু অন্তর দিয়ে ভালকে ভাল মনে করা, সৎকাজকে সৎ মনে করা এবং অসৎকাজকে অসৎ মনে করা তোমাদের উপর আবশ্যক। (এটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের সর্বশেষ স্তর)।

তখন মহিলাটি বলল, আপনি যথার্থ বলেছেন, জাযাকাল্লাহু খাইরান (আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন)।

শয়তান আল্লাহর অনেক বান্দাকে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, সে তাদের সামনে নামাজ, যিকির, তেলাওয়াত, রোযা, দুনিয়াবিমুখতা, সংসারবিমুখ হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া-ইত্যাদি ইবাদতসমূহকে সুশোভন করে উপস্থাপন করে। শয়তান তাদের এসব ইবাদতে মগ্ন রেখে উপরিউক্ত বিধানসমূহ কিংবা শরিয়তের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত রাখে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তখন তারা সেগুলো পালনের কথা চিন্তাও করে না। অথচ নবিগণের প্রকৃত ওয়ারিশ হক্কানি উলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে, এসব বিধান থেকে তাদের পালানোর কোনো পথ নেই। এজন্য যে, দিন বলা হয় আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করাকে। সুতরাং যে আল্লাহ তায়ালার অবশ্য পালনীয় হুকুমসমূহ বর্জন করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা যে দিন ও শরিয়ত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই দিন ও শরিয়ত এবং তাঁর ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ সম্পর্কে যে অবগত, সে দেখতে পাবে, সমাজে যাদের দিনদার বুজুর্গ মনে করা হয়- অর্থাৎ, সংসারত্যাগী ইবাদতগুজার- তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক দিনের মদদ ও নুসরাত করে থাকে।

তার মধ্যে কিসের দিন, তার মধ্যে কিসের কল্যাণ যে আল্লাহর বিধানসমূহ লঙ্ঘিত, হদসমূহ নষ্ট, দিনকে পরিত্যাক্ত ও রাসুলের সুন্নত থেকে মানুষকে বিমুখ হতে দেখে, অথচ সে ঠান্ডা মনে নিশ্চুপ বসে থাকে? সে তো বোবা শয়তান!

দিনের জন্য সবচেয়ে বড়ো আপদ তো তারা যারা নিজেদের পানাহার, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষমতা ও রাজত্ব সব ঠিকমতো চলতে থাকলে দিনের কি ক্ষতি হলো না হলো-তা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা থাকে না। তারা তা পরোয়া করে না।

তাদের মধ্যে যারা আরেকটু উঁচু স্তরের দিনদার ও ভালো মানুষ তারা শুধু একটু দুঃখ প্রকাশ করে, কান্নার ভান করে!

কিন্তু তাদের কারও যদি সামান্য আর্থিক ক্ষতি হয়, কিংবা সম্মান হানি হয়, তখন তাদের পেরেশানি, দৌড়ঝাঁপ ও জান-মাল ব্যয় হয় দেখার মতো। অন্যায় ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের জন্য আল্লাহ মানুষকে যে মুখ, হাত ও অন্তর দিয়েছেন, নিজের ক্ষতি ঠেকাতে সেগুলো তখন তারা সব একসঙ্গে ব্যবহার করে। এরা আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে পড়ে যায় ও তাঁর ক্রোধে নিপতিত হয়। সেই সঙ্গে ইহজীবনে সবচেয়ে বড়ো যে বিপদে আক্রান্ত হয়, তা হচ্ছে তাদের অন্তর মরে যায়। কারণ অন্তর পূর্ণরূপে জীবিত থাকলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য ইমানদারের ক্রোধ হয় সবচেয়ে ভীষণ। সে তখন পূর্ণরূপে দিনের নুসরাত ও সাহায্য করে।

অন্যায়ে নেক বান্দার নিরব থাকা আযাবের কারণ

ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালা এক ফেরেশতাকে নির্দেশ পাঠিয়ে বলেন যে, অমুক অমুক জনপদ ধসিয়ে দাও। তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রভু! কীভাবে সম্ভব, তাদের মধ্যে তো আপনার অমুক ইবাদতগুজার বান্দা আছেন? তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাকে সবার আগে ধসিয়ে দাও। কারণ আমার নাফরমানি দেখে তার চেহারার রং কোনোদিন পরিবর্তন হয়নি।

আবু উমর ইবনে আবদুল বার *তামহিদ* নামক গ্রন্থে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা একজন নবির কাছে ওহি পাঠিয়ে বললেন, আপনি অমুক দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গকে বলে দিন, তোমার দুনিয়াবিমুখতার প্রতিদানে আমি তোমাকে দুনিয়াতেই আত্মিক প্রশান্তি দান করেছি। আর দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে তুমি মান-সম্মান ও ইজ্জত লাভ করেছো, কিন্তু তোমার উপর আমার যে সকল হক ছিল সেগুলোর ব্যাপারে তুমি কী করেছো? তখন সে বলল, প্রভু! আমার উপর আপনার কোন হক? আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি কি কাউকে বন্ধু বানিয়েছ কিংবা শুধু আমার জন্য তুমি কারও সঙ্গে শত্রুতা রেখেছ?

এই হাদিসটি বিশিষ্ট জাহেদ মুহাম্মদ ইবনে আবুল ওরদ-এর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনায় ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*: ১০/৩১৬ ও খতিব বাগদাদিকৃত *তারিখে বাগদাদ*: ৩/২০২-এ। অবশ্য সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। যেমনটি আল্লামা মুনাবি *জামে সগিরের* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফায়জুল কাদিরে* বর্ণনা করেছেন, ৩/৭০।

'সেটি ইমানের সর্বনিম্ন স্তর'– এ কথার ব্যাখ্যা

ইমাম কারাফি, যিনি তার সময়ে মালেকি মাযহাবের অন্যতম শায়খ ছিলেন। তিনি তার কিতাব *ফুরুক*-এ (৪:২৫৬) বলেন, প্রশ্ন: আমরা দেখতে পাই যে, অনেক মজবুত ইমানদার ব্যক্তিও হাত ও জবানের দ্বারা অসৎকাজে বাধা প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়ে। তবে তাদের এই অক্ষমতা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার আযমত ও বড়োত্বের ঘাটতি আছে এবং তাদের ইমান শক্তিশালী নয়। এটি ইমান শক্তিশালী হওয়ার পরিপন্থি নয়। কেননা, কোনো একটি নেক কাজ করতে না পারা ইমানের মধ্যে ত্রুটি থাকা আবশ্যক করে না। তাহলে নবিজির এই হাদিসের ব্যাখ্যা কী?

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি তা না পারে তাহলে মুখে বাধা দেবে। যদি তাও না পারে তাহলে অন্তরে অন্তরে সেই কাজটিকে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর।

আলোচ্য হাদিসে ইমান দ্বারা উদ্দেশ্য কর্মসংক্রান্ত ইমান। বিশ্বাস ও অন্তরগত ইমান নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ইমান নষ্ট করার মতো নন।

অর্থাৎ, বাইতুল মাকদিসমুখী হয়ে তোমরা যে নামাজগুলো আদায় করেছো, সেগুলো নষ্ট করার মতো নন। আয়াতে নামাজকে ইমান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি যে, নামাজ হলো একটি আমল। ইমান তথা বিশ্বাস নয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইমানের সত্তরটি শাখা আছে। সর্বোচ্চ শাখা হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই-এই সাক্ষ্য দেওয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। (এই হাদিসে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলার কাজকে ইমান আখ্যা দেওয়া হয়েছে, অথচ এটি কোনো ইমান ও আকিদা-বিশ্বাস নয়, বরং এটি স্রেফ একটি আমল। একটি কাজ।)

আর অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের হাদিসে ইমানকে যে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, সেই হাদিসটি মূলত তখন সহিহ হবে যখন তা দ্বারা কর্মসংক্রান্ত ইমান উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। আমরা বলব, সবচেয়ে শক্তিশালী কর্মসংক্রান্ত ইমান হলো, কোনো অন্যায় কাজে হাত দিয়ে বাধা দেওয়া। কেননা, হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার দ্বারা অন্যায় কর্মটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। এর চেয়ে আরেকটু নিম্ন স্তরের ইমান হচ্ছে মুখে বাধা দেওয়া। কেননা, হাতের চেয়ে মুখের প্রভাব সাধারণত কম হয়ে থাকে। মুখে বলার দ্বারা অন্যায় সবসময় বন্ধ হয় না। তবে অনেক সময় হয়। আর সবচেয়ে দুর্বল স্তরের ইমান হচ্ছে, অন্যায় কাজকে মনে মনে ঘৃণা করা। এর দ্বারা অন্যায় বন্ধ হয় না। তবে মনে মনে ঘৃণা করার কারণে তার মধ্যে সাধারণ ইমানটুকু রয়ে যায়।

অর্থাৎ, অন্তরস্থিত বিশ্বাসের অর্থে ইমানের স্বরূপ তখনো তার মাঝে অবশিষ্ট থাকে। তখন হাদিসে বলা 'ইমানের দুর্বলতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ইসলাম দুর্বল হয়ে যাওয়া ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা না থাকা। যেমনটি নিম্নোক্ত হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে:

"بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ...". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

'ইসলাম অপরিচিতরূপে এসেছে। অচিরেই আবার সেই অপরিচিতরূপে ফিরে যাবে।'

সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করবে, তাহলে তার খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। উবাদা ইবনে সামেত রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে বৎস, মানুষের হাতে যা কিছু আছে, অর্থাৎ মানুষ যা কিছুর মালিক, তা থেকে নির্মুখাপেক্ষী হও, কেননা এটাই প্রকৃত সচ্ছলতা। লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকো। নিজের প্রয়োজন ও অভাবের কথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রকাশ করো না। কেননা, এটাই দরিদ্রতা।[৪৭] এমনভাবে নামাজ পড়ো যেন এটাই তোমার শেষ নামাজ।[৪৮]

'অন্যায় কাজ বাধা দেওয়া' হাদিসে অন্তরের দুর্বলতা উদ্দেশ্য নয়। কারণ সে তার যতটুকু সামর্থ্য ছিল ততটুকু দায়িত্ব পালন করেছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। (দেখুন শায়খ মুহাম্মদ আলি আল-মালিকিকৃত *তাহজিবুল ফুরুক* ৪/২৮৩-২৮৪ নং পৃষ্ঠা।)

[৪৭] **প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় দারিদ্র্য**

মানুষের যে অতৃপ্ত মন! কামনা করতেই থাকে। এটা নিন্দনীয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরের এই অভাব ও দারিদ্র্য থেকেই আল্লাহ তায়ালার কাছে মুক্তি কামনা করতেন। তিনি তাঁর দরবারে প্রার্থনা করে বলতেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাই।

আর সম্পদের অভাবের অর্থে যে দারিদ্র্য শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটি ভিন্ন বিষয়। এরূপ দারিদ্র্যের ফজিলত বিষয়ক অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বড়ো বড়ো ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও আলেম এই দারিদ্র্যকে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইমাম আহমদ ও অন্যদের সূত্রে আমার আলোচনাটি দেখুন *সাফাহাতুম মিন সাবরিল উলামা আলা শাদাইদিল ইলমি ওয়াত তাহসিল* গ্রন্থের ১৪৫-১৫৩ নং পৃষ্ঠায়। আলোচনাটি আছে গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের তৃতীয় অধ্যায়ে দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনের উপর ধৈর্যধারণে উলামায়ে কেরামের ঘটনাবলি শীর্ষক শিরোনামে। মোল্লা আলি কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির *মিরকাতুল মাফাতিহ* গ্রন্থের ৩:১৪০ নং পৃষ্ঠাটিও দেখে নিতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে বাহ্যিক সচ্ছলতার সঙ্গে প্রকৃত দারিদ্র্যের একটি চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরছি। এক ব্যক্তি ইবরাহিম বিন আদহাম রহিমাহুল্লাহকে বললেন, হে আবু ইসহাক, আমি চাই যে আপনি আমার পক্ষ থেকে এই জুব্বাটি গ্রহণ করুন। তখন তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি সচ্ছল হও, তাহলে আমি তোমার এই হাদিয়াটি গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু তুমি যদি দরিদ্র হও তাহলে আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব না। লোকটি বলল, আমি সচ্ছল। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার সম্পদের পরিমাণ কত? সে বলল, দুই হাজার দিনার। ইবরাহিম বিন আদহাম তাকে বললেন, তুমি কি চাও না যে তা ২০০০ এর পরিবর্তে ৪০০০ হয়ে যাক? লোকটি বলল, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, তাহলে তো দেখছি তুমি নিজেই দরিদ্র। আমি তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে পারব না।

[৪৮] পাঁচজন বিস্ময়কর আবেদের ঘটনা

প্রতিটি ইবাদতকে জীবনের শেষ ইবাদত মনে করে করার অসংখ্য ঘটনা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে পাওয়া যায়। ইতিহাস ও জীবনীমূলক গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালার এমন অনেক ইবাদতগুজার বান্দার কথা আছে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের ঘটনা আমরা এখন আপনার সামনে তুলে ধরছি। এরা সকলে প্রায় সমকালিন ছিলেন। কাছাকাছি শহরে বসবাস করতেন।

১. ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ *তারিখুল ইসলাম* নামক গ্রন্থে (৪:১৪৪), হাফেয ইবনে হাজার *তাহজিবুত তাহযিবে* (৬:২৮৬) মহান তাবেয়ি, বিশিষ্ট আবেদ আব্দুর রহমান ইবনে আবি নুউম বাজালির (মৃত্যু ১০০ হিজরি) জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'বুকাইর ইবনে আমের বলেন, যদি তাকে বলা হতো মালাকুল মউত আপনার রুহ কবজ করতে এসেছেন, তাহলে তার অবস্থার মাঝে কোনো পরিবর্তন আসতো না।'

২. *তারিখুল ইসলামে* (৪:৪৫) বিশিষ্ট তাবেয়ি দুনিয়াত্যাগী মুসলিম বিন ইয়াসার বসরি রহিমাহুল্লাহ-এর (মৃত্যু ১০০ হিজরি) জীবনবৃত্তান্তে এসেছে,

মুসলিম বিন ইয়াসারের পুত্র আবদুল্লাহ থেকে ইবনে আওন রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করে বলেন যে, আবদুল্লাহ বলেন,

'তার পিতা যখন নামাজে দাঁড়াতেন, মনে হতো কেউ কোনো কিলক গেঁথে রেখেছে। না এদিকে নড়ছেন না ওদিকে। গায়লান ইবনে জারির বলেন,

মুসলিম ইবনে ইয়াসার যখন নামাজ পড়তেন তখন তাকে ফেলে রাখা কাপড়ের মতো নিষ্প্রাণ মনে হতো।

ইবনে শাওযাব বলেন, মুসলিম বিন ইয়াসার নামাজে দাঁড়ানোর সময় ঘরের লোকদের বলতেন, তোমরা কথা বলো, সমস্যা নেই। কারণ (নামাজে মনোনিবেশের কারণে) আমি তোমাদের কথা শুনতে পাই না। বর্ণিত আছে, একবার তার ঘরে আগুন লাগলে ঘরের লোকেরা সবাই দৌড়াদৌড়ি করে আগুন নেভালো। পরবর্তীতে যখন তাকে আগুন লাগার কথা বলা হলো, তখন তিনি বললেন, আমি তো কিছুই টের পাইনি। মাদি বিন সুলাইমান থেকে এ ঘটনাটি সাইদ বিন আমের দাবয়ি বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম মানসুর ইবনে যাজান ছাকাফি ওয়াসিতি রহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত আলেম ছিলেন। মৃত্যু ১৩১ হিজরি। ইমাম যাহাবির *তাযকিরাতুল হুফফাজ* গ্রন্থে (১/১৪১) তার জীবনী আলোচনায় এসেছে, তার ছাত্র হুশাইম বলেন, তাকে যদি বলা হতো, মালাকুল মউত আপনার রুহ কবয করতে আপনার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তখন তার অতিরিক্ত কোনো আমল করার প্রয়োজন ছিল না।

৪. ইমাম মানসুর ইবনে মুতামার সুলামি কুফি। মৃত্যু ১৩২ হিজরি। *তাযাকিরাতুল হুফফাজ* গ্রন্থে (১:১৪২-১৪৩) তার জীবনী আলোচনায় এসেছে, তাঁর শিষ্য সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আপনি মানসুরকে নামাজ পড়তে দেখলে বলতেন, তার প্রাণবায়ু মনে হয় এখনই উড়ে যাবে।

৫. কুফার বিশিষ্ট আবেদ মুহাম্মদ ইবনে সুকা গানাবি, যিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও তার স্তরের অন্যান্যদের শায়খ। *তাহযিবুত তাহযিব* নামক কিতাবে (৯:২০৯) তার জীবনবৃত্তান্তে এসেছে, সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, কুফায় এমন তিনজন ব্যক্তি ছিলেন যদি তাদের কাউকে বলা হতো, আপনি আগামীকাল মারা যাবেন; তাহলে (শেষ প্রস্তুতি হিসেবে) তাদের অতিরিক্ত কোনো আমল করার প্রয়োজন ছিল না। সেই তিনজন হলেন মুহাম্মদ বিন সুকা, আমর বিন কায়েস মুলাই, আবু হাইয়ান ইয়াহইয়া বিন সাইদ তামিমি। আর মুহাম্মদ বিন সুকার পক্ষে তো আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করাই অসম্ভব ছিল।

এ বিষয়ে ইমাম আব্দুল হাই লাখনবির একটি মূল্যবান ও অতুলনীয় কিতাব রয়েছে। কিতাবটির নাম *ইকামাতুল হুজ্জাহ আলা আন্নাল ইকছার ফিত তাআব্বুদি লাইসা বি-বিদআহ*। কিতাবটির উপর আমার কাজ করার এবং তা প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে। আপনি চাইলে তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

খুব ভালভাবে জেনে রাখো, তাকদিরের ভাল-মন্দের উপর পূর্ণ ইমান না আনা পর্যন্ত তুমি কিছুতেই ইমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে না।[৪৯]

---

[৪৯] **তাকদিরের উপর ইমানের স্বাদ কীভাবে লাভ হয়?**

এ বিশ্বাস তোমার মাঝে থাকতে হবে যে, ভালো-মন্দ যা কিছু হয় সব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়। তোমাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, যা তোমার তাকদিরে লেখা আছে তা অবশ্যই তোমার কাছে আসবে। আর যা লেখা নেই তা তুমি কিছুতেই লাভ করতে পারবে না। ইমাম আহমদ *মুসনাদ*-এ (৫:৩১৭) এবং ইমাম আবু দাউদ *তার সুনান*-এ (৪:২২৫) বিখ্যাত তাবেয়ি ওয়ালিদ ইবনে উবাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

'আমি আমার বাবা উবাদাহ বিন সামেত রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে এলাম, তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমি তার মৃত্যুর আশঙ্কা করছিলাম। আমি বললাম, বাবা আমাকে কিছু উপদেশ দিন; আমার জন্য একটু কষ্ট করুন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে বসাও। (তাকে বসানো হলো)। তখন তিনি বললেন, হে বৎস, তুমি যতক্ষণ তাকদিরের ভাল-মন্দের উপর পূর্ণ ইমান না আনবে, কিছুতেই ততক্ষণ ইমানের স্বাদ এবং ইমানের হাকিকত লাভ করতে পারবে না।

আমি বললাম, আব্বাজান, তাকদিরের ভালো-মন্দের বিষয়টি আমি কীভাবে জানব? তিনি বললেন, বৎস! যা তোমার কাছে না আসার, তা কখনোই তোমার কাছে আসবে না। আর যা তোমার কাছে আসার তা অবশ্যই তোমার কাছে আসবে।

বৎস! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। তারপর কলমকে নির্দেশ দিয়েছেন, লিখো। তখন কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু লিখল। বৎস, তুমি যদি তাকদিরের উপর ইমান ছাড়া মৃত্যুবরণ করো তাহলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পিছনে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস, আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি সেগুলো স্মরণ রেখো,

আল্লাহর হুকুমসমূহ রক্ষা করো, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। সবসময় তাকে স্মরণ রেখো, তাহলে তাঁকে তোমার সামনে দেখতে পাবে। প্রার্থনা করলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। সাহায্য চাইলে তাঁর কাছে চেয়ো। আর জেনে রেখো, সবাই মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তাহলে আল্লাহ যতটুকু তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন, কেবল ততটুকু উপকার করতে পারবে। আর তারা সবাই মিলে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তাহলেও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যদি তোমার তাকদিরে ক্ষতি লিখে রাখেন, তাহলে তিনি যতটুকু ক্ষতি লিখে রেখেছেন, তারা কেবল তোমার ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকদিরের কাগজ শুকিয়ে গিয়েছে। (ইমাম তিরমিযি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদিসটি হাসান সহিহ।)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন ইমান প্রার্থনা করি যা সবসময় আমার অন্তরের সাথে লেগে থাকবে, যাতে আমার ইয়াকিন হয়ে যায় যে, আপনি আমার তাকদিরে যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু ছাড়া কোনো বিপদ আমাকে আক্রান্ত করতে পারবে না এবং আপনি আমার জন্য যতটুকু রিযিক বণ্টন করে রেখেছেন ততটুকু রিজিকে যাতে আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি।

তাকদিরে বিশ্বাসেই জীবনের সুখ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য, ইলম ও আমলে তাঁর সদৃশ ইমাম ইবরাহিম হারবি বলেন, সকল জাতির জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তাকদিরে সন্তুষ্টি ছাড়া কারও জীবন সুখের হয় না। (*তারিখে বাগদাদ*, ৬:৩০)।

গুনাহের জন্য তাকদিরকে দোষারোপ না করা

এ বিষয়ে সতর্ক থাকা যে, কোনো গুনাহ করার সময় তাকদিরের ওজর পেশ না করা। কেননা, এ ক্ষেত্রে তাকদির কোনো দলিল নয়। তাকদির তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানির বিষয়ে বাধ্য করে না। তোমাকে ইচ্ছাশক্তি দান করা হয়েছে। সেই ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে তুমি স্বেচ্ছায় তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছো এবং খাহেশাত ও হারাম বিষয়সমূহের দিকে ঝুঁকেছো। তারপর নিজের

সাফাই গাওয়ার জন্য তাকদিরের যুক্তি পেশ করছো, এসব কিছু ঘটার জন্য আল্লাহকে দায়ি করছো। এভাবে তুমি তাকদিরের উপর সমস্ত দোষ চাপাতে চাচ্ছ এবং নিজেকে গুনাহের কলঙ্ক থেকে মুক্ত রাখতে চাইছো।

যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে তুমি বুঝতে ভুল করেছো এবং বিশ্বাসের ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছো। নাউযুবিল্লাহ!

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আবু আবদির রহমান, মানুষ জিনা করে, শরাব পান করে, চুরি করে, হত্যা করে, তারপর বলে এসব কিছু তো পূর্ব থেকেই আল্লাহর জানা ছিল, আমাদের তো এগুলো থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিলো না।' তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেগে গিয়ে বললেন,

'সুবহানাল্লাহ কি আশ্চর্য কথা! আল্লাহ তায়ালার ইলমে ছিল যে তারা এসব করবে, কিন্তু তাঁর এই জানা তাদের এসব কাজ করতে বাধ্য করেনি। বান্দার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার ইলমের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তোমাদেরকে ছায়া দানকারী আকাশের মতো, ঘিরে রাখা জমিনের মত। তোমরা যেমন আসমান ও জমিন থেকে বের হতে পারবে না, অনুরূপ আল্লাহ তায়ালার ইলম থেকেও কখনো বের হতে পারবে না। যেমনিভাবে আসমান ও জমিন তোমাদের পাপ কাজ করতে বাধ্য করে না, তেমনিভাবে আল্লাহর ইলমও তোমাদের এসব করতে বাধ্য করে না।'

তারপর ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'গুনাহ করে তা স্বীকারকারী আমার কাছে আল্লাহর সেই বান্দার চেয়ে উত্তম, যে সারাদিন রোযা রাখে, সারারাত ইবাদত করে আর একথা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি ইনসাফ করেন না।'

(আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুরতাজা ইয়ামানিকৃত *আল-মুনইয়া ফি শারহি কিতাবিল মিলাল ওয়ান নিহাল।* পৃষ্ঠা নং ২৫-২৬। সেই কিতাবে হযরত ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুর এই কথাটির কিছু অংশ মারফুভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে সহিহ হলো এটি তার কাছ থেকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত। যদি কথাটি তার দিকে সম্পৃক্ত করা সঠিক হয়ে থাকে যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি।'

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ কথাটিতে তাকদিরকে সর্বোত্তমরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

তাকদিরের লিখন অপরিবর্তিত

তাকদিরের লিখন যে খণ্ডানো যায় না, ইসলামি ইতিহাসের পাতায় এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। সেখান থেকে আমরা পাঁচটি ঘটনা তুলে ধরছি। এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারব, আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দার কল্যাণ ও মুক্তির ফায়সালা করলে কারও ক্ষমতা নেই তার কোনো ক্ষতি করার। আর তিনি কারও অকল্যাণ ও ধ্বংসের ফায়সালা করলে কারও ক্ষমতা নেই তাকে রক্ষা করার। সে কোনো সুরক্ষিত দুর্গে থাকলেও তা তাকে বাঁচাতে পারবে না।

প্রথমে আমরা এমন চারটি ঘটনা উল্লেখ করব যেখানে মানুষ কারও ক্ষতি করতে চেয়েছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যার ফলে সে বেঁচে যায়। আর যারা তার ক্ষতি করতে চেয়েছিল, তারা ব্যর্থ হয়।

তাকদিরের কাছে হাজ্জাজের হার মানা

১. মহান তাবেয়ি আবদুর রহমান বিন আবি নুউম বাজালি আলকুফি। মৃত্যু ১০০ হিজরি। অধিক ইবাদতগুজার ছিলেন। তিনি কেমন ইবাদত করতেন, সে প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে তার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার *তাহযিবুত তাহযিব* নামক গ্রন্থে (৬:২৮৬) তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

মুহাম্মদ বিন ফুযাইল তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান এক বছর আগেই হজের ইহরাম বেঁধে ফেলতেন। তিনি লাব্বাইক বলতে থাকতেন আর বলতেন, যদি এই হজ মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ যেন তা সম্পন্ন করার তাওফিক না দেন।

কুফাবাসীদের মধ্যে তিনি বিখ্যাত আলেম ছিলেন। সর্বদা ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতেন। জামাজিমের সময়* তিনি হাজ্জাজের কাছে গেলেন। তাকে নসিহত করলেন। হাজ্জাজ তাকে কতল করার জন্য পাকড়াও করল এবং অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করল। পনেরো দিন পর্যন্ত তাকে তার ভেতর আটকে রাখল। (খাবার-পানি কিছুই দেওয়া হলো না)। তারপর হাজ্জাজ তার লাশ বের করে দাফন করার নির্দেশ দিল। কারাকক্ষের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতেই তারা দেখল তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে হাজ্জাজ তখন তাকে বলল, আপনি মুক্ত। আপনার যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

এ ঘটনা থেকে অবশ্য আমরা আরেকটি বিষয় জানতে পারলাম। আর তা হচ্ছে, উত্তম ও বিশেষ গুণাবলির কারণে মানুষ অনেক সময় জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা পায়। হাজ্জাজ সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয়, তার মাঝে সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন ও রক্তপাতের স্বভাব ছিল। কিন্তু সে অনেক সময় জ্ঞানী-গুণীদের কদর করত। তাদের মূল্যায়ন করত। সম্মান জানাত। জ্ঞান ও গুণের কারণে তাদের ছেড়ে দিত। যেমনটি এই ঘটনায় আমরা দেখতে পেলাম। হাজ্জাজের জীবনীতে এমন আরও ঘটনা আছে।

এবার 'জামাজিম'-এর পরিচয় স্পষ্ট করা যাক। 'জামাজিম' কী?

*জামাজিমের ঘটনা যে প্রত্যক্ষ করেছে সে আর জীবনে কোনোদিন হাসেনি

জামাজিম দ্বারা 'দিরুল জামাজিম'-এর ঘটনা উদ্দেশ্য। ইরাকে কুফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম দিরুল জামাজিম। যেখানে মুসলিম উম্মাহর জালেম শাসক হাজ্জাজের সঙ্গে আবুদর রহমান বিন আশআশের যুদ্ধ হয়েছিল। ইতিহাসের গ্রন্থগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, এই ঘটনাটি ৮৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। যেমন ইবনে আসিরকৃত *কামেল:* ৪/৪৬৭। এই জায়গাটির নাম 'দিরুল জামাজিম'। কারণ, এই যুদ্ধে এত পরিমাণ মানুষ নিহত হয়েছিল যে, সর্বত্র শুধু মানুষের কর্তিত মাথা পড়ে ছিল। ইবনে আশআশের সঙ্গে থাকা অনেক উলামায়ে কেরাম, সালেহীন ও বুজুর্গ ব্যক্তি এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। কুফার প্রধান কারি বিখ্যাত তাবেয়ি তালহা বিন মুসাররিফ এক লোককে হাসতে দেখে বললেন, সে জামাজিমের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করলে কখনো হাসত না। সেখানে যে পরিমাণ মুসলমান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে, তা দেখার পর কারও হাসি আসার কথা না।

২. আবু নুআইমের *হিলয়াতুল আউলিয়া* (১০/৩২৪), খতিব বাগদাদির *তারিখে বাগদাদ* (৭/১০১), ইবনুল জাওযির *মুনতাযাম* (৬/২১৭) গ্রন্থে বিখ্যাত বুজুর্গ, মুহাদ্দিস বুনান হাম্মাল বাগদাদির জীবনী আলোচনায় এসেছে।

বুনান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদান ইবনে সাইদ, আবুল হাসান, তিনি হাম্মাল নামে পরিচিত ছিলেন। হাসান বিন আরাফাহ (মৃত্যু ২৫৭ হিজরি) ও অন্যান্যদের শাগরিদ ছিলেন। তাদের থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত,

দুনিয়াবিমুখ ও ইবাদতগুজার ছিলেন। বংশগত দিক থেকে বাগদাদি হলেও মিশরের বাসিন্দা ছিলেন। সর্বস্তরের মানুষের নিকট তার বিশেষ মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি বাদশার কাছ থেকে কখনো কিছু গ্রহণ করতেন না। ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতায় ছিলেন অতুলনীয়।

আবু আলি রু-জাবারি ছিলেন অনেক বড়ো মাপের একজন সুফি। তিনি বলেন, মিশরে আমার আসার একমাত্র কারণ ছিল বুনান হাম্মালের ঘটনাটি জানা। তাকে সিংহের সামনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু সিংহ তাকে খাবে তো দূরের কথা, স্পর্শও করেনি। সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ছিল, তিনি মিশরের শাসক ইবনে তালুনকে-মৃত্যু ২৭০ হিজরি- সৎকাজের আদেশ দিয়েছিলেন। এতে ইবনে তালুন তার প্রতি ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে হিংস্র প্রাণীর সামনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। তখন তাকে সিংহের খাচার ভেতর নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু সিংহটি তার কাছে এসে শুধু তার ঘ্রাণ শুঁকে দেখে। তারপর তার কাছ থেকে সরে যায়। তার কোনো ক্ষতি করে না। তারপর যখন তাকে সিংহের খাঁচা থেকে বের করা হলো, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সিংহটি যখন আপনার কাছে এসে ঘ্রাণ শুঁকছিল, তখন আপনার কেমন লাগছিল? আপনার অনুভূতি কী ছিল?

তিনি বললেন, আমি তখন হিংস্র প্রাণীর ঝুটা ও তার লালার মাসআলায় উলামায়ে কেরামের যে এখতেলাফ আছে তা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। অর্থাৎ হিংস্র প্রাণীর ঝুটা ও তার লালা কি পবিত্র নাকি অপবিত্র?

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুবহানাল্লাহ। তাঁর অন্তর কি স্থির অবিচল! আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কত গভীর এবং গায়রুল্লাহ থেকে কী নির্মুখাপেক্ষী!

আল্লাহ তায়ালা বুনান হাম্মালকে ইবনে তালুনের মৃত্যুর পর আরও তেতাল্লিশ বছর জীবিত রেখেছিলেন। ৩১৩ হিজরিতে তিনি মিসরে ইন্তেকাল করেন। তিনি বলতেন, নির্দোষ ব্যক্তি সাহসী হয় আর যে দোষী, সে ভীতু হয়। মন্দ ব্যক্তি সবসময় ভয়ে থাকে।[৪৯]

সুবহানাল্লাহ! এই নেককার, মহান ব্যক্তিগণ এমন মহৎ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন যে, জালেম ও রক্তপিপাসু ব্যক্তিরাও বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাদের মর্যাদা দান করতে বাধ্য হতেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার না করে মুক্তি দিয়ে দিতেন।

বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক মুসতাফা সাদেক রাফেয়ি তার গ্রন্থ *ওহয়ুল কালাম*-এ (৩/৫০-৫৮) *সিংহ* শিরোনামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে তিনি এই ঘটনাটি তুলে ধরেছেন এবং তা থেকে অর্জিত উপদেশ ও শিক্ষা তুলে ধরে দেখিয়েছেন, সমাজে নেক, সৎ, প্রভাবমণ্ডিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুণী মানুষদের গুরুত্ব কত! তিনি এ সম্পর্কে সেখানে খুব মূল্যবান আলোচনা করেছেন। নির্বাচিত কিছু অংশ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

মুসতাফা সাদেক রাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

যে শহরে সহিহ দিন, রুহানি কামালাত (আত্মিক পূর্ণতা) এবং ঐশী আখলাক চরিত্রের অধিকারী কোনো মহান, সমৃদ্ধ মানুষ নেই, মূর্খতার দিক থেকে তা সেই শহরের ন্যায় যেখানে কোনো বই-পুস্তক নেই। যদিও সেই শহরের প্রত্যেক অধিবাসী আলেম হোক। সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার থাকুক। তথাপি এসব বই পুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার এমন মানুষের তুলনায় নগণ্য, যে সঠিক দিনের অনুসারী, আত্মিক পূর্ণতা ও সমুন্নত আখলাক-চরিত্রের অধিকারী। বই-পুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার দিয়ে এমন ব্যক্তিত্বের অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। কেননা বই-পুস্তক সঠিক হোক কিংবা ভুল, তার শেষ সীমা কিন্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি পর্যন্তই।

অধিকন্তু আত্মিক পূর্ণতা লাভকারী একজন মানুষের আত্মা যে কোনো বস্তুর হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। মানুষের উপর জ্ঞানের প্রভাবের চেয়ে তার প্রভাব বেশি হয়ে থাকে। কেননা মানুষ, তাকে দেখে কোনো কিছুর হাকিকত সম্পর্কে জানতে পারে। তার স্বরূপ বুঝতে পারে। তার জীবনটাই হচ্ছে একটি দাওয়াত। তার সিরাত হচ্ছে প্রকাশ্য সিরাত, যা মহৎ কর্মে পরিপূর্ণ।

মানুষ যদি দীর্ঘ দশ বছর মহৎ গুণাবলির তাৎপর্য ও অর্জনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে এবং এ বিষয়ে শত শত গ্রন্থ রচনা করে, তারপর গিয়ে আত্মিক পূর্ণতা লাভকারী, সমৃদ্ধ কোনো মানবের সাক্ষাৎ লাভ করে, তার সঙ্গে উঠাবসা করে। তার সাহচর্য গ্রহণ করে, তাহলে তিনি একাই তাদের জন্য সুদীর্ঘকাল আলোচনা পর্যালোচনার চেয়ে অধিক উপকারী সাব্যস্ত হবেন এবং শত সহস্র গ্রন্থের চেয়ে উত্তম পথপ্রদর্শক হবেন।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক আসমানি কিতাবের সঙ্গে একজন করে নবি পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি প্রতিটি শব্দকে বাস্তবে রূপদান করতে পারেন এবং

মানুষের ভেতরের শক্তিকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন। পাশাপাশি মানুষ যেন তাকে দেখে মানবিক গুণাবলি শিখতে পারে। কেননা, তিনি তাদের চেয়ে অধিক মানবিক গুণাবলির অধিকারী।

একজন কামেল ব্যক্তির আলামত হল, মানুষের মাঝে শুধু তার উপস্থিতি তার আমলের চেয়ে অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী হবে। যেন মানুষের আত্মার সঙ্গে তার আত্মার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি তাদের কাছে পিতৃতুল্য হবেন। তাকে দেখামাত্র যে কেউ অনেক বড়ো মনে করবে। আর এমন ব্যক্তির মাঝেই মানবীয় পূর্ণতা নিহিত থাকে। যেন তাকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে; সাধারণ মানুষের কাছে যা অসম্ভব, তা সম্ভব বলে প্রমাণ করার জন্য।

কঠিন রোগগুলো সাধারণত সংক্রামক হয়ে থাকে। এটি আল্লাহ তায়ালার এক বিস্ময়কর হেকমত। রোগীর কাছে যে আসে কিংবা তাকে যে স্পর্শ করে সেও সংক্রমিত হয়। প্রচণ্ড শক্তির বিষয়টিও অনুরূপ। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তার নেক বান্দাদের সৃষ্টি করেন এবং তাদের ভেতর থাকা তাকওয়ার শক্তিকে সংক্রামক করে দেন। অসুস্থতা মানুষকে যেমন বিভিন্ন খাহেশাত থেকে ফিরিয়ে রাখে, তেমনি তাকওয়াও তাদেরকে যাবতীয় গুনাহ ও নাফরমানি থেকে ফিরিয়ে রাখে।

রোগ যেমন মানুষকে কমজোর ও দুর্বল করে দেয় তেমনি তাকওয়াও নফসে আম্মারাহ তথা খারাপ কাজের নির্দেশ দানকারী নফসকে কমজোর ও দুর্বল করে দেয়। তাকওয়ার শক্তি নফসকে এভাবে দুর্বল করতে করতে একপর্যায়ে শেষ করে দেয়। কুপ্রবৃত্তি বলতে তখন আর মানুষের মাঝে কিছু থাকে না। মানুষের মর্যাদা তখন অনেক গুণ বেড়ে যায়। সত্য ছাড়া আর কোনো কিছু তার মাঝে বাস করতে পারে না। কোনো সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে পারে না।

কোনো সমাজে যখন আত্মিক গুণাবলি সমৃদ্ধ কোনো পথপ্রদর্শনকারী না থাকে, সেই সমাজকে লাঠির ভয় দেখিয়ে খুব কমই সংশোধন করা যায়। বড়ো বড়ো আল্লাহর ওলি, বুজুর্গ, মহান নেতা, বীর সিপাহসালার, উলামায়ে কেরাম এবং তাদের মতো অন্য যারা আছেন, তাদের সবার ব্যাপারটি একরকম। অর্থাৎ, তারা সবাই নিজেদের ব্যক্তিত্ব, হেকমত ও প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকেন। তাদের সংস্পর্শে যারা আসে, তাদের সঙ্গে যারা মিশে, নিজেদের গুণাবলির দ্বারা তারা সে সকল সাধারণ মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

৩. ফাঁসির রায় দিতে গিয়ে মুক্তির রায় দিয়ে ফেলা

ইবনে হাজাম যাহেরির শিষ্য হাফেয হুমাইদি তার কিতাব *জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস*-এ (পৃ. ১১৮) লিখেন, ইবনে হাজামের পিতার নাম আবু উমর আহমদ বিন সাইদ বিন হাজাম। তিনি স্পেনের উযির ছিলেন। একদিন তিনি স্পেনের আমির মানসুর আবু আমের মুহাম্মদ বিন আবু আমেরের- মৃত্যু ৩৯২ হিজরি- এক সাধারণ বৈঠকে বসা ছিলেন। আমিরের সামনে তখন একটি দরখাস্ত এল। দরখাস্তে এক কয়েদির মা তার বন্দি ছেলের সঙ্গে দয়ার আচরণ করার অনুরোধ করেছিলেন। তার ছেলেকে আমির ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্য বন্দি করেছিলেন। কারণ সে তার দৃষ্টিতে মারাত্মক একটি অপরাধ করেছিল।

দরখাস্তটি পড়ে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সামনে তুমি সেই নালায়েকের কথা বলছ। তারপর তিনি কলম নিয়ে লিখতে চাইলেন, يُصْلَبُ (তাকে শূলে চড়ানো হোক।) কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি লিখে ফেললেন, يُطْلَقُ (তাকে মুক্ত করে দেওয়া হোক।) তারপর সেই কাগজটি উজিরের দিকে ছুড়ে মারলেন। উযির বাদশার স্বাক্ষর করা নির্দেশটি পড়ল। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে দায়িত্বশীল পুলিশ বরাবর লিখলো, তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। বাদশা তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা লিখতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি কী লিখছো? তখন উজির বললো, তাকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে ছেড়ে করে দেওয়ার আদেশ তোমাকে কে দিয়েছে? তখন তিনি বাদশাকে তার স্বাক্ষর করা সেই কাগজটি দেখালেন।

বাদশা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে শূলে চড়ানোর কথা লিখতে চেয়েছিলাম। আবার তিনি নতুন করে লিখে দিলেন। কিন্তু এবারও ভুল করলেন। শূলে চড়ানোর পরিবর্তে মুক্ত করার কথা লিখলেন। পরপর তিনবার তার এমন ভুল হলো। তখন তিনি বললেন, হাঁ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যাকে মুক্ত করতে চান তাকে আমি আটকে রাখতে পারব না।

কাজি ইবনে খাল্লিকান *ওফায়াতুল আয়ান* গ্রন্থে (৩:৩২৫) ইবনে হাজামের (মূল নাম: আলি ইবনে আহমদ) জীবনবৃত্তান্তে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেন।

৪. জল্লাদের তরবারির থেকে মুক্তি লাভ করা

বিখ্যাত অভিধানবিদ ইবনে দুরাইদের ছাত্র বসরার অধিবাসী আবুল হাসান রাব্বান মুহাম্মদ ইবনে ইমরান আবদি লিখেন,

বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ যখন আমের ইবনে হিত্তানকে-যিনি খারেজি ইমরান ইবনে হিত্তানের ভাই ও তার মাযহাবের অনুসারী- গ্রেফতার করে নিয়ে আসলো। তারপর তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল, তখন জল্লাদ তার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো। হাজ্জাজ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, বেশ্যা নারীর বাচ্চার গর্দান উড়িয়ে দাও।

আমের তখন মাথা উঠিয়ে হাজ্জাজকে বলল, হাজ্জাজ, তোমার পরিবার তোমাকে কুশিক্ষা দিয়েছে। মৃত্যুর পরে কী এমন কোনো গালি আছে যা থেকে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো? তুমি আমাকে যে গালি দিলে, সেই গালি যে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব না- তা তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে?

তখন হাজ্জাজ লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে ফেলল। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে আমেরকে বলল, আমি কি তোমার অনিষ্ট থেকে বেঁচে তোমার কাছ থেকে কোনো নেকি হাসিল করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন হাজ্জাজ তার জন্য একটি ঘোড়া ডেকে পাঠাল। সাথে কিছু অর্থকড়ি দিয়ে বলল, যাও, যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। তিনি তার কওমের লোকদের মাঝে ফিরে আসলে তারা বলল, এই ফাসেকের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, হাতকে মুক্তকারী ব্যক্তি হাতকে বেঁধে দিয়েছে, গর্দান মুক্তকারী ব্যক্তি তা তার তার কাছে বন্ধক হিসেবে রেখে দিয়েছে। এ কথা বলে তিনি আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। দশটিরও অধিক কবিতা পঙক্তি আবৃত্তি করলেন। যার সার কথা ছিল, তিনি নিমকহারামি পছন্দ করেন না।

এই ব্যক্তিটিকে দেখুন যাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তা প্রায় কার্যকর হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে আল্লাহ তায়ালা হত্যাকারীর মুখ থেকে বের হওয়া একটি ভুল শব্দের উসিলায় তাকে মুক্তি দান করলেন। এই শব্দটি তার মুক্তির এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার উসিলা হয়েছিল। প্রবাদ আছে, মৃত্যুর

নির্ধারিত সময়ই মানুষের জীবনের প্রহরী। অর্থাৎ নির্ধারিত সময় আসার আগ পর্যন্ত মৃত্যু নিজেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

এবার পঞ্চম ঘটনাটি শোনা যাক। এ ঘটনাটি আগের চারটি ঘটনা থেকে ভিন্ন। এখানে এক ব্যক্তি একজনকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তাই সে ধ্বংস হয়েছিল। আর তাকে বাঁচানোর চেষ্টাকারী ব্যক্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

৫. এক সেনাপতির ঘটনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানি সেনাবাহিনীর যারা বড়ো বড়ো কমান্ডার ছিলেন তাদের একজন আমাকে বলেন, তারা একবার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। প্রত্যেক সৈন্য একটি স্থান নির্ধারণ করে গর্ত খুঁড়ল। তারপর নিজেকে রক্ষা করতে সেখানে অবস্থান নিল। তাদের ব্যারাকগুলো পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সেনাপতি তাদের পাশ দিয়ে গেল। এক সৈন্যের ব্যারাক তার খুব পছন্দ হল। সে তার ভেতর অবস্থান নেওয়া সৈন্যটিকে বলল, তুমি সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাও। তারপর সেখানে তার পছন্দের একজনকে নিয়ে এল। সেই সৈন্যটি অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। যুদ্ধ শুরু হল, শত্রুরা কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো। বড়ো একটি গোলা এসে সেই ব্যারাকের উপর পড়ল। গোলার আঘাতে সেনাপতির প্রিয়জন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। আর সেই সৈন্যটি বেঁচে গেল। সে আরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিল।

সুবহানাল্লাহ! সেই সত্তা মহান যার ফায়সালা ও নিরাপত্তার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না।

এ ঘটনা পড়ে কেউ যেন এই ধারণা না করে যে, সর্তকতা অবলম্বন করে কোনো লাভ নেই। কারণ তা তাকদিরকে প্রতিরোধ করতে পারে না। তাকদিরকে প্রতিরোধ করা যাক বা না যাক সর্তকতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এটি ইসলামি শরিয়তের নির্দেশ। মহান তাবেয়ি মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ শিখখির-মৃত্যু ৯৫ হিজরি-বড়ো সুন্দর কথা বলেছেন। কারও অধিকার নেই যে, ছাদে গিয়ে এ কথা বলে নিজেকে ফেলে দেওয়া যে, আল্লাহ আমার তাকদিরে এমনটি লিখে রেখেছেন। বরং তার উচিত সতর্ক থাকা এবং চেষ্টা করে যাওয়া। এরপরও কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে তাকে মেনে নিতে হবে যে, তাকদিরের লিখন ছাড়া কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

সত্য বলবে, সত্যের উপর আমল করবে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অধিক নুর ও বিচক্ষণতা দান করবেন। যারা মানুষকে আদেশ করে, অথচ নিজে আমল করে না, তুমি তাদের মতো হয়ো না; তাহলে এর পাপ তোমার ঘাড়ে চাপবে এবং তুমি আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

> আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হচ্ছে, তোমরা যা করো না তা বলে বেড়ানো। (সুরা সফ, আয়াত নং ৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ وَعَظَ وَلَمْ يَتَّعِظْ وَزَجَرَ وَلَمْ يَنْزَجِرْ وَنَهٰى وَلَمْ يَنْتَهِ فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْخَائِبِيْنَ.

> যে অন্যকে উপদেশ দেয়, অথচ নিজে উপদেশ গ্রহণ করে না, অন্যকে সতর্ক করে অথচ নিজে সতর্ক হয় না, অন্যকে নিষেধ করে অথচ নিজে বিরত থাকে না, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট ব্যর্থদের অন্তর্ভুক্ত।[৫০]

ইমাম যাহাবি *তাজকিরাতুল হুফফাজে* (১:৬৪) মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহর জীবনী বর্ণনায় এই ঘটনাটি উল্লেখ করেন।

ইমাম যাহাবি *তারিখুল ইসলাম*-এ (৪:৫৫) দুনিয়াবিমুখ বিখ্যাত তাবেয়ি ফকিহ মুসলিম বিন ইয়াসার রহিমাহুল্লাহর-মৃত্যু ১০০ হিজরি- জীবনবৃত্তান্তে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, 'এমনভাবে আমল করো, যেন মনে হয়, এই আমলই তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এমন ব্যক্তির মতো করো, যে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা তাকদিরে লিখে রেখেছেন, এর বাইরে কিছু হবে না।'

[৫০] এ হাদিসটি আমি সহিহ, জইফ ও মওজু হাদিসের কিতাবগুলোতে খুঁজে পাইনি। আল্লাহ-ই এ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

জ্ঞানী ও মুত্তাকি ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে মিশবে না।[৫১]

বিচক্ষণ আলেম ছাড়া অন্য কারও সাহচর্য গ্রহণ করবে না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমাদের মধ্যে সঙ্গী হিসেবে কে উত্তম? তিনি বললেন,

مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ وَزَادَكُمْ فِيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ.

যাকে দেখলে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।[৫২] যার কথা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যার আমল তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৫৩]

---

[৫১] **আলেমদের মজলিস ব্যতীত সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন**

হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, উলামায়ে কেরামের মজলিসগুলো ছাড়া সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন। (ইবনে আবুল বারকৃত *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*, ১:৫১)

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরি রহমাতুল্লালি আলাইহি বলেন, কেউ যদি নবিদের মসজিদগুলো দেখতে চায় সে যেন আলেমদের মসজিদগুলোর দিকে তাকায়। (ইবনুল কায়্যিম জাওযিকৃত *মিফতাহু দারিস সাআদা* : পৃষ্ঠা নং ১২৯)

[৫২] **নেক বান্দাদের মজলিসের প্রভাব**

আর তা এ কারণে যে, অনুসরণীয় ও আদর্শবানদের কথা শ্রবণের চেয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দ্বারা মানুষ অধিক প্রভাবিত হয় এবং তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাহাবায়ে কেরাম এই নেয়ামত অধিক পরিমাণে লাভ করেছিলেন। যেহেতু তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন, তাকে খুব কাছ থেকে দেখতেন; তার সঙ্গে মিশতেন, তাই তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে মানবজাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, যাদেরকে মানুষের কল্যাণে বের করা হয়েছে।

নেককার ও অনুসরণীয় কোনো ব্যক্তির দর্শন লাভের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়। কারণ তার চোখে মুখে ও সর্বাঙ্গে, তার নীরবতা ও সরবতায়, নড়াচড়া ও স্থিরতায়, সবকিছুতে আল্লাহর নুর ও তাজাল্লির ঝলকানি থাকে। মহব্বত ও সাকিনা নামক প্রশান্তির শীতল ছায়া থাকে।

তাই তাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তার বাহ্যিক দর্শনই মানুষকে আল্লাহমুখী করে দেয়। এরাই ওই সমস্ত লোক যাদের দর্শন লাভে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

নেক বান্দাদের সান্নিধ্যের উপকারিতা

'উত্তম বন্ধু সে-ই, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়'-এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযি র. *নাওয়াদিরুল উসুল* গ্রন্থের ১৪০ নং পৃষ্ঠায় বলেন, এরা ওই সমস্ত লোক, যাদের উপর আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশিত। আল্লাহর নৈকট্যের ঝলক, তার মহিমার নুর, বড়োত্বের প্রভাব, মাহাত্ম্যের ভালোবাসা যাদের উপর ছেয়ে থাকে। তাই কেউ তাদের দিকে তাকালে তার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। কারণ সে তখন তার মাঝে ঊর্ধ্বালোকের বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পায়।

আর অন্তর হচ্ছে এ সকল বস্তুর খনি, নুরের আবাস। চেহারা অন্তরের রঙ্গে রঙিন হয়। অন্তরে আল্লাহর নুর থাকলে তা চেহারায় প্রকাশ পায়। তাই তাকে দেখলে তোমার নেক আমল ও তাকওয়ার কথা স্মরণ হবে। তার ভেতর থাকা আল্লাহ তায়ালার হুকুমের ইলম ও সেগুলোর মহিমা তোমার অন্তরে ছড়িয়ে পড়বে।

অন্তরে যখন প্রকৃত বাদশার নুর থাকে, তখন তা চেহারায়ও প্রকাশ পায়। অন্তর থেকে চেহারায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন তুমি সেই চেহারার দিকে তাকালে তোমার সত্য ও হকের কথা মনে পড়বে, দিনের পথে অবিচল থাকার মনোভাব তোমার মাঝে সৃষ্টি হবে।

অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা, বড়োত্ব ও মহত্ত্বের নুর থাকলে তা চেহারায় প্রতিফলিত হয়। সেই চেহারার দিকে তুমি তাকালে তোমার মাঝে আল্লাহর তায়ালার বড়োত্ব, মহত্ত্ব ও ক্ষমতার স্মরণ জাগ্রত হবে। কারও অন্তরে যখন আল্লাহ তায়ালার নুর থাকে, যা সকল নুরের উৎস, সেই নুরের দর্শন তোমাকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত রাখবে।

সুতরাং অন্তরের কাজ হচ্ছে তা চেহারাকে সিঞ্চিত করে এবং তাকে তাই পান করায়, যা অন্তর পান করে। অন্তরে যা থাকবে, চেহারায় তা-ই প্রকাশ পাবে, অন্য কিছু নয়। তাই অন্তরে যে নুরই থাকবে তা চেহারায় প্রকাশ পাবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.

এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন। (সুরা দাহর, আয়াত নং ১১)

বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা যখন মন উৎফুল্ল হয় এবং নুর দ্বারা যখন অন্তর আলোকিত হয়, তখন চেহারাও তার সাথে সাথে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এটাকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তাকে দেখার দ্বারা তোমার আল্লাহর কথা স্মরণ হবে এবং তিনি এটাকে আল্লাহর অলি হওয়ার আলামত বলেছেন।

মুনাবিকৃত *ফায়জুল কাদির*: ৩/৪৬৭।

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, সালাফে সালেহিন ও আকাবিরদের মাঝে এই গুণটি অনেক বেশি পরিমাণে ছিল। মানুষ তাদের দর্শন লাভ করে উপকৃত হওয়ার জন্য তাদের কাছে আসত। কারণ শুধু তাদের দেখার দ্বারাই অন্তর আলোকিত হয়ে যেত এবং অন্তরে নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হতো। দিনকে প্রিয় মনে হত এবং আল্লহর স্মরণ জাগ্রত হত।

আলেমদের মজলিসে গমনের উদ্দেশ্য

ইমাম ইবনুল জাওযি তাঁর কিতাব *সাইদুল খাতিরে* (২/৩০৩) বলেন, সালাফে সালেহিনের অনেকে আল্লাহর নেক বান্দাদের কাছে শুধু তাদের দিঙনির্দেশনা লাভ ও তাদের জীবন কাছ থেকে দেখার জন্য যেতেন। ইলম হাসিলের জন্য নয়। কারণ তাদের দিঙনির্দেশনা ও জীবনই তাদের ইলমের ফলস্বরূপ।

আবু তালেব মাক্কি *কুতুল কুলুব* গ্রন্থে বলেন, তারা বিভিন্ন শহরে উলামায়ে কেরাম ও নেক বান্দাদের যিয়ারত লাভ, তাদের এক নজর দেখা, বরকত হাসিল করা ও তাদের কাছ থেকে আদব শেখার জন্য যেতেন।

আবুল আব্বাস বারদায়ি বলেন, আমি হাসান বিন ইসমাইলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মজলিসে পাঁচ হাজারের অধিক মানুষ শরিক হত। তন্মধ্যে পাঁচশ-রও কম লোক তার কথা লিপিবদ্ধ করত। অন্যরা তার কাছ থেকে উত্তম আদব, আচরণ ও জীবনবিধি শিক্ষাগ্রহণ করত। (দেখুন ইবনুল জাওযিকৃত *মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল*, পৃষ্ঠা নং ২১০)

আহমদ বিন সালমান নাজ্জাদ বলেন, আমি আবু বকর বিন মুতাব্বিইকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বলের কাছে বারো বছর গমন করেছি। তিনি ছাত্রদের তার মুসনাদ পড়াতেন। আমি এই বারো বছরে একটি হাদিসও লিখিনি। আমি শুধু তার সিরাত, আখলাক ও আদব দেখার জন্য যেতাম।

আমরা এখন আপনার সামনে এমন এগারোজন ব্যক্তির নমুনা তুলে ধরব, যাদের চেহারা দেখলে মানুষের আল্লাহর কথা স্মরণ হত। মানুষ যাদের কাছ থেকে আদব ও শিষ্টাচার, জীবন চলার পথ ও পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করত এবং তাদের সাক্ষাৎ লাভে উপকৃত হত। আজ হাজার বছর পরে তাদের বিভিন্ন ঘটনা শুধু শুনেই আমরা উপকৃত হচ্ছি। তাহলে যারা তাদের সরাসরি দেখত, তারা কী পরিমাণ উপকৃত হত!

১. আমর ইবনে মাইমুন আওদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

উভয় যুগই পেয়েছিলেন। তবে নবিজির সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য তিনি অর্জন করতে পারেননি। তাই তিনি সাহাবি নন। তাবেয়ি। মুআয বিন জাবাল রা.-এর সঙ্গে ইয়ামান থেকে আগমন করে কুফায় বসবাস করতে থাকেন। আল্লাহর অনুগত নেককার বান্দা ছিলেন। এত দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন যে, একশবার হজ ও ওমরাহ করেছিলেন। তার ছাত্র আবু ইসহাক সাবিয়ি বলেন, তাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হতো। ৭৫ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (দেখুন, হাফেয ইবনে হাজারকৃত *তাহযিবুত তাহযিব*: ৮: ১০৯। ইমাম যাহাবিকৃত *ইবার*: ১: ৮৫ ও তারই *তাযকিরাতুল হুফফাজ*: ১: ৬৫।

২. ইবনে সিরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি

বিখ্যাত তাবেয়ি, ইমাম, ফকিহ, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন র.। মৃত্যু ১১০ হিজরি। তিনি তার মজলিসে বসা লোকদের সঙ্গে কথা বলতেন, তারাও তার সঙ্গে কথা বলত। তিনি হাসতেন। লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন; কিন্তু ফিকহ ও হালাল-হারাম বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত এবং একটু আগের অবস্থা তিনি ভুলে যেতেন। এমন মনে হত, যেন তিনি কখনো আগের অবস্থায় ছিলেনই না। তারা তার সামনে কারও মন্দ আলোচনা করলে তিনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল যা জানতেন তা আলোচনা করতেন।

তার দুই শিষ্য হিশাম বিন হিসান আযদি এবং আইয়ুব বিন কাইসান সাখতিয়ানি-দুজনই বসরার অধিবাসী-বলেন, আহলে কিবলা অর্থাৎ, মুসলমানদের জন্য নেকির আশা রাখতে তার চেয়ে বেশি আমি আর কাউকে দেখিনি। (ইবনে সাদকৃত *তাবাকাতে কুবরা*: ৭: ১৯৫, ১৯৭, ২০০)

যখন মৃত্যুর আলোচনা করতেন, যেন তার প্রতিটি অঙ্গ প্রাণহীন হয়ে পড়ত। বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ তাকে আল্লাহর যিকির ছাড়া অবস্থায় দেখেনি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকৃত *আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল*: ১/২০। ইমাম যাহাবিকৃত *তারিখুল ইসলাম*: ৪/১৯৪ এবং *তাযকিরাতুল হুফফাজ*: ১/৭৮।

৩. হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম হাসান বসরি রহমাতুল্লালি আলাইহি মহান তাবেয়ি ছিলেন। মৃত্যু ১১০ হিজরি। ইবনে সিরিন এবং তিনি সামসময়িক ও একই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ইবনে সিরিনের মতো তাকে দেখলেও আল্লাহর কথা স্মরণ হত।

ইউনুস বিন উবাইদকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, হাসান বসরির মতো আমল করে এমন কাউকে কি আপনি চিনেন? তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমল তো দূরের কথা, শুধু তার মতো কথা বলে এমন কাউকেও আমি চিনি না। তারপর তিনি তার বর্ণনা তুলে ধরে বললেন, হাসান বসরি কারও দিকে মনোনিবেশে করলে এমন চিন্তাযুক্ত ভাব নিয়ে করতেন, যেন এখনই কোনো প্রিয়জনের দাফন করে এসেছেন। বসলে এমনভাবে বসতেন, যেন তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। জাহান্নামের কথা আলোচনা হলে তাকে এত বিমর্ষ দেখাত যে, মনে হত জাহান্নামের আগুন শুধু তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

তার এক ছাত্র আশআস বিন আবদুল্লাহ বলতেন, আমরা হাসান বসরির মজলিস থেকে যখন বের হয়ে আসতাম, তখন আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়া এমনভাবে বের হয়ে যেত, আমরা তাকে কোনো গুরুত্বই দিতাম না।

ইউনুস বিন উবাইদ বলেন, কেউ যদি হাসানের দিকে শুধু তাকাত, তার কোনো আমল না দেখত, কখনো কোনো কথাও না শুনত, তাহলেও সে উপকৃত হত।

আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*: ২/১৫৮। ইবনে কাসিরকৃত *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৯/২৬৭।

মাতারুল ওয়াররাক বলেন, বিখ্যাত ফকিহ এবং আল্লাহর কালামের অনেক বড়ো আলেম জাবের বিন জায়েদ বসরার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু যখন হাসান বসরির আত্মপ্রকাশ ঘটল, তখন তাকে দেখে মনে হলো যেন তিনি আখেরাতের জগৎ থেকে এসেছেন। সেখানে স্বচক্ষে যা যা দেখেছেনে, সেগুলো এখন বর্ণনা করছেন।

তাহযিবুত তাহযিব: ২/২৬৪।

৪. মুহাম্মদ বিন ওয়াসি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

জাফর বিন সুলাইমান বলেন, আমরা অন্তরে কাঠিন্য অনুভব করলে মুহাম্মদ বিন ওয়াসির কাছে চলে যেতাম। তার চেহারার দিকে তাকালে মনে হত, সন্তানহারা কোনো মা। ইমাম যাহাবিকৃত *তারিখুল ইসলাম*: ৫/১৫৯

মুহাম্মদ বিন ওয়াসি ইমাম হাসান বসরির ছাত্র ছিলেন। একজন ইবাদতগুজার, দুনিয়াবিমুখ, মুজাহিদ আলেম ছিলেন। ১৩২ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৫. হিশাম বিন হাসসান কুরদুসি বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম হাফেয হিশাম বিন হাসসান কুরদুসি র.। মৃত্যু ১৪৮ হিজরি। আল্লাহর ভয়ে অধিক ক্রন্দনকারী আবেদ ছিলেন। একবার তিন হজে যাবেন। হজের সফরের জন্য ঘরের লোকেরা তার জন্য বাহন, পাথেয় ও খাবার প্রস্তুত করে রাখল; কিন্তু সন্তানের এত দীর্ঘ সফর তার মায়ের কাছে কষ্টকর মনে হল। তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। ইমাম হিশাম তখন মায়ের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সফর স্থগিত করে দিলেন। মা ইন্তেকাল

করলে পরবর্তীকালে তিনি আর কোনো হজই মিস করেননি। তার মা যেহেতু সারা বছর রোযা রাখা ছেলের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন; তাই তিনি শুক্রবার ছাড়া অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন। মায়ের ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি ধারাবাহিক রোযা রাখা শুরু করেন। হাম্মাদ বিন সালামা বলেন, হিশাম বিন হাসসানকে দেখামাত্র কান্না চলে আসত। *তাজকিরাতুল হুফফাজ:* ১/১৬৩

৬. আব্দুল্লাহ বিন শাওযাব খুরাসানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

মুহাদ্দিস ও বিশ্বস্ত রাবি আব্দুল্লাহ বিন শাওযাব খুরাসানি বালখি-মৃত্যু ১৫৬ হিজরি- বসরার বাসিন্দা ছিলেন। তারপর সেখান থেকে বায়তুল মাকদিস চলে যান। তার ছাত্র কাছির বিন ওয়ালিদ বলেন, আব্দুল্লাহ বিন শাওযাবকে দেখলে আমাদের ফেরেশতাদের কথা মনে হত। *তাহযিবুত তাহযিব:* ৫/২৫৫

৭. আব্দুল আজিজ বিন আবি রাওয়াদ মাক্কি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

আব্দুল আজিজ বিন আবি রাওয়াদ মাক্কির মৃত্যু ১৫৯ হিজরি। তার জীবনবৃত্তান্তে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার সম্পর্কে বলেন, তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তার দু চোখের অশ্রু গাল বেয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ত।

তার ছাত্র শুআইব বিন হারব বলেন, আব্দুল আজিজ বিন আবি রাওয়াদকে দেখলে মনে হত, যেন তিনি কেয়ামতের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ, নিজেই কেয়ামতের ময়দানে দাঁড়িয়ে কেয়ামতবাসীদের দেখছেন। (*তাহযিবুত তাহযিব:* ৬/৩৩৮-৩৩৯।)

৮. মুহাম্মদ বিন মুনকাদির এবং জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা

মদিনার শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং মালেকি মাযহাবের ইমাম ইমাম মালেক বিন আনাস-মৃত্যু ১৭৬ হিজরি- রহমতুল্লাহি আলাইহির জীবনীতে এসেছে, মুসআব বিন আবদুল্লাহ বলেন, মালেকের সামনে যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হতো, তখন তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তিনি বাঁকা হয়ে যেতেন। মজলিসের সাথিদের তা দেখে খুব কষ্ট হত। একদিন তাকে এ ব্যাপারে

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে আমার এই অবস্থা দেখে আশ্চর্য হতে না। আমি মুহাম্মদ বিন মুনকাদিরের নিকট গমন করতাম। তাকে কোনো হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তিনি এমনভাবে কাঁদতেন যে তার প্রতি আমাদের দয়া হত।

আমি জাফর বিন মুহাম্মদের-ইমাম জাফর সাদেক-কাছেও গমন করতাম। তিনি অনেক রসিক ও হাসিখুশি মানুষ ছিলেন; কিন্তু তার সামনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হলে তখন তার চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যেত। আমি যখনই অন্তরে কাঠিন্য অনুভব করতাম, মুহাম্মদ বিন মুনকাদিরের নিকট চলে যেতাম। নেককার বান্দাগণ তার দিঙনির্দেশনা লাভের জন্য তার চারপাশে জমা হয়ে থাকত। আমি তাকে এক নজর দেখতাম আর এই এক নজরেই আমার নফসের কয়েকদিনের উপদেশ লাভ হয়ে যেত। (কাজি ইয়াজকৃত *তারতিবুল মাদারিক:* ২/ ৫১-৫২)

৯. ফুযাইল বিন ইয়াজ মাক্কি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

বিশিষ্ট আবেদ, দুনিয়াবিমুখ, মুহাদ্দিস, ইমাম ফুযাইল বিন ইয়াজ মাক্কি খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে মক্কায় চলে যান। মৃত্যু ১৮৭ হিজরি। তার খাদেম ইবরাহিম বিন আশআস বলেন, আমি এমন কাউকে দেখিনি, যার অন্তরে আল্লাহর আযমত ও বড়োত্ব ফুজাইলের চেয়ে বেশি।

তার সামনে যখন আল্লাহ তায়ালার আলোচনা করা হত কিংবা তিনি যখন কুরআন শুনতেন, ভয় এবং দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন, তার দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকত। উপস্থিত লোকদের এই অবস্থা দেখে তার প্রতি দয়া হত। খালেদ বিন রাবাহ বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আমাকে বলেছেন, আমি যখন ফুজাইলকে দেখতাম, তখন আমার নিজের ভেতর আখেরাতের চিন্তা এবং নিজের প্রতি ঘৃণা বেড়ে যেত। এ কথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। (*তাহযিবুত তাহযিব:* ৮/২৯৬)

১০. আব্দুল্লাহ বিন দাউদ খুরাইবি কুফি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

হাফেযে হাদিস, ইমাম, ইবাদতগুজার, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ বিন দাউদ খুরাইবি কুফি-মৃত্যু ২১৩ হিজরি-তার জীবনী বর্ণনায় এসেছে, ইরাকের মুহাদ্দিস এবং সন্ন্যাসী, ইবাদতগুজার, ইমাম ওকি ইবনুল জাররাহ বলেন, আব্দুল্লাহ বিন দাউদের চেহারা দেখা এবাদত। (*তাযকিরাতুল হুফফাজ:* ১/৩৩৮।)

১১. আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা কানাবি মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা কানাবি মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। অর্থাৎ, তিনি প্রথমে মদিনার বাসিন্দা ছিলেন। তারপর বসরায় চলে যান। মৃত্যু ২২১ হিজরি। তার সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন, কানাবি যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন, চলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের নিকট যাই। তার জীবনী বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকেরা নিজের অজান্তেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া শুরু করত। (*তাযকিরাতুল হুফফাজ* ১/৩৮৩)

সালাফদের মাঝে এমন মহান ব্যক্তিদের সংখ্যা অসংখ্য। এদের মতো মানুষের সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিগুলো যিনি বলেছেন বড়ো সুন্দর বলেছেন,

إِذَا سَكَنَ الْغَدِيْرُ عَلٰى صَفَاءٍ   وَجُنِّبَ أَن يُّحَرِّكَهُ النَّسِيْمُ

بَدَتْ فِيْهِ السَّمَاءُ بِلَا امْتِرَاءٍ   كَذَاكَ الشَّمْسُ تَبْدُوْ وَ النُّجُوْمُ.

كَذَاكَ (وُجُوْهُ) أَرْبَابِ التجَلِّيْ   يُرٰى فِيْ صَفْوِهَا اللهُ الْعَظِيْمُ

কূপের পানি যখন নিস্তরঙ্গ ও স্বচ্ছ হয়
আর কোমল বাতাসও তাকে আন্দোলিত করে না,
তখন সে পানিতে আকাশ বড়ো স্বচ্ছ দেখায়
সূর্য ও তারারা ভাসতে থাকে।
আল্লাহর নুর ও তাজাল্লি লাভকারী বুযুর্গদের চেহারাও এমন।
স্বচ্ছ নুরানি সে চেহারায় তুমি মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি মজলিস এক বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, وَزَادَ فِيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُه (তাদের কথা তোমাদের ইলম বৃদ্ধি করে।) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত সাহাবি আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের একটি মজলিসে বসা আমার অন্তরে দৃঢ়তা আনয়নে এক বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

উমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট ওবায়দুল্লাহর মজলিসের গুরুত্ব

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের র. *আল ইলাল ফি মারিফাতির রিজাল* (১:৩৪৫, ২:৩০৬), কাজি ইবনে খাল্লিকানের *ওফায়াতুল আয়ান* (১:২৭১) গ্রন্থে মদিনার সাতজন বিখ্যাত ফকিহের একজন তাবেয়ি ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উত্বাহ বিন মাসউদ। যিনি নেক ও বুজুর্গ এবং ইলমের সমুদ্র ও কবি ছিলেন। তার অবস্থা বর্ণনায় এসেছে,

উমর বিন আব্দুল আজিজ বলেন,

لِأَنْ يَكُوْنَ لِيْ مَجْلِسٌ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

> ওবায়দুল্লাহর একটি মজলিস আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক প্রিয়।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম, আমি ওবায়দুল্লাহর কাছ থেকে তার একটি রাত বায়তুল মালের ১০০০ দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করব। তখন লোকেরা বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো বায়তুল মালের অধিক হেফাজত করেন; তাহলে এত সম্পদ কেন খরচ করবেন? তখন তিনি বলেন, তা নষ্ট হবে কীভাবে? আল্লাহর শপথ! আমি ওবায়দুল্লাহর মতামত, উপদেশ ও পরামর্শের মাধ্যমে বায়তুল মালে হাজার-হাজার মুদ্রা ফিরিয়ে আনব। তার মতো লোকদের সঙ্গে কথা বলার মাঝে বুদ্ধির-বিকাশ, অন্তরের প্রশান্তি, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি এবং আদব ও শিষ্টাচার সংশোধন করে নেওয়ার শিক্ষা লাভ করা যায়।

কবির এই নিম্নোক্ত কথাটি বড়ো চমৎকার!

জ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো স্বাদ আমার অবশিষ্ট নেই।

[৫৩] আবদ বিন হুমাইদ এবং আবু ইয়ালা তাদের মুসনাদে হাদিসটি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি হাফেয হাইসামির মাজমাউয যাওয়ায়েদে (১০/২২৬) এবং ইবনে হাজারের আল-মাতালিবুল আলিয়া-তে (৩/১৯৩) আছে। মাতালেবে এই শব্দে আছে: وَزَادَ فِيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُه যেমনটি এখানে আছে।

আর মাজমায়ে আছে: وَزَادَ فِيْ عَمَلِكُمْ مَنْطِقُه (তাদের কথা তোমাদের আমল বৃদ্ধি করে)। মনে হয় এটিই সঠিক। সেখানে হাদিসটি শুরু হয়েছে এভাবে,

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ... قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ (ইয়া রাসুলাল্লাহ, কোন সঙ্গী উত্তম? তিনি বললেন,...।) এই হাদিসটি হাসান।

হাফেয হাইসামি বলেন, আবু ইয়ালা এটি বর্ণনা করেছেন। সনদে মুবারক বিন হাসসান আছেন। তিনি বিশ্বস্ত। এছাড়া সূত্রের অন্য সকল রাবির হাদিস ইমাম বুখারি তার কিতাবে এনেছেন।

হাফেয মুনযিরি *তারগিব ওয়াত তারহিবে* (১/৮৯) অনুরূপ কথা বলেছেন। শায়খ হাবিবুর রহমান আযমি মাতালিবে আলিয়ার টীকায় আবদ বিন হুমাইদের হাদিস সম্পর্কে লিখেন, বুছিরি বলেন, এর রাবিগণ বিশ্বস্ত। আবু ইয়ালাও এটি বর্ণনা করেছেন। আসমা বিনতে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এই হাদিসের সমর্থক।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস-এর একটি হাদিস এই হাদিসের সমর্থক। সেই হাদিসের শব্দ অনেকটা এই হাদিসের কাছাকাছি। হাকেম তিরমিযি নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থে (পৃ নং ২৪০) সেটি উল্লেখ করেছেন। হাফেয সুয়ুতি জামে সগিরে (৩/৪৬৮) তার কাছ থেকে সেটি নকল করেছেন, যা মুনাবির ফাইযুল কাদিরেও আছে। সেই হাদিসের শুরুটি এভাবে; خِيَارُكُمْ مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُه (তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যাকে দেখার দ্বারা তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়)।

ইবনে হিব্বান হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়ে আনাস রা. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের মাঝে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর যিকিরের চাবি। তাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। (*ফাইজুল কাদির* ইমাম মুনাবি: ২/৫২৮।)

এই হাদিসটি ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মাসউদের সমর্থক হাদিস দ্বারাও শক্তিশালী হয়। হাইসামি সেটি উল্লেখ করেছেন, *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ*: ১০/৭৮।

হকের সামনে নত হও ও তার বশ্যতা মেনে নাও।[৫৪] সর্বদা আল্লাহর যিকির করতে থাকো, তাঁর নৈকট্য লাভ করবে।[৫৫]

---

৫৪ আমর বিন উবাইদের উক্তি: আমার ও হকের মাঝে কোনো শত্রুতা নেই।

সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের অবস্থা এমনি। তারা যখন হক চিনতে পারেন, দ্রুত তা আঁকড়ে ধরেন। আর যখন বাতিল তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা তা ঘৃণা করেন এবং তার থেকে দূরে সরে আসেন। আমর ইবনে উবাইদের ঘটনা, তিনি একটি মাসআলায় মত দিতে গিয়ে ভুল করে ফেলেন। ওয়াসিল বিন আতা এটা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেন। তখন তার কাছে নিজের ভুলটি ধরা পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের মত থেকে ফিরে এসে বলেন, আমার এবং হকের মাঝে কোনো শত্রুতা নেই। (হে ওয়াসিল,) তোমার কথাই সঠিক। উপস্থিত যারা আছে আমি তাদের সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি আমার পূর্বের মত ত্যাগ করছি। মানুষ তার এ কাজটিকে খুব উত্তম মনে করল। যেহেতু তিনি তার পূর্বের মত থেকে ফিরে কোনোরূপ তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই সঠিক গ্রহণ করে নিয়েছেন। এই ঘটনাটিকে তারা তার দিনদারির আলামত মনে করত। (ইবনে মুরতাযাকৃত *আল মুনয়াতু ওয়াল আমালু*, পৃষ্ঠা নং ৫১।)

ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান আম্বরির উক্তি: আমি নিজেকে ছোটো মনে করে হকের দিকে ফিরে আসি।

উবায়দুল্লাহ আম্বারি বসরার শীর্ষস্থানীয় আলেম, ফকিহ ও কাজি ছিলেন। মৃত্যু ১৬৮ হিজরি। আবু নুআইম *হিলয়াতুল আউলিয়া* (৯:৬) এবং হাফেয ইবনে হাজার *তাহযিবুত তাহযিবে* (৭:৭) তার জীবনবৃত্তান্তে বলেন,

তার ছাত্র আব্দুর রহমান বিন মাহদি বলেন, আমরা একটি জানাজায় ছিলাম। তখন আমি তাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভুল মাসআলা দিলেন। আমি তরুণ ছিলাম। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার সংশোধন করুন, মাসআলাটি এমন নয়। মূলত এমন। তখন তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রেখে তারপর মাথা তুলে বললেন, বেটা, তুমি সত্য বলেছ, আমি নিজেকে ছোটো মনে করে তোমার কথার দিকে ফিরে আসছি, তারপর তিনি বললেন, ভুল মাসআলার গুরু হওয়ার চেয়ে হক মাসআলার শিষ্য হওয়াও আমার কাছে অধিক প্রিয়।

তাহযিবুত তাহযিবে (১০:২২) মালেক বিন মিগওয়াল কুফির-মৃত্যু ১৫৯ হিজরি-জীবনী আলোচনায় এসেছে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, এক লোক মালিক বিন মিগওয়ালকে বলল, আল্লাহকে ভয় করুন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার গাল মাটির সাথে লাগিয়ে ফেললেন।'

আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

[৫৫] এখানে গ্রন্থকার ইমাম মুহাসেবি যিকিরের অনেক বড়ো একটি ফায়দার কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর যিকিরের উপকারিতা বর্ণনা

তিনি তার *আল ওয়াবিলুস সায়্যিব মিনাল কালিমিত তায়্যিব* নামক গ্রন্থের ৫৭-১৩৩ নং পৃষ্ঠায় যিকিরের অনেক উপকারিতা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আলোচনাটি যিকিরকারী ও যিকির না কারী সকলের নিকট যিকিরকে প্রিয় করে তুলবে। প্রতিটি উপকারিতা দলিল-প্রমাণ সহ বর্ণনা করা হয়েছে। উপকারিতাগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন, যাতে আপনিও আল্লাহ তায়ালার অধিক যিকিরকারী বান্দা-বান্দিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

"আল্লাহ তায়ালার যিকিরে একশর অধিক ফায়েদা আছে। দয়াময় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে, শয়তানকে বিতাড়িত করে, দুশ্চিন্তা দূর করে, আনন্দ আনয়ন করে, দেহ-মনকে শক্তিশালী করে, অন্তর ও চেহারাকে আলোকিত করে, রিযিক আনয়ন করে, যিকিরের দ্বারা ইমানের স্বাদ লাভ হয়, আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার বীজ রোপিত হয়। স্রষ্টার প্রতি এই ভালোবাসাই ইসলামের রুহ। যিকিরের দ্বারা আল্লাহর মারেফাত, তাঁর আনুগত্য ও নৈকট্য হাসিল হয়। যিকিরকারীর অন্তর জীবিত থাকে এবং আল্লাহ তায়ালাও তাকে স্মরণ করেন।

যিকির অন্তর ও রুহের খোরাক। অন্তরের মরিচা দূর করে। গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যিকির করলে অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। নিঃসঙ্গতা দূর হয়। আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি লাভ হয়। যিকিরকারীর উপর সাকিনা নামক বিশেষ রহমত নাযিল হয়। আল্লাহর রহমত তাকে বেষ্টন করে নেয়। ফেরেশতারা তাকে ঘিরে রাখে। যিকির মানুষকে ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সৌভাগ্যবান করে, তার সঙ্গিকেও সৌভাগ্যবান করে।

আর কেয়ামতের দিন আফসোস ও পরিতাপ করা থেকে তাকে নিরাপদ রাখবে। যিকিরকারী যদি যিকিরের সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনও করে তাহলে এ কান্না হচ্ছে তার উপর আল্লাহ তায়ালার ছায়া। এর দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সে বিভিন্ন নেয়ামত ও সওয়াব লাভ করে।

এটি সবচেয়ে সহজ, তবে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। এর দ্বারা জান্নাতে চারা রোপণ হয়। যিকিরকারী কখনো আল্লাহকে ভুলে যায় না। যিকির যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থায় করা যায়। এরূপ আর কোনো ইবাদত নেই। যিকির বান্দার জন্য দুনিয়াতে, কবরে এবং হাশরের দিনে নুর হবে। এর উসিলায় বান্দার সমস্ত কথা ও কাজ নুরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহর অলি হওয়ার মূল পথ। অন্তরের অভাব দূর করে। যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দান করে। ঘুমন্ত, উদাসীন অন্তরকে জাগ্রত করে। আল্লাহর মারেফাত লাভ হয়। উত্তম হালত সৃষ্টি হয়। যিকিরকারী যার যিকির করে তার নিকটে থাকে। আল্লাহ তার সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি, যার যবান যিকিরের দ্বারা সর্বদা সজীব থাকে।

যিকির অন্তরের কাঠিন্য দূর করে। আল্লাহর নেয়ামতকে আকর্ষণ করে। আল্লাহর আযাব হটিয়ে দেয়। যিকিরকারীর জন্য যিকির আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়ার কারণ। যিকিরের মজলিস যেন ফেরেশতাদের মজলিস এবং জান্নাতের বাগান। সমস্ত আমলের হুকুম মূলত আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্যই দেওয়া হয়েছে। যে আমলে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির থাকে, সেই আমলকারী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। সর্বদা যিকির করা, এটি শারীরিক, আর্থিক এবং উভয়টি একসঙ্গে- এমন অনেক আমলের বিকল্প।

যিকির আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে। সমস্ত বিপদাপদ ও যাবতীয় বিষয়কে সহজ করে দেয়। দেহ-মনে শক্তি আনয়ন করে। যিকিরকারী আখেরাতের ময়দানে অন্যান্য আমলকারীর চেয়ে আগে থাকবে। যিকির বান্দা ও জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায়। ফেরেশতারা যিকিরকারীর জন্য ইস্তেগফার করতে থাকে। জমিনের যে স্থানের উপর আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় তা অন্যান্য স্থানের উপর গর্ব করে। কেয়ামতের দিন তা যিকিরকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। যিকির মুনাফেকি থেকে মুক্তির পরোয়ানা।

যিকিরের মাঝে আছে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত নাম ও সিফাত, তাঁর হামদ, পবিত্রতার ঘোষণা ও এগুলোর হুকুম এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধের বর্ণনা। যিকির মুখেও হতে পারে আবার মনে মনেও হতে পারে। উভয়ভাবে করার মাঝেই যিকিরের পূর্ণতা। শুধু মনে মনেও করা যায়। আবার শুধু মুখেও করা যায়। সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত করা। তারপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা। তারপর অন্যান্য দোয়া। (ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা র.-এর আলোচনা শেষ হলো।)

যিকিরের অনেক প্রকার

বুখারি শরিফের হাদিস, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমাতে যায় তখন শয়তান তার মাথায় তিনটি গিঁট দেয়। সে যখন ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর যিকির তথা দোয়া পড়ে তখন গিঁটগুলো খুলে যায়।'

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারিতে (১৩: ২৩) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, যিকিরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো শব্দ নেই যে, তা ব্যতীত যিকির হবে না। বরং প্রত্যেক এমন শব্দ বা কথা যাকে আল্লাহর যিকির বলা যায়, তাই যিকির। যিকির হতে পারে, কুরআন তেলাওয়াত, হাদিস পাঠ ও দিনি ইলমের চর্চা।

যিকিরের শক্তি ও বরকত

ইবনুল কায়্যিম র. তার পূর্বোল্লিখিত কিতাব *আল-ওয়াবিলুস সায়্যিবে* (১০৮ নং পৃ.) যিকিরের ফযিলত সংক্রান্ত আলোচনায় গণনা করতে গিয়ে বলেন, যিকিরের ৬১ টি ফায়দা। যিকির যিকিরকারীর মাঝে শক্তি ও উদ্যমের সৃষ্টি করে। সে যিকিরের সঙ্গে এমন কাজ করতে পারে যা যিকির ছাড়া তার পক্ষে করা সম্ভব হত না।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার জীবনাচরণ, কথাবার্তা, বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়া ও লেখালেখির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর রকমের শক্তি প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি একদিনে এত পরিমাণ লিখতে পারতেন যে একজন হস্তলিপিকারেরও তা লিখতে এক সপ্তাহ সময় লাগতো। আর যুদ্ধের সময় সৈন্যরা তো তার বিরাট শক্তির প্রদর্শনী দেখেছে।

মাছের জন্য পানি যেমন অন্তরের জন্য যিকির তেমন

ইবনুল কায়্যিম সেই গ্রন্থের ৫৮ এবং ৫৯ নং পৃষ্ঠায় আরও বলেন যে, আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে বলতে শুনেছি, মাছের জন্য পানি যেমন অন্তরের জন্য যিকির তেমন। মাছ যদি পানি থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে মাছের কি অবস্থা হবে চিন্তা করো?

যিকির ছিল ইবনে তাইমিয়ার খোরাক

একদিন আমি তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ফজরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর সেখানে বসেই আল্লাহর যিকির করা শুরু করলেন। অর্ধ দিন এভাবেই কেটে গেল। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, এটাই আমার খাবার, সকালের নাস্তা। আমি এই নাস্তা যদি না খাই তাহলে আমার শক্তি কমে যায় কিংবা তিনি এরূপ কথা বলেছেন।

একবার তিনি আমাকে বলেন, আমি কখনো যিকির ছাড়ি না। তবে মাঝে মাঝে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে একটু বিরতি নেই। যাতে বিশ্রাম নিয়ে আবার যিকিরের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকিরসমূহ

ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যা রহমতুল্লাহি আলাইহি যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২:৩৭) বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে উত্তমরূপে আল্লাহর যিকির করতেন। তাঁর সমস্ত কথাই ছিল আল্লাহর যিকির ও এ সংশ্লিষ্ট। তাঁর আদেশ-নিষেধ, শরিয়তের বিধান প্রণয়ন, সব আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে তাঁর আল্লাহর নাম ও সিফাত, হুকুম আহকাম, নেয়ামত ও আযাব বর্ণনাও ছিল আল্লাহর যিকির। আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন নেয়ামত উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করা, হামদ, ছানা ও তাসবিহ পাঠ করাও তাঁর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহর কাছ তাঁর প্রার্থনা করা, তাঁকে ডাকা, তাঁর প্রতি আগ্রহী হওয়া, তাঁকে ভয় করা নবিজির এগুলোও আল্লাহর যিকির ছিল। তাঁর নীরবতাও ছিল আল্লাহর যিকির।

তিনি সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকতেন। তাঁর দাঁড়ানো, বসা, শোয়া, হাঁটাচলা, আরোহণ-অবতরণ, কোথাও অবস্থান এবং সফর-সর্বাবস্থায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর যিকির চলতে থাকত।

জায়েয ও নাজায়েয যিকিরের বর্ণনা

প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, একাকী কিংবা কয়েকজন মিলে যিকির করার কিছু শর্ত ও আদব আছে। কিছু মানুষ যিকিরের সময় যে বিশেষ রকমের নড়াচড়া করে, সুন্দর সুরে গেয়ে গেয়ে যিকির করে, অদ্ভুত রকমের লাফালাফি করে, হাত পা-ছুড়ে, সামনে পিছনে ঢুলে, ডানে বামে মাথা ঝাঁকিয়ে, মজলিসে গোল হয়ে বসে, পা দিয়ে জমিনে আঘাত করে, এগুলো সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থি। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে এসব থেকে মুক্ত। এভাবে যারা যিকির করে তাদের অন্তরে যদি খুশু খুযু থাকত তাহলে অবশ্যই যিকিরের সময় তারা শান্ত ও স্থির থাকত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও খুশু-খুযু থাকত। যেমনটি মহান তাবেয়ি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন।

এর চেয়ে আরও আপত্তিজনক হলো যে, তারা যিকিরের মজলিসের শুরুর দিকে আল্লাহর নাম নিয়ে শান্ত ও স্থিরভাবে যিকির করে, কি যিকির করছে তা বোঝা যায়; কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের গতি বাড়তে থাকে। গতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে লাফালাফি ও চিল্লাফাল্লা। তখন তারা কী যিকির করছে কিছুই বোঝা যায় না। মুখ দিয়ে শুধু কিছু অর্থহীন আওয়াজ করে, এই আস্তে এই জোরে। (যেমন আমাদের দেশে হু হু, হু হু শব্দ বলে যিকির করতে শোনা যায়।) অনেক সময় শুধু জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। এই ধম ছাড়ছে, এই ধম নিচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস এই উঠছে, এই নামছে। সেই সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লাফালাফিও নতুন মাত্রায় বাড়ছে। এগুলোকে তারা আল্লাহর যিকির বলে থাকে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এগুলো আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কত মারাত্মক বেয়াদবি!

এক লোক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.–এর কাছে এসে সুর করে টেনে টেনে কুরআন পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে এভাবে তেলাওয়াত করতে নিষেধ করলেন। লোকটা কারণ জানতে চাইলো। তিনি বললেন, তোমার নাম কী? সে বলল, মুহাম্মদ? তখন তিনি বললেন, কেউ যদি তোমার নামটা সুর করে টেনে এভাবে ডাকে মু---হা---ম্মাদ, তোমার ভাল লাগবে?

ইমাম ইবনুল হুমাম ঘটনাটি *ফাতহুল কাদিরের* আযান অধ্যায়ে (১/১৭৩) উল্লেখ করেছেন। যিকির তো আল্লাহ তায়ালার আযমাত, তাঁর নামের ইজ্জত ও সম্মান, তাঁর মহত্ত্ব ও বড়োত্বের প্রমাণ বহন করে। অবশ্য অসংখ্য মানুষকে এভাবে যিকির করতে দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। কারণ তারা অধিকাংশ একেবারেই সাধারণ মানুষ,

যাদের মাঝে দিনের এবং রাব্বুল আলামীনের প্রতি আদবের কোনো জ্ঞান নেই। যদি থাকত তাহলে কী আর এভাবে যিকির করত। আপনি তাদের যে কাউকে দেখুন, কীভাবে নিজের নামের বেলায় সুর করে টেনে টেনে ডাকা অপছন্দ করছে। অথচ মহান আল্লাহর নামের বেলায় তা অপছন্দ করছে না।

খায়রুল কুরুনে (কল্যাণযুগে) এভাবে যিকির করার কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না। এভাবে যিকির করার পেছনে যে যুক্তি তুলে ধরা হয় তা হচ্ছে, অন্তরকে অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে এমনটি করা হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য একটি কথা। কারণ সালাফে সালেহিনের আমল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একনিষ্ঠমনে আল্লাহর যিকির করতে তারা আমাদের চেয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সামনে এভাবে যিকিরের কথা উল্লেখ করা হলে তারা মারাত্মক আপত্তি করেছেন। আর দিনের ক্ষেত্রে তারাই হচ্ছেন অনুসরণীয় ও নির্ভরযোগ্য ইমাম। আমরা এখন এভাবে যিকিরের বিষয়ে তাদের কিছু অভিমত তুলে ধরছি।

কিতাবের শেষে একাকী ও জামাতের সাথে জোরে জোরে যিকিরের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

নাজায়েয যিকির সম্পর্কে ইমাম শাতেবির বক্তব্য

ইমাম আবু ইসহাক শাতেবি-যিনি একজন উসুলবিদ, ফকিহ, সুফি এবং আহলে কাশফ ছিলেন-তার কিতাব *আল-ইতিসামে* চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে (১/২৬৮) নাজায়েয যিকিরের মজলিসের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

.... তারা সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বের হয়ে গিয়েছে। তারা একত্র হয়। তারপর একজন সুন্দর সুরে টেনে টেনে এমনভাবে কুরআন পড়ে যে, মনে হয় কোনো গান গাচ্ছে। নাজায়েয গান। তারপর তারা বলে, আসো, আমরা আল্লাহর যিকির করি। এ কথা বলে তারা উঁচু স্বরে যিকির শুরু করে। সেই যিকির চলতে থাকে পালাক্রমে। একপাশে কিছু লোক সম্মিলিত সুরে কোরাস করে যিকির ধরে, তারপর আরেকপাশের কিছু লোক। সবাই মিলে একসঙ্গে গানের সুরে যিকির করে। তারা বলে, এভাবে যিকির করা মুস্তাহাব। আসলে তারা মিথ্যা বলে। যদি তাই হতো, তাহলে তা বুঝতে ও তার উপর আমল করতে সালাফে সালেহিন অধিক যোগ্য ছিল। অথচ তাদের থেকে এভাবে যিকির করার কোনো ঘটনা বর্ণিত হয়নি।

ইমাম বুখারি তার কিতাব সহিহ বুখারিতে দুই ঈদের অধ্যায়ে মুসলমানদের দুই ঈদের সুন্নত অনুচ্ছেদে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর রা. প্রবেশ করলেন, আমার কাছে তখন আনসারদের দুজন বালিকা বসা ছিল। তারা বুআছের দিন আনসাররা যুদ্ধের যে গানটি গাইত তা গাচ্ছিল। তিনি বলেন, তারা দুজন পেশাদার গায়িকা ছিলো না।

মাজমাউ বিহারিল আনওয়ারে (৩/৪২) আল্লামা ফাত্তানী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যে আরবদের মতো গানের অনুমতি দিয়েছিলেন, সেই গান হচ্ছে শুধু তাদের মতো কবিতা আবৃত্তি। আর তারা উটকে জোরে চালানোর জন্য হুদা গাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

নাজায়েয পদ্ধতিতে যিকিরের বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজারের বক্তব্য

হাফেয ইবনে হাজার র. *ফাতহুল বারিতে* (২/৩৬৮) বলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবি- পুরো নাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে উমর। কুরতুবের শায়খ ছিলেন- বলেন, উপরোল্লিখিত হাদিসে আয়েশা রা.-এর উক্তি, 'তারা দুজন পেশাদার গায়িকা ছিলো না' কথাটির ব্যাখ্যা হলো, বালিকা দুজন পেশাদার গায়িকাদের মতো গানের বিষয়ে অবগত ছিলো না। আয়েশা রা.-এর কথায় পেশাদার গায়িকাদের গান থেকে দূরে থাকা বোঝানো হয়েছে, যারা অনেক সাকিন হরফে হরকত দিয়ে থাকে, আবার অনেক হরফ বাড়িয়ে নেয়। আর এটা যদি কোনো গানে না হয়ে কবিতায়ও হয়ে থাকে, যাতে নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনা, মদ ও অন্যান্য হারাম বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

যিকিরের সময় ইচ্ছাকৃত চিৎকার ও লাফালাফির ব্যাপারে ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবি র. বলেন,

তথাকথিত সুফিরা উক্ত বিষয়ে এমন সব বিদআত সৃষ্টি করেছে, যেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যাদের হক মনে করা হয়, যারা সঠিক পথের দাবিদার তাদের অনেকের উপর প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের অনেকের কাছ থেকে পাগল ও বালকসুলভ আচরণ যেমন তালে তালে নৃত্য ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু এর অশুভ পরিণতি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, তারা এসব কাজকে ইবাদত ও নেক আমল বলে আখ্যায়িত করেছে। আরও বলেছে,

এটা অবস্থার উন্নতি সাধন করে। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায়, এগুলো ইসলামবিকৃতকারী যিন্দিকদের প্রভাব ও নির্বোধদের প্রলাপ। (আলোচনাটি শেষ হলো)

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, সুফিদের অবশ্য এটাকে ভালো অবস্থা সৃষ্টির কারণ বলার পরিবর্তে খারাপ অবস্থা সৃষ্টির কারণ বলা দরকার। (অর্থাৎ, এটি অবস্থার উন্নতি নয়, অবনতি সাধন করে।) (*ফাতহুল বারি*: ২/৩৬৮)

নাজায়েয যিকির সম্পর্কে ইমাম মালেক র-এর বক্তব্য

কাজি ইয়াজ র. *তারতিবুল মাদারেকে* (২/৫৪) ইমাম মালেক র.-এর অবস্থা বর্ণনায় বলেন, তিন্নিসি বলেন, আমরা মালেক র.-এর কাছে ছিলাম। তার ছাত্ররা তাকে ঘিরে রেখেছিল। তখন নাসিবিনের এক লোক বলল, আমাদের ওখানে কিছু লোক আছে, যাদের সুফি বলা হয়। তারা প্রচুর আহার করে। তারপর কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করে এবং দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। এদের ব্যাপারে আপনার কী মত? তখন ইমাম মালেক র. বললেন, তারা কী বাচ্চা? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, পাগল? সে বলল, না। বরং তারা পির-বুজুর্গ এবং জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। তখন তিনি বললেন, কোনো মুসলমান এমন করে বলে আমি শুনিনি।

লোকটি তখন আরও বিস্তারিত বলতে গিয়ে বলল, খাওয়া-দাওয়ার পর তারা দাঁড়িয়ে চতুষ্পদ প্রাণীর মতো নাচতে শুরু করে। কেউ নিজের মাথায় আঘাত করতে থাকে, আর কেউ মুখে। তখন ইমাম মালেক হাসতে হাসতে উঠে ঘরে চলে গেলেন। তার শিষ্যরা লোকটিকে বলল, তুমি তো আমাদের শায়খের জন্য অশুভ বলে সাব্যস্ত হলে। আমরা ত্রিশ বছরেরও অধিক কাল তার খেদমতে আছি, কিন্তু আজকে ছাড়া কখনো তাকে হাসতে দেখিনি।

ইমাম আবু বকর খাল্লাল র.-এর *আল-হাছছু আলাত তিজারতি ওয়াস সিনাআ-* নামক গ্রন্থের ২৪ নং পৃষ্ঠায় এসেছে: ইসহাক বিন সাইয়ার নাসিবি আবদুল মালেক বিন যিয়াদ নাসিবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা ইমাম মালেক র.-এর খেদমতে ছিলাম। তখন আমরা তার সামনে আমাদের এলাকায় সুফিদের নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি তাকে বললাম, তারা ইয়ামানের শানদার পোশাক পরে। আর এমন এমন করে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি মুসলমান? আবদুল মালেক বলেন, ইমাম মালেক হাসতে হাসতে চিৎ হয়ে পড়লেন। আবদুল মালেক বলেন, তখন তার এক শাগরিদ আমাকে বলল, এ-কী! শায়খের এমন অদ্ভুত অবস্থা আমরা কখনো দেখিনি। আমরা তাকে কখনো হাসতে দেখিনি।

নাজায়েয যিকির সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি র.-এর বক্তব্য

বিখ্যাত মুফাসসির ও সুফি ইমাম কুরতুবি তার *তাফসির আল জামে লি-আহকামিল কুরআনে* (৭:৩৬৫) সুরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

> নিশ্চয় মুমিন তারাই যাদের সামনে আল্লাহর যিকির করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ইমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (সুরা আনফাল: ২)

ইমাম কুরতুবি বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তাযালা মুমিনদের তাঁর স্মরণের সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর তাদের এমন অবস্থা ইমানি শক্তি ও আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় হুকুমের প্রতি যত্নবান থাকার কারণে হয়। যেন আল্লাহর যিকিরের সময় তাদের মনে হয় তারা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এরূপ আরেকটি আয়াত হচ্ছে, (হে নবি!) আপনি অক্ষমতা প্রকাশকারীদের সুসংবাদ দান করুন, যাদের সামনে আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়।

এবং অপর আরেকটি আয়াত, আল্লাহর যিকিরের দ্বারা তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

এটি আল্লাহর পূর্ণ মারেফাত ও অন্তর স্থির হওয়ার দলিল।

আয়াতের ওজাল শব্দের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আযাবের ভয়। আর আল্লাহর মারেফাত যত বেশি হবে তাঁর ভয়ও তত বেশি হবে। এতে আশ্চর্য ও বৈপরীত্যের কিছু নেই।

এই উভয় অর্থকে আল্লাহ তায়ালা নিচের একটি আয়াতে নিয়ে এসেছেন:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.

> আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী; এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসামঞ্জস্য, যার বক্তব্যসমূহ বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যাদের অন্তরে তাদের প্রতিপালকের ভয় আছে তারা এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়। তারপর তাদের দেহ মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। (সুরা যুমার, আয়াত নং ২৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস থাকার কারণে তাদের মন প্রশান্ত হয় যদিও তারা আল্লাহকে ভয় করে।

এই হল আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভকারী এবং তাঁর প্রভাব ও শাস্তিকে ভয়কারীদের অবস্থা। মূর্খ জনসাধারণ ও নির্বোধ বেদআতিদের অবস্থা এমন নয়। তারা ভেড়ার মত চিৎকার করে, গাধার মত আওয়াজ করে এবং এটাকে আল্লাহ তায়ালার ভয়ের কারণ বলে মনে করে। তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব, আল্লাহর মারেফাত লাভ ও তাঁর ভয়ের ক্ষেত্রে তোমরা তো আল্লাহর রাসুল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের স্তরে পৌঁছতে পারোনি। তা সত্ত্বেও ওয়াজ-নসিহত শ্রবণের সময় তাদের অবস্থা ছিল তারা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতেন এবং তাঁর জাত ও সিফাত বোঝার চেষ্টা করতেন। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের সময় তাঁর মারেফাত লাভকারী এসব বান্দাদের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

> এবং রাসুলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শুনে, তখন সত্য জানার কারণে তাদের চোখসমূহকে দেখবে যে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ইমান এনেছি, সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সঙ্গে আমাদের নাম লিখে নিন। (সুরা মায়েদা আয়াত নং ৮৩)

এই আয়াতে বর্ণিত হালত ছিল সাহাবায়ে কেরামের। যাদের অবস্থা এমন নয় তারা সাহাবায়ে কেরামের হেদায়েত ও তরিকার উপর নেই। কেউ যদি কোনো তরিকা অবলম্বন করতে চায়, সে যেন তাদের তরিকা গ্রহণ করে।

আর যে পাগলদের অনুসরণ করবে, তার অবস্থা হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

পাগলামির অনেক স্তর রয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি।

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, লোকেরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক প্রশ্ন করলেন। একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে মিম্বারে তাশরিফ নিলেন এবং বললেন, যা কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাও। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই মিম্বারে আছি তোমাদের প্রত্যেকটি কথার আমি উত্তর দেব। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিলেন, না জানি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আযাব ইত্যাদির কোনো ফয়সালা চলে আসে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম প্রত্যেকেই কাপড়ে মুখ ঢেকে কান্না করছে। তারপর তিনি হাদিসটি বর্ণনা করলেন।

ইমাম তিরমিযি রহমতুল্লাহি আলাইহি সহিহ আখ্যা দিয়ে ইরবায বিন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

> وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ.
>
> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের এমন নসিহত করলেন যে, তাতে সকলে অশ্রুসিক্ত হল এবং সকলের অন্তর ভয়ে কম্পিত হল।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু বলেননি; আমরা চিৎকার করে কাঁদলাম, নাচলাম এবং জমিনে পা দিয়ে আঘাত করলাম, জযবার আতিশয্যে দাঁড়িয়ে গেলাম।

নাজায়েয তরিকায় যিকির সম্পর্কে ইমাম শাতেবির বক্তব্য

আরও কয়েকশ বছর আগে, হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল যে, যিকিরকারীদের হালকা বানিয়ে চিল্লাফাল্লা করে যিকির করা, সুরেলা গান কবিতা ইত্যাদি শ্রবণ করা, যিকিরের সময় লাফালাফি করা চক্কর লাগানো- ইত্যাদি বিষয়গুলো কেমন?

ইমাম আবু ইসহাক শাতেবি, যিনি বিখ্যাত ফকিহ, উসুলবিদ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সুফি, মুহাক্কিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মেধাবী আলেম ছিলেন, তিনি তার অনবদ্য কিতাব

আলইতিসাম-এ প্রশ্নটি উত্থাপন করে বিশ পৃষ্ঠারও অধিক আলোচনা করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিদআতিদের প্রতিটি বিষয় দলিল-প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন। সেখানে তিনি বিশদ ও সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। আপনার তা পড়া উচিত। কারণ তা অন্তর ও জ্ঞান বুদ্ধিকে আলোকিতকারী খাঁটি ইলমে পরিপূর্ণ।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, যে সমস্ত যিকিরকারী বলে যে, যিকিরের সময় তাদের এ ধরনের নড়াচড়া ও কর্মকাণ্ড-এগুলো বৈধ অথবা বৈধতার সীমা বহির্ভূত নয়। তারা আইম্মায়ে কেরামের হারাম ফতোয়াকে মানেন না। না মানলেও বিষয়টি তাদের এভাবে বিবেচনা করা উচিত যে, যেহেতু তারা হারাম বলেছেন, তাই এটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই উলামায়ে কেরাম যেটিকে হারাম বলেছেন তা থেকে দূরে থাকা ও বেঁচে থাকার জন্য হলেও তাদের তা বর্জন করা উচিত। কারণ তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী সুফি তো তাকেই বলে, যে যাবতীয় সন্দেহমূলক বিষয় থেকে বেঁচে থাকে এবং মাকরুহে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে কোনো কোনো বৈধ কাজও বর্জন করে। হারাম তো অনেক দূরের কথা। আর যে হেদায়েত চায়, আল্লাহই তাকে একমাত্র হেদায়েত দানকারী। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের আপনার পছন্দনীয় আমলের দিশা দান করুন।

ভুল পদ্ধতিতে আল্লাহর নামের যিকির

এখানে আমি আরেকটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাই, বর্তমানে বিভিন্ন যিকিরের হালকায় যা প্রচুর দেখা যায়। বিষয়টি হলো, শুধু আল্লাহ আল্লাহ শব্দ বলে যিকির করা এবং তা বারবার জপতে থাকা। কারণ আল্লাহ তায়ালার জাতের মহান এই নামটির উচ্চারণ যিকিরের শুরুর দিকে তো সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে, কিন্তু তারা যখন দ্রুত যিকির করে, তখন শব্দটির কোনো কোনো অক্ষর উচ্চারণ থেকে বাদ পড়ে যায় এবং তা একটি অস্পষ্ট আওয়াজে পরিণত হয়, যা মুখের ভিতর দ্রুত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, কিন্তু শুনে বোঝা যায় না। এভাবে যিকির করা নিষেধ। (কারণ এভাবে আল্লাহ তায়ালার নামের প্রতি চরম অবমাননা প্রকাশ পায়)। যারা এভাবে যিকির করে আমরা তাদের থেকে পানাহ চাই।

১১৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

(جُلَسَاءُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَاضِعُوْنَ الْمُتَوَاضِعُوْنَ الْخَائِفُوْنَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا)

যারা অনুগত, বিনয়ী, (আল্লাহর ভয়ে) ভীত এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারী, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর সঙ্গী হিসেবে থাকবে।[৫৬] আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং

প্রকৃত তাসাউফের পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা ইমাম আবু আবদুল্লাহ বিন তুবি সিকলি-এর প্রতি রহম করুন, যিনি নিম্নোক্ত কবিতায় তাসাউফের সঠিক ও প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন:

তাসাউফ তালি দেওয়া পশমের পোশাক পরার নাম নয়। নয় আধ্যাত্মিক গান শুনে ক্রন্দন করার নাম।

তাসাউফ কোনো চিৎকার, নর্তন-কুর্দন ও মাতাল মাতাল ভাব করা এবং আচ্ছন্নতায় পাগল হয়ে যাওয়ার নাম নয়।

বরং তাসাউফ হলো সমস্ত কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকা, কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা, সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত, নিজের গুনাহের জন্য লজ্জিত ও সদা চিন্তাগ্রস্ত থাকা।

(দেখুন ইমাদ ইস্পাহানীকৃত *খারিদাতুল কাসর* নামক কিতাব, ১১:২৯)

[৫৬] এই হাদিসটি আমি কোনো হাদিসের কিতাবে পাইনি।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি র. *শরহু হাদিসিল ইলমি* নামক গ্রন্থে (পৃ. ১৭-২১) বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ হাদিস,

إذا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا، قَالُوا: و مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ.

যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাবে তখন কিছুক্ষণের জন্য বিচরণ করে যেয়ো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতের বাগানসমূহ কী? নবিজি বললেন, যিকিরের হালকাসমূহ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এই হাদিসটি বর্ণনা করার সময় বলেন, যিকিরের হালকা দ্বারা উদ্দেশ্য গল্পের আসর নয়। বরং ফিকহের হালকা, ফিকহের মজলিস উদ্দেশ্য। হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকেও এমন অর্থ বর্ণিত আছে। এই অর্থটি তাদের দুজন থেকে ইবনুল জাওযি *আল-কুস্‌সাস ওয়াল মুযাক্কিরিন* নামক কিতাবে (পৃ. ১২৯) বর্ণনা করেছেন।

যিকিরের ফযিলত সম্পর্কে হযরত মুআয বিন জাবাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উক্তি

মুআয ইবনে জাবাল র.-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে বলতে লাগলেন, হে মৃত্যু! তোমাকে স্বাগতম। আমার অভাবের সময় তুমি আগমন করেছ, তোমাকে স্বাগতম। মৃত্যুর আগমনে যে আফসোস করে সে কামিয়াব নয়। হে আল্লাহ, আপনি জানেন যে দুনিয়াতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা আমার কাছে এজন্য পছন্দনীয় নয় যে, আমি শুধু দুনিয়ার সৌন্দর্য, বয়ে চলা নদ-নদী ও বৃক্ষরাজি অবলোকন করব। আমি তো দুনিয়ায় থাকতে চাই দীর্ঘ রাত জেগে ইবাদত করতে, প্রখর রোদে তৃষ্ণার্তদের পিপাসা নিবারণ করতে এবং আলিমগণের যিকিরের হালকায় ভিড় জমাতে।

তাফাক্কুহ ফিদ্দিন ইবাদত

এশার নামাজের পর আবু মুসা আশআরি রা. হযরত উমর বিন খাত্তাব রা.-এর কাছে এলো, তখন উমর রা. তাকে বললেন, কেন এসেছো? তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তখন তিনি বললেন, ,এই সময়ে? তিনি বললেন, ফিকহ নিয়ে কথা বলব। তখন উমর রা. বসে তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন, তারপর আবু মুসা বললেন, আমিরুল মুমিনিন! তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হবে। তিনি বললেন, এতক্ষণ তো আমরা নামাজেই ছিলাম। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় ঘটনাটি আছে। মুত্তাকি হিন্দিকৃত *কানযুল উম্মালেও* আছে, ৫: ২২৮।)

এখানে যিকিরের হালকা দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমের হালকা। নিম্নোক্ত আয়াতটি এর প্রমাণ,

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

যদি তোমরা না জেনে থাক তাহলে আহলে যিকিরকে জিজ্ঞাসা করো। (এখানে আহলে যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে ইলম)

ইবনে আবদুল বার এটি তার *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি* নামক কিতাবে (১:৫১) উল্লেখ করেছেন।

যিকিরের মজলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হালাল-হারামের মজলিস

আতা খুরাসানি বলেন, যিকিরের মজলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হালাল-হারামের মজলিস। যেখানে আলোচনা হয় কীভাবে ক্রয়-বিক্রয় করবেন, নামাজ পড়বেন, রোযা রাখবেন, বিবাহ-তালাক, হজ ইত্যাদি হুকুম পালন করবেন। আবুস সাওয়ার আদাবি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি এক ইলমি মজলিসে মুজাকারা করছিলেন, এক তরুণ তখন তাদের বলল, আপনারা সবাই সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলুন, তখন আবুস সাওয়ার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আরে বোকা, আমরা এতক্ষণ তাহলে কিসের মাঝে ছিলাম?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকৃত *কিতাবুয যুহদ*, পৃষ্ঠা নং ৩১৬-৩১৭।

দারেমি তার সুনানে ইলম ও আলেমের ফযিলত অনুচ্ছেদে (১:৯৫) বলেন, বিখ্যাত তাবেয়ি, আবেদ ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যেই মজলিসে ইলমি আলোচনা হয় সেই মজলিস আমার নিকট ততক্ষণ নফল নামাজ পড়ার চেয়ে অধিক প্রিয়। কারণ, হয়ত মজলিসে কেউ এমন কোনো কথা শুনবে যার দ্বারা সে বছর কিংবা জীবনব্যাপী উপকৃত হবে।

হাফেয ইবনে আবদুল বার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, ইলমি আলোচনাই নামাজতুল্য। (*জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি* ১/২২।)

যিকিরের মজলিস দ্বারা ইলমের সেই মজলিস উদ্দেশ্য যেখানে কুরআন তাফসির করা হয়, রাসুলের সুন্নতের আলোচনা হয়, দিনের ফিকহ শেখানো হয়। এ সমস্ত মজলিস সেসব যিকিরের মজলিস থেকে উত্তম যেখানে সুবহানাল্লাহ,

মুমিনদের জন্য কল্যাণ কামনা করো এবং নিজের বিষয়ে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো।[৫৭]

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলে যিকির করা হয়। কারণ ইলমি মজলিসগুলোর হুকুম হয় ফরযে আইন হবে না হয় ফরযে কেফায়া। আর যিকিরের মজলিসগুলোর ব্যাপারে হুকুম হলো এগুলো হয় মুস্তাহাব না হয় নফল।

এ কথার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, যিকিরের মজলিস শুধু সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার-এর যিকিরের উপর সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে সমস্ত মজলিসে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেগুলোও যিকিরের মজলিসের অন্তর্ভুক্ত। এসব মজলিস সাধারণ যিকিরের মজলিসের চেয়ে অধিক উপকারী হয়ে থাকে। কারণ, নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে হালাল-হারাম সম্পর্কে জানা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

মুখে যেসব যিকির করা হয় সেগুলো অধিকাংশই নফল। কখনো কখনো ওয়াজিব হয়, যেমন ফরয নামাজে পঠিত দোয়াসমূহ। আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জানা এগুলো প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রয়োজন অনুসারে ওয়াজিব।

এ কারণে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।

হাফেয ইবনে রজব-এর আলোচনা এখানে শেষ। অবশ্য অন্যান্য ইমামের কিছু কথাও এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

[৫৭] হারেস মুহাসেবির কথা, 'নিজের বিষয়ে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো' এই উপদেশটি সাইয়্যেদুনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর। যেটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক কিতাবুয যুহদে বর্ণনা করেছেন।

পূর্ণ কথাটির অর্থ এরকম, অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকো, নিজের শত্রু থেকে দূরে থাকো, বন্ধুদের মধ্যে যে বিশ্বস্ত তার হেফাজত করো। কারণ এমন কিছু নেই যার দ্বারা একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির তুলনা করা যায়। বিশ্বস্ত ব্যক্তি সেই যে আল্লাহকে ভয় করে। পাপাচারীর সংস্পর্শে এসো না, তাহলে সে তোমাকে পাপাচারে লিপ্ত করবে। তাকে তোমার কোনো গোপন কথা বলে দিয়ো না। আর নিজের বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো যারা আল্লাহকে ভয় করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে উলামায়ে কেরাম আল্লাহকে ভয় করেন। (সুরা ফাতির, আয়াত নং ৩৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

দিন হচ্ছে অন্যের কল্যাণ কামনা।[৫৮]

---

[৫৮] *সহিহ মুসলিম*, ২: ৩৬। তামিম দারি রা. থেকে।

উপদেশদানের সুন্দর পদ্ধতি

জেনে রাখুন, সাধারণ মানুষকে নসিহত করার পদ্ধতি আর খলিফা, বাদশা, বিচারক কিংবা শাসক অথবা বড়ো কোনো ব্যক্তিকে নসিহত করার পদ্ধতি এক নয়। সাধারণ মানুষকে নসিহতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও শৈলী আর বিশেষ ব্যক্তিদের নসিহতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও শৈলী এক নয়। নসিহতের ক্ষেত্রে সবসময় কঠোরতা অবলম্বন করা ঠিক নয়। এভাবে নসিহত অনেক সময় ফলপ্রসূ হয় না। দিনের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে না।

খলিফা মুসতাযি বিল্লাহকে ইবনুল জাওযির নসিহত

আমরা এখন খলিফা মুসতাযি বিল্লাহকে নসিহতের সময় ইমাম ইবনুল জাওযি র. যে শব্দচয়ন করেছেন ও ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন, তা লক্ষ করব। এ ক্ষেত্রে তিনি যে চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ও সুন্দর ভাষা ব্যবহার করেছেন তা পড়ব।

একদিন তিনি হাশেমি বংশোদ্ভূত আব্বাসি খলিফা মুসতাযি বিল্লাহ হাসান বিন ইউসুফের–মৃত্যু ৫৭৪ হিজরি- মজলিসে কথা বলছিলেন, তিনি তাকে শাইবানে রায়ি খলিফা হারুনুর রশিদকে যে নসিহত করেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,

يَا أَمِيْرَ المؤْمِنِيْنَ، إِنْ تَكَلَّمْتُ خِفْتُ مِنْكَ، وَ إِنْ سَكَتُّ خِفْتُ عَلَيْكَ، فَأَنَا أُقَدِّمُ خَوْفِيْ عَلَيْكَ لِمُحَبَّتِيْ لَكَ، على خَوْفِيْ مِنْكَ، قَوْلُ النَّاصِحِ: اِتَّقِ اللّٰهَ، خيرٌ مِنْ قَوْلِ القائل: أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مغفُوْرٌ لَكُمْ.

হে আমিরুল মুমিনিন, আমি যদি কথা বলি, তাহলে নিজের ব্যাপারে আমার ভয় হয়। আর যদি না বলি, আপনার ব্যাপারে আমার ভয় হয়। তবে যেহেতু আপনাকে আমি মহব্বত করি; তাই নিজের জানের ভয়ের চেয়ে আপনার ক্ষতির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। একজন কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষীর 'আপনি আল্লাহকে ভয় করুন' কথাটি আপনাকে যে কারও বলা নিম্নোক্ত কথাটির চেয়ে উত্তম: 'আপনারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের লোক। এ কারণে আপনাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।'

দাউদিকৃত *তাবাকাতুল মুফাসসিরিন*: ১/২৭৩। ইবনুল জাওযিকৃত *মুনতাযাম*: ১/২৮৪।

এই নসিহতটি যেমন সুসংক্ষিপ্ত, তেমনি সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত শিষ্টাচারপূর্ণ। দেখুন কী চমৎকারভাবে পুরো কথার মধ্য থেকে সম্বোধনের শব্দগুলো উনি এড়িয়ে গেছেন! শুরুতে বলেছেন, আমি যদি কথা বলি। এটা বলেননি, আমি যদি আপনার সঙ্গে কথা বলি। তারপর বলেছেন, যদি চুপ থাকি। এটা বলেননি যে, আপনাকে নসিহতের ব্যাপারে যদি চুপ থাকি। তারপর নসিহতের মূল কথাটি বলার সময় বললেন, একজন কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষীর কথা। বলেননি, আপনাকে আমি বলছি। এভাবে বক্তব্য থেকে নিজেকে তিনি আড়ালে নিয়ে গেছেন।

একেবারে শেষ বাক্যে গিয়ে তিনি তাকে সরাসরি সম্বোধন করেছেন। কারণ সেটি ছিল তার প্রশংসা বাক্য। 'আপনারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের লোক। এ কারণে আপনাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।' এই শিষ্টাচারবোধ আমাদের সকলের মাঝে থাকা উচিত।

জেনে রাখো, যে তোমার কল্যাণ কামনা করে সে তোমাকে মহব্বত করে।[৫৯]
যে তোমার সাথে তোষামোদি করে সে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করে।[৬০]

বাদশাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ কে করবে?

কেউ যদি বাদশা কিংবা কোনো শাসককে হিতোপদেশ দানের হিম্মত করে, তাহলে ইমাম সুফিয়ান সাওরি এ বিষয়ে যে নসিহতটি করেছেন তা তার মনে রাখা উচিত। তিনি বলেছেন, বাদশাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নসিহত একমাত্র সেই ব্যক্তি করবে যে সৎকাজ এবং অসৎকাজ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত, নিজেও সৎ এবং আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ।

আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*: ৬/৩৭৯।

[৫৯] বাদশাকে করা এক গায়িকার নসিহতের প্রভাব

এই চমৎকার নসিহতটি দেখুন, যা হারামকে হালালে এবং পাপাচারকে আনুগত্যে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এটি বাদশা মালিকশাহ সালজুকির গায়িকার ঘটনা। বাদশা ৪৪৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৮৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। রায় নামক স্থানে তার দরবারে একজন গায়িকাকে উপস্থিত করা হয়। তিনি তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান। তার গান তার খুব পছন্দ হয় এবং তিনি তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে চান।

তখন গায়িকা বাদশাকে অনুরোধ করে বলল, হে সুলতান, আমার এত সুন্দর চেহারাটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলুক তা আমার খারাপ লাগবে। কারণ হালাল অনেক সহজলভ্য। হালাল এবং হারামের মাঝে শুধু এক শব্দের পার্থক্য (কবুল)। তখন বাদশা বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তিনি তখন কাজি সাহেবকে ডাকলেন। কাজি সাহেব তাদের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। বাদশার ঘরে তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। তার হেরেমেই সে মৃত্যুবরণ করেছিল।

(ইবনে খাল্লিকানকৃত *অফায়াতুল আয়ান*, ২:১৪২।)

সুবহানাল্লাহ, গায়িকার কী যথার্থ প্রজ্ঞাপূর্ণ নসিহত! মুমিনের অন্তর ও কানে তা কত উত্তম প্রভাব ফেলে! তাহলে তার অন্তরে এর প্রভাব কেমন ছিল, যে শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেছে! হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হালালের মাধ্যমে হারাম থেকে, আনুগত্যের মাধ্যমে নাফরমানি থেকে, অনুগ্রহের মাধ্যমে অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন। প্রবৃত্তির আক্রমণ থেকে আমাদের হেফাজত করুন, কারণ তা ধ্বংস ও পতন ডেকে আনে।

যে তোমার উপদেশ গ্রহণ করে না, সে তোমার ভাই নয়। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لَا خَيْرَ فِيْ قَوْمٍ لَيْسُوْا بِنَاصِحِيْنَ وَلَا خَيْرَ فِيْ قَوْمٍ لَا يُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ.

এমন লোকদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই যারা কল্যাণকামী নয় এবং তারাও কল্যাণশূন্য যারা কল্যাণকামীদের ভালোবাসে না।[৬১]

---

[৬০] অর্থাৎ, যে তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যেতে দেখেও তোমার গুনাহের কাজটি সমর্থন করে, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তা থেকে তোমাকে ফেরানোর চেষ্টা করে না, সে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করে। তাকে তুমি তোমার ঘৃণ্য শত্রু মনে করবে। কারণ সে তোমার সঙ্গে শত্রুর আচরণ করছে, বন্ধুর নয়।

[৬১] সাইয়্যেদুনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তির উপর রহম করুন যে উমরকে তার দোষগুলো ধরিয়ে দিয়েছে।

কোনো কল্যাণকামী যদি তার কোনো দোষ-এর দিকে ইঙ্গিত করতেন, তাহলে তিনি সেটাকে হাদিয়া মনে করতেন এবং হাদিয়া দানকারীকে রহমতের দোয়া পাওয়ার উপযুক্ত মনে করতেন।

সদুপদেশ দানকারীদের সাহচর্য গ্রহণ করার উপদেশ

এক ব্যক্তি হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَقْوَامٍ يُخَوِّفُونَنَا حَتَّى تَكَادُ قُلُوبُنَا تَطِيرُ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «وَاللهِ لَأَنْ تَصْحَبَ أَقْوَامًا يُخَوِّفُونَكَ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْأَمْنُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَصْحَبَ أَقْوَامًا يُؤَمِّنُونَكَ حَتَّى يَلْحَقَكَ الْخَوْفُ»

আমরা তাদের সঙ্গে কী আচরণ করব, যারা গুনাহের বিষয়ে আমাদের এমন ভয় দেখান যে, আমাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়? তখন হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, তাদের সুহবত গ্রহণ করো, যারা তোমাকে গুনাহের ভয়

সর্বদা সততাকে প্রাধান্য দিবে, সফলকাম হবে।[৬২] অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করে চলবে, নিরাপদ থাকবে।[৬৩] কারণ

দেখাতে থাকে, আর তুমি গুনাহ থেকে বেঁচে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে যাও। এটি তোমার জন্য এমন ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম, যারা তোমাকে গুনাহের আযাব না-হওয়ার ব্যাপারে অভয় দিতে থাকে। এভাবে একসময় তোমার কাছে ভয়ের বিষয়টি (আযাব) উপস্থিত হয়ে যায়।

(আবু নুয়াইমকৃত *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ২:১৫০)

৬২ সততার ফজিলত ও তার প্রভাব

হাফিয ইবনুল জাওযি *মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল* নামক গ্রন্থে (পৃ. ৩৫০) তামিম রাজির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবু জুরআকে বলতে শুনেছি, আমি আহমদকে বললাম, আপনি বাদশা মুতাসিমের তরবারি ও ওয়াসিকের চাবুক থেকে কীভাবে মুক্তি পেলেন? তখন তিনি বলেন, সত্য ও সততাকে কোনো ক্ষতের উপর রাখা হলে সেই ক্ষত ভালো হয়ে যায়।

ইবনে মুফলিহকৃত *আদাবে শারইয়্যায়* (২:২০০) বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর মারুজি বলেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন গুণের কারণে মানুষ প্রশংসিত হয়? তিনি বললেন, সততা। বসরার কাজি ইয়াস বিন মুয়াবিয়া মুযানি বলেন, মানুষের সর্বোত্তম আখলাক হল, সততা। সততা থেকে যে বঞ্চিত হলো তার কাছ থেকে চরিত্রের সবচেয়ে উত্তম গুণটি ছিনিয়ে নেওয়া হলো। (*আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯:৩৩৬)

৬৩ অর্থাৎ, অনর্থক বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো। فُضُوْلٌ শব্দটি মূলত فَضْلٌ শব্দের বহুবচন। তবে কোনো কল্যাণ নেই এমন বস্তুর ক্ষেত্রে একবচনের পরিবর্তে বহুবচন ফুযুল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এজন্য যার মধ্যে ফুজুল তথা অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার অভ্যাস থাকে তাকে فُضُوْلِيٌّ বলা হয়। ফুকাহায়ে কেরাম فُضُوْلِيٌّ শব্দটিকে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যে এমন জিনিসে হস্তক্ষেপ করে যে জিনিসের সে মালিক নয়, উকিল নয়, অভিভাবকও নয়।

অনর্থক বিষয় থেকে মুক্ত থাকা আসলেই কঠিন

ফুজুল প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে হতে পারে। এর ক্ষতি অনেক ব্যাপক এবং এ থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। তবে আল্লাহ যাকে তাওফিক দান করেন সাহায্য করেন তার জন্য সহজ।

রাবাহ বিন ইয়াজিদ লাখমি একজন বিখ্যাত আলেম, বিশ্বস্ত রাবি, আবেদ, যাহেদ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন। মুজাহাদা ও উন্নত আখলাকের অধিকারী ছিলেন। তার ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতা ছিল প্রবাদতুল্য। মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। ১৩৪ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মাত্র আটত্রিশ বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, আমি বছরের পর বছর গুনাহ থেকে বিরত থাকার সাধনা করেছি,তারপর নফসের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ এসেছে। আমি জবানকে অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকার অভ্যাস করিয়েছি। পনেরো বছর পর জবানের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ এসেছে।

আবু ওসমান সাইদ বিন মুহাম্মদ বলেন, আমার প্রবল ধারণা, ইয়াযিদ লাখমি এই রিয়াজাত ও মুজাহাদা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরপরই শুরু করেছেন। কারণ তিনি মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। এর মধ্যেই তিনি নফসকে মুজাহাদার উপর নিয়ে এসেছিলেন। (দেখুন আবুল আরাব কাইরুওয়ানীকৃত *ওয়া তাবাকাতু উলামায়ে ইফরিকিয়্যাহ তিউনিস*, পৃষ্ঠা নং ১২৪ এবং আবু জায়েদ দাব্বাগকৃত *মাআলিমুল ইমান ফি মারিফাতি আহলিল কাইরুওয়ান*, ১:২৬০।)

ইমাম শাফেয়ির অনর্থক বিষয় থেকে মুক্ত থাকার প্রশংসা

ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, চারটি বিষয় মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি করে: ১. অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করা, ২. মেসওয়াক করা, ৩. নেক লোকদের ও ৪. উলামায়ে কেরামের সুহবত। (ইবনুল কাইয়িম এটি *যাদুল মাআদে* বর্ণনা করেছেন, ৩:৪১৭।)

সততা নেককাজের পথপ্রদর্শন করে।[৬৪] আর নেককাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উসিলা। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়।[৬৫]

যেহেতু অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন, তাই গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ গ্রন্থের একাধিক স্থানে অনর্থক বিষয় থেকে সতর্ক করেছেন। এ সমস্ত পৃষ্ঠায় তিনি অনর্থক বিষয়ের বিভিন্ন প্রকার, ক্ষতি, ফলাফল ও প্রভাবসমূহ বর্ণনা করেছেন। খুব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আপনারও উচিত ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য যাবতীয় অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা। কারণ এর পরিণতি লজ্জা। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং আপনাকে তাঁর সাহায্য ও সুরক্ষার মাধ্যমে হেফাজত করুন। আর নেককারদের তিনিই হেফাজতকারী।

৬৪ 'নেক কাজের দিকে পথপ্রদর্শন করে'-কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য নেককাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

হাফেয আবু নাঈম হিলইয়াতুল আউলিয়ায় (২:৩৫৯) জাফর ইবনে সুলাইমান দুবায়ির সূত্রে মালিক বিন দিনারের জীবনবৃত্তান্তে বলেন, আমি মালেক বিন দিনারকে বলতে শুনেছি, সততা ও মিথ্যা মানুষের অন্তরে যুদ্ধ করতে থাকে। একপর্যায়ে একটি আরেকটিকে বের করে দেয়। সততা যদি দুর্বল থাকে যেমন খেজুরের চারা দুর্বল থাকে, যার শুধু একটি ডাল থাকে। তখন কোনো বাচ্চা সেটাকে উপড়ে ফেললে তা মূলসহ নষ্ট হয়ে যায়। আর কোনো বকরি তাকে খেয়ে ফেললেও মূল থেকে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে আর সেটাকে নিয়মিত পানি দেওয়া হয়, যত্ন নেওয়া হয় তাহলে তা বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে, একপর্যায়ে তার শক্ত একটি মূল তৈরি হয়, যার উপর সে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার ছায়া তৈরি হয়, যে ছায়া মানুষ গ্রহণ করে। তাতে ফল আসে, যে ফল মানুষ আহার করে।

অনুরূপ সততা যখন অন্তরে দুর্বল থাকে, মানুষ তখন এর যত্ন নিলে, পরিচর্চা করলে, আল্লাহ তা বৃদ্ধি করতে থাকেন। মানুষ যত্ন নিতে থাকে আর আল্লাহ বৃদ্ধি করতে থাকেন। একসময় আল্লাহ তা তার জন্যে বরকতে পরিণত করেন। তখন তার কথা গুনাহগারদের জন্য পথ্য হিসেবে কাজ করে।

জাফর বিন সুলাইমান বলেন, তারপর ইবনে দিনার বলেন, তোমরা কি তাদের দেখনি? তারপর তিনি নিজের দিকে ফিরে বললেন, অবশ্যই আল্লাহর শপথ আমি

তাদের দেখেছি, হাসান বসরি, সাইদ বিন জুবায়ের ও তাদের মতো অন্যান্যরা। তাদের যে কারও কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বহু লোকের অন্তর সজীব করে তুলতেন।

৬৫ অর্থাৎ, গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট মিথ্যার চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো স্বভাব ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও সম্পর্কে যদি জানতেন যে, তার মিথ্যা বলার স্বভাব আছে তাহলে তিনি তার জন্য দোয়া করতেন। এভাবে একসময় তার কাছে খবর পৌঁছত যে, লোকটি তওবা করে নিয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা বৈধ

মুসাওয়াদাতু আলি তাইমিয়া ফি উসুলিল ফিকহি গ্রন্থের ২৩৩ নং পৃষ্ঠায় এসেছে, উলামায়ে কেরামের মাঝে এ বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য আছে যে, মিথ্যা কি মূলতই নিন্দনীয় নাকি স্থানভেদে মিথ্যা বললে গুনাহ না হওয়ার হুকুম দেওয়া যায়?

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল-যিনি হাম্বলি মাযহাবের বিখ্যাত আলেম ছিলেন-বলেন, মিথ্যায় গুনাহ থাকা না থাকার বিষয়টি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে কিছু ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম বানিয়ে কথা বলার বৈধতা দিয়েছেন এবং সেটাকে উত্তম জ্ঞান করেছেন।

অপরদিকে অল্প কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরামের মত হল, মিথ্যা মূলত নিন্দনীয়। অবশ্য শরিয়ত যেসব ক্ষেত্রে বানিয়ে বলার অবকাশ রেখেছে, সে প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য হলো, এখানেও মিথ্যার অনিষ্ট বিদ্যমান, কিন্তু শরিয়ত এর চেয়ে বড়ো কোনো খারাপ কাজ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এটিকে বৈধতা দিয়েছে; কিন্তু ইবনে আকিল এই ব্যাখ্যাকে অনেক দূরবর্তী বলেছেন।

যাই হোক, উভয় পক্ষের মূলকথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা থেকে অস্পষ্ট কথা বলে হলেও বাঁচা সম্ভব ততক্ষণ মিথ্যা বলা হারাম। শায়খ তাকি উদ্দিন ইবনে তাইমিয়া বলেন, কোনো কিছু মন্দ হওয়ার বিষয়টি মানুষের বিবেকের উপর নির্ভরশীল। এ কথাটি যারা মানতে নারাজ তারা বলেন, কোনো কিছুর ভালো বা মন্দ হওয়ার ভিত্তি মানুষের বিবেক নয় বরং শরিয়ত। শরিয়ত যেটাকে উত্তম বলেছে, সেটা উত্তম। আর শরিয়ত যেটাকে মন্দ বলেছে সেটা মন্দ। তারা মিথ্যাকে স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে মন্দ ও ভালো বলে থাকেন।

আর যারা কোনো কিছুর ভালো বা মন্দ হওয়ার বিষয়টি শরিয়তের পরিবর্তে মানুষের সুস্থ বিবেকের উপর নির্ভরশীল মনে করেন এবং হুকুমও বিবেকের অনুগামী করেন, তারা এটাকে সর্বাবস্থায় গুনাহ বলেন।

হুকুমকে বিবেকের অনুগামী করার অর্থ কিছু কাজ এমন আছে মানুষের সুস্থ বিবেক যেটাকে খারাপ মনে করে, তাহলে সেটা গুনাহের কাজ। আর যেটাকে ভালো মনে করে সেটা সওয়াবের কাজ। ইসলামি শরিয়তও মানুষের সুস্থ বিবেকের এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেছে। এ কারণেই ইসলামকে ফিতরাত তথা সুস্থ স্বভাব প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, জমহুর উলামায়ে কেরামের মতের সমর্থনে উম্মে কুলসুম রা. থেকে বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত একটি হাদিস আছে। হাদিসটি হলো,

لَيْسَ الكَذَّابُ الذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاس، فَيَنْمِيْ خَيْرًا وَ يَقُولُ خَيْرًا.

> সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে।

ইমাম মুনাবি ফায়জুল কাদিরে (৫:৩৫৯) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষের মাঝে মীমাংসাকারীর মিথ্যাবাদী হওয়াকে নাকচ করা হয়েছে তার সৎ উদ্দেশ্যের বিবেচনায়। কারণ (সংশোধন, মীমাংসা-সন্ধি, সদ্ভাব সৃষ্টি সহ) কিছু বিষয় এমন আছে, যেসব ক্ষেত্রে মানুষ ক্ষতি রোধে ও শান্তি স্থাপনে একটু বাড়িয়ে কথা বলতে ও সততার সীমা অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। যেহেতু ফেতনা-ফাসাদকে এড়ানোর জন্য মীমাংসা করে দেওয়া অনেক বড়ো একটি কাজ, তাই এটি বাস্তবায়নে সামান্য মিথ্যা বলার অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

দুজনের মাঝে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার সুরত হলো, এক জনের কাছে অপর জনের ভালো কথাগুলো (বানিয়ে) বলবে। সুন্দর কথাগুলা পৌঁছাবে। যদিও সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এমন কোনো কথা সে না শুনুক। তবে শর্ত হলো, এসব বানানো কথা সংশোধনের উদ্দেশ্যে হওয়া চাই।

যুদ্ধের ময়দানে মিথ্যা বলার সুরত হলো, নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে অনেক বাড়িয়ে বলা। এমন কথা বলা, যার দ্বারা যোদ্ধাদের মাঝে সাহস ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। শত্রুকে ফাঁদে ফেলতে মিথ্যা বলা।

স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যা বলার সুরত হলো, তাকে ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি ও নেক আশা দেওয়া। তার জন্য অন্তরের ভালোবাসা বাড়িয়ে প্রকাশ করা যাতে দাম্পত্য স্থায়ী হয় এবং এভাবে সে তার আখলাক সংশোধন করতে পারে।

আর পাপাচার মানুষকে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিপতিত করে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا تَتَكَلَّمْ فِيْمَا لَا يَعْنِيْكَ وَلَا تَمَارِ سَفِيْهًا وَلَا حَلِيْمًا وَاذْكُرْ أَخَاكَ بِمَا تُحِبُّ أَن يَّذْكُرَكَ بِهِ.

> অনর্থক বিষয়ে কথা বলো না। এমনকি প্রয়োজনীয় বিষয়েও অধিক কথা বলো না। নির্বোধ ও অসহিষ্ণু ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ো না।[৬৬] তুমি তোমার ভাইয়ের মুখ থেকে তোমার সম্পর্কে যে আলোচনা শুনতে পছন্দ করো, তার সম্পর্কে তুমি তেমন আলোচনা করো।

এমন ব্যক্তির মতো আমল করো, যে বিশ্বাস করে, নেককাজ করলে তাকে অবশ্যই প্রতিদান দেওয়া হবে, আর গুনাহ করলে তাকে পাকড়াও করা হবে।[৬৭]

ইমাম নববি বলেন, উলামায়ে কেরাম মিথ্যা বলার বৈধ সুরতগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে আমার কাছে ইমাম গাজালি র.-এর বক্তব্যটি সবচেয়ে উত্তম মনে হয়েছে। মানুষের কথা হচ্ছে উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি উদ্দেশ্য ভালো ও প্রশংসনীয় হয়। আর তা সত্য ও মিথ্যা উভয়টির মাধ্যমে পূরণ করা যায়; তাহলে এ ক্ষেত্রে মিথ্যার প্রয়োজন না থাকায় তা হারাম। (যেহেতু সত্যের মাধ্যমেও পূরণ করা সম্ভব।) আর যদি মিথ্যা ছাড়া সম্ভব না হয়, তখন হুকুম হলো: উদ্দেশ্য বৈধ হলে মিথ্যা বলা বৈধ। আর উদ্দেশ্য আবশ্যকীয় হলে মিথ্যা বলাও আবশ্যক।

[৬৬] অর্থাৎ, তার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ো না। কারণ তর্ক কোনো ভালো কিছু বয়ে আনে না। তর্ক সম্পর্কে আরও আলোচনা দেখুন ১৩০ নং পৃষ্ঠার টীকায়।

[৬৭] অনুরূপ একটি কথা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে। দেখুন হাফেয ইবনে আবদুল বারকৃত *নুযহাতুল মাজালিস*: ২/২৫০-২৫১।

সর্বদা আল্লাহর শোকর আদায় করো। আশাকে ছোটো করো। অধিক পরিমাণে কবর জিয়ারত করো, কেননা কবর তোমার মাঝে মৃত্যুর স্মরণ জাগ্রত করবে।[৬৮] দুনিয়াতে এমনভাবে চলাফেরা করো যেন তুমি হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো।[৬৯]

---

[৬৮] অর্থাৎ, কবর যিয়ারতের সময় আপনার অন্তরের উপস্থিতিও যেন থাকে। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, কবর জিয়ারত করো। এতে তোমার আখেরাতের কথা স্মরণ হবে, মৃতদেরকে গোসল দাও, কারণ প্রাণহীন দেহের সঙ্গে মেশার দ্বারা অনেক বড়ো নসিহত হাসিল হয় আর জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ তোমাকে আখেরাতের ব্যাপারে ভাবিয়ে তুলবে আর দুনিয়াতে চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। *মুসতাদরাকে হাকেম* চতুর্থ খণ্ডের ৩৩০ নং হাদিস। হাকিম বলেন, এটি সহিহ সনদের হাদিস। ইমাম যাহাবি *তালখিসুল মুসতাদরাকে* এটিকে সহিহ বলেছেন।

[৬৯] আখেরাতের আযাবের কথা স্মরণের দ্বারা দুনিয়াবিমুখতা তৈরি হয়

এটি কোনো সহজ বিষয় নয়। আখেরাতের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যখন অন্তর পূর্ণ জাগ্রত থাকে, তখন এমন চিন্তার দ্বারা অনেকের অন্তর ফেটে যায়।

মহান তাবিয়ি রবি ইবনে খুসাইম- যিনি বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিষ্য ছিলেন- তার জীবনীতে এসেছে, তিনি যখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসতেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাকে বলতেন, আল্লাহর শপথ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দেখলে খুশি হতেন। আর আমি যখনই তোমাকে দেখি, আমার আল্লাহর ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। ভিন্ন একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন তাকে দেখতেন তখন কুরআনের এই আয়াতটি পড়তেন,

وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ.

আর তোমরা আল্লাহর ভয়ে ভীতদেরকে সুসংবাদ দান করো।

রবি ইবনে খুসাইম তেমনি একজন ব্যক্তি ছিলেন।

তাবিয়ি রবি ইবনে খুসাইমের মূর্ছা যাওয়া

হাফেয যাহাবি *তাহযিবুত তাহযিবে* ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদগণ তার জীবনবৃত্তান্তে বলেন, রবি ইবনে খুসাইম ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফুরাত নদীর তীর দিয়ে হাঁটছিলেন। একটি কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রবি ইবনে খুসাইম আগুন দেখতে পেলেন। অর্থাৎ, তিনি আগুন দেখলেন ও আগুনের দাউ দাউ শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا.

> আগুন যখন দূর থেকে তাদের দেখবে তখন তারা তার গর্জন ও হুঙ্কার শুনতে পাবে। (সুরা ফুরকান, আয়াত নং ১২)

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। জোহরের নামাজের সময় হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু তাকে ডাকলেন, হে রবি, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে জোহরের নামাজ পড়ালেন। নামাজ পড়ে আবার গিয়ে ডাকলেন, হে রবি, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আসরের সময় হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আসরের নামাজ পড়ালেন। তারপর আবার এসে ডাকলেন, হে রবি, হে রবি! কিন্তু এবারও তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিনি গিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ালেন। তারপর ফিরে এসে আবার ডাকলেন, হে রবি, রবি। কিন্তু তার কোনো সাড়াশব্দ নেই। অবশেষে ভোরের ঠান্ডা বাতাস যখন তার গায়ে এসে লাগল, তখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। *তারিখে বাগদাদে* (১০/১৬৭)

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লার জীবনবৃত্তান্তে এসেছে, নুয়াইম বিন হাম্মাদ বলেন, ইবনুল মুবারক যখন দাসমুক্তির অধ্যায় পড়তেন, তখন এমনভাবে কাঁদতেন, মনে হতো, জবাই করা ষাঁড় কিংবা গরুর ভেতর থেকে যেমন আওয়াজ বের হয়, তার ভেতর থেকে তেমন আওয়াজ বের হচ্ছে।

আমাদের কেউ তখন তার কাছে যাওয়ার কিংবা তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেত না।

আখেরাতের বর্ণনা শুনে ইবনে ওহাবের অন্তর ফেটে যাওয়া

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লার শিষ্য মুহাদ্দিস ফকিহ, যাহেদ, আবেদ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব কুরাশি মিসরি-মৃত্যু ১৯৭ হিজরি- আল্লামা কাজি ইয়াজের *তারতিবুল মাদারেক* নামক গ্রন্থে (৩/২৪১) তার অবস্থা বর্ণনায় এসেছে, ইউনুস বলেন, ইবনে ওয়াহাব বলেন, হাদিসের ছাত্ররা একবার আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা শোনাতে বললো, আমার মনে হয় না আমার পক্ষে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। তারপর তিনি তাদের নিয়ে বসলেন। তখন তারা তার সামনে জাহান্নামের বর্ণনা পড়া শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু জ্ঞান ফিরল না। বলা হলো, তার সামনে জান্নাতের বর্ণনা পড়া শুরু করো, কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। এভাবে অচেতন অবস্থায় ১২ দিন কেটে গেল। তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তখন চিকিৎসক ডাকা হল। চিকিৎসক এসে বললেন, অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, তিনি স্ট্রোক করেছেন।

রিসালাতুল মুসতারশিদিন প্রণেতা ইমাম মুহাসেবি রহিমাহুল্লার এই বিষয়ের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। গ্রন্থটির নাম *তাওয়াহহুম*। ১৩৫৭ হিজরিতে মিশর থেকে গ্রন্থটি ছাপানো হয়েছে। সেখানে তিনি জাহান্নামে ঢোকার আগে ও পরে ভয়ঙ্কর আজাবের দৃশ্য দেখে জাহান্নামিদের যে অনুভূতি হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে জান্নাতে প্রবেশের আগে ও পরে নায-নেয়ামত, প্রতিদান দেখে জান্নাতিদের মনে যে আনন্দের অনুভূতি হবে সে প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি পাঠে আপনার মনে হবে, যেন আপনি সেসব স্বচক্ষে দেখছেন। একটি বাস্তব অনুভূতি আপনার ভেতর তৈরি হবে। বর্ণনার ভাষা যেমন সাহিত্যগুণসম্পন্ন, তেমনি প্রভাবমণ্ডিত, যা একজন পাঠকের মনে আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করে, তাকে উপদেশ গ্রহণে সাহায্য করে এবং আখেরাতের আমলের জন্য সচেষ্ট করে তোলে। গ্রন্থটি আপনার পাঠ করা উচিত।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

اِعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يَنْسَى وَالْخَيْرَ لَا يَفْنَى وَاعْلَمْ أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكَ خَيْرٌ مِّنْ كَثِيرٍ يُطْغِيكَ.

এমনভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর নিজেকে তুমি মৃতদের মধ্যে গণ্য করো। জেনে রাখো, তোমার মন্দ কর্মের কথা ভুলে যাওয়া হবে না। আর ভালো কাজ নিঃশেষ হয়ে যাবে না।[৭০] প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট ও অল্প পরিমাণ সম্পদ এমন অধিক সম্পদ থেকে উত্তম যা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় লিপ্ত করে।[৭১]

---

[৭০] ভালোভাবে জেনে রেখো যে, তোমার কর্ম নিয়ে মানুষ আলোচনা করে এবং আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং তুমি ভালো আমল করার চেষ্টা করো, যাতে মানুষের নিকট এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমার ভালো আলোচনা হয়। আরবের বিজ্ঞ ব্যক্তি আকসাম বিন সাইফি তামিমি বলেন, যিনি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজ গোত্রের একশজন লোককে সঙ্গে নিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে যায়। অবশ্য ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য সে লাভ করেছিল। তার সঙ্গীরা মদিনায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন, তোমরা সকলেই কিছু ঘটনা ও গল্পের সমষ্টি। (যা নিয়ে মানুষ আলোচনা করে)। সুতরাং (সুন্দর আমলের দ্বারা) নিজেদের জীবনের গল্পকে সুন্দর করার চেষ্টা করো।

ইমাম ইবনে দুরাইদ বলেন,

إِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَه　　فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا لِمَنْ وَعَى

মানুষের মৃত্যুর পর শুধু তার স্মৃতি থেকে যায়। সুতরাং যারা স্মরণে রাখে তাদের জন্য তোমরা ভালো স্মৃতি রেখে যাও।

[৭১] তাকওয়া ও পরহেযগারির নিদর্শন, বিখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো।[৭২] আখেরাতের পাথেয়কে ঠিক করে নাও[৭৩] এবং বেশি বেশি আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করো।[৭৪] তুমি নিজেই

«إِيَّاكُمْ وَمَا شُغِلَ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا كَثِيرَةُ الْأَشْغَالِ لَا يَفْتَحُ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ شُغْلٍ إِلَّا أَوْشَكَ ذَلِكَ الْبَابُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ»

দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে তোমরা দূরে থাকো। কারণ অন্তরকে গাফেল করে দেওয়ার মতো দুনিয়াবি ব্যস্ততা অনেক। মানুষ ব্যস্ততার একটি দরজা খোলা মাত্র সেই দরজা তার সামনে আরও দশটি দরজা খুলে দেয়। (আবু নুআইমকৃত *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ২:১৫৩।)

মহান তাবেয়ি কাতাদা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

مَا كَثُرَتْ النِّعَمُ عَلَى قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ أَعْدَاؤُهَا

মানুষের নেয়ামত বেশি হলে সেই নেয়ামতের শত্রুও বেশি থাকে। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকৃত *আল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল*, ১:১৭৪।)

[৭২] মজলুম কাফের হলেও তার দোয়া কবুল করা হয়

মজলুমের দোয়া কবুল হয়। যদিও মজলুম আল্লাহর নাফরমান ও গুনাহগার বান্দা হোক না কেন, অথবা মুশরিক-কাফের হোক না কেন। সুরা রাদের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.

আর কাফেরদের সমস্ত দোয়াই ব্যর্থ। (সূরা রাদ : ১৪)

এখানে কাফেরদের দোয়া ও প্রার্থনা দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের দেব-দেবী ও উপাস্যদের উদ্দেশ্যে করা প্রার্থনা। পূর্বের আয়াত থেকে এটি বুঝে আসে। তবে সম্ভাবনা আছে যে এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের আল্লাহকে ডাকা। তখন এই ডাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে

আখেরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে ডাকা। আর দুনিয়াতে মজলুম অত্যাচারিত সে যে-ই হোক না কেন, তার দোয়া কবুল করা হয়। সামনে আমরা এ কথাটির স্বপক্ষে প্রমাণ তুলে ধরছি,

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

> মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তার দোয়া ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না। (অর্থাৎ, সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়)। (*বুখারি*, ৩:২৮৫, ৫:৭৩; *মুসলিম*,১:১৯৭)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু ইয়ালা এবং যিয়া মাকদিসি *মুখতারাহ* গ্রন্থে হাদিসটি নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেন,

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، وإِنْ كَانَ كَافِرًا، فَإِنَّها لَيْسَ دُوْنَها حِجَابٌ.

> তোমরা মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো যদিও সে কাফের হয়। কারণ (সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে) তার সামনে কোনো অন্তরায় থাকে না।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মজলুমের দোয়া কবুল করা হয়, যদিও সে পাপাচারী হোক না কেন। কারণ তার পাপ ও গুনাহের কুফল শুধু তার নিজের উপর বর্তাবে। *মুসনাদে আহমদ*: ২/৩৬৭। হাসান সনদে।

উজির ইয়াহইয়া বারমাকি মজলুমের বদদোয়াকে নিজের বন্দি হওয়ার কারণ মনে করেছিলেন

মজলুমের বদদোয়ার বিষয়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনা আমরা এখন বর্ণনা করব যা উযির ইয়াহইয়া বিন খালেদ বার্মাকির সঙ্গে ঘটেছিল। তিনি বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তার দান-সদকা ছিল প্রবাদতুল্য।

খতিব বাগদাদি বলেন, আব্বাসি খলিফা মাহদি তার পুত্র হারুন-অর-রশিদকে ইয়াহিয়া বিন খালেদের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি তাকে নিজের কাছে রেখে লালন পালন করেন। তার স্ত্রী নিজের পুত্র ফজলের সঙ্গে তাকে দুধ পান করান। তাই হারুনুর রশিদ ছিল ইয়াহইয়ার দুধ পুত্র। হারুনুর রশিদ খলিফা হয়ে ইয়াহইয়ার অনুগ্রহ স্বীকার করেছিলেন এবং তাকে মন্ত্রীর পদ দান করেছিলেন। তিনি তাকে সম্মান করতেন এবং তার আলোচনা করার সময় বলতেন, আমার পিতা। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত যাবতীয় বিষয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একবার কী হল, হারুনুর রশিদ বারমাকিদের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তখন তিনি ইয়াহইয়া বিন খালেদ বারমাকির প্রতি রুষ্ট হলেন এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন। তার পুত্র জাফরকে হত্যা করলেন। ১৯০ হিজরিতে ইয়াহইয়া ইন্তেকাল করেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় তার পুত্র জাফর তাকে বলল, এত ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যুগ আজকে আমাদের হাতে বেড়ি পড়িয়েছে। আমাদের পশমের পোশাক পরতে ও বন্দি জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে। তখন তার পিতা ইয়াহইয়া তাকে বললেন, বৎস, হতে পারে এটি কোনো মজলুমের বদদোয়ার ফল, যা রাতের অন্ধকারেও নিজের গন্তব্য পানে ছুটতে থাকে। অথচ আমরা সে সম্পর্কে গাফিল থাকি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা গাফেল থাকেন না। তিনি ভুলে যান না। তারপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন,

رُبَّ قَوْمٍ قَدْ غَدَوْا فِيْ نِعْمَةٍ ... زَمَنًا وَالدَّهْرُ رَيَّانَ غَدِقْ

سَكَتَ الدَّهْرُ زَمَانًا عَنْهُمْ ... ثُمَّ أَبْكَاهُمْ دَمًا حِيْنَ نَطَقْ

কত মানুষ কত কাল নেয়ামতে ডুবে ছিল। আর সময়ও তাদের জন্য
ছিল সুসিক্ত আনন্দময়।

যুগ তাদের ব্যাপারে দীর্ঘদিন নিশ্চুপ ছিল। তারপর যখন মুখ খুলল,
তখন তাদের রক্ত অশ্রুতে ভাসিয়ে গেল।

এই চমৎকার অর্থপূর্ণ পঙক্তি দুটি কবি আবুল আতাহিয়ার। সামআনিকৃত *আল-আনসাব* গ্রন্থে (২/৪০) প্রথম পঙক্তিটি তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে আবুল আতাহিয়া কবিতার উপর ডক্টর শুকরি ফয়সল রচিত *আবুল আতাহিয়া ওয়া শে'রুহু* গ্রন্থে আমি এই পঙক্তি দুটি পাইনি।

শেষ রাতে মাজলুমের বদদোয়ার তির বড়ো ধ্বংসাত্মক

ইমাম নববি র. প্রণীত *আরবায়িনান নাবাবিয়্যা* গ্রন্থের ২৪ নং হাদিস,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا»

আবু যর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ, আমি জুলুমকে আমার উপর হারাম করে দিয়েছি। আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না।

আল্লামা সাদুদ্দিন তাফতাযানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি *শারহুল আরবায়িনান নাবাবিয়্যাহ* গ্রন্থের ১৯৪ নং পৃষ্ঠায় এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, বর্ণিত আছে, বাদশা নুহ বিন আসাদ বিন সামান (যিনি মা-ওয়ারাউন নাহরের গভর্নর ছিলেন) যখন সমরকন্দবাসীর উপর ট্যাক্স আরোপ করলেন, তখন নিজের একজন প্রতিনিধি সমরকন্দবাসীর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানকার উলামা-মাশায়েখ ও সর্দারদের একত্র করলেন এবং বাদশার চিঠি পড়ে শোনালেন। বিখ্যাত ফকিহ আবু মানসুর মাতুরিদি প্রতিনিধিকে বললেন, আপনি বাদশার পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, এখন আপনি তার কাছে আমাদের জওয়াবটি পৌঁছে দেবেন। আপনি তাকে বলবেন, আপনারা আমাদের উপর আরও জুলুম করতে থাকুন, আমরা শেষ রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে আরও বেশি করে দোয়া করতে থাকব। তারপর সবাই উঠে চলে গেল। এর কিছুদিন পর বাদশা নুহ বিন আসাদ নিহত হলো এবং তার পেটে লোহার তির বিদ্ধ ছিল, যাতে লেখা ছিল:

بَغَى وَلِلْبَغْيِ سِهَامٌ ... أَتَتْهُ مِنْ أَيْدِيْ الْمَنَايَا وَالْقَدَرِ

سِهَامُ أَيْدِي الْقَانِتَاتِ ... يَرْمِيْنَ عَنْ قَوْسٍ لَهَا اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ

সে জুলুম করেছিল। আর জুলুমের তিরও তার অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে তা মওত ও তাকদিরের হাত ধরে এলো।

নিজের উত্তরাধিকারী হও। অন্যদের তোমার উত্তরাধিকারী বানিয়ো না।[৭৫] নিজের বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং গাফলত থেকে জাগ্রত হও।[৭৬]

এটি রাতে উঠে ইবাদতকারীদের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত তির। যারা ধনুক থেকে রাতে তির নিক্ষেপ করে থাকে।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, শাসক নুহ বিন আসাদ বিন সামানের সঙ্গে ফকিহ আবু মানসুর মাতুরিদির ঘটনায় তাওয়াক্কুফ করা উচিত। কারণ দুজনের মাঝে সময়ের ব্যবধান অনেক। নুহ বিন আসাদ বিন সামানের মৃত্যু ২৪৫ হিজরির দিকে। আর ফকিহ আবু মানসুর মাতুরিদির মৃত্যু ৩৩৩ হিজরি। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এটা নিয়ে ভাবার আছে।

এ সংক্রান্ত আরও দুটি কবিতা পঙক্তি আমি দিমাশকের একটি প্রাসাদে নকশাকৃত কাঠের দেয়ালে লেখা দেখেছি,

حَفِظَ التَّارِيْخُ فِيْ طَيَّاتِهِ ‏ ‏ ‏ اِسْمَ مَنْ شَادُوْا عَلَى الْعَدْلِ الدُّوَلَ

وَلَقَدْ أَنْبَأَ عَمَّنْ ظَلَمُوْا! ‏ ‏ ‏ فَجَرَى ذِكْرُهُمْ مَجْرَى الْمَثَلِ!!

ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম সংরক্ষিত আছে যারা ইনসাফের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করে রাষ্ট্রকে সুসংহত করেছিল।

ইতিহাস আমাদের সেসব জালেমদের কথাও বলেছে। তবে মন্দের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে তাদের আলোচনা করা হয়েছে।

[৭৩] অর্থাৎ, আখেরাতে তোমার যেসব কাজে লাগবে সেগুলো সংশোধন করে নাও।
[৭৪] অর্থাৎ, আখেরাতের জন্য নেক আমল করে তুমি তোমার পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।

[৭৫] *নাহজুল বালাগায়* সাইয়েদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে: হে বনি আদম, তোমার সম্পদের ক্ষেত্রে তুমি নিজেই নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী হও। আর তোমার মৃত্যুর পর তোমার সম্পদ যেভাবে ব্যবহৃত হওয়া তুমি পছন্দ করো সেভাবে তুমি তোমার জীবদ্দশাতেই ব্যবহার করে যাও। ইমাম আহমদের *কিতাবুয যুহদ* গ্রন্থে (৩৩৩ নং পৃষ্ঠা) এই উক্তিটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র বিখ্যাত তাবেয়ি রাবি বিন খুসাইমের বলা হয়েছে।

কেননা তোমাকে তোমার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৭৭] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لَوْ عَقَلَ ابْنُ آدَمَ عَنْ رَبِّهِ كَانَ خَيْرًا لَّهُ مِنْ جِهَادِهِ.

যদি মানুষ তার প্রতিপালক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে, তাহলে তা তার জন্য জিহাদ করার চেয়ে উত্তম।

আখেরাতই যার একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান। যেমনটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে এসেছে,

---

আমি আমার সম্পদকে আমার প্রভুর নিকট গচ্ছিত রাখছি এবং আমার সন্তানদের জন্য আমার প্রভুকে রেখে যাচ্ছি:

বিখ্যাত তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন কাসিম আল মাদানি -মৃত্যু ১০৮ হিজরি কিংবা তার পরে- মদিনায় তার মালিকানাধীন কিছু সম্পদ ছিল। একবার তার কিছু মাল অর্জিত হলো। তখন তাকে বলা হলো এগুলো আপনি আপনার সন্তানের জন্য সঞ্চয় করুন। তিনি বললেন, না। তবে আমি এগুলো আমার নিজের জন্য আমার রবের নিকট সঞ্চয় করছি। আর আমার রবকে আমার সন্তানদের জন্য রাখছি।

তিনি যা সঞ্চয় করছেন এবং যার কাছে গচ্ছিত রাখছেন তা কতইনা উত্তম!

[৭৬] অর্থাৎ, আখেরাতের বিষয়ে তোমার ঘুমিয়ে থাকা ও উদাসীনতা থেকে জাগ্রত হও।
[৭৭] আবু বারযা আসলামি রা, থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোনো বান্দার পদদ্বয় (কিয়ামাত দিবসে) এতটুকুও সরবে না, তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা হবে, কীভাবে তার জীবনকালকে অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং কী কী কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে।

জামে’ আত-তিরমিযি, ৪:৬১২। আবু ইসা তিরমিযি বলেন, এ হাদিসটি হাসান সহিহ।

"تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا -مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّهُ مَن كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَا اللَّه ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللَّه -تعالى- لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّه إِلا جَعَلَ اللَّه قُلُوبَ الْمُؤْمِنِين تَنْقَادُ إِلَيْهِ بِالْوُدِّ وَالرَّحْمَةِ،

তোমরা যথাসম্ভব দুনিয়ার চিন্তা ফিকির থেকে অবসর হও। কারণ দুনিয়া যার সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তার দুনিয়াবি ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে আখেরাতের প্রস্তুতি থেকে ফিরিয়ে রাখেন এবং তার চোখের সামনে সবসময় অভাব ও দরিদ্রতাকে তুলে ধরেন।[৭৮] আর আখেরাত যার সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হয়, আল্লাহ তার যাবতীয় বিষয় ঠিক করে দেন এবং তার অন্তরে সচ্ছলতা দান করেন। কোনো বান্দা যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী হয়, আল্লাহ তায়ালা তখন মুমিনদের অন্তরে তার প্রতি রহমত ও ভালোবাসা ঢেলে দেন।[৭৯]

---

[৭৮] তার যত সম্পদ থাকুক, সে সবসময় নিজেকে দরিদ্র অভাবী ও বঞ্চিত মনে করতে থাকে।

[৭৯] হাদিসটি ইমাম সুয়ুতি *জামে সগিরে* উল্লেখ করেছেন যা আল্লামা মুনাবির ব্যাখ্যা গ্রন্থ *ফাইজুল কাদিরে* (৩/২৬০) আছে। সেই হাদিসের শব্দের সঙ্গে এই হাদিসের অনেক মিল রয়েছে। মুনাবি বলেন, তাবারানি এই হাদিসটি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। *জামে সগির* এবং *তাবারানিতে* جَمَعَ الله له-এর পরিবর্তে جَمَعَ الله أَمْرَه শব্দে এসেছে।

আর *জামে সগিরের* শেষ বাক্যটি এরূপ,

تَفِدُ إِلَيْهِ بِالوُدِّ وَ الرَّحْمَةِ.

অর্থাৎ, দ্রুত ধাবিত হয়। তারপরে এসেছে,

প্রিয় ভাই আমার! আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআনের বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় থেকে বেঁচে থাকো।[৮০] দিনের বিষয়ে তর্ক করা[৮১] এবং আল্লাহ তায়ালার

وَ كَانَ الله تعالى بِكُلِّ خَيْرٍ أَسْرَعَ

জামে সগিরের রেওয়ায়েতটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে,

تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيا مَا اسْتَطَعْتُمْ فإِنَّهُ مَنْ كانَتِ الدُّنْيا أكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَى الله ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ومَنْ كانَتِ الآخِرَةُ أكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ الله تَعَالى لَهُ أمْرَهُ وَجَعَلَ غِناهُ فِي قَلْبِهِ وَمَا أقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى الله تَعَالَى إِلَّا جَعَلَ الله قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ تَنقادُ إِلَيْهِ بالوُدِّ والرَّحْمَةِ وَكانَ الله تَعالى بِكُلِّ خَيْرٍ إِلَيْهِ أَسْرَعَ.

জামে সগিরের ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুনাবি বলেন, ইমাম মুনযিরি হাদিসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। হাইসামি বলেন, এর সনদে মুহাম্মদ বিন হাসসান মাসলুব আছেন। তিনি কাজ্জাব মিথ্যুক। অন্যরাও তাকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা মুনাবির কথা এখানে শেষ।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ র. বলেন, এই তাহকিকের ভিত্তিতে হাদিসটি চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বল। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

[৮০] অর্থাৎ, কুরআনের ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ পোষণ করা থেকে বিরত থাকো কিংবা উদ্দেশ্য: কুরআন মুহদাস নাকি কাদিম। অর্থাৎ, অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে নাকি পূর্ব থেকেই অস্তিত্বে ছিল এসব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়ো না। কিংবা উদ্দেশ্য মুতাশাবিহাতসমূহ। অর্থাৎ, যে সকল আয়াত বা শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে একাধিক অর্থ নেওয়া যায়, এর কোনো অর্থ নির্দিষ্ট নয় সেগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কুরআনকে কুরআন দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পিছনে পড়ো না। তা এভাবে যে একটি আয়াতকে অন্য আয়াতের বক্তব্যের পরিপন্থি সাব্যস্ত করা। যে কারণে কুরআনের বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

কুরআন নিয়ে যে গবেষণা করে তার কর্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং যথাসম্ভব বিপরীত বিষয়সমূহের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা। কারণ কুরআনের এক আয়াতে অপরাধকে সত্যায়ন করে। সুতরাং কারো যদি কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হয় আর সমন্বয় বিধান করা তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে তার এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে এটা তার জ্ঞান ও বোঝার দুর্বলতার কারণে। তার উচিত সে বিষয়টি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের দিকে সোপর্দ করা; পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

যদি তোমরা কোনো বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হও তাহলে সেটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের দিকে সোপর্দ করো।

মুসনাদে আহমদ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কুরআন শরিফ নাযিল হয়েছে কুরআন নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা কুফুরি। তিনি কথা বলেছেন, সুতরাং কুরআনের যা বুঝে আসে তার উপর তোমরা আমল করো। আর না জানা বিষয়ে নিজেকে কুরআনের আলেমের কাছে সোপর্দ করো। আল্লামা মুনাবিকৃত *ফাইজুল কাদির*: ৬/২৬৫।

[৮১] জিদাল এবং জাদাল শব্দের পরিচয়

১. جِدَالٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে, অন্যের উপর জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে তর্কে লিপ্ত হওয়া।

এটি আরবি جَدْلٌ থেকে নেওয়া হয়েছে। جَدْلٌ অর্থ: রশি, দড়ি। ক্রিয়ায় ব্যবহার:

جَدَلْتُ الحَبْلَ أَجْدُلُه جَدْلاً.

> অর্থ: আমি রশি দড়ি পাকিয়েছি। যেন দুজন বিতর্ককারীর প্রত্যেকে নিজের কথা দ্বারা অপরকে প্যাঁচিয়ে তার কথা থেকে ফিরিয়ে আনতে চায়। নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এভাবে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া শরিয়তে নাজায়েয। অবশ্য ইনসাফ ও সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তা জায়েয আছে।

তবে এরূপ উদ্দেশ্যে বিতর্ককারী বর্তমানে খুবই কম।

জাদল এবং ইফহাম এ দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আপনি যখন কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তার উপর জয়ী হতে চাইবেন তখন আপনি জাদল তথা বিতর্ক করছেন। আপনি বিতর্ককারী। আর আপনি যখন তাকে কোনো কিছু বোঝানোর, তার কাছে প্রিয় করে তোলার কিংবা তাকে আত্মস্থ করানোর চেষ্টা করবেন, তখন আপনি হবেন মুফহিম অর্থাৎ, যে বোঝায়। মুফহিম হতে পারলে দেখবেন যে শ্রোতা আপনার কাছ থেকে প্রকৃত সত্য জানতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। সে আপনাকে মহব্বত করছে এবং আপনার প্রতিকৃতজ্ঞ থাকছে।

ইমাম ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ তার এক রেসালায় বলেন, মানুষের জন্য ইসলামের একটি সৌন্দর্য হল, অনর্থক বিষয় বর্জন করা। আল্লাহ যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান তখন তিনি তার মাঝে কলহ-বিবাদের রোগ সৃষ্টি করে দেন। আর যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তিনি তাকে আমল করার তাওফিক দান করেন। তিনি যদি তোমার জিহ্বা ছিনিয়ে নিয়ে তোমার অন্তর তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন, তাহলে মনে করবে তিনি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন আর যদি তোমার অন্তর ছিনিয়ে নিয়ে তোমার জিহ্বা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন তাহলে তুমি বিরাট বিপদে পড়ে গেলে।

আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং এটাকে মানুষের হেদায়েত থেকে ভ্রষ্টতার দিকে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত সাহাবি আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

(مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ)

কোনো সম্প্রদায় হেদায়েতের রাস্তা পেয়ে আবার পথ ভোলা হয়ে থাকলে তা শুধু তাদের বিবাদ ও বাক-বিতণ্ডায় জড়িত হওয়ার কারণেই হয়েছে।

তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন,

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.

"এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়"। (সুরা যুখরুফ : ৫৮)

মুসনাদে আহমদ: ৫/২৫২। *ইবনে মাজাহ*, ১:১৯। *জামে' তিরমিযি*, ১২:১৩৩। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন। *মুসতাদরাকে হাকেম*: ২/৪৪৮। হাকেম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। ইমাম যাহাবি তার সহিহ বলাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ তার *মুসনাদে* (২/৩৫২,৩৬৪) মাকহুলের সূত্রে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يُؤمِنُ العَبدُ الإيمانَ كُلَّه حتّى يَترُكَ المِراءَ وَ إنْ كانَ صادِقًا

> মুমিন যতক্ষণ হকের উপর থাকা সত্ত্বেও তর্ক বর্জন না করে ততক্ষণ সে পূর্ণ ইমানদার হয় না।

এই হাদিসের সনদটি দুর্বল। কারণ তা মুনকাতে (বিচ্ছিন্ন)। মাকহুল আবু হুরায়রা রা.-এর কাছ থেকে হাদিসটি শুনেননি।

ইমাম তিরমিযি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করো না।

তিরমিযি: ৮/১৬০। তবে সনদ দুর্বল।

ইমাম তিরমিযি এবং ইবনে মাজাহ আনাস রা. থেকে অপর একটি হাদিস মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَرَكَ المِراءَ وَ هُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ.

> যে নিজে হক হওয়া সত্ত্বেও তর্ক না করে, জান্নাতের মাঝখানে তার জন্য একটি বালাখানা নির্মাণ করা হয়।

তিরমিযি: ৮/১৫৯; *ইবনে মাজাহ*: ১/১৯। ইমাম তিরমিযি এই হাদিসের সনদটিকে হাসান বলেছেন।

তর্ক যেহেতু ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং দুজন মানুষের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে, তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এজন্য তর্ক বর্জনকারীর জন্য এমন বিশাল প্রতিদান ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত তর্ক বর্জন করা ও তা থেকে দূরে থাকা।

এক লোক তাবেয়ি ইমাম সিরিন র.-এর সঙ্গে তর্ক করতে চাইলো। তখন তিনি তাকে বললেন, আমি জানি তোমার উদ্দেশ্য কী। আমি চাইলে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি। তবে আমি তর্ক করব না।

ইবনে সাদকৃত *তাবাকাতুল কুবরা*: ৭/১৯৫।

সিফাতের সীমা নির্ধারণ বিষয়ে কথা বলা থেকে দূরে থাকো।[৮২] তুমি তাদের মতো হও যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

---

বিতর্ক করার দশটি আদব

আমি তৎকালিন যুগে হাম্বলি মাযহাবের ইমাম মাহফুজ বিন আহমদ কালওয়াজিকৃত *আল-ইনতিসার ফি-মাসায়িলিল কিবার* গ্রন্থটির জনৈক আলেমের হাতে লেখা একটি নুসখা পেয়েছিলাম। সেই নুসখার উপরেই এই আদবগুলো লেখা ছিল। তারা অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিরল ও মুক্তার মতো দামী কোনো কথা পেলে অনেক সময় দ্রুত তা কিতাবের উপরই লিখে ফেলতেন। যাতে কখনো কথাটি ভুলে গেলে খুঁজে পেতে সমস্যা না হয়। কিতাবের উপরে থাকায় কিতাব যতবার হাতে নিবে, ততবার লেখাটি নজরে পড়বে। এভাবে বারবার দেখতে দেখতে তার মুখস্থ হয়ে যাবে

সেখানে লেখা ছিল, বিতর্ক করার আদব: এক. রাগ করবে না। দুই. ক্লান্তি প্রকাশ করবে না। তিন. আশ্চর্য হবে না। চার. কোনো বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত দেবে না। পাঁচ. হাসবে না। ছয়. নিজের দাবিকে দলিল বানাবে না। সাত. যখন আমরা ঘটনা বর্ণনা করব, তখন দৃষ্টান্ত এবং যার দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে উভয়ের মাঝে সাজুয্য বর্ণনা করব। আট. কোনো বুদ্ধিসম্মত দলিল পেশ করলে অধিক জানার উদ্দেশ্যে আমরা সেটার সমালোচনা করব। নয়. উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য যেন হয় নিজেকে অজ্ঞ মনে করে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করা। প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হওয়া নয়। দশ. প্রতিপক্ষ যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলবে, ততক্ষণ অন্য কারও প্রতি মনোযোগী না হওয়া।

বহস ও তর্ক-বিতর্কের আদব বিষয়ে এই কথাগুলো অত্যন্ত মূল্যবান

[৮২] এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য: আল্লাহর তায়ালার জাতের সীমা নির্ধারণ করতে যেয়ো না। অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সিফাতের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা অথবা তাঁকে কর্মহীন বলা যে, তিনি নিজে কোনো কিছু করেন না। বরং অন্যান্য মাখলুককে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন-ইত্যাদি আলোচনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

মূর্খরা তাদের সম্বোধন করলে তারা শুধু বলে সালাম। (সুরা ফুরকান, ৬৩)

আদব ও শিষ্টাচারকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। প্রবৃত্তি ও ক্রোধ থেকে দূরে থাকো। সতর্ক ও সচেতন থাকার উপায় অবলম্বন করো।[৮৩]

ইমাম ইবনুল জাওযি র. '*আল-মুতাশাবিহ ফিল কুরআন*' (পৃষ্ঠা, ১০-১১) নামক রিসালায় বলেন, বলো, আমি আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনলাম তাকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা, তার কোনো উদাহরণ তুলে ধরা ব্যতীত।' কেয়ামতের দিন তোমার মুক্তির ব্যাপারে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এ আকিদা পোষণ করতে হবে যে, তোমার রব কোনো কিছুর সদৃশ নন। আর কোনো কিছুও তার সদৃশ নয়।

আমি তোমাকে নিজের বুদ্ধি ও দর্শনের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِه شيءٌ (কোনো কিছু তার সদৃশ নয়।) যারা আল্লাহ তায়ালার সদৃশ সাব্যস্ত করে এবং জড়বস্তু ও জীবের ন্যায় তাঁকে দেহধারী বলে, তাদের দাবি খণ্ডনের জন্য কুরআনের এই আয়াতটিই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যারা তাঁকে কর্মহীন বলে তাদের দাবি খণ্ডনের জন্য কুরআনের এই নিম্নোক্ত আয়াতটি তোমার জন্য যথেষ্ট, وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ (আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা)।

আল্লাহ তায়ালার জাত ও সিফাত বা সত্তা ও গুণাবলী নিয়ে তর্ক ও চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর আর কিছু নেই। তোমরা আল্লাহর নেয়ামতরাজি নিয়ে চিন্তা করো। তাঁর জাত ও সিফাত নিয়ে নয়।

[৮৩] দুনিয়ার প্রবঞ্চনায় পড়ে আখেরাত সম্পর্কে মানুষের উদাসীনতা

দুনিয়ার ফেতনা খুবই রঙিন ও চাণক্যময়, যা মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। এটা তোমাকে তোমার শেষ পরিণতি সম্পর্কে বে-খবর, উদাসীন করে দেবে। মানযিলের কথা ভুলিয়ে দেবে। তাই ধোঁকার এই দুনিয়া থেকে সতর্ক ও সচেতন থাকার উপায়

অবলম্বন করা খুব জরুরি। ইবনুল মুকাফফা রহিমাহুল্লাহ আসলেই সত্য বলেছেন যে, মানুষ আখেরাতের বিষয়ে উদাসীন থেকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও খেল-তামাশায় মত্ত হয়। এটা তাকে তার উদ্দেশ্য ও মনযিল থেকে ফিরিয়ে রাখে। এর অশুভ পরিণতিতে সে দুনিয়ার ধোঁকার মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

তিনি তার বিখ্যাত *কালিলাতাও ওয়া দিমনা* নামক কিতাবে সিংহ ও ষাঁড়ের পরিচ্ছেদের পূর্বে আখেরাতের বিষয়ে মানুষের উদাসীনতা থেকে দুনিয়ার ধোঁকায় মত্ত থাকার বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে বড়ো সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

সেখানে তিনি বলেন, আমি মানুষের অনেক উদাহরণ খুঁজেছি। আমার কাছে মানুষের উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির মতো মনে হলো, যে এক পাগলা হাতির কাছ থেকে বাঁচতে কুয়ায় আশ্রয় নিয়ে উপর থেকে আসা দুটি ডাল ধরে ঝুলে রইল। আর তার পা দুটি কুয়ার মাঝে থাকা কোনো একটি কিছুর উপর রাখল। কুয়ার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরাতেই সে দেখল চারটি সাপ তাদের গর্ত থেকে মাথা বের করে রেখেছে। তারপর সে কুয়ার গভীরে তাকাল, তখন সে তিন্নিন সাপ দেখতে পেল- যা সাপদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সাপ, শুকনো খেজুর গাছের মতো লম্বা, রক্তের মতো লাল লাল চোখ, মুখটা এত বিশাল যে, একসঙ্গে অনেকগুলো প্রাণী গিলে খেতে পারে, দাঁতগুলো বর্শার ফলার মতো। সাপটি তাকে খাওয়ার জন্য মুখ হা করে আছে। সে কখন উপর থেকে পড়বে, এই অপেক্ষায় আছে। তারপর সে ডাল দুটির দিকে তাকালো। দেখলো ডালের গোড়ায় বড়ো বড়ো দুটি ইঁদুর, একটি সাদা আর একটি কালো। তারা বিরামহীনভাবে ডাল দুটি কেটে যাচ্ছে।

নিজেকে নিয়ে সে খুব ভীষণ বিপদ ও দুশ্চিন্তায় ছিল, হঠাৎ সে তার পাশেই একটি মধুর চাক দেখতে পেল, তাতে মধু আছে। সে তখন মধু খেতে শুরু করল। মধুর স্বাদ তাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিল। সে নিজের মুক্তির বিষয়ে চিন্তা করবে কি, মধু চেটে খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার মনেই নেই যে, তার পা দুটি চারটি সাপের একেবারে উপরে। কখন যে সে তাদের গ্রাসে পরিণত হয়, তা জানা নেই। তার মনে নেই, ইঁদুর দুটি অনবরত ডাল দুটি কেটে যাচ্ছে। তাদের কাটা শেষ হওয়া মাত্রই সে তিন্নিন সাপের উপর গিয়ে পড়বে; কিন্তু সে সব ভুলে তখনও মধু খেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তিন্নিন সাপের মুখে গিয়ে পড়ল। আর এভাবে সে ধ্বংস হয়ে গেল।

হে আল্লাহর বান্দা, আখেরাতের বিষয়ে গাফেল থেকো না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং তোমাকে গাফলত থেকে হেফাজতে রাখুন।

সর্বদা আল্লাহর ধ্যানমগ্নতা যেন হয় তোমার চূড়ান্ত লক্ষ্য। নম্রতাকে বন্ধু মনে করবে। ধীরস্থিরতাকে সঙ্গী, নিরাপত্তাকে আশ্রয়স্থল, অবসরকে গনিমত, পৃথিবীকে বাহন এবং আখেরাতকে নিজের মানযিল বানিয়ে নিবে।[৮৪]

হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,[৮৫]

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةً دُوْنَ الْجَنَّةِ.

আল্লাহ তায়ালা জান্নাত ছাড়া মুমিনের জন্য প্রশান্তির কোনো বস্তু তৈরি করেননি।[৮৬]

অন্তরে গাফলত সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকো। শয়তানের চক্রান্ত ও প্রবৃত্তির আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকো।,[৮৭] শাহওয়াতের তীব্রতা[৮৮] এবং নফসের মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকো।

---

৮৪ মূল কপিতে মানযিল শব্দের পরিবর্তে মানহিল শব্দটি আছে; কিন্তু সেটি ভুল। তাই এখানে সঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

৮৫ তিনি হলেন মহান তাবেয়ি হাসান বসরি। দুনিয়াবিমুখ ও ইবাদতগুজারদের ইমাম। মৃত্যু: ১১০ হিজরি। আয়েশা রা. তাঁর কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে তিনি যার কথা নবিদের কথার মতো? (দেখুন ইবনুল মুরতাযাকৃত আল-মুনয়াতু ওয়াল আমালু, পৃষ্ঠা নং ৩৬।)

৮৬ হাসান বসরি র. আরও বলেন, মৃত্যু দুনিয়াকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে। মৃত্যু দুনিয়াতে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য আনন্দ ও খুশির কিছু রাখেনি।

ইমাম যাহাবিকৃত *তারিখুল ইসলাম*: ৪/১০২।

হাসান বসরির ছাত্র মালেক বিন দিনার র. বলতেন,

عُرْسُ الْمُتَّقِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুত্তাকিদের বাসর তো কেয়ামতের দিন হবে। (অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন হবে তাদের খুশির দিন)।

আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ২: ৩৮০।

৮৭ অর্থাৎ, খাহেশাতের হামলা থেকে সতর্ক থাকো, যা তোমাকে দুর্বল করে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করবে।

৮৮ হারাম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ওয়াজিব। এর মাঝেই প্রকৃত স্বাদ নিহিত

অর্থাৎ, খাহেশাতের তীব্রতা এবং তার আগুন থেকে বেঁচে থাকো। মানুষ যদি যিকিরের পাশাপাশি নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে সামান্য সময়ের জন্যও বিরত থাকে এবং এর অনুসরণ ও বিরোধিতার পরিণাম ও পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে এটা তার জন্য অনেক বড়ো সফলতা এবং কুপ্রবৃত্তির উপর জয়লাভের কারণ হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির চাদর তাকে ঢেকে নিবে। তার অন্তর আলোকিত হয়ে যাবে। রুহ উচ্চমার্গে পৌঁছে যাবে। ইমান বৃদ্ধি পাবে। ফেরেশতারা তাকে বেষ্টন করে রাখবে। সে রুহানি ও আসমানি এমন বরকত লাভ করবে, যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব না। সুতরাং আল্লাহকে আঁকড়ে ধরে সাহায্য প্রার্থনা করো, মুক্তি লাভ করবে।

নিজের খাহেশাত ও প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ কতই না উত্তম, এতে ফেরেশতারা তোমার উপর খুশি হয়, মুবারকবাদের দোয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আর তোমার প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ কতই না নিকৃষ্ট! এতে শয়তান তোমার প্রতি খুশি হয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টি তোমাকে বেষ্টন করে নেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং তোমাকে নিজের উপর প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে হেফাজত করুন।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, জেনে রাখো, কুপ্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে গুনাহ করার কারণে যে মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হয়, তার চেয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে ধৈর্যধারণ করা অধিক সহজ। কারণ, কিছু গুনাহ এমন আছে, যা করলে পরিণামে তোমাকে অবশ্যই যন্ত্রণা ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিংবা সেই গুনাহের স্বাদের চেয়ে অধিক উপভোগ্য কোনো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অথবা তা তোমার জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে তোমার জন্য লজ্জা ও অনুতাপ বয়ে নিয়ে আসবে। কিংবা তা তোমার মান-সম্মান নষ্টের কারণ হবে, যা নষ্ট না-হওয়াটা তোমার জন্য উত্তম ছিল। অথবা তা তোমার মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করে ফেলবে, কিংবা মানুষের মাঝে তোমার খ্যাতি ও মর্যাদা কমিয়ে দেবে। এই খ্যাতি ও মর্যাদা না-কমাটাই ছিল তোমার জন্য কল্যাণকর। অথবা সেই পাপের কারণে কোনো অপদস্থ ও নীচ তোমার ইজ্জত নিয়ে টান দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে, অথচ এতদিন সে এই সুযোগ পায়নি, কিংবা তুমি এমন দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-

এজন্য যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَعْدٰى أَعْدَائِكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ.

'তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তোমার মাঝে বসবাসকারী নফস।'[৮৯] আর তা সবচেয়ে বড়ো শত্রুতে পরিণত হয়েছে, তার কথামতো তোমার চলার কারণে।

যেকোনো বিষয়ে হক অস্পষ্ট মনে হলে, তুমি তা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহিনের জীবনদর্পণের সামনে তুলে ধরবে।[৯০] তারপরও স্পষ্ট না হলে, যার দিন ও ইলমের ব্যাপারে তোমার সন্তুষ্টি আছে, তার মত গ্রহণ করবে।

যাতনায় নিক্ষিপ্ত হবে, যার তুলনায় সেই গুনাহের স্বাদ খুবই নগণ্য। অথবা তুমি এমন ইলম ভুলে যাবে, যা ভুলে না-যাওয়াটাই তোমার জন্য অধিক উত্তম ও উপভোগ্য ছিল। গুনাহ করতে গিয়ে তুমি কখনো-কখনো এমন কাজ করে বসবে, যা তোমার শত্রুকে আনন্দিত করবে আর বন্ধুকে করবে ব্যথিত, অথবা তোমার যে নেয়ামত লাভ করার কথা ছিল তা আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, বা তোমার ব্যক্তিত্বে কলঙ্কের এমন দাগ বসবে, যা আর কখনো মুছবে না। কারণ কর্ম অনুযায়ী মানুষের চরিত্র ও গুণ বিশেষিত হয়। (অর্থাৎ, কর্ম ভালো হলে তাকে ভালো বলা হয়। আর কর্ম খারাপ হলে...। (*কিতাবুল ফাওয়ায়েদ*: ১৩৯।)

[৮৯] ইমাম বাইহাকি কিতাবুয যুহদে হাদিসটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এর একটি সমর্থক হাদিস আছে যা হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত।

হাফেয ইরাকি বলেন, ইমাম বাইহাকি হাদিসটি ইবনে আব্বাস রা. থেকে কিতাবুয যুহদে বর্ণনা করেছেন। সনদে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান গাযওয়ান হাদিস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেখুন *তাখরিজু আহাদিসিল ইহইয়া* গ্রন্থের শুরুর দিকে।

আল্লামা যুবাইদি হাফেয ইরাকির তাহকিকের পরে বলেন, এই হাদিস সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজারের হস্তলিখিত মতটি আমি দেখেছি। তার মতটি ছিল, এই সনদ ছাড়াও আরও একাধিক সনদে হাদিসটি হযরত আনাস রা. ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। *শারহুল ইহইয়া*: ৭/২০৬।

৯০ আলজেরীয় কপিতে ইবারতটি এই শব্দেই আছে। আর মূল কপি দুটিতে ইবারত এভাবে আছে,

وَكُلُّ أَمْرٍ لَاحَ لَكَ ضَوْؤُهُ بِمِنْهَاجِ الْحَقِّ، فَاعْرِضْهُ عَلَى الْكِتَابِ.

অর্থ: কোনো বিষয় তোমার কাছে কল্যাণকর মনে হলে, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহিনের জীবনাদর্শের সামনে পেশ না করে তুমি তা বাস্তবায়ন করো না।

কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সুফিয়ায়ে কেরামের সম্পর্ক

জুনায়েদ বাগদাদি র. বলেন, আমাদের সুফিদের তরিকা ও মাযহাবের ভিত্তি একমাত্র কুরআন ও হাদিস। সুতরাং কুরআনের অর্থ যার জানা নেই, সে যদি হাদিস লিখে ফিকহ অর্জন করে নেয়, তাহলেও তাকে অনুসরণ করা যাবে না।

দেখুন শাইখ ইবনুল কায়্যিমকৃত *ইগাছাতুল লাহফান*: ১/১২৫।

শায়খ শারানি তার *কাশফুল গুম্মা* নামক কিতাবে (১/১০) লিখেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেননি, তা অন্ধকারপূর্ণ। এ পথ যে অনুসরণ করবে, সে ভ্রষ্টতা ও ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, সর্বাবস্থায় শরিয়তের উপর চলবে। নিজের কাশফ ও কারামতের অনুসরণ করবে না। কারণ তা ভুলও হতে পারে। অধিক পরিমাণে ফিকহের কিতাব মুতালাআ (অধ্যয়ন) করবে, কিন্তু কিছু সুফিদের দেখা যায়, যাদের মাঝে তরিকতের কিছু আসর দেখা দিয়েছে, তারা ফিকহের কিতাব পড়া ছেড়ে দিয়েছে। অজ্ঞতাস্বরূপ বলছে, এসব ফিকহ হলো অন্তরায় (তরিকতের পথে)।

শারানির জীবনবৃত্তান্ত আলোচনায় ইবনে ইমাদ *শাযারাতুয যাহাব* নামক গ্রন্থে (৮/৩৭৪) এটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গাযালি র. বলেন, জুনায়েদ বাগদাদি র. বলেন, একদিন আমার শায়খ হযরত সিররি সাকতি আমাকে বললেন, আমার এখান থেকে যাওয়ার পর তুমি কার মজলিসে যাও? আমি বললাম, হারেস মুহাসেবির নিকট। তিনি বললেন, বেশ! তার কাছ থেকে তুমি ইলম ও আদব গ্রহণ করবে। তবে কালামশাস্ত্র ও কালামশাস্ত্রবিদদের নিয়ে তিনি যেসব কথা বলেন, সেগুলো গ্রহণ করবে না। আমি তার কাছ থেকে উঠে আসার সময় তাকে বলতে শুনলাম, আল্লাহ তোমাকে হাদিসওয়ালা সুফি বানিয়ে দিন। তাসাউফের জ্ঞানসম্পন্ন হাদিসওয়ালা না।

(অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে কুরআন ও সুন্নতকে প্রাধান্য দেওয়া সুফি বানিয়ে দিন, তাসাউফের জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া সুফি নয়।)

ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ১/৩৭-৩৮।

ইমাম গাযালি র. বলেন, তিনি এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছে, তারপর তাসাউফের, সে সফলতা লাভ করেছে। আর যে ইলম অর্জনের আগেই তাসাউফে মশগুল হয়েছে, তার নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা আছে।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ তার *শারহু হাদিসিল ইলম*-নামক গ্রন্থের ১৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন, অনেক মানুষ যারা নিজেদের বাতেনি ইলমের অধিকারী বলে দাবি করে, এটা নিয়ে কথা বলে এবং এতেই সীমাবদ্ধ থাকে: তারা শরিয়তের বাহ্যিক ইলম, অর্থাৎ, বাহ্যিক হুকুম-আহকাম, হালাল-হারাম, এসবের সমালোচনা করে এবং এসব বিষয়ের আলেমদের নিন্দা করে বলে, আসল ইলম জাহেরি ইলমের অধিকারী এসব ব্যক্তির আড়ালে রয়ে গেছে। তাদের কাছে তো ইলমের শুধু খোসাটা আছে। মূল ইলম তো আমাদের কাছে।

মূলত এসব মন্তব্যের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পবিত্র শরিয়ত ও নেক আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তার প্রতি দোষারোপ করা হয়। অনেক সুফি তো নিজেদের শরয়ি হুকুমের ঊর্ধ্বে মনে করে এবং দাবি করে যে, এগুলো সাধারণ মানুষের জন্য, যে হক পেয়ে গেছে তার জন্য নয়। তার জন্য এসব হুকুম পালন মর্তবা হাসিলের পথে বাধাস্বরূপ।

জুনায়েদ বাগদাদি র. ও অন্যান্য সুফিগণ যেমন বলেছেন, এরা পৌঁছে গেছে, তবে জাহান্নামে (হকের কাছে নয়)। শয়তান তাদের সবচেয়ে বড়ো ভ্রান্তি ও ধোঁকার শিকার বানিয়ে ফেলেছে। সে এখন তাদের নাচাতে থাকবে, এভাবে এক সময় সে তাদের ইসলাম থেকে খারিজ করে দেবে।

কেউ কেউ ধারণা করে এই বাতেনি ইলম নবুয়তের আলো ও কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং তা অর্জন করতে হবে একমাত্র অন্তরের হালাত, ইলহাম, কাশফ ও কারামাতের মাধ্যমে। এরাও নবিজির পূর্ণাঙ্গ দিন ও শরিয়তের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল ধারণায় লিপ্ত। কারণ তাদের ধারণা, যে উপকারী ইলমের মাধ্যমে আত্মার সংশোধন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, রাসুলের দিন ও শরিয়ত তা নিয়ে আগমন করেনি। এ ভ্রান্ত বিশ্বাস রাসুলের মুবারক শিক্ষা থেকে তাদের সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তাসাউফের বিষয়ে নিজের মনগড়া কথা বলতে প্ররোচিত করেছে। এভাবে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে।

জেনে রাখো; মানুষের অন্তরে সত্যকে গ্রহণ করার প্রবণতাই সত্যের সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দান করে।[৯১] তুমি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদিসটি শোননি?

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَ إِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ.

নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো যদিও মুফতি সাহেবরা তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকে।[৯২]

---

[৯১] **হকের উপর বাতিল কখন বিজয়ী হয়?**

১. কারণ সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি হককে স্বাভাবিকভাবেই কবুল করে নেয় এবং বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এজন্য যতক্ষণ মানুষের অন্তর হকের সঙ্গে জুড়ে থাকবে, হকের উপর স্থির থাকবে, ততক্ষণ হক বাতিলের মুকাবেলায় জয়ী হবে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে (মুতাযিলা ফেতনার সময় যখন মুতাযিলারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং তৎকালিন বাদশার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা মানুষকে কুরআন মাখলুক এ কথার দিকে দাওয়াত দিচ্ছিল) জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কি দেখছেন না কীভাবে হকের উপর বাতিল জয়লাভ করল? তিনি বললেন, কখনো না। হকের উপর বাতিলের জয় হলো, মানুষের অন্তরগুলো হক থেকে দূরে সরে গিয়ে বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়া। অথচ আমাদের অন্তরগুলো এখনও হককে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে।

ইবনুল জাওযিকৃত *মানাকিবুল ইমাম আহমদ*, পৃষ্ঠা নং ৩১১।

[৯২] ইমাম বুখারি হাদিসটি এই শব্দে *তারিখুল কাবিরে* সাহাবি ওয়াবেসা বিন মাবাদ আসাদি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইমাম সুয়ুতি *জামে সগিরে* উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববি *আরবায়িনের* ২৭ নং হাদিসে এটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে হাদিসটি পূর্ণরূপে এসেছে। তারপর তিনি বলেন, 'এটি হাসান হাদিস, যা আমি *মুসনাদে আহমদ* ও *মুসনাদে দারেমি* থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছি।'

ইমাম নববির *আরবায়িনে* বর্ণিত পূর্ণ হাদিসটি এরূপ, ওয়াবেসা ইবনে মাবাদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

আমি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি নেকি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?'

আমি বললাম, জি, হাঁ।

তিনি বললেন, 'নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো, যা সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তা হচ্ছে নেকি, আর যা তোমার আত্মাকে অশান্তিতে রাখে ও মনে সংশয় সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে গুনাহ, যদিও মানুষ (তার স্বপক্ষে) ফাতওয়া দেয়।

'নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো'–কথাটি কাকে বলা যাবে?

ইমাম গাযালি র. *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিনে* (৫:৬) এই হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, এমন অন্তরের অধিকারীর সংখ্যা খুবই কম? এ কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে বলেননি, তুমি নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো। বরং তিনি শুধু হযরত ওয়াবেসা রা.-কে এই কথা বলেছেন বিবেককে। কারণ তিনি তার সম্পর্কে জানতেন।

ইমাম গাযালি র. আরও বলেন, অন্তরকে জিজ্ঞাসা শুধু উলামায়ে কেরাম কর্তৃক বৈধ বিষয়সমূহে করা যাবে। তারা কোনো বিষয় হারাম বললে, সে বিষয়ে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। বিরত থাকতে হবে। তারপরও আমরা সবাইকে এ অধিকার দিতে পারি না। কারণ অনেক মানুষ আছে, খুব ওয়াসওয়াসা প্রবণ। সে সব বিষয়ে (সন্দেহ পড়ে) নাজায়েয বলে দেবে। আবার অনেকে আছে শিথিলপন্থি, সে সব বিষয়কে জায়েয বলে দেবে। তাই এ দুই প্রকারের মানুষের গণনা করা যাবে না। গণনা শুধু সেই আলেমকে করতে হবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকপ্রাপ্ত, সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ বুঝতে পারে। কারণ, সে হচ্ছে এমন মানদণ্ড যার মাধ্যমে প্রকৃত বিষয় যাচাই করা যায়। আর এ ধরনের অন্তর খুব কম মানুষের আছে।

ইমাম শাওকানির *ইরশাদুল ফুহুল*: ২৩৩।

আল্লামা মুনাবি *ফাইযুল কাদিরে* (১/৪৯৫) বলেন, জনৈক আলেম বলেন, যদি এই হাদিসে সম্বোধন সকলের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলেও কথাটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, আল্লাহ যার বক্ষকে ইয়াকিনের নুর ও বিশ্বাসের আলো দ্বারা উন্মুক্ত করেছেন,

শরয়ি দলিল ছাড়া চিন্তাশক্তি ব্যবহার করে কোনো মাসআলা যে বলে দিতে পারে, কিন্তু কেউ যদি এমন না হয়, তাহলে তার জন্য শরিয়তের মাসআলার অনুসরণ করা আবশ্যক। যদিও সেই মাসআলা তার বুঝে না-আসুক।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি র. বলেন, এই হাদিস এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে হক চেনার, হকের প্রতি আশ্বস্ত হওয়ার ও হককে গ্রহণ করার যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার ভেতরে প্রকৃতিগতভাবেই হকের প্রতি ভালোবাসা এবং বাতিলের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে রেখেছেন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আদিষ্ট তথা নেক আমলের বিষয়কে মারুফ (পরিচিত। অর্থাৎ, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি যার সঙ্গে পূর্ব থেকে পরিচিত) আর নিষিদ্ধ তথা গুনাহের বিষয়কে মুনকার (অপরিচিত) বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন, মুমিনের অন্তর আল্লাহ তায়ালার যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। হযরত ওয়াবেসা রা.-এর হাদিসটি দ্বারা আমরা জানতে পারি, কোনো বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা যাবে। তারপর তা যে বিষয়ের প্রতি আশ্বস্ত হবে, তা নেক ও হালাল কাজ। আর যে বিষয়ের প্রতি আশ্বস্ত হবে না, তা গুনাহ ও হারাম কাজ।

আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি মাক্কি বলেন, ওয়াবেসা রা.-কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেওয়া উত্তরের মাঝে এদিকে ইঙ্গিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সঠিক বুঝ, অত্যধিক মেধা ও আলোকিত অন্তরের অধিকারী মনে করতেন। এজন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার অন্তরের বুঝের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, সে নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পেয়ে যাবে। কারণ তার মতো যোগ্য লোক নিজে নিজেই বুঝতে পারে। আর যদি ভারী মাথা ও মোটা বুদ্ধির অধিকারী হয় তাহলে তাকে এমন নির্দেশ দেওয়া হবে না। কারণ সে কোনো বিষয়ের ফলাফলে পৌঁছতে পারে না। বরং তার সামনে শরিয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হয়। সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আচরণ এমন ছিল। তিনি তাদের সঙ্গে তাদের মেধার স্তর অনুযায়ী কথা বলতেন। এ কারণে আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আদেশ করেছেন, মানুষের সঙ্গে তাদের স্তর অনুযায়ী আচরণ করার।

(দেখুন ইমাম নববির *আরবায়িন*-এর উপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল মুবিন বি-শারহিল আরবায়িন*: পৃষ্ঠা নং ১৯২।

দৃঢ় ইলমের মাধ্যমে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখো।[৯৩] আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের পদ্ধতি জানার মাধ্যমে নিজের ভাবনা চিন্তার প্রতি খেয়াল রাখো। তুমি তাঁর দরবারে এমনভাবে দাঁড়াও যেভাবে নিরাপত্তা কামনাকারী গোলাম তাঁর প্রভুর সামনে দাঁড়ায়, তাহলে তুমি তাঁকে দয়া ও অনুগ্রহশীল পাবে।[৯৪]

---

[৯৩] ইমাম মুহাসেবি র.-এর এই কথাটির উদ্দেশ্য, কোনো কাজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করার আগে শরিয়তের হুকুম জেনে নেওয়া আবশ্যক। অন্যথায় লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। কারণ, যে ইলম ব্যতীত আমল করে সে সঠিকের চেয়ে ভুল বেশি করে।

সাইয়েদুনা উমর ইবনে আবদুল আযিয র. বলেন, ইলম ছাড়া যে ইবাদত করে, এক বর্ণনায় আছে, ইলম ছাড়া যে আমল করে, তার লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়।

সুনানে দারেমি: ১/৭৭; ইমাম আহমদকৃত *কিতাবুয যুহদ*: পৃ. ৩০১। খতিবে বাগদাদিকৃত আল-*ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*: ১/১৯। ইবনে আবদুল বারকৃত *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*: ১/২৭। ইমাম যাহাবিকৃত *তাযকিরাতুল হুফফাজ*: ১/৩৪৯।

[৯৪] যে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে একান্তমনে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ডাকে কত দ্রুত সাড়া দেন এবং তাকে কত দ্রুত সাহায্য করেন!

এক শ্রমিকের ঘটনা যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করে নিহত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল:

পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত আছে,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

> অর্থ, বরং তিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন...। (সুরা নামল, আয়াত নং ৬২)

হাফেয ইবনে কাসির তার তাফসিরে (৩/৩৭১) এই আয়াতের তাফসিরে হাফেয ইবনে আসাকির দিমাশকির গ্রন্থ থেকে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করেন:

এক ব্যক্তি তার খচ্চরে আরোহণ করে দামেশক হতে যাবাদানি পর্যন্ত মানুষ পৌঁছে দিত। একবার এক ব্যক্তি তার খচ্চরে আরোহণ করল। সে বলল, আমি একটি পথ ধরে তাকে নিয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু লোকটি আমাকে অন্য পথ ধরে চলতে বলল।

সে বলল, এই পথ ধরে চলো, তা অধিক নিকটবর্তী। আমি তাকে বললাম আমার তো এই পথ চেনা নেই। তখন সে বলল, এই পথ অধিক নিকটবর্তী। (তার পীড়াপীড়িতে) আমি সেই পথ ধরে চলতে লাগলাম। কিন্তু চলতে চলতে একটি গভীর বনে পৌঁছে গেলাম। সেখানে (এক ভয়ানক দৃশ্য আমার নজরে পড়লো। বহু) মৃতের লাশ পড়ে আছে। লোকটি আমাকে খচ্চর থামাতে বলল। আমি খচ্চর থামালে সে নেমে পড়ল। তারপর কাপড়চোপড় শক্ত করে গুটিয়ে নিল। তারপর একটি ছুরি বের করে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। আমি ছুটে পালাতে চেষ্টা করলে সে আমাকে ধরে ফেলল। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলাম। তাকে বললাম, তুমি আমার খচ্চর ও মাল সব নিয়ে যাও; তবু আমাকে ছেড়ে দাও। সে বলল, মাল তো সব আমারই হবে, তবে তোমাকে আমি হত্যা করবো। আমি তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখালাম কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করল না। তখন আমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বললাম, তুমি আমাকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবার অনুমতি দাও। সে বলল, জলদি করো। আমি নামাজের জন্য দাঁড়ালাম কিন্তু আমার মুখে কুরআনের একটি হরফ উচ্চারিত হচ্ছিল না। আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর সে আমাকে দ্রুত নামাজ শেষ করার তাড়া দিচ্ছিল। হঠাৎ আল্লাহর অনুগ্রহে আমার মুখ থেকে এই আয়াত উচ্চারিত হলো,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

> বরং তিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন...।

এমন সময় একজন অশ্বারোহী উপত্যকার প্রবেশ পথ দিয়ে দ্রুত আসলো, তার হাতে একটি বর্শা ছিল। সে তা সেই দস্যুকে লক্ষ করে নিক্ষেপ করল। আর বর্শাটি নির্ভুলভাবে তার বুকে গিয়ে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি অশ্বারোহীকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি সেই মহান সত্তার প্রেরিত দূত, যিনি কোনো অসহায় ব্যক্তি তার নিকট দোয়া করলে তিনি তা কবুল করেন এবং বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন। লোকটি বলল, আমি তখন আমার খচ্চর নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলাম।'

সুবহানাল্লাহ! সেই মহান সত্তা পবিত্র, যিনি আশ্রয় দান করেন অথচ তার কারও আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُنْزِلُ العَبْدَ مِن نفسه بِقَدْرِ مَنْزِلَته منه.

বান্দা তার অন্তরে আল্লাহ তায়ালাকে যতটুকু মর্যাদা দান করে, আল্লাহ তায়ালাও তাকে ততটুকু মর্যাদা দান করেন।[৯৫]

---

[৯৫] এটি দীর্ঘ একটি হাদিসের অংশ, যা আল্লাহ তায়ালার যিকিরের ফযিলতের ব্যাপারে এর অনুরূপ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের প্রথম অংশটি হযরত জাবের রা. থেকে নিম্নোক্ত শব্দে মারফুভাবে বর্ণিত হয়েছে,

يا أَيُّها الناسُ! إن لله سَرَايا مِن المَلائِكَة تَحِلُّ وَ تَقِفُ عَلى مجالِسِ الذِّكْرِ في الأَرْضِ... إِنَّ للهَ يُنْزِلُ العبدَ منه حيثُ أَنْزَلَه مِنْ نَفْسِه.

হাফেয মুনযিরি র. বলেন, ইবনু আবিদ দুনিয়া, আবু ইয়ালা, বাযযার, তাবারানি, বাইহাকি এবং হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদকে সহিহ বলেছেন। এই হাদিসের সমস্ত সনদে গুফরার আযাদকৃতকৃতদাস উমর আছে। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন ও ইমাম নাসায়ি তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, তার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। তবে তার অধিকাংশ হাদিস মুরসাল। ইবনে সাদ বলেন, তিনি বিশ্বস্ত, তবে প্রচুর হাদিস বর্ণনা করতেন। সনদের অন্যান্য রাবিগণ বিশ্বস্ত, প্রসিদ্ধ ও উদ্ধৃতি দেওয়ার উপযুক্ত। এ কারণে হাদিসটি হাসান। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। (*আত তারগিব ওয়াত তারহিব*: ৩/৬৫; ৫/৫৩৪)

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, হাফেয যাহাবি র. *তালখিসুল মুসতাদরাকে* (১/৪৯৫) হাকেম র.-এর এই হাদিসটি বর্ণনা ও তার মন্তব্য: হাদিসটি সহিহ সনদের.-এরপর বলেন, আমি বলি, সনদের উমর দুর্বল।

ইমাম যাহাবি *মিযানুল ইতিদালে* (২/২৬৪) উমর সম্পর্কে ইমাম মুনযিরির উদ্ধৃতিটি তুলে ধরার পর বলেন, ইবনে হিব্বান বলেন, উমর সে সমস্ত রাবিদের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদিসের বর্ণনাকে উলট পালট করে। সে বিশ্বস্ত রাবিদের থেকে বর্ণনা করত। তবে তার বর্ণনা শক্তিশালী রাবিদের মতো মনে হতো না। তার উদ্ধৃতি দেওয়া ঠিক হবে না। আর কোনো কিতাবে তার উল্লেখ শুধু সাক্ষ্য হিসেবে আনা যেতে পারে। ইমাম যাহাবি তারপর উপরোক্ত হাদিসটি উমর সম্পর্কে ইবনে হিব্বানের কথার সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেন।

আর অন্তরে আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় বান্দার ভয়, ইলম ও মারেফাত অনুযায়ী।

জেনে রাখো, আল্লাহকে যে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাকে প্রাধান্য দেন।[৯৬] যে আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহর ওয়াস্তে যে কোনো কিছু ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তায়ালা সে কারণে তাকে আযাব দিবেন না। যেমনটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

دَعْ ما يُرِيْبُكَ إلى مَا لا يُرِيْبُكَ.

> 'সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে দিয়ে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো।' কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি যা ছেড়ে দিয়েছো তা কখনোই তুমি হারাবে না। [৯৭]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, উমর ইবনে আবদুল্লাহ আল মাদানি যিনি গুফরার আযাদকৃতকৃতদাস, দুর্বল। তিনি প্রচুর মুরসাল রেওয়ায়েত করতেন। দেখুন *তাকরিবুত তাহযিব।*

সুতরাং হাদিসটি দুর্বল। আর হাফেয মুনযিরির হাদিসটিকে যে সহিহ বলেছেন, তা ঠিক নয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

[৯৬] যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যকে নিজের সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশেষভাবে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি দান করবেন।

[৯৭] পুরো হাদিসটি এই শব্দে ইমাম মালেক থেকে, তিনি নাফের সূত্রে, নাফে ইবনে ওমরের সূত্রে মারফুভাবে আবু নুআইম *হিলয়াতুল আউলিয়ায়:* ৬/৩৫২; খতিব বাগদাদি *তারিখে বাগদাদে:* ২/৩৮৭ বর্ণনা করেছেন। হাফেয যাহাবি *তাযকিরাতুল হুফফাজে* ৩/৮১৪ ইবনে মা'দানের জীবনবৃত্তান্তে বলেন, তার পুরো নাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন রাশেদ বিন মাদান। তবে তার এই সনদটি নিয়ে অনেক আপত্তি আছে। আবু নুআইম, খতিব বাগদাদি, ইমাম যাহাবিসহ সবাই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এসব আপত্তির পেছনে কারণ, এই সনদে আবদুল্লাহ বিন রুমান (ইস্কান্দারি) আছেন। উপরের সবাই তাকে দুর্বল বলেছেন। আর শেষ বাক্যটি,

অর্থাৎ, فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ হাদিসে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে। এই কথাটি হাদিস হিসেবে প্রমাণিত নয়। তাই আমরা মূল হাদিসের দুপাশে ঊর্ধ্বকমার বাইরে এই বাক্যটি উল্লেখ করেছি।

(তরজমাতেও আমরা এটিকে হাদিসের বাক্যের বাইরে রেখেছি।-অনুবাদক)

কারণ হাদিসটি ইমাম আহমদ হযরত আনাস রা. থেকে তার *মুসনাদে*, নাসায়ি হযরত হাসান আলি রা.-এর সূত্রে, তাবারানি ওয়াবেসা বিন মাবাদের সূত্রে এই অতিরিক্ত বাক্যটুকু ছাড়া নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম সুয়ুতির জামে সগিরেও হাদিসটি আছে। জামে সগিরের ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুনাবি বলেন, হাদিসটির সনদ হাসান। এর কিছু সমর্থক হাদিস আছে, যা হাদিসটিকে সহিহ-এর স্তরে নিয়ে গেছে।

দেখুন *আত-তাইসির বি-শারহিল জামে সগির।*

ইমাম আহমদ মুসনাদে, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম মুসতাদরাকে ২/১৩, আবু নুআইম *হিলয়াতুল আউলিয়ায়*, ৮/২৬৪ হাসান বিন আলি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো। কারণ হক হলো, নিশ্চিত আর মন্দ হলো সন্দেহ।

হাকেম বলেন, এটি সহিহ সনদের হাদিস। তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এই হাদিসটি তাদের কিতাবে আনেননি। ইমাম যাহাবি হাকেমের সমর্থনে বলেন, সহিহ হাদিস।

আর শেষ বাক্যটি মূলত কাজি শুরাইহের কালাম। দেখুন ইবনে সাদকৃত *তাবাকাতে কুবরায়:* ৬/১৩৬; *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক:* ১১/১৫৭,৩০৮। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তাকওয়া অবলম্বন করা যেমন সহজ; তেমনি কঠিন

এখানের আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করে হাসসান বিন আবি সিনান বসরি, যিনি তাবেয়িদের মাঝে প্রসিদ্ধ ইবাদতগুজার এবং হাসান বসরির শিষ্য ছিলেন, তার উক্তিটি তুলে ধরছি। তিনি বলেন, তাকওয়া অবলম্বনের চেয়ে সহজ কোনো বিষয় দেখতে পাইনি। তা এভাবে যে, যা তোমার কাছে সন্দেহযুক্ত

উত্তম ব্যাখ্যার মাধ্যমে মন্দ ধারণা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখো। সংক্ষিপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে হিংসাকে প্রতিরোধ করো এবং আল্লাহর ক্ষমতার কথা স্মরণ করে অহংকার বর্জন করো।[৯৮] ওজর পেশ করতে হয় এমন কাজ পরিত্যাগ করো।[৯৯] কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে হয় এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকো।

বলে মনে হয়, তা ছেড়ে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো। ইমাম বুখারি র. এই উক্তিটি সহিহ বুখারিতে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের শুরুতে মুতাশাবিহাত বা সন্দেহজনক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ পরিচ্ছেদের টীকায় উল্লেখ করেছেন।

বুখারির ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার *ফাতহুল বারিতে* (৪/২৫০) এবং *তাহযিবুত তাহযিবে* (৩/৩৫৩) বলেন, 'আবু নুআইম *হিলয়াতুল আউলিয়ায়* যুহাইর বিন নুআইম বাবি সালুলি র.-এর (যিনি দুনিয়া বিমুখ আবেদ ও সংসারত্যাগী মানুষ ছিলেন) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইউনুস বিন উবাইদ (আবদি র., হাসান বসরি র.-এর ছাত্র, মৃত্যু ১৩৯) এবং হাসসান বিন আবি সিনান একসঙ্গে হলেন। তখন ইউনুস বললেন, আমি আমার নিজের অবলম্বনের জন্য তাকওয়ার চেয়ে কঠিন কিছু খুঁজে পাইনি। তখন হাসসান বলেন, তবে আমি তাকওয়া অবলম্বনের চেয়ে সহজ কিছু খুঁজে পাইনি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কী রকম? হাসসান বললেন, যা আমার কাছে সন্দেহযুক্ত বলে মনে হয়, আমি তা ছেড়ে সন্দেহমুক্তটি গ্রহণ করি। এভাবে আমার প্রশান্তি হয়ে যায়।

জনৈক আলেম বলেন, হাসসান তার নিজের স্তর ও মর্তবা অনুযায়ী কথাটি বলেছেন। আর তিনি যেটাকে সহজ বলছেন, তা অনেক মানুষের কাছে বহু কষ্টকর কাজের চেয়েও কঠিন।'

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, সেই ব্যক্তিকে অভিবাদন, যার মনোবল এত উঁচু হবে, যা তাকে হাসসান বিন সিনানের পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সে শান্তিতে থাকবে।

[৯৮] অর্থাৎ, আল্লাহর ক্ষমতার চিন্তা করে অন্তর থেকে অহংকারকে বের করে ফেলবে।

[৯৯] সাইয়েদুনা আলি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকো, সুস্থ বিবেক যা অপছন্দ করে। যদিও তোমার নিকট কাজটি করার কোনো ওজর থাকে। কারণ, তোমার এই মন্দ কাজটির কথা শুনে যারা সমালোচনা করবে তাদের সকলের নিকট গিয়ে তুমি ওজর পেশ করতে পারবে না।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে দিনের হেফাজত করো। ইলম অর্জনের মাধ্যমে আমানত রক্ষা করো। সহনশীল ব্যক্তিদের শিষ্টাচার গ্রহণ করে জ্ঞানবুদ্ধিকে সুদৃঢ় করো। সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করো। নির্জনে আল্লাহ তায়ালার যিকির করো[১০০] এবং নেয়ামতের শোকর আদায় করো।[১০১]

শুরুনবুলালিকৃত *মারাকিল ফালাহ* গ্রন্থের রোযাদারের জন্য যা মাকরুহ এবং যা মাকরুহ নয় অনুচ্ছেদে, পৃষ্ঠা নং ৬৬২ এবং আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরিকৃত *ফায়জুল বারি*: ১/১৫৩।

১০০ একাকী নির্জনে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। কারণ এভাবে রিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি মুক্ত থাকা যায় এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক আশা করা যায়। কেয়ামতের দিন সাত ব্যক্তির আরশের ছায়ায় স্থান পাওয়ার যে হাদিসটি আছে, সেখানে এক ব্যক্তি এমন আছে যে নির্জনে আল্লাহ তায়ালার যিকির করত।

১০১ সালাফে সালেহিন অধিক পরিমাণে হামদ ও শোকর আদায় করতেন

শোকর শব্দের অর্থ, কারও কাছ থেকে কোনো উপকার, দান-অনুগ্রহ লাভের কারণে তার প্রশংসা করা। কেউ কেউ শোকরের ফলাফল ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে এর সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছেন যে, শোকর হচ্ছে প্রাপ্ত নেয়ামতের হেফাজত ও অপ্রাপ্ত নেয়ামত অর্জন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তোমরা শোকর আদায় কর তাহলে আমি তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেব।

সাহাবায়ে কেরাম রা. ও সালাফে সালেহিনের জবানে আল্লাহ তায়ালার শোকর ও প্রশংসা সর্বক্ষণ জারি থাকত। এক মুহূর্তও তাদের হামদ ও শোকর ছাড়া কাটত না। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-কষ্টে, একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতে তাদের অবস্থা এমনই ছিল। কারণ, তাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার অনবরত নেয়ামত দর্শনে আলোকিত ছিল। তাই তাদের জিহ্বা নেয়ামতদানকারী প্রশংসিত মহান স্রষ্টার প্রশংসায় সর্বদা সতেজ থাকত। বরং কেউ কেউ এমন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে যেতেন, যার সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হয় এবং তারা দুজন খুব পরিচিত। উদ্দেশ্য, তাকে সালাম দিলে বা তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এভাবে তিনি তার মুখ থেকে আল্লাহর এই প্রশংসাবাণীটি শুনবেন।

আলহামদুলিল্লাহ শব্দ শোনার জন্য তারা একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন

এমন নিয়ত ও উদ্দেশ্য আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল ও পবিত্র জীবনীতেও দেখতে পাই। তাবারানি হাসান সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সকালটা কেমন ছিল? সে বলল, আমি আপনার সামনে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই উত্তরটিই তোমার কাছ থেকে আমি শুনতে চেয়েছিলাম।

হাইসামিকৃত *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ১০/ ১৪০, ৮/৪৬।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আলকামা বিন মারসাদ থেকে, আর তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কারও কারও সঙ্গে দিনে একাধিকবার দেখা হত। আমরা একে অপরকে –তার অবস্থা সম্পর্কে– জিজ্ঞাসা করতাম, এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য থাকত শুধু আল্লাহ তায়ালার হামদ ও প্রশংসা করা।

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে বলতে শুনেছি, তাকে এক লোক সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? লোকটি বলল, আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি। উমর রা. বললেন, আপনার কাছ থেকে এটিই শুনতে চেয়েছিলাম।

হুবাইব বিন আবি সাবেত সাইদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জান্নাতে সর্বপ্রথম সেসব মানুষদের ডাকা হবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করত। কিংবা তিনি বলেন, সুখে-দুঃখে। *কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকায়েক*: ৬৮-৬৯।

সর্বদা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা

ইসহাক বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত উমর রা. এক লোককে বললেন, হে অমুক, সকাল কেমন কাটল? সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি। উমর রা. তখন বললেন, এ বাক্যটি শোনার জন্যই তোমাকে প্রশ্ন করেছি।

আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*: ৭/২৩০।

প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করো এবং সর্বাবস্থায় ইস্তেখারা করো। আল্লাহ তোমার জন্য যে ফয়সালা করেছেন, তাতে আপত্তি করো না এবং যে আমল নিয়ে তুমি আল্লাহর দরবারে হাজির হতে চাও, তা নিজের উপর আবশ্যক করে নাও। অন্যের যেসব বিষয় তুমি অপছন্দ করো, নিজের আখলাক-চরিত্রকেও সেগুলো থেকে মুক্ত করো। যে সঙ্গীর দ্বারা প্রতিদিন কল্যাণ বৃদ্ধি পায় না, তার সঙ্গ ত্যাগ করো। ক্ষমা ও মার্জনাকে নিজের অংশ বানিয়ে নাও।[১০২]

ইবনে উমর রা.-এর বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্য

হযরত ইবনে উমর এই উদ্দেশ্যে বাজারে যেতেন যে, মানুষ তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আর উত্তরে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন।

ইবনে সাদ সাইদ মাকবারি থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর রা. বলেন, আমি বাজারে যেতাম। তবে আমার কোনো প্রয়োজন থাকত না। শুধু এজন্য যেতাম যে, আমি লোকদের সালাম দেব আর তারা আমাকে সালাম দেবে। বুশাইর বিন ইয়াসার বলেন, ইবনে উমরের আগে কিংবা তার চেয়ে দ্রুত কেউ সালাম দিতে পারত না।

তাবাকাতে কুবরা: ৪/১৫৫-১৫২।

[১০২] গ্রন্থকার বাক্যটি দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, তুমি যখন কারও সঙ্গে বিবাদে জড়াবে তখন তা আরও দীর্ঘায়িত করার চেয়ে ক্ষমা করে দেওয়াটাই উত্তম। আসলে তিনি সত্যই বলেছেন, কারণ বিবাদ-বিসংবাদ মানুষের দিনকে ধ্বংস করে, মানসিক অস্থিরতা তৈরি করে, অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট করে, ঘুম হারাম করে এবং অন্তরকে সর্বদা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে। তাই জুলুম ও ক্ষতির শিকার হলেও ক্ষমা করে দেওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত। ক্ষমা মানুষকে এ সকল ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং এর পরিবর্তে অন্তরে প্রশান্তি, দয়া ও অনুগ্রহের সুখানুভূতি আনয়ন করে।

সালম বিন কুতাইবার মামলা দায়ের না করে চলে আসার ঘটনা

তাবে তাবেয়িনদের মধ্যে হযরত সালম বিন কুতাইবা বাহেলি বাসরি র.-এর আপন চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে ঝামেলা বাঁধলো। সালম বিষয়টি নিয়েকাজির দরবারে গেলেন। তারপর নিজের সম্মান বজায় রাখতে দাবি ছেড়ে দিলেন। তিনি কাজির দরবার থেকে সফল হয়ে ফিরলেন।

সালম বিন কুতাইবা বলেন, একদিন আমি বিচারের জন্যকাজির দরবারে বসা ছিলাম, তখন আমার পাশ দিয়ে বশির বিন উবাইদুল্লাহ গমন করার সময় জিজ্ঞাসা করল, এখানে বসে আছ কেন? আমি বললাম, আমার ও আমার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে বিবাদ আছে। সে আমার কিছু জিনিস নিজের বলে দাবি করছে। তখন তিনি বললেন, আমার উপর তোমার পিতার অনুগ্রহ আছে। আমি তোমাকে এর প্রতিদান দিতে চাই। শোন, আল্লাহর কসম! ঝগড়া-বিবাদের চেয়ে মন্দ কিছু নেই। এতে ধর্মকর্ম বরবাদ হয়, ভদ্রতা বিনষ্ট হয় এবং জীবনের আনন্দ উধাও হয়ে যায়। অন্তর এতেই আচ্ছন্ন থাকে।

সালম বিন কুতাইবা বলেন, এ কথা শুনে আমি ঘরে চলে যাওয়ার জন্য উঠে যেতে লাগলাম। তখন আমার চাচাতো ভাই আমাকে বলল, আপনার কি হলো চলে যাচ্ছেন যে? আমি বললাম, না, আর বিবাদ নয়। সে বলল, তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে, আমিই হক। বললাম, না। বরং আমি বিবাদ দূরে ঠেলে মহৎ হতে চাই। সে বলল, যদি তাই হয় তবে আমিও আর কোনো দাবি রাখছি না। সে বস্তুটি এখন তুমিই নিয়ে নাও।

এই ঘটনাটি ইমাম গাযালি *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* কিতাবে জিহ্বার বিপদ-আপদ অধ্যায়ের পঞ্চম আপদ: ঝগড়া-বিবাদ করা, সেখানে এবং ইবনে আবিদ দুনিয়া *কিতাবুস সামতের* ৯৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষ যখন কারও কাছ থেকে কষ্ট পায় এবং ধৈর্যধারণ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়, প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা না-করে, তার পরিণাম প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণকারীর চেয়ে উত্তম হয়। কারণ, সে যখন ক্ষমা ও ধৈর্যধারণ করে, নিজের দাবি ছেড়ে দেয়, ভালো আচরণ করে, তখন সে অন্তরের শীতলতা, প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করে। আর অনেক সময় অন্যায় আচরণকারী, জালেম ও শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়া, তার কাছে তাকে মেরে ফেলার চেয়েও বড়ো শাস্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

ঝগড়া-বিবাদ ও প্রতিশোধ বর্জনকারীর উত্তম পরিণাম

ইমাম ইবনুল কায়্যিম র. প্রতিশোধ গ্রহণ ও বর্জন-এ দুটি অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেন, শান্তি ও অন্তরের শীতলতা লাভের যে কী চমৎকার অনুভূতি! এটা শুধু সেই ব্যক্তি বুঝতে পারবে, যে তা জানে এবং এর স্বাদ যে কখনো পেয়েছে। আর তা এভাবে যে, সে কষ্টের বদলা ও প্রতিশোধ নিয়ে নিজের মনের আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয় না। বরং মন থেকে সব কষ্ট মুছে ফেলে এবং ক্ষমা ও সবরের মাঝে অন্তরের যে শীতলতা ও প্রশান্তি, তাকে নিজের জন্য অধিক উপকারী, উপভোগ্য, উত্তম এবং কল্যাণকর মনে করে।

অন্তর যখন প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কিছু হাতছাড়া করে। এভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর বুদ্ধিমান কখনো নিজের ক্ষতিতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে এসব কাজকে নির্বোধদের কাজ বলে মনে করে। কারণ, অন্তর যদি হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, সেখানে শান্তি আসবে কোত্থেকে?

যখন সে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা বর্জন করবে, তখন সে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ। এভাবে সে নিরাপত্তা ও স্বস্তি লাভ করবে। সে যদি প্রতিশোধ নেয়, তাহলে অবশ্যই তার ভেতর ভয় ঢুকে যাবে। কারণ প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে সে মানুষটি তার শত্রু হয়ে গিয়েছে। আর শত্রু যত দুর্বলই হোক না কেন, বুদ্ধিমান কখনো তার থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কত সামান্য শত্রু কত বড়ো শত্রুকে পরাভূত করল! যখন প্রতিশোধ না-নিয়ে ক্ষমা করে দেবে, তখন শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া ও তা বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত থাকবে। আর ক্ষমা, মার্জনা, ধৈর্য অবশ্যই শত্রুর কোমরকে ভেঙ্গে দেয় এবং তার ক্ষতির আশঙ্কা থেকে নিশ্চিত থাকা যায়। প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তব জীবন থেকেও আমরা এর প্রমাণ পাই।

মাদারিজুস সালেকিন: ২/৩২০।

প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে আবু শামার কিছু পঙক্তি

এই কবিতা পঙক্তিগুলো হাফেয, ফকিহ, ইতিহাস ও অভিধানবিদ আবু শামা মাকদিসি বিরচিত। তার পুরো নাম আবদুর রহমান বিন ইসমাইল দিমাশকি র.। মৃত্যু ৬৬৫ হিজরি।

তুমি উপদেশমূলক এই পঙক্তিগুলো শোন এবং ঝগড়া-বিবাদের সময় বদলা না নিয়ে বিচারের দায়িত্ব মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও।

আবু শামা মাকদিসি একবার শত্রুপক্ষের ভীষণ শত্রুতার শিকার হয়েছিলেন। তার বয়স ছিল তখন সত্তর। এই বয়সে তাকে শারীরিকভাবে অনেক কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি সে সময় দিমাশকের শায়খ ছিলেন। তাকে বলা হলো, আপনি বিচার ও সাহায্যের জন্য শাসকদের নিকট যান। তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন, যা তিনি তার *জাইলুর রওযাতাইন* নামক কিতাবের (পৃষ্ঠা নং ২৪০) শেষে উল্লেখ করেছেন।

قُلْتُ لمن قالَ: أما تَشْتَكِيْ ما قَدْ جَرى فَهُوَ عَظِيْمٌ جَلِيْلٌ:

يُقَيِّضُ الله تعالى لنا مَنْ يَأْخُذُ الحَقَّ وَ يَشْفِيْ الغَلِيلَ

إذا توكلنا عليه كَفَى، فحسبنا الله و نِعْمَ الوَكِيْلُ

যে আমাকে বলেছিল, আপনি শাসকদের নিকট কেন বিচার নিয়ে যাচ্ছেন না, আপনার সঙ্গে মারাত্মক অন্যায় কাজ করা হয়েছে-

আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য এমন কাউকে দাঁড় করিয়ে দেবেন, যে অধিকার আদায় করবে এবং অন্তর্জ্বালাকে প্রশমিত করবে।

আমরা যখন আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করেছি, তখন তিনিই যথেষ্ট। আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট আর তিনি উত্তম অভিভাবক।

জেনে রাখো, সর্বাবস্থায় মুমিনের সততার পরীক্ষা হয়। বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে তার নিজেরও পরীক্ষা হয়।[১০৩] আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে

---

[১০৩] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. হকের উপর এমন দৃঢ় অবিচল ছিলেন যে, তিনি সৃষ্টির ভালোবাসা ও স্রষ্টার সাহায্য লাভ করেছিলেন। খালকে কুরআন তথা কুরআন সৃষ্টি নাকি সৃষ্টি না-এই মাসআলায় যখন তাকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার পায়ে শিকল পড়ানো হয়, তখন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলার বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি। বরং তার আশঙ্কা ছিল, বয়সের ভারে শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে চাবুকের আঘাত তিনি সহ্য করতে পারবেন না, আর তখন হকের উপর অবিচল থাকা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। তার ধৈর্যশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন তিনি এমন কিছু কথা শ্রবণ করলেন, যা তাকে হকের উপর দৃঢ় অবিচল থাকতে এবং আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে সাহায্য ও শক্তি জোগালো। আর কথাগুলো তিনি এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছিলেন, যাদের ব্যাপারে কখনো ধারণা করা যায় না তারা এমন কথা বলতে পারে।

একদল গ্রাম্য চোর ও চালাক ব্যক্তি তার কাছে এলো। তখন তিনি শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তার বয়স ছিল তখন ৫৭ বছর। বার্ধক্যের বয়সে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন আর শারীরিক বিভিন্ন দুর্বলতাও তাকে পেয়ে বসেছিল। তার গায়ের জামা কাপড় খোলা হল। তারপর দুই হাত দুদিকে বেঁধে তাকে চরমভাবে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হলো। একপর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করলেন। এভাবে হকের বিজয় হলো এবং শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তার ধৈর্য ও সাহসিকতা দেখে রাসুলের সুন্নাহপ্রেমী মুসলমানগণের চক্ষু শীতল হল এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অন্তরে তার ভালোবাসা গেঁথে গেল।

ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বাগদাদ থেকে গ্রেফতার করে রিক্কা নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে শাসক মামুন থাকে, তারপর তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, তখন কতিপয় উলামায়ে কেরাম তার কাছে তাকিয়ার উপর (একজন মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করে তার ঠিক বিপরীত বলা ও করাকে তাকিয়া বলে।) আমল করার বিষয়ে যে সমস্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে এলেন। কিন্তু তিনি তাকিয়া করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিম্নোক্ত হাদিসটি সম্পর্কে তোমরা কী বলবে,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يُنْشَرُ أَحَدُهُم بِالمِنْشَارِ، ثُمَّ لاَيَصُدُّه ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ،

অর্থ : তোমাদের পূর্বে এমন কিছু লোক গত হয়েছে যাদেরকে করাত দিয়ে ফেড়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তা তাদেরকে তাদের দিন থেকে ফেরাতে পারেনি।

তখন তারা তার তাকিয়ার উপর আমল করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেল।

কারাগারে যখন তাকে হত্যা করে ফেলার ও ভয়ানক নির্যাতনের হুমকি দেওয়া হল তখন তিনি বললেন, যখন মূর্খ ব্যক্তি তার মূর্খতার কারণে চুপ থাকে আর একজন আলেম তাকিয়ার পক্ষে কথা বলে তখন হক মানুষের কাছে কীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে?

আবু সাইদ হাদ্দাদ আল-ওয়াসিতি, যার প্রকৃত নাম আহমদ বিন দাউদ, তিনি বলেন, ইমাম আহমদ প্রহারের শিকার হওয়ার আগে আমি তার সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ তোমার পরিবার আছে। ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে। তুমি মাজুর মানুষ। আমি এসব কথা বলছিলাম, যেন তার তাকিয়ার পক্ষে মত দেওয়া সহজ হয়। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু সাইদ! তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে দুনিয়াতে তুমি শান্তিতে থাকবে।

ইমাম আহমদ কারারক্ষীদের বললেন, না জেলখানাকে আমি ভয় পাচ্ছি, আর না তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করাকে। আমার ভয় তো শুধু চাবুককে। আমি আশঙ্কা করছি চাবুকের আঘাতে আঘাতে না আমার ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন জেলখানায় থাকা এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ, দেখবেন আপনার তেমন কোনো কষ্ট হবে না। চাবুকের প্রথম দশ-বারোটি আঘাত হয়তো আপনি অনুভব করবেন। এরপর আপনি আর টের পাবেন না যে বাকি চাবুকের আঘাতগুলো কোথায় পড়ছে। একথা শুনে যেন তার ভয় দূর হয়ে গেল।

(ইবনুল জাওযিকৃত *মানাকিবুল ইমাম আহমদ*, পৃষ্ঠা নং ৩১৬ ৩৩২ ও ৩৩৫। ইবনু আবি ইয়ালাকৃত *তাবাকাতুল হানাবিলা* (১/৪৩) গ্রন্থে আহমদ বিন দাউদ আবু সাইদ আল ওয়াসিতির জীবনী বর্ণনায়। ইবনে কাসিরকৃত *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া* (১০/২৩৪)।

পকেটমার আবুল হাইসামকে দেখে ইমাম আহমদের ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পেল

ইমাম আহমদ বলেন যে, আমি এই মুসিবতে আক্রান্ত হওয়ার পর একজন গ্রাম্য ব্যক্তির কথার মাধ্যমে আমার অন্তর যে স্থিরতা ও অবিচলতা লাভ করেছে, আর কারও কথায় তা হয়নি। কথাটি সে আমাকে রাহবাতে তাওক নামক স্থানে বলেছিল। সে আমাকে বলেছিল, হে আহমদ, যদি হকের উপর থাকার কারণে তোমাকে হত্যা করা হয় তাহলে তো তুমি শহিদ। আর যদি বেঁচে যাও তাহলে একটি প্রশংসনীয় জীবন যাপন করবে। তার এই কথা শুনে আমার অন্তরে সাহসের সঞ্চয় হলো।

ইমাম আহমদের ছেলে আবদুল্লাহ বলেন, আমি প্রায়ই আমার বাবাকে বলতে শুনতাম, আল্লাহ তায়ালা আবুল হাইসামের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তায়ালা আবুল হাইসামকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ তায়ালা আবুল হাইসামকে মাফ করুন।

তখন আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা আবুল হাসান কে? তিনি বললেন, তুমি কি তাকে চিনো না। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমাকে যেদিন চাবুক মারার জন্য আনা হয়েছিল, আমার হাত দুটি তখন কাষ্ঠদণ্ডের সঙ্গে বাঁধা ছিল। হঠাৎ একজন লোক পেছন থেকে আমার কাপড় ধরে টানছিল আর বলছিল, আপনি কি আমাকে চেনেন? আমি বললাম, না। সে বলল, আমি আবুল হাইসাম আল-আইয়ার, (অর্থাৎ, আল্লাহর নাফরমানিতে পটু), চুরি-চামারি ও পকেটমারে উস্তাদ। বাদশার ফাইলে লেখা আছে, আমি এতবার গ্রেফতার হয়েছি যে, আমাকে সর্বমোট ১৮০০০ চাবুক পেটা করা হয়েছে। এত ভয়াবহ কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও আমি শুধু দুনিয়ার স্বার্থে শয়তানের আনুগত্যে ধৈর্যের সঙ্গে লেগে আছি। সুতরাং তুমি দিনের স্বার্থে রহমানের আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করো, দৃঢ় অবিচল থেকো।

ইমাম আহমদ বলেন, হুকুম জারি করা হলো, আমাকে নিয়ে এসে আমার দুই হাত দুদিকে প্রসারিত করে পেছন থেকে কাঠের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো। একটি কুরসি নিয়ে আসা হলো। তারপর আমাকে তার উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আমার পেছনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন আমাকে বলল, কাঠ দুটিকে উপর থেকে শক্ত করে ধরো; কিন্তু আমি তার কথা বুঝতে পারলাম না তাই আমার হাত দুটো

একটু ঢিলা রয়ে গেল। চাবুক আঘাতকারী চাবুক নিয়ে আসলো। তাদের মধ্য থেকে একজন এসে আমাকে জোরে জোরে দুটি চাবুক মারলো। মুতাসিম তাকে বলল, তোর হাত কেটে যাক! আরো জোরে মার। তারপর আরেকজন এসে আমাকে দুটি চাবুক মারলো। তারপরও অপরজন এসে আমাকে অনেকগুলো চাবুক মারল। আমি বেহুশ হয়ে পড়লাম। যখন চাবুক মারা বন্ধ হলো তখন আমার হুশ ফিরলো।

তখন মুতাসিম আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে মুতাজিলাদের মতাদর্শ গ্রহণের দাওয়াত দিতে লাগলো। খলিফা মামুনের পরে মুতাসিমও মুতাজিলা আকিদার অনুসারী ছিল; কিন্তু আমি তার কোনো কথার উত্তর দিলাম না। তারা বলতে লাগলো, তোমার ধ্বংস হোক! খলিফা তোমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমি গ্রাহ্য করলাম না। তারা আবার প্রহার করা শুরু করল। তারপর মুতাসিম আবার আমার কাছে এসে আমাকে দাওয়াত দিলো; কিন্তু আমি তার কোনো কথার উত্তর দিলাম না। তারা আবার আমাকে প্রহার করল। তৃতীয়বার মুতাসিম আমার কাছে এসে আমাকে দাওয়াত দিল; কিন্তু প্রচণ্ড প্রহারের কারণে আমি তার কোনো কথাই বুঝতে পারিনি। তারপর তারা আবার আমাকে প্রহার করলো। যখন আমার হুশ চলে গেল, আমি নির্যাতনের কষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে মুতাসিম ভয় পেয়ে গেল। আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। জ্ঞান ফিরলে আমি নিজেকে একটি ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমার পায়ের বেড়িগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল ২২১ হিজরির ২৫ শে রমজানের কথা।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, আমরা তোমার চেহারার উপর ঝুঁকে পড়ে ছিলাম। তোমার পিঠের উপর একটি চাটাই দিয়ে আমরা তোমাকে পা দিয়ে মাড়িয়েছি (যাতে তোমার জ্ঞান ফিরে)।

ইমাম আহমদ বলেন, আমি এসবের কোনো কিছুই টের পাইনি। তখন তারা আমার কাছে কিছু ছাতু নিয়ে আসলো যাতে আমি তা খেয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলি। কিন্তু আমি তা গ্রহণ না করে রোযা রাখলাম। জোহরের নামাজের সময় হলে কাজি ইবনে সুমাআ নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষ করে আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার কাপড়ে তোমার শরীর থেকে টপটপ করে রক্ত পড়ছে, এই কাপড় পড়েই তুমি নামাজ পড়ে নিলে? আমি বললাম, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাজ পড়ছিলেন, তখন তার জখম থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। আমার উত্তর শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বাড়িতে ফিরে এলে একজন শল্যচিকিৎসক আগমন করলেন। তিনি তার শরীরে ঝুলে থাকা গোশতের একটি টুকরা কেটে তার চিকিৎসা করা শুরু করলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে আরোগ্য দান করলেন। তার আরোগ্য লাভ করার কথা শুনে খলিফা মুতাসিম ও মুসলমানগণ খুব খুশি হলেন। কারণ মুতাসিম ইমাম আহমদের উপর নির্যাতনের কারণে খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। ইমাম আহমদ তার উপর যারা অত্যাচার করেছে তাদের মধ্যে বিদআতিদের ছাড়া সবাইকে মাফ করে দিলেন। তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন,

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> অর্থ: তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে দেয়। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (সুরা নুর, আয়াত নং ২২)

আর বলতেন, তোমার কারণে যদি তোমার কোনো মুসলিম ভাইকে আযাব দেওয়া হয় তাহলে এতে তোমার কী লাভ?[১০৩]

(তিনি এই কথাটি তার উস্তাদ ইমাম শাফেয়ি র.-এর নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তির প্রতি লক্ষ রেখে বলেছিলেন,

مَنْ نَالَ مِنِّيْ أَوْ عَلِقْتُ بِذِمَّتِهِ   سَامَحْتُهُ لِلّٰهِ رَاجِيَ مِنَّتِهِ

كَيْ لَا أُعَوِّقُ مُسْلِمًا يَوْمَ الْجَزَاءِ   وَلَا أَسُوْأُ مُحَمَّدًا فِيْ أُمَّتِهِ

যে আমাকে কোনো কষ্ট দিয়েছে, অথবা যার কাছে আমার কোনো হক প্রাপ্য আছে, আমি তাকে আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের আশায় ক্ষমা করে দিলাম।

কারণ প্রতিদান দিবস তথা কেয়ামতের দিন আমি কোনো মুসলমানকে বিপদে ফেলতে চাই না, আর না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর উম্মতের ব্যাপারে পেরেশানিতে ফেলতে চাই।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাকে মাত্র ১৮ টি চাবুক মারা হয়েছে। আর আবুল হাইসামকে মারা হয়েছে ১৮০০০। এখনো আমার অনেক চাবুক খাওয়া বাকি আছে। ইত্যবসরে পয়গাম চলে এলো, আমিরুল মুমিনিন খলিফা তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

নিজেই নিজের পাহারাদার। সুতরাং হকের উপর অবিচল থাকো, সৃষ্টির ভালোবাসা পাবে।

নিজের মাঝে ইলমের প্রকৃত তলব সৃষ্টি করো, অন্তর্দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারবে, জ্ঞানের ফল্গুধারা তোমার সামনে প্রকাশ পাবে এবং খালেস আল্লাহ তায়ালার তৌফিকের মাধ্যমে যে জ্ঞান তোমার লাভ হবে, তা তুমি নিজেই চিনতে পারবে। যে ইলম অনুযায়ী আমল করে, সে-ই অগ্রগামী। যে আহলে ইলম, তার মাঝে আল্লাহর ভক্তি মাখা ভয় থাকে। যে আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল, সে তাঁর উপর ভরসা করে। যে দৃঢ় বিশ্বাসী, সে তাঁকে ভয় করে এবং যে শোকর আদায় করে, সে তাঁর অধিক নেয়ামত লাভ করে।

জেনে রাখো; সঠিক বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী মানুষ সঠিক বুঝ লাভ করে থাকে। তখন তার তাকওয়া ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। আর আল্লাহ যাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করেন, ইমানের পর ইলম দ্বারা সজিব করেন, বিশ্বাসের দৃষ্টি দান করেন এবং যাকে নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত

আবুল হুসাইন ইবনুল মুনাদি বলেন, আমার দাদা আমাকে বলেছেন। আবু আব্দুল্লাহ অর্থাৎ, ইমাম আহমদকে জমিন থেকে মাত্র এক বিঘত উপরে খলিফা মুতাসিমের সামনে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে প্রহার বন্ধ হয়। চেহারা ও পুরো শরীর হলুদ হয়ে শিথিল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থা দেখে খলিফা মুতাসিম ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর বাঁধনের রশি খুলে দেওয়ার এবং তাকে কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এক জল্লাদ বলেছিল, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের দৃঢ়তা ও অবিচলতা ১৮০০০ চাবুকের বাড়ি খাওয়া সেই চোরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর কসম আমি তাকে এত প্রহার করেছি যে, কোনো উটকে যদি আমার সামনে এনে বসিয়ে দেওয়া হতো আর আমি তাকে এভাবে প্রহার করতাম, তাহলে তার পেট ছিদ্র হয়ে যেত। অপর এক জল্লাদ বলেছিল, আমি যদি কোনো হাতিকে এভাবে প্রহার করতাম, তাহলে তার পেট ফেটে যেত।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তার সত্যবাদী বান্দাদের কত দ্রুত সাহায্য করে থাকেন!

করেন; যাবতীয় পুণ্যের কাজ তার জন্য সুবিন্যস্ত (সহজ) করে দেওয়া হয়। সুতরাং তাকওয়ার মাঝে তোমরা পুণ্য অনুসন্ধান করো এবং যারা আল্লাহভীরু তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করো।[১০৪]

---

১০৪ গ্রন্থকার রহমতুল্লাহি আলাইহি 'তাকওয়ার মাঝে তোমরা পুণ্য অনুসন্ধান করো' এই কথাটির মাধ্যমে তাকওয়ার অনেক বড়ো একটি উপকারিতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, بِرٌّ এটি এমন একটি শব্দ যার মধ্যে সমস্ত কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লামা ফিরোজাবাদি র. তার গ্রন্থে তাকওয়ার ফযিলত ও পবিত্র কুরআনে মুত্তাকি বা আল্লাহভীরুদের যে সকল সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে সাতাশটি সুসংবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

১, সুসংবাদ লাভের সুসংবাদ:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى

যারা ইমান এনেছে এবং *তাকওয়া* অবলম্বন করেছে তাদের জন্যে রয়েছে ইহকালিন ও পরকালীন জীবনে সুসংবাদ। (সুরা ইউনুস : ৬৩-৬৪)

২. সঙ্গদানের সুসংবাদ:

إِنَّ اللهَ معَ الذينَ اتقوا

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা *তাকওয়া* অবলম্বন করেছে। (সুরা নাহাল : ১২৮)

৩. ইলম ও হিকমাত দান:

إِنْ تَتَّقوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

যদি তোমরা *আল্লাহকে ভয় করো* তাহলে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান (হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী কুরআনের ইলম) দান করবেন। (সুরা আনফাল: ২৯)

৪. গুনাহ মাফ এবং বিরাট প্রতিদানের মাধ্যমে সম্মান দান:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

আর যারা *তাকওয়া* অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দান করবেন

৫. পঞ্চম নম্বরটি গ্রন্থের হস্তলিখিত কপিগুলোতে খুঁজতে হবে। মুদ্রিত কপি থেকে এটি বাদ পড়ে গেছে।

৬. ক্ষমার সু সংবাদ:

وَاتَّقُوا الله إن الله غفورٌ رَحِيمٌ.

আর তোমরা *আল্লাহকে ভয়* করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও চির দয়ালু। (সুরা আনফাল: ৬৯)

৭. সবকিছু সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

আর যে ব্যক্তি *তাকওয়া* অবলম্বন করবে আল্লাহ তার সকল বিষয় সহজ করে দেবেন। (সুরা তালাক: ৪)

৮. দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

আর যে *তাকওয়া* অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করে দেবেন। (সুরা তালাক: ২)

৯.অবসর ও নিশ্চয়তার সঙ্গে প্রশস্ত রিজিকের সুসংবাদ:

وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

আর *মুত্তাকি* ব্যক্তিকে তিনি এমন জায়গা থেকে রিযিক পৌঁছাবেন যা তার ধারণায় ছিল না। (সুরা তালাক:৩)

১০. আজাব ও শাস্তি থেকে মুক্তি:

ثُمَّ نُنَجِّي الذينَ اتَّقَوْا

তারপর আমি সেসকল বান্দাকে মুক্তি দান করব যারা *তাকওয়া* অবলম্বন করেছিল। (সুরা মারয়াম: ৭২)

১১. মুক্তি ও সফলতা লাভ:

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ

যারা *তাকওয়া* অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তাদের মুক্তি দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। (সুরা যুমার: ৬১)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

নিশ্চয় *মুত্তাকিদের* জন্য আছে সফলতা। (সুরা নাবা: ৩১)

১২ তাওফিক ও সুরক্ষার সুসংবাদ:

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

বরং পুণ্য এই যে, লোকে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর নবিগণের প্রতি ইমান আনবে আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির ও যাঞ্চাকারীদের দান করবে এবং দাস মুক্তিতে ব্যয় করবে। আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যখন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে তা পূরণে অভ্যস্ত থাকবে এবং সঙ্কটে-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য-স্থৈর্যে অভ্যস্ত থাকবে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং এরাই *মুত্তাকি।* (সুরা বাকারা: ১৭৭)

১৩. মুত্তাকি ব্যক্তিদের সত্যবাদী হওয়ার সাক্ষ্য:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

এরাই ওই সকল লোক যারা সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকি। (সুরা বাকারা: ১৭৭)

১৪. সম্মান ও মর্যাদা লাভের সুসংবাদ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে মুত্তাকি, সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত। (সুরা হুজুরাত: ১৩)

১৫. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ:

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। (সুরা আলে ইমরান: ৭৬; সুরা তওবা: ৪ ও ৭)

১৬. সফলতা লাভের সুসংবাদ:

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সুরা বাকারা: ১৮৯; সুরা আলে ইমরান: ২০০)

১৭. আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন:

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

তবে তোমাদের অন্তরের *তাকওয়া* শুধু তাঁর কাছে পৌঁছে। (সুরা হজ: ৩৭)

১৮. মেহনতের প্রতিদান লাভের সুসংবাদ:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

নিশ্চয়ই যে *তাকওয়া অবলম্বন* করে এবং ধৈর্যধারণ করে, সে অবশ্যই প্রতিদান লাভ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সদাচারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। (সুরা ইউসুফ: ৯০)

১৯. দান-সদকা কবুল হওয়ার সুসংবাদ:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ *মুত্তাকি* ব্যক্তিদের দান-সদকা কবুল করেন। (সুরা মায়েদা:২৭)

২০. ইখলাস ও অন্তরে স্বচ্ছতার অধিকারী হওয়ার সুসংবাদ:

فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

আর তা হল অন্তরের তাকওয়ার প্রমাণ। (সুরা হজ: ৩২)

২১. আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য:

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে *ভয় করো।* (সুরা আলে ইমরান: ১০২)

২২. জান্নাত ও জান্নাতের বিভিন্ন প্রস্রবণের সুসংবাদ:

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.

নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা জান্নাত ও জান্নাতের বিভিন্ন প্রস্রবণের মাঝে থাকবে। (সুরা দুখান: ৫২)

২৩. বিপদ থেকে মুক্ত থাকা:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ.

নিশ্চয় মুত্তাকিগণ অবশ্যই নিরাপদ স্থানে থাকবে। (সুরা দুখান, ৫১)

২৪. সমস্ত সৃষ্টির ওপর মর্যাদা লাভ:

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা কেয়ামতের দিন মর্যাদায় সকলের উপরে থাকবে। (সুরা বাকারা: ২১২)

২৫. কেয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তির ভয় ও দুঃখ না থাকা:

فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

সুতরাং যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করেছে, তাদের কোন ভয় থাকবে না, আর তারা দুঃখিত হবে না। (সুরা আরাফ: ৩৫)

সত্যানুসন্ধান ও গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে পূর্ণ ইয়াকিন অর্জন করো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ .

আর এভাবে আমি ইবরাহিমকে সমস্ত আসমান ও জমিনের রাজত্ব দেখাই যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। (সুরা আনআম, আয়াত নং ৭৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَعَلَّمُوا اليَقِيْنَ، فَإِنِّيْ أَتَعَلَّمه.

তোমরা ইয়াকিন অর্জন করো আমিও ইয়াকিন অর্জনের মধ্যে আছি।[১০৫]

---

২৬. জান্নাতে সমবয়স্কা স্ত্রী লাভের সুসংবাদ:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا.

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য আছে সাফল্য। উদ্যানরাজি ও আঙুর। সমবয়স্কা নবযৌবনা তরুণী। (সুরা নাবা: ৩১, ৩২, ৩৩)

২৭. আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য, সাক্ষাৎ ও দিদার লাভের সুসংবাদ:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সমস্ত ক্ষমতা যার হাতে, সেই মহাসম্রাটের সান্নিধ্য। (সুরা কামার: ৫৫)

[১০৫] এই হাদিসটি আবু নুআইম হিলয়াতুল আউলিয়ায় (৬/৯৫) ছাওর বিন ইয়াযিদ থেকে মুরসালভাবে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন:

জেনে রাখো, যার মধ্যে তিনটি গুণ নেই সে প্রবৃত্তি দ্বারা শাসিত,[১০৬] গুণ তিনটি হলো,

১. নাফরমানির চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া।
২. অজ্ঞতার চেয়ে ইলমকে প্রাধান্য দেওয়া এবং
৩. দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া।

تَعَلَّمُوا الْيَقِيْنَ كَمَا تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنِّيْ أَتَعَلَّمُه

অর্থ: যেভাবে তোমরা কুরআন শিখো সেভাবে ইয়াকিন শিক্ষা করো, কারণ আমি নিজেও ইয়াকিন শিখি।

হাদিসটির সনদে বাকিয়্যা ইবনে অলিদ হিমসি আছেন, যার তাদলিস সম্পর্কে সবাই অবগত। আর হাদিসটি তিনি عَنْ (থেকে, হতে) শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। তার শায়খ আব্বাস বিন আখনাস সাকসাকি সম্পর্কে ইমাম যাহাবি মিযানুল ইতিদালে বলেন, তিনি অজ্ঞাত। তাই হাদিসটি দুর্বল, ভিত্তিহীন। হাদিসের অর্থও গরিব। তাছাড়া আরবি ব্যাকরণগত কিছু সমস্যাও আছে। যেমন .... শব্দটি। এটি এরূপ হওয়ার কথা ছিল ....।

তারপর আমি হাফেয ইরাকির কিতাব *তাখরিজু আহাদিসিল ইহইয়া* (১/১২২) – তে হাদিসটি দেখলাম। সেখানে তিনি হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন, 'ছাওর বিন ইয়াযিদ থেকে আবু নুআইম হাদিসটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। অথচ এটি মুদাল হাদিস। ইবনু আবিদ দুনিয়া ইয়াকিন নামক কিতাবে খালেদ বিন মাদান থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।'

এ কথাটি সঠিকের অধিক কাছাকাছি। ইমাম গাযালি র. বলেন, 'তোমরা ইয়াকিন শিক্ষা করো' কথাটির অর্থ তোমরা আহলে ইয়াকিনদের মজলিসে বসো, তাদের কাছে ইয়াকিনের কথা শোনো, সবসময় তাদের অনুসরণ করো; যাতে তাদের ইয়াকিনের মতো তোমাদের ইয়াকিনও শক্তিশালী হয়।

[১০৬] যার বিবেক-বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার কাছে পরাজিত।

আর যেই আলেমের মাঝে তিনটি গুণ নেই, কিয়ামতের দিন তার ইলম তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে।

১. ইচ্ছাশক্তিকে দমনের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দান থেকে বিরত থাকা।
২. অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে আমল করা এবং
৩. দয়া ও উপকারের মাধ্যমে ইনসাফ করা।

জেনে রাখো, বিবেকের চেয়ে অন্য কিছু দ্বারা কেউ সুসজ্জিত হতে পারেনি[১০৭] এবং ইলমের চেয়ে সুন্দর কোনো পোশাক কেউ পরিধান করতে পারেনি।[১০৮]

---

[১০৭] মহান তাবেয়ি উরওয়া বিন জুবায়ের র. বলেন, দুনিয়াতে বান্দাকে সর্বোত্তম যে জিনিসটি দেওয়া হয় তা হচ্ছে বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধি। আর আখেরাতে বান্দাকে সর্বোত্তম যে জিনিসটি দেওয়া হবে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি।

ইবনে আবিদ দুনিয়াকৃত *আল-আকলু ওয়া ফাযলুহু*: পৃষ্ঠা নং ১৩।

[১০৮] **ইলমের ফযিলত ও মর্যাদা:** হাসান বসরি র. বলেন, যদি ইলমের কোনো সুরত থাকত, তাহলে সে দেখতে চন্দ্র-সূর্য, আকাশ ও তারকারাজির চেয়ে সুন্দর হতো।

মুআয বিন জাবাল রা. বলেন, ইলম হচ্ছে মূর্খতায় ডুবে থাকা মৃত অন্তরের জীবন, আন্ধকারে চোখের জ্যোতি, দুর্বলের জন্য দেহের শক্তি। বান্দা ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর নির্বাচিত পুণ্যবান বান্দাদের মর্যাদা ও আখেরাতে অনেক উচ্চ মর্তবা লাভ করে থাকে। ইলম নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা রোযার সমতুল্য। ইলমের আলোচনা নামাজ সমতুল্য। মানুষ এর দ্বারা আত্মীয়ের হক এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে জানতে পারে। ইলম হচ্ছে ইমাম। আমল তার মুক্তাদি। নেককার ও সৌভাগ্যবানদের ইলম দান করা হয় আর বদকার ও দুর্ভাগাদের ইলম থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

হাফেয ইবনে রজব এটি তার কিতাব *শারহু হাদিসিল ইলম*-এ বর্ণনা করেছেন। পৃষ্ঠা নং ৩৩ ও ৩৫।

আল্লাম ফিরুজাবাদি বলেন, 'জেনে রেখো, ইলমে আখলাকে এ কথা একেবারে সুস্পষ্ট যে, যাবতীয় মানবিক গুণাবলির মূল হচ্ছে চারটি। ১. ইলম, ২. সাহসিকতা, ৩. চারিত্রিক পবিত্রতা, ৪. ন্যায় ও ইনসাফ।

কারণ একমাত্র বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায় এবং একমাত্র ইলমের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা যায়।[১০৯]

ইলম হচ্ছে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির গুণ। সাহসিকতা ক্রোধশক্তির গুণ। চারিত্রিক পবিত্রতা কামশক্তির গুণ। আর ন্যায় সমাজের সকলের মাঝের একটি সাধারণ গুণ।

নিঃসন্দেহে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অন্যান্য শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণটিও স্বাভাবিকভাবেই শ্রেষ্ঠ হবে। কারণ ইলম ছাড়া অন্যান্য গুণগুলো পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইলম অন্যান্য গুণ ছাড়াও পূর্ণরূপ লাভ করতে পারে। তাই ইলম সেগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী হলেও সেগুলো তার মুখাপেক্ষী। সুতরাং ইলম সর্বশ্রেষ্ঠ।

(দেখুন ফিরুজাবাদির কিতাব *বাসাইরু যাবিত তাময়িজ ফি লাতাইফিল কিতাবিল আযিয,* পৃষ্ঠা নং ১/৪২।)

নাসিরুদ্দিন তুসি তার রিসালাহ *আদাবুল মুতাআল্লিমিনের* শুরুতে বলেন, ইলমের মর্যাদা সর্বজনবিদিত। কারণ ইলম বিশেষভাবে শুধু মানুষকেই দান করা হয়েছে। ইলম ছাড়া অন্য সমস্ত গুণের ক্ষেত্রে মানুষ ও সকল প্রাণী সমান। (তাদের মাঝেও সেসব গুণ পাওয়া যায়।) যেমন, সাহসিকতা, শক্তি, দয়ার্দ্রতা ইত্যাদি। ইলমের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে হযরত আদম আ.-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছিলেন এবং তাদের আদম আ.-কে সেজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর ইলম অনুযায়ী আমল হলে তা চিরস্থায়ী সুখ লাভেরও মাধ্যম।

[১০৯] কবিতার ভাষায় ইলম ও বিবেক-বুদ্ধির নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরা

গ্রন্থকার আবু আবদুল্লাহ মুহাসেবির 'একমাত্র বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায় এবং একমাত্র ইলমের মাধ্যমে তার আনুগত্য করা যায়।'-এই উক্তির দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের আকল ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য কোনো কোনো আলেম ইলমকে আকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন এবং এ দুটির মাঝে একটি সূক্ষ্ম তর্ক তুলে দিয়েছেন, যেখানে উভয় গুণই একে অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরে। তাদের নিজেদের ভাষায় কথাগুলো তিনি কবিতার আকারে তুলে ধরেছেন,

عِلْمُ الْعَلِيْمِ وَ عَقْلُ الْعَاقِلِ اِخْتَلَفَا مَنْ ذَا الَّذِيْ مِنْهُمَا قَدْ أَحْرَزَ الشَّرَفَا؟
فَالْعِلْمُ قَالَ: أَنَا أَحْرَزْتُ غَايَتَهُ وَالْعَقْلُ قَالَ: أَنَا الرَّحْمٰنُ بِيْ عَرَفَا
فَأَفْصَحَ الْعِلْمُ إِفْصَاحًا وَقَالَ لَهُ: بِأَيِّنَا اللهُ فِيْ فُرْقَانِهِ اتَّصَفَا؟
فَبَانَ لِلْعَقْلِ أَنَّ الْعِلْمَ سَيِّدُهُ فَقَبَّلَ الْعَقْلُ رَأْسَ الْعِلْمِ وَانْصَرَفَا.

আলেমের ইলম এবং বুদ্ধিমানের বুদ্ধির মাঝে বিরোধ দেখা দিল যে, তাদের দুজনের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ?

তখন ইলম বলল, আমি শ্রেষ্ঠত্বের চূড়াকে স্পর্শ করেছি। আর আকল বলল, আমার দ্বারা মানুষ আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। (তাই আমি শ্রেষ্ঠ)।

ইলম আরও স্পষ্ট করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে বলল, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুজনের মাঝে কাকে নিজের গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

তখন আকলের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, ইলম-ই তার সর্দার। সে তখন ইলমের মাথায় চুমু খেয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু কবিতার এই কথাগুলো যিনি বলেছেন, তার একটি বিষয় ছুটে গেছে যে, আকল হচ্ছে ইলমের উৎস ও মূল। আকলের সঙ্গে ইলমের সম্পর্ক তেমন, যেমন সূর্যের সঙ্গে আলোর এবং চোখের সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ.

নিশ্চয় তাতে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন আছে।

গ্রন্থকার ইমাম মুহাসেবি তার *আর-রিয়ায়াহ* নামক গ্রন্থে বলেন, আকলের দৃষ্টান্ত চোখের মতো। আর ইলমের দৃষ্টান্ত প্রদীপের মতো। যে ব্যক্তি অন্ধ, দৃষ্টিশক্তি নেই, অন্ধকারে প্রদীপ তার কোনো কাজে আসবে না। আর যার দৃষ্টিশক্তি আছে, তবে প্রদীপ নেই। সেও অন্ধকারে প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পাবে না।

ইমাম ইবনুল জাওযি র.-ও এ কথার অর্থটি গ্রহণ করে তার *তালবিসুল ইবলিস* নামক গ্রন্থের শুরুতে বলেন,

আম্মা বাদ, মানুষের সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত হলো তার আকল তথা বিবেক-বুদ্ধি। কারণ আকল হচ্ছে আল্লাহর জাত ও সিফাতের পরিচয় লাভের একটি মাধ্যম। আবার এই আকল নবিদের উপর ইমান আনারও কারণ, কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ প্রদত্ত এই আকল ব্যবহার করে পূর্ণ ফায়দা লাভে সচেষ্ট হয়নি, তখন আল্লাহ নবিদের প্রেরণ করেছেন এবং আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। শরিয়তের দৃষ্টান্ত সূর্যের মতো। আর আকলের দৃষ্টান্ত চোখের মতো। সুস্থ চোখ যখন খোলা হয় তখন তা সূর্যকে দেখতে পায়। ঠিক তেমনি আকলের সামনে যখন নবিদের সত্য বাণী অকাট্য মুজিযা দ্বারা প্রমাণিত হয় তখন আকল তা মেনে নেয় এবং না দেখা বিষয়কে স্বীকার করে নিয়ে তার উপর ইমান আনয়ন করে।

শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী দামেশকের অধিবাসী শায়খ শিহাবুদ্দিন ইবনে জুহাইল (যার প্রকৃত নাম আহমদ বিন ইয়াহইয়া) র. বলেন, শরিয়ত আকলের ব্যবহারকে সংশোধন করেছে, তার সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য বলেছে এবং কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আকল যে যুক্তি তুলে ধরে সেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে। যেমন মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সুরা ইয়াসিনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ.

আমার সম্পর্কে সে উপমা রচনা করে, অথচ নিজ সৃষ্টির কথা ভুলে বসে আছে। সে বলে, কে এই অস্থিগুলোকে জীবিত করবে- এগুলো পঁচে গলে যাওয়া সত্ত্বেও? আপনি বলে দিন, যিনি সেগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই সেগুলোকে জীবিত করবেন।

আকল যে যুক্তি তুলে ধরে সেই যুক্তি দ্বারা তাওহিদের উপরও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

যদি আসমান ও জমিনে একাধিক উপাস্য থাকত তাহলে আসমান ও জমিন ধ্বংস হয়ে যেত। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত নং ২২)

সে কতই না ক্ষতিগ্রস্ত যে এমন যুক্তি-প্রমাণকে উপেক্ষা করে, যা আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন এবং এমন দলিলকে বাতিল বলে যা আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরেছেন। (ইমাম তাজুদ্দিন সুবকিকৃত *তাবাকাতুস শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা*: ৯/৮৪-৮৫)

জেনে রাখো, সুফিগণ আধ্যাত্মিক বিভিন্ন অবস্থার মূলনীতি ইলমে ইলাহির ভিত্তির উপর রেখেছেন। অবশ্য পারিপার্শ্বিক ও শাখাগত মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে তারা ইজতেহাদ করেছেন।[১১০] তুমি কি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটি শোনোনি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ، ورَّثَهُ اللهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

যে ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অজানা ইলম দান করেন।[১১১]

---

[১১০] এ সংক্রান্ত আলোচনা ৯০ নং টীকায় 'কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সুফিয়ায়ে কেরামের সম্পর্ক' শিরোনামে গত হয়েছে। সেখানে শায়খ শারানি এবং হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি কুরআন-সুন্নাহ এবং হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতার কথা তুলে ধরেছেন।

[১১১] এটি হাদিস নয়। বরং (যেমনটি বর্ণিত আছে) হযরত ইসা আ.-এর উক্তি। আবু নুআইম আনাস রা. থেকে মারফু সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, আহমদ বিন হাম্বল র. জনৈক তাবেয়ি থেকে ইসা বিন মারইয়াম আ.-এর সূত্রে এটি উল্লেখ করেছেন। তাই কোনো রাবির হয়ত মনে হয়েছে, তিনি এটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তখন সে ভুল করে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে হাদিসটি সম্পৃক্ত করে সেভাবে এর সনদ বানিয়ে নিয়েছে। (*হিলয়াতুল আউলিয়া:* ১০/১৫)

হাফেয ইরাকি বলেন, আবু নুআইম *হিলয়াতুল আউলিয়ায়* হাদিসটি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

(*তাখরিজু আহাদিসিল ইহইয়া:* ১/১২২)

হাফেয ইরাকির এই কথায় ত্রুটি আছে। কারণ আবু নুআইম হাদিসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেননি। শুধু এর সনদকে মওজু বলেছেন। একটু আগে আমরা সুস্পষ্টরূপে তার সে বক্তব্য পড়েছি।

এর আলামত হলো, তার মাঝে আল্লাহর ভয়ের কারণে ইলমের সূক্ষ্মবোধ এবং আমলের কারণে ইলম বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ইলম যত বাড়তে থাকে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ও বাড়তে থাকে। আর আমল যত বাড়তে থাকে, সাথে সাথে বিনয়ও ততো বাড়তে থাকে।[১১২]

সুফিবাদের তরিকার মূলনীতি হলো, সততা ও উত্তম আখলাকের সঙ্গে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে নেওয়া,[১১৩] নফসের চাহিদা অনুযায়ী নয়, বরং ইলম অনুযায়ী আমল

---

১১২ এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ি র.-এর নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিগুলো কত যথার্থ!

তিনি বলেন,

عَلى قَدْرِ عِلْمِ المَرْءِ يَعْظُمُ خَوْفُهُ   فَلا عالِمٌ إلّا مِن اللهِ خائفُ

آمِنُ مَكْرِ اللهِ بِالله جَاهِلٌ   وَ خَائِفُ مَكْرِ اللهِ باللهِ عارِفُ

মানুষের ইলম অনুযায়ী তার ভেতর আল্লাহর ভয় তৈরি হয়। এমন কোনো আলেম নেই যে আল্লাহকে ভয় করে না। (যদি না করে তাহলে সে আলেম নয়)।

আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে যে নিজেকে নিরাপদ মনে করে সে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জাহেল, অজ্ঞ। আর আল্লাহর শাস্তিকে যে ভয় করে, সে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অবগত।

১১৩ صِدْقٌ (সততা) শব্দ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য আপনি যখন কাউকে কোনো সৎকাজের আদেশ করবেন, তখন আপনি নিজেও তা পালন করবেন। আর কাউকে যখন অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবেন, তখন আপনি নিজেও তা থেকে বিরত থাকবেন। অন্যথায় আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এমন লোকদের নিন্দা করে বলেছেন, তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ করো আর নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করো। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?

করা[১১৪]এবং সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া।

হাসান বসরি র. বলেন, তুমি যদি সৎকাজের আদেশ দানকারী হও, তাহলে নিজেও তার উপর আমল করো। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি অসৎকাজে নিষেধকারী হও, তাহলে নিজেও তা থেকে বিরত থাক। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.কৃত *কিতাবুয যুহদ:* পৃষ্ঠা নং ৩৬০)

[১১৪] এ কথাটির ব্যাখ্যা আমরা ইমাম ইবনুল জাওযি র.-এর একটি ঘটনা থেকে তুলে ধরছি, যাতে তুমি নফসের চাহিদার উপর ইলমকে প্রাধান্য দানের বিষয়টি বুঝতে পারো। ইমাম ইবনুল জাওযি যিনি হাফেযে হাদিস, ইরাকের বিখ্যাত আলেম ও জগদ্বিখ্যাত ওয়ায়েজ, কোমল চেহারা, মিষ্টি ব্যবহার, নম্র ভাষা, পরিশীলিত আচার-উচ্চারণের অধিকারী ও রসিক মানুষ ছিলেন। ছন্দবদ্ধ কথার মাধ্যমে ওয়াজ করার দারুন যোগ্যতা ছিল তার।

তার মজলিসে হাজারও মানুষ শরিক হতো। কেউ কেউ লক্ষ মানুষ শরিক হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি এত সুন্দর ওয়াজ করতেন যে, অন্য কেউ তা পারত না। অনেক উযির ও বাদশা তার মজলিসে শরিক হতেন। পর্দার আড়াল থেকে খলিফারাও শুনতেন। মানুষ তার দরসে উপস্থিত হওয়ার জন্য এক-দুদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করত এবং দূর-দূরান্ত থেকে এসে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত।

এক লোক তাকে বলল, আপনার ওয়াজ শোনার আগ্রহে কাল সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তিনি বললেন, এজন্য ঘুমাতে পারনি যে, মজলিসে ভাল জায়গা পাওয়া নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তায় ছিলে। এখন তোমার উচিত, মজলিসে যা কিছু শুনেছো সেগুলোর উপর আমল করে আজকে সারারাতও জেগে থাকবে।

(দেখুন হাফেয আবু শামা আল-মাকদিসিকৃত *যাইলুর রাওযাতাইন:* পৃষ্ঠা নং ২২। এবং হাফেয যাহাবিকৃত *তাযকিরাতুল হুফফাজ:* (৪/১৩৪২-১৩৪৫), ইমাম আবুল ফারয ইবনুল জাওযির জীবনবৃত্তান্ত আলোচনায়।)

আল্লাহ তায়ালা ইমাম ইবনুল জাওযির উপর রহম করুন! তার অন্তর ও চিন্তা-চেতনা কত জাগ্রত ছিল! তিনি এই গাফেল লোকটিকে নফসের হক আদায় থেকে ইলমের হক আদায়ের দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, যাদের ইলম তাদের মাঝে আল্লাহর ভয়, আমল, অন্তর্দৃষ্টি[১১৫] এবং আকল মারেফাত বৃদ্ধি করেছে। আদবের স্বল্পতার কারণে তুমি যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না পারো, তাহলে নিজেকে তিরস্কার করো! বাস্তবতা তো হলো, আহলে ইলমের নিকট মুখলিস বান্দাদের পরিচয় গোপন থাকে না।

জেনে রাখো, প্রতিটি চিন্তার মাঝে আদব আছে, প্রতিটি ইশারায় ইলম আছে আর এর পার্থক্য সে-ই করতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে এবং আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাদের সম্বোধন করেছেন, তা থেকে বিশ্বাসের ফল লাভ করেছে।

আর একজন সত্যবাদীর মাঝে এর আলামত হল, সে যখন কোনো কিছু দেখে তখন তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। নীরবতার সময় চিন্তামগ্ন থাকে। কথা বললে কল্যাণের কথা বলে। কিছু না পেলে সবর করে। আর কিছু পেলে শোকর

---

[১১৫] **দাড়ির সামান্য ময়লা থেকে ইমাম বুখারির মসজিদকে পরিষ্কার রাখা**

ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারির অন্তর্দৃষ্টি ছিল বিস্ময়কর। বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে তিনি যে বিপুল জ্ঞানের সাক্ষর রেখেছেন, তা তো প্রসিদ্ধ। যেমনটি আহলে ইলমগণ জানেন। আর আমলের ক্ষেত্রে, হাফেয ইবনে হাজার ইমাম বুখারির জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ক একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন:

মুহাম্মদ বিন মানসুর বলেন, আমরা ইমাম বুখারির মজলিসে ছিলাম, এক ব্যক্তি তার দাড়ি থেকে সামান্য ময়লা খুঁটে মসজিদে ফেলল। আমি ইমাম বুখারিকে দেখলাম যে, তিনি একবার লোকটির দিকে আর একবার ময়লার দিকে তাকাচ্ছেন। লোকেরা একটু অন্যমনস্ক হলে আমি দেখলাম যে, তিনি হাত দিয়ে ময়লাটি উঠিয়ে তার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, ময়লাটি বের করে ফেলে দিলেন।' (*হাদয়ুস সারি মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারি:* ২/১৯৬)

এভাবে ইমাম বুখারি মসজিদকে দাড়ির সামান্য ময়লা থেকে রক্ষা করলেন। এটি তার ইলমি ও আমলি অন্তর্দৃষ্টির আলামত। এদের আদর্শই আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

আদায় করে। কোনো বিপদাপদে পতিত হলে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে। তাকে মূর্খ জ্ঞান করা হলে সহনশীলতা প্রদর্শন করে। জ্ঞান লাভ হলে বিনয় ও শিক্ষাদানের সময় নম্রতা অবলম্বন করে। কেউ কিছু চাইলে সে তা প্রদান করে।

সে নেক কাজের ইচ্ছা পোষণকারীদের জন্য শেফা, হেদায়েত সন্ধানীদের সাহায্যকারী, সত্যবাদীদের প্রকৃত বন্ধু এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য নিরাপত্তার চাদর। সে নেক। নিজের ব্যাপারে আল্লাহর নৈকট্য কামনাকারী এবং আল্লাহর হক আদায়ে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী।

আমলের চেয়ে তার নিয়ত উত্তম এবং কথার চেয়ে তার কাজ অধিক প্রভাবমণ্ডিত। সত্য তার ঠিকানা। লজ্জা তার আশ্রয়স্থল। ইলম তার আল্লাহর ভয়।[১১৬] তাকওয়া তার সাক্ষী। দৃষ্টি তার নুরের, যা দিয়ে সে প্রত্যক্ষ করে।

---

[১১৬] 'ইলম যার আল্লাহর ভয়' গ্রন্থকার-এর এ কথাটির উদ্দেশ্য, যার ইলম তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরিয়ত যে সমস্ত বিষয়ে রুখসত তথা ছাড় দিয়েছে, সে সেসব রুখসত গ্রহণ করে না ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয় না। এমন হালত সহিহ ইলম অর্জনের মাধ্যমে হাসিল হয়। বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যারা অন্যদের জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারকের খোদাভীতির অনুপম দৃষ্টান্ত

খোরাসানের ফকিহ, তৎকালিন যুগের ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র.। জন্ম: ১১৮, মৃত্যু:১৮১ হিজরি। এমন সূক্ষ্ম তাকওয়াবোধের অধিকারী ছিলেন, যার দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায়। তার অবস্থা বর্ণনায় এসেছে,

আবু হাসসান বসরি ইসা বিন আবদুল্লাহ র. বলেন, আমি হাসান বিন আরাফাকে বলতে শুনেছি, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, আমি শামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কলম লেখার জন্য ধার নিয়েছিলাম; কিন্তু কাজ শেষে তা ফিরিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর সেখান থেকে সফর করে যখন আমি মারব শহরে চলে এলাম, তখন দেখলাম যে, কলমটি আমার কাছেই রয়ে গেছে। আমি তখন আবার শামে ফিরে গিয়ে সেই ব্যক্তিকে তার কলম ফিরিয়ে দিয়ে এলাম।

(দেখুন খতিবে বাগদাদিকৃত *তারিখে বাগদাদ*: ১০/১৬৭; হাফেয ইবনে হাজারকৃত *তাহযিবুত তাহযিব*: ৫/৩৮৭।)

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আপনার কাছে ঘটনাটি অদ্ভুত মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, বাস্তবে কী এমন ঘটনা ঘটে? এটা কী সম্ভব? হা, বর্তমান যুগে আমাদের মতো মানুষের জীবন ও সমাজে এমন ঘটনা শুনতে পাওয়া অসম্ভব। তবে আজ থেকে বারো শ বছর আগে মানুষের জীবন ও আদর্শ আমাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের কালের দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক গুণ, ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, আদর্শ, তাকওয়া ও আমলের দূরত্বও বেড়ে গেছে।

ইমাম আবু দাউদের সুন্নাহ প্রেম

সুনানে আবু দাউদ কিতাবের গ্রন্থকার ইমাম আবু দাউদ র.। মৃত্যু: ২৭৫ হিজরি।

তিনি হাঁচিদাতার হাঁচির উত্তর দিতে এমন কাজ করেছেন, যা বর্তমান যুগে আমাদের কাছে বিস্ময়কর ও অসম্ভব বলে মনে হবে। আল্লামা শানাওয়ানি আনাস রা.-এর হাঁচি বিষয়ক হাদিসের টীকায় লিখেন যে, ইমাম আবু দাউদ র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক জাহাজে ছিলেন, পাড়ে থাকা এক লোককে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলতে শুনলেন, তখন তিনি এক দিরহাম দিয়ে একটি ছোটো নৌকা ভাড়া করে পাড়ে গিয়ে সেই লোককে হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে আসলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো (সামান্য হাঁচির উত্তর দেওয়ার জন্য আপনি এত কষ্ট করলেন?!) তখন তিনি বলেন, হতে পারে সেই লোকটি মুসতাজাবুত দাওয়া (যে দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়)। জাহাজের সবাই যখন শুয়ে পড়ল, তখন তারা এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেল, যে জোরে জোরে বলছে, আবু দাউদ মাত্র এক দিরহামের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছে।

جَمَالُ ذِيْ الأَرْضِ كَانُوا فِيْ الحَيَاةِ وَهُمْ   بَعْدَ المَمَاتِ جَمَالُ الكُتُبِ وَالسِّيَرِ

> পৃথিবীতে মানুষের সৌন্দর্য শুধু পার্থিব জীবনেই। আর তারা মৃত্যুর পর গ্রন্থ ও জীবনকর্মের সৌন্দর্য।

(দেখুন শানাওয়ানি র.কৃত *মুখতাসারু ইবনে আবি জামরাহর* ব্যাখ্যাগ্রন্থ, পৃষ্ঠা নং ২৯০)

তার জবান থেকে শুধু প্রকৃত ইলমের কথাই উচ্চারিত হয় এবং সে ইয়াকিন ও বিশ্বাসের এমন দলিল, যা সে মানুষের সামনে তুলে ধরে।[১১৭]

---

[১১৭] এটি কত মহান ও সুন্দর একটি গুণ! এ গুণটি যখন কোনো মুসলমানের মাঝে পাওয়া যায় তখন তার মর্যাদা ও সৌন্দর্য আরও অনেক বেড়ে যায়!

আমাদের সালাফে সালেহিনের মাঝে এমন গুণান্বিত মানুষ ছিলেন অসংখ্য।

বন্দি জীবনের উপর ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.-এর ধৈর্য ও তার বিস্ময়বোধ

আল্লাহ তায়ালা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রতি রহম করুন। তিনি তার মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সালাফদের এই গুণটিকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন। শেষ বয়সে তার উপর এক কঠিন সময় নেমে এসেছিল। তাকে লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দামেশকের এক কেল্লায় বন্দি করে রাখা হয়। সঙ্গে তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিমকেও বন্দি করে একটি আলাদা কক্ষে রাখা হয়। এ অবস্থায়ই ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যু হয়।

কারাগারে তিনি খুব প্রশান্তি ও আনন্দে এবং তাকদিরের ফয়সালায় পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যেন গ্রন্থকার ইমাম মুহাসেবিরি নিম্নোক্ত বর্ণনার প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

'তার অন্তর্দৃষ্টি নুরের, যা দ্বারা সে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে। সে প্রকৃত ইলমের অধিকারী, তার জবান থেকে শুধু প্রকৃত ইলমের কথাই উচ্চারিত হয় এবং সে ইয়াকিন ও বিশ্বাসের এমন দলিল যা সে মানুষের সামনে তুলে ধরে।'

মোটকথা, জেলখানা তার জন্য ছিল নির্জনবাস। (একান্তে আল্লাহর ইবাদত করার সুযোগ)। তিনি এই নেয়ামত পেয়ে আল্লাহ তায়ালার অনেক শুকরিয়া আদায় করতেন।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ ইবনে তাইমিয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উস্তাদজী একবার আমাকে বললেন, আমার শত্রুরা আমার কী করতে পারবে? আমার জান্নাত এবং আমার উদ্যানরাজি তো আমার সিনায়। (এ কথার দ্বারা তার উদ্দেশ্য সিনায় থাকা ইমান, ইলম, কুরআন ও সুন্নাহ)। আমি যেখানেই যাই না কেন, আমার সিনা তো আমার সঙ্গেই। আমাকে ছেড়ে যায় না। আমার বন্দি জীবন তো আমার জন্য নির্জনে ইবাদত করার সুযোগ। যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আমি শহিদ। আর দেশান্তর করা হলে তা আমার কাছে ভিন দেশ ভ্রমণ।

কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি বলতেন, আমি যদি তাদের এই দুর্গ ভর্তি স্বর্ণও প্রদান করি, তথাপি আমি তাদের এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারব না। অথবা তিনি বলেছেন, তারা আমার জন্য যে কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে আমি তার প্রতিদান দিতে পারব না।

বন্দি থাকা অবস্থায় সেজদায় পড়ে তিনি এই দোয়া পড়তেন,

اللهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিকির, শোকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতে সাহায্য করুন। তিনি অধিক পরিমাণে এই দোয়াটি পড়তে থাকতেন।

একবার তিনি আমাকে বললেন, প্রকৃত বন্দি তো সে-ই, যার অন্তর আল্লাহর যিকিরবিহীন ভিন্ন কিছুতে আটকে আছে। গ্রেফতার তো সে-ই, প্রবৃত্তির হাতে যে গ্রেফতার হয়ে আছে। যখন তিনি কারাগারের ভেতর প্রবেশ করলেন, তখন ভেতরের দেয়ালটি দেখে কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

'তারপর তাদের মাঝে এক দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, যে দেয়ালের দরজা থাকবে। যার ভেতরে থাকবে রহমত আর বাহিরে আযাব।' (সুরা হাদিদ, আয়াত নং ১৩)

আল্লাহ সাক্ষী, আমি তার চেয়ে উত্তম জীবনের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি। অথচ তার জীবনে অভাব ও সংকট ছিল। সেই সঙ্গে ছিল কারাবাস, জালিমের হুমকি-ধমকি এবং কম্পমান অবস্থা। তা সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে উত্তম জীবনের অধিকারী, প্রচণ্ড মানসিক শক্তিশালী ও সুখী মানুষ ছিলেন। তার চেহারায় নেয়ামতের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট।

যখন কোনো বিপদাপদে আমরা প্রচণ্ড শঙ্কিত হয়ে পড়তাম, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে যেত, পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসত, তখন আমরা তার কাছে গমন করতাম। তাকে দেখে, তার কথা শুনে অন্তরের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেত। অন্তর থেকে সমস্ত সন্দেহ-শঙ্কা দূরীভূত হয়ে ইমান ও ইয়াকিনের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠত এবং তা সম্পূর্ণ শান্ত-স্থির হয়ে যেত। তিনি বলতেন, দুনিয়ার

এসব গুণাবলি সে-ই ব্যক্তি অর্জন করতে পারে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে, আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল, যার নিয়ত সুন্দর, আল্লাহকে যে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ভয় করে, যার আশা-আকাঙ্ক্ষা ছোটো, আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য যে পূর্ণ সতর্ক থাকে এবং তাঁর আযাব থেকে বাঁচার জন্য কান্নার সমুদ্রে অবগাহন করে।

তাই তার সময় অতি মূল্যবান এবং সে সর্বাবস্থায় গুনাহমুক্ত থাকে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্যে সে প্রতারিত হয় না। ভোরের মৃদু মন্দ বাতাস তাকে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ভুলিয়ে দিতে পারে না। কখনো সে গাফলতের ঘোরে বিভোর হলে, সঙ্গে সঙ্গে আবার জেগে উঠে।

জেনে রাখো, জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান যখন সঠিক হয় এবং তার ইয়াকিন ও বিশ্বাস যখন দৃঢ় হয় তখন সে অবগতি লাভ করে যে, একমাত্র সততাই তাকে তার আল্লাহরআজাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে। সে তখন মৃত্যুপরবর্তী চিরস্থায়ী আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সত্যানুসন্ধানে সচেষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই মানুষের মাঝে তার সৎকর্মের চর্চা হবে, এই আশায় সত্যবাদীদের আখলাক-চরিত্র অনুসন্ধান করে,[118] এবং পবিত্র কুরআনের

জান্নাত আছে- অর্থাৎ, আল্লাহর উপর এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত দিনের উপর ইমান- যে তাতে প্রবেশ করেনি-অর্থাৎ, যার অন্তরের সঙ্গে ইমান মিশে যায়নি-সে আখেরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।

সেই সত্তা পবিত্র যিনি তার সঙ্গে মিলনের পূর্বেই বান্দাদের জান্নাত প্রত্যক্ষ করিয়েছেন এবং দুনিয়াতেই তাদের জন্য জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছেন। জান্নাতের সন্ধানে যতক্ষণ তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করতে থাকে, ততক্ষণ জান্নাতের আলো-বাতাস ও সুরভি তারা লাভ করতে থাকে।

(দেখুন ইবনুল কায়্যিমকৃত *আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব* গ্রন্থের ৬৬-৬৭ নং পৃষ্ঠা, যা হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি র. *জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা* গ্রন্থে (২/৪০২) বর্ণনা করেছেন)

[118] অর্থাৎ, তার জীবদ্দশাতেই তাকে তার সততা, আমানতদারি, দিনদারি ও উত্তম আখলাকের কারণে নেক লোকদের মাঝে গণ্য করা হয়, মানুষের মাঝে তার ভালো আলোচনা হয়।

নিম্নোক্ত আয়াতটি শোনার কারণে নিজের জানমাল সমস্ত কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করে দেয়।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।[১১৯]

---

[১১৯] সুরা তাওবা, আয়াত নং, ১১১। সম্পূর্ণ আয়াতটি হলো:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে ফলে হত্যা করে ও নিহত হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ তাওরাত ও ইঞ্জিলে দিয়েছেন এবং কুরআনেও দিয়েছেন। আল্লাহ অপেক্ষা অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছো, সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য।

ইমাম আবুল ওফা বিন আকিল হাম্বলি, তার সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন; তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে একজন এবং মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি তার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তার একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নিজের জান আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করা তোমার কাছে যেন অনেক বড়ো মনে না হয়। কারণ, এই জানই গতকাল তুমি একজন গায়িকার প্রেমে

কিংবা একজন তরুণের প্রেমে নিঃশেষ করেছ। দুনিয়ার ধন-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ও দূর-দূরান্ত সফর করে নিজেকে তুমি অনেক কষ্ট ও বিপদে ফেলেছ। তারপর যখন আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে এসেছ তখন এই কষ্টটাই–অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় তোমার সামান্য ত্যাগ স্বীকার ও সামান্য অর্থ ব্যয়-তোমার কাছে অনেক বড়ো মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! সেই সত্তার উদ্দেশ্যে নিজের জান উৎসর্গ করা উত্তম, যার উদ্দেশ্যে জান উৎসর্গ করা হলে তিনি তা আবার ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। আর যখন তিনি ফিরিয়ে দেন তখন অনেক নেয়ামতের সঙ্গে ফিরিয়ে দেন। যে নেয়ামতের সঙ্গে ফিরিয়ে দেন, সেই নেয়ামতকে চিরস্থায়ী করে দেন। তিনি সেই সত্তা যার উদ্দেশ্যে নিজের জানমাল ব্যয় করা এবং দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করা উত্তম হয়, তিনি কি সেই সত্তা নন যিনি বান্দার উদ্দেশ্যে বলেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.

আর আল্লাহর রাস্তায় যাদের হত্যা করা হয় তাদের তোমরা মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া হয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনো যারা (শাহাদাত লাভ করে) তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দবোধ করে যে, তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে তখন তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দ উদযাপন করে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯ থেকে ১৭১।)

এমন ব্যক্তি অজ্ঞতার পর জ্ঞান, দারিদ্র্যের পর সচ্ছলতা, দূরত্বের পর নৈকট্য এবং ক্লান্তির পর বিশ্রাম লাভ করেছে। তার যাবতীয় বিষয় উত্তম হয়েছে। সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছে। তাকওয়া তার লেবাস ও সর্বদা আল্লাহর ধ্যান তার প্রকৃত অবস্থায় পরিণত হয়েছে। দেখা যায়, মৃত্যুর পূর্বেই মানুষের মাঝে তার সৎকর্মের আলোচনা হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা চারদিকে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেন।

তুমি কি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটি শোননি?

(أُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)

এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তোমার মধ্যে এইভাব জাগ্রত না হয় যে, তুমি তাঁকে দেখছ, তাহলে মনে করবে, তিনি তোমাকে দেখছেন।[১২০]

বিখ্যাত তাবেয়ি কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার সঙ্গে লেনদেন করেছেন এবং তিনি বান্দাকে অনেক উচ্চমূল্য প্রদান করেছেন। হাসান বসরি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে জীবন দান করেছেন, যে জীবন তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন, সম্পদ দিয়েছেন যে সম্পদের রিযিকদাতা তিনিই। তারপর তিনি আবার বান্দাদের থেকে তা খরিদ করে নিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ!

ইমাম নাসাফি তার তাফসিরে (২: ২৫৫) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে এক বেদুইন এ কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, লাভজনক বিক্রয়। আমরা এ লেনদেন প্রত্যাহার করতে চাই না, বাতিলও করতে চাই না।

তারপর সে জিহাদে শরিক হয়ে শাহাদাত লাভ করে।

(দেখুন হাফেয ইবনে রজব হাম্বলিকৃত *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ* ১/১৫৫।)

[১২০] আবু নুআইম এই শব্দে হাদিসটি *হিলয়াতুল আউলিয়ায়* (৮/২০২) যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ুতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু নুআইমের উদ্ধৃতিতে *জামে সগিরে* (১/৫৫১) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জামে সগিরের ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুনাবি বলেন, এই শব্দে হাদিসটি হাসান; কারণ এর সমর্থনে অন্য একটি হাদিস আছে।

সে চুপ থাকলে মূর্খরা তাকে নিশ্চুপ ও কথা বলতে অক্ষম মনে করে।[১২১] অথচ প্রজ্ঞার কারণে সে চুপ থাকে।[১২২] সে কথা বললে নির্বোধরা তাকে বেহুদা মনে

এই হাদিসের শব্দ ইমাম মুসলিম *সহিহ মুসলিমে* (১/১৫৭) হযরত উমর *রাদিয়াল্লাহু আনহু* থেকে ইমান অধ্যায়ে সুওয়ালে জিবরাইলের যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সেই হাদিসের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়।

[১২১] صِمِّيتٌ শব্দের অর্থ, কোনো কারণ ও অক্ষমতা ছাড়া সবসময় চুপ থাকে যে। কথা বললে, সুন্দর কথা বলে। আমাদের সালাফে সালেহিনের অনেকে এমন ছিলেন।

إِذَا سَكَتُوْا رَأَيْتَ لَهُمْ جَمَالاً وَإِنْ نَطَقُوْا سَمِعْتَ لَهُمْ عُقُوْلاً

> অর্থ: তারা চুপ থাকলে, সৌন্দর্য প্রকাশ পেত। আর কথা বললে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত। (অর্থাৎ, জ্ঞানগর্ভ কথা বলতেন)।

তুমি একটু তাদের মজলিস, ভাবগাম্ভীর্য, স্থিরতা, আল্লাহর ভয় এবং তাদের নুরানি চেহারা-সুরতের কথা কল্পনা করো। এখন এই বর্ণনাটি পড়ুন।

অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা এবং লুকমান আলাইহিস সালাম-এর চুপ থাকা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ.

> অর্থ: আর আমি লুকমানকে হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করেছিলাম। (সূরা লুকমান : ১২)

ইমাম ইবনে জারির তাবারি তার তাফসিরে এই আয়াতের তাফসিরে লিখেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর আমি লুকমানকে দিনের বুঝ, সঠিক জ্ঞান এবং যথার্থ মত প্রদান ও সঠিক কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলাম। মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী,

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ.

> এখানে হেকমত শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ফিকহ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সঠিক কথা বলার এমন যোগ্যতা যা নবুয়ত লাভ করা ব্যতীত অর্জিত হয়। (সূরা লুকমান : ১২)

আমর বিন কায়েস রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত লুকমান হাকিম ছিলেন একজন কালো হাবশি গোলাম। তার ঠোঁট দুটো ছিল মোটা মোটা। আর পা দুটি ছিল চওড়া। লুকমান হাকিমের মজলিসে একদিন একজন লোক এল। তিনি তখন উপস্থিত লোকদের তালিম দিচ্ছিলেন। তখন লোকটি তাকে বলল, আপনি কি সেই লোক নন যে অমুক জায়গায় আমার সঙ্গে বকরি চরাত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে জিজ্ঞাসা করল, এত উচ্চ মর্যাদা আপনি কীভাবে লাভ করলেন? তিনি বললেন, সদা সত্য কথা বলে এবং অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থেকে।

(দেখুন তাফসিরে তাবারি : ২১/৬৭)

ইবনু আবি হাতেম বলেন, আমার পিতা আবু দারদা রা.-যার উপাধি ছিল হাকিমুল উম্মত-বর্ণনা করেন, একবার তিনি (আবু দারদা) আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত লুকমান হাকিম সম্পর্কে বললেন, তিনি যেই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তা তিনি পরিবার, বংশ, ধন-সম্পদ ও অন্যান্য গুণাবলির কারণে লাভ করেননি। বরং তিনি অধিক নিশ্চুপ ও চিন্তামগ্ন এবং গভীর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। কখনও দিনে ঘুমাতেন না। তাকে কেউ কখনও থুতু ফেলতে, শব্দ করে গলা পরিষ্কার করতে, পেশাব-পায়খানা ও গোসল করতে, অনর্থক কোনো কাজে লিপ্ত হতে ও কখনও হাসতে দেখেনি। এ সকল গুণাবলির কারণেই তিনি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। (দেখুন তাফসিরে ইবনে কাসির : ৫/৩৮১)

আল্লাহ তাকে হেকমত দান করেছিলেন। কত উত্তম আখলাক ছিল তার! সুতরাং তুমি চেষ্টা করো তার আদর্শ গ্রহণ করার।

[১২২] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি এমন লোকদের দেখেছি, তাদের কেউ মানুষের সঙ্গে বসলে তারা তাকে কথা বলতে অক্ষম মনে করত। অথচ তিনি অক্ষম নন। তিনি একজন মুসলিম ফকিহ।' তার ভিন্ন এক বর্ণনায় এসেছে, 'যদি কোনো ফকিহ লোকদের সঙ্গে বসে, তাহলে কেউ কেউ তাকে কথা বলতে অক্ষম মনে করবে। অথচ তিনি অক্ষম নন। তিনি মূলত প্রসিদ্ধি লাভ করা পছন্দ করেন না। (দেখুন আবু খাইসামাকৃত *কিতাবুল ইলমে :* ১১৪ নং পৃষ্ঠা এবং ইমাম আহমদের *কিতাবুয যুহদে :* ২৬১ নং পৃষ্ঠা)

করে। অথচ আল্লাহর জন্য অন্যের কল্যাণকামনা থেকে সে কথা বলে।[১২৩] তারা তাকে ধনী মনে করে। যেহেতু সে কখনো কারও কাছে কিছু চায় না। অথচ লজ্জার কারণে সে কারও কাছে কিছু চাইতে পারে না। মানুষ তাকে দরিদ্র মনে করে, অথচ বিনয়ের কারণে সে নিজেকে ছোটো করে রাখে।

সে অনর্থক কোনো কাজ করে না। সাধ্যাতীত কিছু করার চেষ্টা করে না। অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু গ্রহণ করে না কিন্তু যা হেফাজত করা তার দায়িত্ব, তা সে ছেড়ে দেয় না। মানুষ তার কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করে। অথচ সে নিজে কষ্টে থাকে। তাকওয়া তথা খোদাভীতির কারণে তার ভেতর থেকে লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা মরে গেছে। ইলমের নুর দ্বারা সে তার শাহওয়াতের আগুনকে নিভিয়ে ফেলেছে। [১২৪]

---

[১২৩] কবির এই নিম্নোক্ত পঙক্তিটিতে তার পরিচয় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

ضَحُوكُ السنِّ إِنْ نَطَقُوا بِخَيْرٍ   وَعِنْدَ الشَّرِّ مِطْراقٌ عَبُوْسٌ

সদাহাস্য, কথা বললে উত্তম কথা বলে, আর অন্যায়ের ক্ষেত্রে যেন কঠিন হাতুড়ি।

তার ও তার মতো সালাফে সালেহিন ও তাদের মতো পরবর্তী মানুষদের ব্যাপারে এ কথা বলা সঠিক হবে যে, তারা কথা বললে সত্য বলে, চুপ থাকলেও হক ও উত্তম বিষয়ে চুপ থাকে না। তারা না থাকলে মানুষ বাতিলের মাঝ থেকে হককে, নকলের ভেতর থেকে আসলকে চিনতে পারত না।

[১২৪] **যুননুন মিসরিকে শুকরান কাইরুআনির নসিহত**

ইমাম হারেস মুহাসেবির উপরিউক্ত কথাটির অনুরূপ গভীর অর্থ, মর্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নসিহত বিখ্যাত বুযুর্গ শুকরান কাইরুআনির কথার মাঝে আছে। তিনি যুননুন মিসরি, সাহনুন এবং আওন বিন ইউসুফের-তারা সবাই সামসময়িক ছিলেন-শায়খ ছিলেন। ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতায় যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৮৬ হিজরিতে সত্তরোর্ধ্ব বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার জীবনবৃত্তান্তে এসেছে, যুননুন মিসরি যখন তার কাছে এলেন, তার সাহচর্য গ্রহণ করে ও কথা শুনে উপকৃত হওয়ার জন্য, তখন সত্তর দিন তার দরবারে পড়ে রইলেন, তারপর যখন দেশে ফিরে যেতে চাইলেন,তখন তিনি তার কাছে উপদেশ ও নসিহত কামনা করলেন। শায়খ শুকরান তাকে বললেন,

এমন হয়ে যাও এবং এমন যারা, তাদের সঙ্গ গ্রহণ করো।[১২৫] তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। তাদের আখলাক-চরিত্রে নিজেকে রাঙাও। এরা নিরাপদ ধনভাণ্ডার।[১২৬] যে দুনিয়া অর্জন করল আর এদের হাতছাড়া করল সে ক্ষতিগ্রস্ত।[১২৭]

জেনে রেখো, যে দুনিয়াবিমুখ, সে যা পাবে তা-ই তার খাবার। যেখানে জায়গা পাবে সেটাই তার বাসস্থান। যা দিয়ে সতর ঢাকা যায় তা-ই তার পোশাক। সরবতার মাঝে তার নিরবতা। কুরআন তার কথা। প্রতাপশালী ও পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তার বন্ধু। যিকির তার সঙ্গী। দুনিয়াবিমুখতা তার সহচর। নিরবতা তার ভালোবাসা। আল্লাহভীতি তার মুক্তিসনদ। (জান্নাত ও ক্ষমা লাভের) আকাঙ্ক্ষা তার বাহন। নসিহত তার মনোবল। আল্লাহর সৃষ্টি ও কুদরত নিয়ে চিন্তা তার শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম। ধৈর্য তার আরামের বালিশ। মাটি তার বিছানা। সত্যবাদীগণ তার ভাই। প্রজ্ঞা তার কথা। বিবেক-বুদ্ধি তার প্রমাণ। সহনশীলতা তার বন্ধু। তাওয়াক্কুল তার উপার্জন। ক্ষুধা তার নিত্য সঙ্গী। আর আল্লাহ তার সাহায্যকারী।

যুননুন বলেন, তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। এখানে বান্দার জন্য আরও কিছু বিষয় কি স্পষ্ট করা যায়? তিনি বললেন, নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করো। আত্মসমালোচনা করো। তোমার জন্য এখন এতটুকুই যথেষ্ট। যুননুন বলেন, আমি তাকে এক নসিহতমূলক বয়ানে বলতে শুনেছিলাম, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, সে ধনী। আর যে ভরসা করে না, সে কষ্ট করে করে ক্লান্ত। যে শোকর আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আর যে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট, সে নিরাপদ। জালেমদের দিকে তাকানো, তাদের সঙ্গে উঠাবসা করা মূলত একটি আপদ। আর তাদের সঙ্গ বর্জন করা রাস্তার প্রথম সিঁড়ি।

১২৫ আলেমদের সুহবতের ফায়েদা ও ফযিলত

এরা সেই সমস্ত লোক, ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ যাদের নাম দিয়েছেন, আখেরাতের আলেম। দুনিয়াদার আলেমদের থেকে পার্থক্য করার জন্য তিনি তাদের এই নাম দিয়েছেন। তুমি তাদের পথ ও মত গ্রহণ করলে তাদের মতো হবে। আর যদি তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো তাহলে তোমাকে তাদের মাঝে গণ্য করা হবে। তাদের সাহচর্য গ্রহণের কারণে তুমিও সফল ও কামিয়াব হয়ে যাবে। মুসলিম শরিফে (১৭/১৪) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আল্লাহ তায়ালার এক দল ভ্রাম্যমান ফেরেশতা আছে। তারা জমিনে ঘুরে (যিকিরের মজলিস সন্ধান করে) বেড়ায়। তাঁরা যখন আকাশমণ্ডলীতে আরোহণ করেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোত্থেকে আসছো? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবহিত। তখন তাঁরা বলতে থাকেন, আমরা ভূমণ্ডলে অবস্থানকারী আপনার বান্দাদের কাছ থেকে এসেছি। যারা আপনার তাসবিহ পড়ে, তাকবির পড়ে, তাহলিল বলে ('লা-ইলা-হাইল্লাল্লা-হ'-এর) যিকির করে, আপনার প্রশংসা করে, আপনার নিকট তাদের প্রত্যাশিত বিষয় প্রার্থনা করে এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাদের মার্জনা করে দিলাম এবং তারা যা প্রার্থনা করছিল আমি তা তাদের প্রদান করলাম। আর তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল আমি তা থেকে তাদের মুক্তি দিলাম। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের রব! তাদের মাঝে তো অমুক পাপী বান্দা ছিল, যে তাদের সাথে বৈঠকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বসেছিল। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। তারা তো এমন কওম যাদের সঙ্গীরা দুর্ভাগা হয় না।

এক দার্শনিক কবির কবিতা

بِعِشْرَتِكَ الْكِرَامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ　　فَلاَ تُرَيَنْ لِغَيْرِهِمْ أُلُوْفًا

পুণ্যবান লোকদের সঙ্গে উঠাবসার কারণে তোমাকেও তাদের মাঝে গণ্য করা হয়। সুতরাং তাদের ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে যেন তোমাকে না দেখা যায়।

আমাদের শায়খ আল্লামা বশির গাযযি হালবির কিছু সুন্দর কবিতা আছে। সেগুলো মূলত ফার্সি ভাষায়। তিনি আরবি করেন। আরবিতে কবিতাগুলো আরও উপভোগ্য ও চমৎকার হয়েছে। কবিতাগুলো তিনি 'হালবের মাটি'র পক্ষ থেকে বলেছেন, যাকে সেখানকার লোকেরা হালব বাসেম (BALOON BOARD)* বলে। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ الطِّيْنَ فِي الْحَمَّامِ يَوْمًا　　بِكَفِّ الْحِبِّ أَثَرَ ثُمَّ نَسَمْ

فَقُلْتُ لَهُ: أَ مِسْكٌ أَمْ عَبِيْرٌ؟　　لَقَدْ صَيَّرْتَنِيْ بِالْحِبِّ مُغْرَم

أَجَابَ الطِّيْنُ أَنِّيْ كُنْتُ تُرْبًا　　صَحِبْتُ الْوَرْدَ صَيَّرَنِيْ مُكَرَّم

أَلِفْتُ أَكَابِرًا وَازْدَدْتُ عِلْمًا　　كَذَا مَنْ عَاشَرَ الْعُلَمَاءَ يُكْرَمُ

আমি একদিন গোসলখানায় প্রিয়ার হাতে এক টুকরো মাটি দেখলাম, তার এমন প্রভাব ছিল যে খুশবু ছড়াচ্ছিল।

তখন আমি মাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি মেশক নাকি আবির সুগন্ধি? তুমি তো আমাকে প্রিয়ার প্রেমে মাতোয়ারা করে তুললে।

উত্তরে মাটি বলল, আমি মাটি ছিলাম, কিন্তু ফুলের সঙ্গ আমাকে সম্মানিত করে তুলেছে।

আমি আকাবিরে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছি, তাই আমার ইলম বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে যে সুসম্পর্ক রাখবে, সে সম্মানিত হবে।

*'হালব বাসেম' খুবই নরম ও হালকা এক প্রকারের মাটি। এটিকে প্রথমে খুব মিহি করে পেষা হয়। তারপর তাতে মেশক, গোলাবের সুগন্ধি মেশানো হয়। তারপর বিশেষ পদ্ধতিতে শুকানো হয়। শুকানোর পর মাটির ছোটো একটি টুকরা একটি পাত্রে রেখে উপর দিয়ে পানি ঢেলে দেওয়া হয়। দশ মিনিট এভাবে ভিজিয়ে রাখার পর পুটিং বা খামিরের মতো তৈরি হয়। তারপর গোসলকারী সাবান দিয়ে ভালো করে মাথা বা শরীর ধুয়ে তা সারা গায়ে মাখে। পনেরো মিনিট এভাবে রেখে দিয়ে তারপর ধুয়ে ফেলে। তখন মাথা বা শরীর থেকে সুন্দর একটি খুশবু ছড়ায়।

ইমাম কাজি আবু মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব বিন নাসর আল-মালেকি বাগদাদি, তারপর মিসরি। অর্থাৎ, প্রথমে ইরাকের বাগদাদ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। পরে মিসর গিয়ে বসবাস শুরু করেন। জন্ম: ৩৬২। মৃত্যু: ৪২২। তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে কাজি ইয়াজ বলেন, আন্দালুসের এক বাসিন্দা তার এই ঘটনাটি আমাকে বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি মিসরের গোসলখানায় গোসল করতে গেলাম। সেখানে আমার কাজি আবু মুহাম্মদ অর্থাৎ, আবদুল ওয়াহাব মালেকির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমার হাতে একটি পাত্রে এই সুগন্ধিটি ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে তা ব্যবহারের অনুরোধ করলাম। তখন তিনি তা হাতে নিয়ে ঘ্রাণ শুঁকলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোত্থেকে পেলে? বললাম, এক গোলাম ক্রয় করেছিলাম। তার সঙ্গে থাকা জিনিসপত্রের মাঝে এটি পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মালিকের কাছ থেকে গোলামটি ক্রয় করার সময় এসব জিনিসপত্রেরও কথা বলে নিয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি তখন বললেন, তাহলে এটি তোমার কাছেই রেখে দাও। আমার তাতে কোনো প্রয়োজন নেই।

এরা বিপদে প্রস্তুতি স্বরূপ, বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকা মানুষ। যদি কখনো তোমার তাদের প্রয়োজন হয়, তারা (তোমার প্রয়োজন এমনভাবে পূরণ করবে যে) তোমাকে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে এবং নির্জনে যখন তারা আল্লাহকে ডাকবে তখন তোমাকে ভুলে যাবে না।

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ: এরা আল্লাহর সৈন্য। জেনে রাখো; আল্লাহর সৈন্যরাই সফলকাম। (সুরা মুজাদালাহ, আয়াত নং ২২)

(দেখুন কাজি ইয়াজকৃত *তারতিবুল মাদারিক লিমারফাতি আসহাবি মাযহাবি মালেক*: ৭/২২৫।)

এ ঘটনাটির মাধ্যমে আমরা দুটি বিষয় জানতে পারি: এক. হালাবি এই সুগন্ধি অনেক আগে থেকেই মানুষ ব্যবহার করে আসছে। আন্দালুসের সেই নাগরিক গোলামটি যদি আন্দালুস থেকে ক্রয় করে থাকে তাহলে সেই চতুর্থ শতাব্দিতেই আন্দালুসে তা প্রসিদ্ধ ছিল। আর মিসর থেকে ক্রয় করে থাকলে মিসরে তা প্রসিদ্ধ ছিল। দুই. ঘটনাটির মাধ্যমে আমরা কাজি আবদুল ওয়াহাব মালেকি র.-এর উঁচু স্তরের তাকওয়ার পরিচয় লাভ করি।

[১২৬] গ্রন্থকার ইমাম হারেস মুহাসেবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'নিরাপদ ধনভাণ্ডার' বলে এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, তাদের সান্নিধ্য ও সুহবত শুধু কল্যাণ-ই কল্যাণ, যাতে কোনো প্রকারের ফেতনা ও অকল্যাণকর কিছু নেই। গুপ্ত ধনভাণ্ডারের বিষয়টি এমন নয়। কারণ অনেকে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেলে তা তার জন্য ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজের দিন, আমানত, নৈতিকতা ও চরিত্র রক্ষা করা তখন তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। দুনিয়া ও আখেরাতে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একারণে গ্রন্থকার নেককার লোকদের সুহবতকে নিরাপদ ধনভাণ্ডার বলেছেন। গুপ্ত ধনভাণ্ডার বলেননি। আল্লাহ তায়ালা ইমাম মুহাসেবির প্রতি রহম করুন। তিনি তাকে কী গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দান করেছিলেন!

[১২৭] কেউ যদি দুনিয়া পেয়ে যায়, আর নেক লোকদের সুহবত না পায়, তাহলে সে নিশ্চিত ক্ষতি ও ধোঁকার শিকার হলো, কারণ সে তাদের ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করেছে। দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে।

আল্লাহ তায়ালা সঠিক বুঝের দ্বারা আমার ও তোমার অন্তরকে প্রশস্ত করুন, ইলমের দ্বারা বক্ষকে আলোকিত করুন, ইয়াকিনের দ্বারা চিন্তাভাবনাকে মজবুত করুন। জেনে রাখো, আমি এই ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে, অন্তরের সমস্ত ব্যাধি অনর্থক কথা ও কাজের দ্বারা সৃষ্টি হয়।[১২৮] আর এসবে লিপ্ত হওয়ার পিছনে মূল কারণ হলো ইলম ছাড়া দুনিয়াবি কাজে প্রবৃত্ত হওয়া[১২৯] কিংবা ইলম অর্জনের পর আখেরাতকে ভুলে যাওয়া।

---

[১২৮] শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি সত্য বলেছেন। এমন কথাই সুনানে আবি দাউদের রাবি বহু গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম হাফেয মুহাদ্দিস সুফি যাহেদ আবু সাইদ বিন আরাবি (আহমদ বিন মুহাম্মদ) বাসরি কুফি-মৃত্যু ৩৪০ হিজরি-বলেছেন, তাসাউফ হচ্ছে সমস্ত অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা। মারেফাত হচ্ছে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে নেওয়া। যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রহণ করা। আর মুআমালা হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিস প্রয়োজনের সময় গ্রহণ করা। তাকদিরের উপর সন্তুষ্টি হচ্ছে অভিযোগ না করা। প্রতিটি কাজের নিরাপত্তা হচ্ছে কৃত্রিমতাকে বর্জন করা।

(দেখুন ইমাম যাহাবিকৃত *তাযকিরাতুল হুফফাজ*: ৩/৮৫২।)

[১২৯] এ কারণে মানুষের হাতে হালাল সম্পদ কম, হারাম সম্পদ বেশি জমা হচ্ছে। কারণ তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা-শিল্প, চাষাবাদ ইত্যাদি শরিয়তের হুকুম না জেনে ও কোনো মুফতির সঙ্গে পরামর্শ না করে শুরু করে। আর তখনই তাতে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটে। শরিয়ত পরিপন্থি বিষয় দেখা দেয়। এভাবে মানুষের চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম বলেন, যখন তুমি কোনো হারাম মাল ভক্ষণ করলে, তুমি আল্লাহর নাফরমানি করলে। আর যখন তুমি হালাল মাল ভক্ষণ করলে তখন ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় তুমি আল্লাহর আনুগত্য করলে।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি র. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম গ্রন্থের নবম হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, জেনে রেখো, এই যে মানুষ অধিকহারে কুরআন-হাদিস ও শরিয়তের পরিপন্থি কাজে জড়াচ্ছে, এর পেছনে কারণ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশকৃত বিষয়সমূহের অনুসরণ না করা এবং নিষেধকৃত বিষয়সমূহ বর্জন না করা। মানুষ যদি কোনো কাজ করার আগে একটি বিষয় নিশ্চিত করে নেয় যে, সে কাজে আল্লাহর হুকুমগুলো জেনে নিবে। শরিয়ত যেভাবে করতে বলে

এর থেকে মুক্তির উপায় হলো, (শরিয়তের হুকুম) জানা নেই এমন সকল বিষয়কে পরহেজগারির কারণে ছেড়ে দেওয়া[১৩০] ও (হুকুম) জানা থাকলে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেনে তারপর গ্রহণ করা।[১৩১]

সেভাবে করবে। আর যেভাবে করতে নিষেধ করে, তা থেকে বেঁচে থাকবে, তাহলে তার যাবতীয় কাজ কুরআন-সুন্নাহ্ মুতাবেক হবে।

সুবহানাল্লাহ! কত সূক্ষ্ম ও যথার্থ কথা! তোমার এই নসিহতটির উপর আমল করা উচিত।

কিন্তু মানুষ নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক কাজ করে। তাই তাদের সকল কাজ সাধারণত শরিয়তের খেলাপ হয়। অনেক সময় শরিয়ত থেকে সে এতদূরে চলে যায় যে, সেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যায়।

১৩০ ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ-এর তাকওয়ার নমুনা

১. সুবহানাল্লাহ! ইমাম আবু হানিফা র. কত বড়ো মুত্তাকি ছিলেন! শরিয়ত ও তাকওয়ার খেলাপ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কত সতর্ক ছিলেন! আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি বলেন, ইমাম আবু হানিফা র. তার ব্যবসায় অংশীদারের নিকট কিছু পণ্য পাঠালেন। সে যেন সেগুলো বিক্রি করে দেয় এবং বিক্রির সময় কাপড়ের ত্রুটির কথা ক্রেতাকে বলে দেয়। লোকটি পণ্যগুলো বিক্রি করে দিল। কিন্তু কাপড়ের ত্রুটির কথা বলতে ভুলে গেল। ক্রেতাও ব্যাপারটি ধরতে পারল না। আবু হানিফা র. যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি সেসব পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য সদকা করে দিলেন। মূল্যের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম। তারপর তিনি তার সেই অংশীদারকেও বাদ দিয়ে দিলেন।

ইবনে আবদুর রহিম মাকদিসির তাকওয়ার নমুনা

এটি তাকওয়ার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। সালাফে সালেহিনের মাঝে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের কথা পাওয়া যায়। ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহিম মাকদিসি হাম্বলি, দিমাশকি, মৃত্যু: ৬৮৮ হিজরি। ইবনুল ইমাদ *শাযারাতুয যাহাব* গ্রন্থে (৫/৪০৬) তার জীবনবৃত্তান্তে বলেন, ইমাম যাহাবি র. বলেন, তিনি একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস, যাহেদ, আবেদ ও অধিক নেক আমলকারী ছিলেন, কঠিন মুত্তাকি ছিলেন। দুনিয়া থেকে খুব সামান্য গ্রহণ করতেন।

তার একটি ঘটনা আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সালেহিয়্যা পাহাড়ে নিজের কোনো এক প্রয়োজনে একটি গর্ত খুঁড়ছিলেন। খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ একটি কলস দেখতে পেলেন। কলসটি ছিল স্বর্ণমুদ্রায় ভরা। তার সঙ্গে তখন তার স্ত্রীও ছিল। সে তাকে গর্ত খুঁড়ার কাজে সহযোগিতা করছিল। কলসটি দেখে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে উঠলেন। তিনি এটিকে নিজের জন্য এক বড়ো ফেতনা ও পরীক্ষা মনে করলেন। তখন কলসটি সেখানে রেখেই আগের মতো মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলেন। স্ত্রীকে বললেন, এটি একটি ফেতনা। হয়ত এর হকদার আছে, আমরা তাকে চিনি না। স্ত্রীর কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন, তিনি কাউকে কিছু বুঝতে দেবেন না এবং নিজেও এর কাছে যাবেন না। তার স্ত্রীও তার মতো নেককার ছিলেন। নিজেদের দারিদ্র্য ও অভাব সত্ত্বেও শুধু আল্লাহর ভয়ে তারা কলসটি সেখানে সেভাবে রেখে চলে এলেন। তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার এটি একটি চূড়ান্ত নিদর্শন।

(দেখুন *শাযারাতুয যাহাব*: ৫/৪০৬)

১৩১ অর্থাৎ, যা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে হালাল, তা গ্রহণ করা। কোনো সন্দেহ হলে কিংবা কোনো বিষয় বুঝে না আসলে নিজে নিজে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত না নেওয়া। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির কাছে জানতে না চাওয়া। কারণ তা অনেক সময় দুর্বলতার শিকার হয় আবার কখনো শক্তিশালী হয় এবং মন-মানসিকতা ও বিভিন্ন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়। তুমি বরং শরিয়তের শরণাপন্ন হবে। উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শরিয়তের হুকুম জানতে চাইবে। কারণ তুমি যে বিষয়ে মাসআলা তালাশ করছ, কিংবা সন্দেহে পতিত হয়েছো, সে বিষয়ে শরিয়তই তোমার জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বড়ো সুন্দর কথা বলেছেন। কথাটি আমি একটি কিতাবের উপর লেখা দেখেছি:

الشَّرْعُ أَعْظَمُ مُرْشِدٍ — فِيْ ظُلْمَةِ الشُّبَهِ البَهِيْمَةِ
وَالْعَقْلُ يَقْفُوْهُ وَلَوْ — لَاهُ لَكُنَّا كَالْبَهِيْمَةِ
فَاتْبَعْهُمَا وَلِمَنْ لَحَا — كَ عَلَيْهِمَا قُلْ: يَا بَهِيْمَهْ

সন্দেহপূর্ণ ও কঠিন বিষয়ে শরিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো পথপ্রদর্শক।

মানুষের বোধশক্তি হচ্ছে তার অনুগামী, যদি শরিয়তের দিঙনির্দেশনা
না থাকত, তাহলে আমরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো হয়ে যেতাম।

তাই শরিয়ত ও বিবেক-বুদ্ধি সঙ্গে নিয়ে চলো, যদি কেউ তোমাকে এ
কারণে তিরস্কার করে তাহলে তাকে বলো, হে সুন্দর! চুপ থাক।

এখানে আরবি بَهِيْمَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ জানোয়ার। আসলে তাকে জানোয়ার বলে সম্বোধন করা হয়নি। بَهِيْمَةٌ শব্দটি উচ্চারণ করলেও পরোক্ষভাবে মূলত এখানে একটি নয়, দুটি শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে بَهِيٌّ (সুন্দর), আর অপরটি مَهْ (চুপ থাক)। একসঙ্গে হবে بَهِيٌّ مَهْ হে সুন্দর, চুপ থাক। রসিকতা করে তাকে এভাবে ডাকা হয়েছে। মুসআব বিন আবদুল্লাহ যাবিরি র. বলেন, আমার পিতা বলেন, সবাই আসলে রসিকতা বুঝতে পারে না। যারা বুদ্ধিমান কেবল তারাই বুঝতে পারে।

এবার কবিতার শেষ কথার ব্যাখ্যায় আসি। অর্থাৎ, তাকে উত্তরে বলো, কল্যাণময় শরিয়ত ও আলোকিত চিন্তা ও বোধের অনুসারী হওয়ার কারণে তুমি আমাকে তিরস্কার করো না। কবি এখানে উলামায়ে কেরামের কথাকেই যেন কবিতার ভাষায় উল্লেখ করে তার আরও সাব্যস্ত করলেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, শরিয়ত মানুষের বোধশক্তিকে রক্ষাকারী। আর বোধশক্তি শরিয়তের প্রদীপ। (এই প্রদীপের ভেতর থেকে শরিয়ত তার আলো ছড়ায়)।

মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি সবসময় শরিয়তের মুখাপেক্ষী

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি বলেন, শরিয়ত হচ্ছে পরিচালক। আর জ্ঞানবুদ্ধি তার অনুগামী। সুতরাং শরিয়তের অবস্থান জ্ঞানবুদ্ধির পূর্বে। জ্ঞানবুদ্ধি সবসময় শরিয়তের মুখাপেক্ষী। শরিয়তের দৃষ্টান্ত সেই খাবারের মতো যা স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করে। আর জ্ঞানবুদ্ধি হলো সেই ঔষধের মতো যা স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং শরিয়ত ও জ্ঞানবুদ্ধি যেন দুই জমজ ভাই, যারা একে অপরকে ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। একজন অপরজনকে ছাড়া চলতে পারে না। তাদের মাঝে সম্পর্ক ও মিল আছে। অমিল নেই যে, মিল স্থাপন করতে হবে।

রাগেব ইস্পাহানি র. আরও বলেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কিছু বিষয় আমরা উপভোগ করি, সুখ লাভ করি। যেমন পরিধান করা, পান করা, দেখা, শোনা ইত্যাদি। এগুলো জৈবিক চাহিদার অনুগামী, যা খুব প্রবল। কারণ, বনি আদমের মাঝে জৈবিক চাহিদার গুণটি সবার আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের জন্য আবশ্যক হলো বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে এই শক্তিকে পরাজিত করা। এজন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ.

> জান্নাতকে কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আর জাহান্নামকে পছন্দনীয় বস্তু দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

(দেখুন রাগেব ইস্পাহানি রহিমাহুল্লাহ-কৃত *আয-যারিআহ ইলা মাকারিমিশ শারিয়াহ* এবং *তাফসিলুন নাশআতাইন ওয়া তাহসিলুস সাআদাতাইন*।)

প্রতিটি মানুষেরই উন্নত গুণাবলি অর্জনের সক্ষমতা আছে। সে চাইলে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহর প্রিয় মুত্তাকি বান্দা হতে পারে।

অবশ্য দুনিয়াতে জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে আখেরাতের নায-নেয়ামতের স্বাদ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি সে সম্পর্কে জানতে অক্ষম। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের নেয়ামতগুলো মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির স্তর উপযোগী করে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আখেরাতের নায-নেয়ামতের উপমা পার্থিব এমন বিষয়ের সঙ্গে দিয়েছেন যা মানুষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ.

> মুত্তাকিদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হল তাতে আছে নির্মল পানির নহর। আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়; আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু মদের নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্যে থাকবে নানা ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা। (সুরা মুহাম্মদ, আয়াত নং ১৫)

ইতোপূর্বে আকল ও ইলমের মাঝে তুলনা শিরোনামে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনাটি পড়ে নিতে পারেন।

আমি দেখেছি, মানুষের অন্তর নষ্ট হয়ে গেলে তার দিন নষ্ট হয়ে যায়। তুমি কি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি শোনোনি,

(أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)

শোনো, মানুষের দেহে একটি গোশত পিণ্ড আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায় তখন পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, তা হচ্ছে কলব।[১৩২]

দেহ বলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দিন। কারণ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আচরণ ভালো ও মন্দ হওয়া দিনের উপর নির্ভরশীল। অন্তর নষ্ট হওয়ার পিছনে মূল কারণ হলো আত্মসমালোচনা না করা এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার ধোঁকায় পড়া। তুমি যদি তোমার অন্তরের সংশোধন চাও তাহলে কোনো কিছু চিন্তা করা ও চাওয়ার সময় একটু থাম। যদি তা আল্লাহর জন্য হয় তাহলে তা গ্রহণ করো। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য হলে তা বর্জন করো।[১৩৩] সর্বদা মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছোটো রাখো।[১৩৪]

---

[১৩২] এটি বুখারি ও মুসলিমে নোমান বিন বাশির রা. থেকে বর্ণিত হাদিসের অংশবিশেষ। ইমাম বুখারি হাদিসটি কিতাবুল ইমানের নিজের দিন রক্ষাকারী ব্যক্তির ফযিলত পরিচ্ছেদে এনেছেন, হাদিস নং ১/১২৬। আর ইমাম মুসলিম এনেছেন হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক বিষয় বর্জন করা পরিচ্ছেদে। হাদিস নং: ১১/২৭।

[১৩৩] শায়খ ফকিহ আহমদ বিন রেসলান শাফেয়ি *মাতনুয যুবাদ* গ্রন্থের শেষে বলেন,

وَزِنْ بِوَزْنِ الشرعِ كُلَّ خاطِرِ ... فَإِنْ يَكُنْ مَأْمُورَهُ فَبَادِرْ

وَإِنْ يَكُنْ مِمَّا نُهِيتَ عَنْهُ ... فَهُوَ من الشيطانِ فَاحذَرْهُ

নিজের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা শরিয়তের মানদণ্ডে যাচাই করো। যদি শরিয়ত নির্দেশিত হয়, তাহলে দ্রুত তা করে নাও। আর যদি শরিয়ত নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে, তা থেকে বেঁচে থাকো।

ইমাম জুনাইদ র. বলেন, আমার অন্তরে যখন কোনো চিন্তা আসে, তখন কুরআন ও হাদিস থেকে তার সমর্থনে দুটি দলিল না পাওয়া পর্যন্ত আমি তা গ্রহণ করি না। মনের চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা র.-এর আলোচনা পিছনে গত হয়েছে। সেই আলোচনাটি পড়ে নিতে পারেন।

১৩৪ জীবন খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে

৩. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كُلَّ يَوْمٍ يُقَالُ: مَاتَ فُلَانٌ و فلانٌ، وَلاَ بُدَّ مِنْ يَوْمٍ يُقَالُ فِيْهِ مَاتَ عُمَرُ.

প্রতিদিন ঘোষণা করা হয়, অমুক অমুক ইন্তেকাল করেছেন। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন ঘোষণা করা হবে উমর ইন্তেকাল করেছে।

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إِذَا كُنْتَ فِيْ إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِيْ إِقْبَالٍ. فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقٰى.

যখন তুমি মৃত্যু থেকে পিঠ ফিরিয়ে রাখো, তখন মৃত্যু তোমার দিকে মুখ করে রাখে। খুব দ্রুতই তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে।

নাহজুল বালাগাহ: ৪/৮৭।

হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

ابْنَ آدَمَ! إِنَّمَا أَنْتَ أيامٌ، كُلَّما ذهَبَ يومٌ، ذَهَبَ بَعْضُكَ.

হে আদম সন্তান, তুমি তো কিছু দিবসের সমষ্টি। একটি দিবস যখন গত হলো, তখন তোমার (জীবনের কিছু) অংশও গত হয়ে গেলো।

ইমাম যাহাবিকৃত *তারিখুল ইসলাম:* ৪/১০৪, ইমাম আহমদকৃত *কিতাবুয যুহদ:* পৃষ্ঠা নং ২৭৮।

হযরত হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই উক্তির অনুরূপ কথাই যেন কবি বলেছেন,

অন্তরের ইচ্ছার কারণে মানুষ যে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ করে এর বহিঃপ্রকাশ আমি কর্ণ-চক্ষু, জিহ্বা, খাবার, পোশাক ও বাসস্থানের মাধ্যমে হতে দেখেছি। যেমন অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কিছু শোনার দ্বারা উদাসীনতা ও ভুলে যাওয়ার রোগ সৃষ্টি হয়। অর্থহীন দৃষ্টির দ্বারা গাফলত ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। অনর্থক কথা বলার দ্বারা অতিরঞ্জন ও বাগ্মী হওয়ার

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا رَاكِبًا ظَهْرَ عُمْرِهِ　　عَلَى سَفَرٍ يُضْنِيهِ بِالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ

يَبِيْتُ وَيُمْسِيْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ　　بَعِيْدًا عَنِ الدُّنْيَا قَرِيْبًا مِّنَ الْقَبرِ.

জীবন বাহনের পিঠে চড়ে মানুষ তো কেবল এক মুসাফির, যে সফর তাকে দিন দিন দুর্বল করে দিচ্ছে।

তার একেকটি সকাল ও একেকটি বিকাল হচ্ছে, আর একটু একটু করে সে দুনিয়া থেকে দূরে সরে কবরের নিকটবর্তী হচ্ছে।

নিম্নোক্ত কবিতাটি যিনি বলেছেন, বড়ো সত্য বলেছেন,

يَسُرُّ الْمَرْءَ ما ذَهَبَ اللَيَالِيْ　　وَكَانَ ذَهابُهُنَّ لَهُ ذِهَابًا

রাতের কেটে যাওয়া মানুষের কাছে খুব আনন্দের, অথচ এতে তার জীবন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত, জনৈক কবি নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিতে তা খুব সুন্দরভাবে চিত্রায়ন করেছেন:

أذانُ الْمَرْءِ حِيْنَ الطِّفلُ يَأْتِيْ　　وتَأْخِيْرُ الصَّلَاةِ إِلَى الْمَمَاتِ.

دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَحْيَاهُ يَسِيْرٌ　　كَمَا بَيْنَ الأذانِ إِلَى الصَّلَاةِ.

আসার সময় আযান হলো, যাওয়ার সময় নামাজ (জানাজা)।

জীবন তো আযান ও নামাজের মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়টুকুই।

প্রবণতা সৃষ্টি হয়।[১৩৫] অতিরিক্ত আহারের দ্বারা লোভ-লালসা ও মন্দ কাজের ইচ্ছা জাগ্রত হয়।[১৩৬] পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের

---

[১৩৫] আতা বিন আবি রাবাহ র.-এর অর্থহীন কথা থেকে বেঁচে থাকার নসিহত

২. ইয়ালা বিন উবাইদ বলেন, আমরা মুহাম্মদ বিন সুকার নিকট গেলাম। তিনি তখন বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কথা বলব না, যা হয়ত তোমাদের উপকারে আসবে? কারণ তাতে আমি নিজেও উপকৃত হয়েছি। আতা বিন আবি রাবাহ আমাকে বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথা অপছন্দ করতেন। তারা আল্লাহর কুরআনের তেলাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং জীবিকার ব্যাপারে অপরিহার্য আলোচনা ছাড়া বাকি সব ধরনের কথাবার্তাকে অর্থহীন মনে করতেন।

তোমরা কি তোমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসাবরক্ষক ফেরেশতা কিরামান কাতেবিনের বিষয়টি ভুলে যাও) (যারা তোমার ডানে ও বামে বসে তোমার কর্ম লিপিবদ্ধ করছে, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত। তোমরা কি এই ভেবে লজ্জাবোধ করো না যে, কেয়ামতের দিন তোমাদের কারও আমলনামা যখন খোলা হবে, তখন সে দেখবে তা এমন অর্থহীন কথায় পরিপূর্ণ যা তার দিনসংশ্লিষ্ট ও দুনিয়ার প্রয়োজনীয় বিষয় নয়।

আতা বিন আবি রাবাহের জীবনী বর্ণনায় এসেছে, ইসমাইল বিন উমাইয়া বলেন, তিনি দিনের লম্বা সময় চুপ থাকতেন। যখন কথা বলতেন, আমাদের কাছে মনে হতো, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তিনি বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত।

দেখুন আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*: ৩/৩১৪। ইমাম যাহাবি র.কৃত *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৫/৮৩,৮৬।

[১৩৬] ইমাম মুহাসেবি র. এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, অতিরিক্ত আহার ও বিলাসিতা মানুষকে অলস ও আরামপ্রিয় করে দেয়। তার মাঝে বিভিন্ন মন্দ ইচ্ছা জাগ্রত করে এবং দিন ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নানা চাহিদা তৈরি করে। তাই বুদ্ধিমান ও সচেতন ব্যক্তির–যদিও তিনি ধনী ও সম্পদশালী হন- উচিত পানাহারে পরিমিতিবোধ বজায় রাখা। কারণ, একেবার স্বল্প আহার যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তেমনি অতিরিক্ত আহারও ক্ষতিকর। ইমাম ইবনুল জাওযি র. তার *সাইদুল খাতির* নামক কিতাবের ৪৪৫নং পৃষ্ঠায় বলেন, মানুষের উচিত শরীরের উপর এমন কোনো কষ্টকর কাজ

দ্বারা অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা সৃষ্টি হয়। বাসস্থানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থসম্পদ ব্যয়ের দ্বারা অপচয় ও আত্মগর্ব সৃষ্টি হয়। [১৩৭]

চাপিয়ে না দেওয়া যা সে সহ্য করতে পারবে না। কারণ শরীর হচ্ছে বাহনের মতো। যদি এর প্রতি দয়ার আচরণ না করা হয়, তাহলে সে আরোহীকে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না।

আর এমন খাবার পরিহার করা উচিত যা দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং যা খাওয়ার দ্বারা কোনো ভাল কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আপনি মনে করবেন না, আমি আপনাকে আপনার পছন্দনীয়, সুস্বাদু ও মজাদার খাবার অধিক পরিমাণে গ্রহণের কথা বলছি। আমি শুধু আপনাকে শরীর ও স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা দান করে এমন খাবার গ্রহণের কথা বলছি এবং ক্ষতিকর খাবার গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করছি। কারণ, অতি আহার অতি নিদ্রার কারণ। তৃপ্তিভরে আহার মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দেয় এবং শরীর দুর্বল করে দেয়। তাই সর্বোত্তম হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

[১৩৭] এখানে আরও কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা তুলে ধরা হলো:

অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা: যেমন যে বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি সে বিষয়ে আলোচনা করা। অথচ সেই আলোচনার তখন প্রয়োজন নেই। অথবা অর্থহীন কোনো বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া।

খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে যেমন অধিক তৃপ্তি ভরে খাওয়া। অথবা রঙবেরঙের বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করা।

ঘুমানোর ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঘুমানো। জেগে থাকার ক্ষেত্রে যেমন অর্থপূর্ণ কোনো কাজ ছাড়া জেগে থাকা।

পোশাকআশাকের ক্ষেত্রে যেমন বছরের বিভিন্ন মৌসুমে ও বিভিন্ন উৎসবে শরয়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাকআশাক ক্রয় করা।

বসবাসের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজনের অধিক খরচ করা, যা বিলাসিতা ও গর্বের পর্যায়ে চলে যায়।

ফার্নিচার ও আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে যেমন এগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করা।

দৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী নয় এমন কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করা। আর নাজায়েয কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করা তো সম্পূর্ণ হারাম।

জেনে রাখো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহমুক্ত রাখা হচ্ছে ফরয। আর অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা হচ্ছে একটি বিশেষ গুণ। এসব কিছুর পূর্বে তওবা করে নেওয়া আবশ্যক। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এটাকে আবশ্যক করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا.

হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে নাসুহা (বিশুদ্ধ) তওবা করো।[১৩৮]

এখানে নাসুহা শব্দের অর্থ হচ্ছে, বান্দা তার রবের নিকট যে গুনাহ থেকে তওবা করছে, তা আর দ্বিতীয়বার না করা।[১৩৯] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষেত্রে যেমন রাস্তায় যাকে দেখে বা যাকে চেনে তার সঙ্গেই মেশা, কথা বলা। পাশে গিয়ে বসা। সেই মানুষটি মুমিন মুত্তাকি ও নেককার কিনা- এগুলো লক্ষ না করা।

খরচের ক্ষেত্রে যেমন অপ্রয়োজনীয় কিংবা অনর্থক খরচ করা।

ইলমের অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে ও প্রয়োজন পড়বে না এমন কোনো ইলম হাসিলে মগ্ন হওয়া।

অপ্রয়োজনীয়' কিতাবাদি। গবেষণা ও পড়াশোনার কাজে লাগবে না, কিংবা উপকারে আসবে না এমন কোনো কিতাব সংগ্রহ করা।

[১৩৮] সুরা তাহরিম, আয়াত নং ৮।

[১৩৯] **ডাকু ফুযাইল ইবনে ইয়াজের তওবা**

এখন তোমাকে ফুযাইল ইবনে ইয়াজের তওবার ঘটনা শোনাব, যে মাত্র এক মুহূর্তের ব্যবধানে ডাকাত থেকে একজন যাহেদ ও আবেদে পরিণত হয়েছিল। তারপর হয়েছিল মুহাদ্দিস, আলেম ও বিশিষ্ট দাই। তার কথা ও কাজই মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকত। তিনি যখন একান্তমনে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সত্য দিলে বিশুদ্ধ তওবা করেছিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি হলেন যাহেদ, আবেদ (ফুযায়ল ইবনে ইয়াজ) তামিমি ইয়ারবুয়ি খুরাসানি, তারপর মক্কি। মৃত্যু: ১৮৭ হিজরি।

ফুযাইলের ছাত্র আবু আম্মার হুসাইন বিন হুরাইছ বলেন, আমি ফযল বিন মুসাকে বলতে শুনেছি, ফুযাইল বিন ইয়াজ ডাকাত ছিল। আবিওয়ারদ ও সারাখস শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়া রাস্তায় ডাকাতি করত। তার তওবার ঘটনাটি হলো, তিনি এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। দেয়াল টপকে তার কাছে যাওয়ার সময় তিনি একজন তেলাওয়াতকারীকে তেলাওয়াত করতে শুনলেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

> যারা ইমান এনেছে, আল্লাহর স্মরণে তাদের বিনয়াবনত হওয়ার সময় কি এখনো আসেনি? (সুরা হাদিদ, আয়াত নং ১৬)

আয়াতটি শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, অবশ্যই হে প্রভু, সময় হয়েছে। তারপর তিনি ফিরে গিয়ে একটি বিরান ঘরে রাত কাটালেন। সেখানে কিছু মুসাফির অবস্থান করছিল। তাদের একজন বলল, চল, এখনই যাত্রা করা যাক। অপরজন বলল, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, কারণ এখন বের হলে পথে ফুযাইল সবকিছু লুট করে নিয়ে যাবে।

ফুযাইল বলেন, আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। রাতে আমি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত থাকি। আর মানুষ আমাকে ভয় পায়। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই লোকদের কাছে এই জন্য নিয়ে এসেছেন; যাতে আমি আমার খারাপ পথ থেকে ফিরে আসি, তওবা করি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট তওবা করছি। আর তওবার পর বাইতুল্লাহর প্রতিবেশি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। তারপর তিনি মক্কায় চলে এলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বাকি জীবন বাইতুল্লাহর পাশেই কাটিয়ে দিলেন।

ফুযাইলের খাদেম ইবরাহিম ইবনে আশআশ বলেন, আমি ফুযাইলের চেয়ে আর কারও মাঝে এত অধিক আল্লাহর আযমত দেখিনি। তার সামনে যখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হতো কিংবা তিনি যখন কুরআন শ্রবণ করতেন, তখন ভয় ও চিন্তা তাকে পেয়ে বসত। দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। তিনি এত পরিমাণে ক্রন্দন করতেন যে, উপস্থিত লোকদের তার প্রতি মায়া হতো। রাবাহ ইবনে খালেদ বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, আমি যখন ফুযাইলকে দেখি, তখন আমাকে নতুন করে আখেরাতের চিন্তা পেয়ে বসে, আমি নিজেকে তখন তিরস্কার করি। এ কথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

তাহযিবুত তাহযিব: ৮/২৯৪,২৯৬।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا، وَ تَقَرَّبُوْا إِلَى اللهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوْا.

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর নিকট তওবা করো এবং কর্মব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল করো।[১৪০]

প্রকৃতই সত্য ও বিশুদ্ধ তওবার পর মানুষের মাঝে এমন সত্য নুরের উদ্ভাস ঘটে

[১৪০] এটি একটি লম্বা হাদিসের চুম্বকাংশ, ইবনে মাজাহ তার *সুনানে* ১০৮১ নং-এ হাদিসটি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে একটু ভিন্ন শব্দে। সেখানে হাদিসটি এভাবে এসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا. وَ بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوْا.

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর নিকট তওবা করো এবং কর্মব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই নেক আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।

হাদিসটির সনদে আলি ইবনু যাইদ ইবনে জুদআন নামক রাবি আছেন, তিনি সকলের নিকট জয়িফ (দুর্বল)।

আর তার থেকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-আদাবি, ইমাম যাহাবি মিযানুল ইতেদালে ৯২/৬৮) তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "ইমাম বুখারি তাকে হাদিস বর্ণনায় মুনকার বলেছেন। ওকী ইবনুল জাররাহ র. বলেন, তিনি হাদিস জাল করতেন (বানাতেন)। (অর্থাৎ, বানিয়ে হাদিস বর্ণনা করতেন।) ইবনে হিব্বান বলেন, তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।"

হাফেয ইবনে হাজার *তাহযিবুত তাহযিব* গ্রন্থে (৬/২১) ইমাম যাহাবির উক্তি নকল করার পর বলেন, ইবনে মাজাহ জুমুআর ফরয অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ

ইমাম হারেস মুহাসেবি বলেন, চারটি বিষয় ছাড়া তওবা শুদ্ধ হয় না।

এক. মন যত পীড়াপীড়ি করুক দ্বিতীয়বার আর সেই গুনাহ না করা।

দুই. লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করা, ক্ষমা চাওয়া।

তিন. নিজের কাছে অন্যের কোনো হক ও প্রাপ্য থাকলে তা আদায় করে দেওয়া।

চার. কারও উপর জুলুম করলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।[১৪১]

সাতটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখা। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, দুই হাত, দুই পা এবং অন্তর। অন্তর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রধান। সমস্ত দেহ সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া না হওয়া এর উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি অঙ্গের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে কিছু আদেশ-নিষেধ রেখেছেন। আর এতদুভয়ের মাঝে কিছু ছাড় ও বৈধ বিষয় রেখেছেন, যেগুলো বর্জন করার মাঝে একজন বান্দার বিশেষ মর্যাদা নিহিত।

আল আদাবির একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আব্দিল বার বলেন,- "এ হাদিসটির ব্যাপারে একদল আহলে ইলম বলেন- এটি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আল আদাবির বানানো হাদিসগুলোর মাঝে একটি, এবং তিনি তাদের (মুহাদ্দিসগণের) নিকট মিথ্যুক হিসেবে চিহ্নিত।"

সুতরাং হাদিসটি মওজু।

উত্তম হত গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ যদি তওবার নির্দেশ সংক্রান্ত হাদিস হিসেবে আগার ইবনে ইয়াসির মুযানি রা.-এর হাদিসটি আনতেন। হাদিসটি হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ، فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

হে লোকসকল! তোমরা তওবা করো, কারণ আমি প্রতিদিন একশবার তওবা করি।

[১৪১] অর্থাৎ, হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দেওয়া।

ঈমান ও তওবার পর অন্তরের জন্য ফরজ হলো, ইখলাসের সঙ্গে আমল করা। কারও ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে সুধারণা পোষণ করা।[১৪২] আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার প্রতি আস্থা রাখা। তাঁর আযাবের ব্যাপারে ভয় ও তাঁর অনুগ্রহের আশা রাখা।[১৪৩]

---

[১৪২] অর্থাৎ, কোনো সৎ মানুষকে যদি সন্দেহজনক কিছু করতে দেখো, তাহলে তার প্রতি ভালো ধারণা রাখো। কারণ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা।

[১৪৩] আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে আল্লাহর কাছেই

জেনে রাখো, কাউকে ভয় পেলে তুমি কী করো? তার কাছ থেকে দূরে থাকো। তার থেকে পলায়ন করো। কিন্তু আল্লাহকে ভয় পেলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তুমি তাঁর কাছেই ছুটে আসো। কারণ, ভয়ও তাঁকে করতে হবে। আশ্রয় ও নিরাপত্তা তাঁর কাছেই চাইতে হবে। আল্লাহ তায়ালার মহান জাত ও সত্তা এমনই। সুতরাং আল্লাহকে যে ভয় করবে সে দৌড়ে আল্লাহর কাছেই আসবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.

অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের প্রতি তাঁর প্রেরিত সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমের সময় এই দোয়া করতেন,

لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ من اللهِ إِلَّا إِلَيكَ.

হে আল্লাহ, মুক্তি ও আশ্রয়স্থল আপনি ছাড়া আর কারও কাছে নেই।

(*বুখারি:* ১১/৯৮; *মুসলিম:* ১৭/৩২।)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাজে সেজদায় পড়ে এই দোয়া করতেন,

অন্তরের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হাদিস হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَن يَّلِيْنُ لَهٗ قَلْبِيْ

মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা আছে যাদের জন্য আমার অন্তর নরম হয়। ১৪৪

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ আমি আপনার গজব ও অসন্তুষ্টি থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় এবং আপনার আজাব থেকে ক্ষমা ও মুক্তির আশ্রয় চাচ্ছি। এমনিভাবে আপনার আজাব থেকে আপনারই রহমতের আশ্রয় চাচ্ছি। এমনিভাবে আপনার আযাব থেকে আপনার রহমতের আশ্রয় চাচ্ছি। আপনার প্রশংসার হক আদায় করার সামর্থ্য আমার নেই। আপনি আপনার নিজের প্রশংসা যেভাবে করেছেন, আপনি তেমনই।

শারহু সহিহ মুসলিমে (৪/২০৪) ইমাম নববি বলেন, ইমাম আবু সুলায়মান খাত্তাবি বলেন, এই দোয়ার একটি সূক্ষ্ম অর্থ রয়েছে। আর তা হচ্ছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং তিনি তার কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি তাকে তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যমে অসন্তুষ্টি থেকে এবং ক্ষমার মাধ্যমে তাঁর আযাব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। আমরা জানি সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। অনুরূপভাবে ক্ষমা ও শাস্তি। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এমন সত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন যার বিপরীতে কোনো কিছু নেই। যেন তিনি তাঁর কাছে তাঁর থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অন্য কারও থেকে আশ্রয় প্রার্থনা নয়। এর অর্থ: আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এবং তাঁর প্রশংসার যে ওয়াজিব হক আদায়ে ত্রুটি হয়েছে তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা।'

১৪৪ ইমাম আহমদ এটি তার *মুসনাদে* (৫:২৬৭) আবু উমামা বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাফেয হাইসামি *মাজমাউজ যাওয়ায়েদে*

অপর একটি হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الحَقَّ يَأْتِيْ وَ عَلَيْهِ نُوْرٌ، فَعَلَيْكُمْ بِسَرَائِرِ القُلُوبِ.

(১০:২৭৬) এটি উল্লেখ করে বলেন, ইমাম তাবারি এটি বর্ণনা করেছেন এবং সনদের সকলকে বিশ্বস্ত বলা হয়েছে। সেখানে হাদিসটি আবু উমামা বাহিলি রা.-থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِيْ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، إِنَّ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَن يَّلِيْنُ لَهُ قَلْبِيْ.

আমার সঙ্গে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেখা হল। তখন তিনি আমার হাত ধরে বলেন, হে আবু উমামা, কিছু মুমিন রয়েছে যাদের জন্য আমার অন্তর নরম হয়ে যায়।

আর মুসনাদে আহমাদে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ أَبُو راشد الحُبْراني: أَخَذَ أَبُوْ أُمامَةَ الباهلِيْ بِيَدِيْ وَ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِيْ رسولُ الله صلى الله عليه و سلم فَقَال: يا أَبَا أُمامَةَ، إِنَّ مِنْ المُؤمنين مَن يَلِيْنُ لِيْ قَلبُه.

আবু রাশেদ হুবরানি বলেন, আবু উমামা বাহিলি আমার হাত ধরে বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বলেন, হে আবু উমামা, মুমিনদের মধ্যে কিছু বান্দা এমন আছে আমার জন্য যাদের অন্তর নরম হয়।

তবে হাফেয যাহাবির *মিযানুল ইতিদালে* (১:৩৩৬) مَن يَلِيْنُ لَه قَلبِيْ ... (যাদের জন্য আমার অন্তর নরম হয়ে যায়) আছে।

তাফসিরে ইবনে কাসিরেও সুরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতের তাফসিরে *মুসনাদে আহমাদের* উদ্ধৃতিতে হাদিসটি এভাবে, অর্থাৎ, مَن يَلِيْنُ لَه قَلبِيْ ... শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে নেই আমার জন্য যার অন্তর নরম হয়। হতে পারে *মুসনাদে আহমদের* মুদ্রিত কপিতে অন্তরকে রাসুলের দিকে সম্পৃক্ত না করে ভুলে মুমিন বান্দার দিকে করা হয়েছে।

মাজমাউয যাওয়ায়েদেও (১:৬৩ এবং ১:৪০৫) এরূপ হয়েছে। প্রকাশনা ১৪১২।

নিশ্চয় যা হক, তা নুর নিয়ে আগমন করে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে অন্তরের গোপন বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা।[১৪৫]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لِلْقُلُوْبِ شَهْوَةٌ وَإِقْبَالٌ وَفِتْرَةٌ وَإِدْبَارٌ فَاغْتَنِمُوْهَا عِنْدَ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا وَذَرُوْهَا عِنْدَ فَتْرَتِهَا وَإِدْبَارِهَا.

মানুষের মাঝে উদ্দীপনা ও অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা রয়েছে। রয়েছে অনুৎসাহ ও অবসাদের মানসিকতা। সুতরাং উদ্দীপ্ত থাকার সময়কে তোমরা গণিমত মনে করো। আর অনাগ্রহ ও অনগ্রসরতার (ক্লান্তির) সময় নিজেকে বিশ্রাম দাও।[১৪৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন,

اَلْقَلْبُ مِثْلُ الْمِرْآةِ إِذَا طَالَ مَكْثُهَا فِي الْيَدِ صَدِئَتْ وَكَالدَّابَّةِ إِذَا غَفَلَ عَنْهَا هُزِلَتْ

---

[১৪৫] হাদিসের কিতাবগুলোতে আমি হাদিসটি খুঁজে পাইনি। আল্লাহ তায়ালা এই হাদিসটি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

[১৪৬] মূল কপি দুটিতে, *হিলয়াতুল আউলিয়ায়* (১:১৩) এবং ইবনে হিব্বানকৃত *রওজাতুল উকালায়*, অর্থাৎ, সবজায়গায় এই শব্দে আছে: شَهْوَةٌ وَ إِقْبَالٌ। এর অর্থ স্পষ্ট। যদি কেউ বলে, এই শব্দ দুটি شِرَّةٌ وَ إِقْبَالٌ শব্দের পরিবর্তে এসেছে। যার অর্থ উৎসাহ উদ্দীপনা, তাহলেও হতে পারে। অর্থ প্রায় কাছাকাছিই।

অন্তর হচ্ছে আয়নাস্বরূপ, যা বেশিক্ষণ হাতে নিয়ে রাখলে তাতে ময়লা পড়ে যায় এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, যার মালিক তার যত্নের ব্যাপারে উদাসীন হলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।[১৪৭]

---

[১৪৭] একটি কপিতে عَدَلَتْ (সরে যায়) শব্দটি আছে। অর্থাৎ, বাহন যন্ত্রটি আরোহীর উদাসীনতা ও অসতর্কতার কারণে গন্তব্যের পথ থেকে সরে যায়।

এমন কিছু উদাসীনতা অসতর্কতা রয়েছে যা মানুষকে সীমাহীন ভোগান্তি ও কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেয় এবং লক্ষ থেকে শত শত মাইল দূরে নিয়ে ফেলে। আল্লামা ইকবাল বড়ো সুন্দর বলেছেন,

لَحْظَةٌ يَا صَاحِبِيْ إِنْ تَغْفُلْ   أَلْفِ مَيْلٍ زَادَ بُعْدُ الْمَنْزِلِ

رَامَ نَقْشَ الشَّوْكِ حِيْنًا رَجُلُ   فَاخْتَفَى عَنْ نَاظِرَيْهِ الْمَحْمِلُ

হে বন্ধু, এক মুহূর্তের ভুল তোমাকে লক্ষ থেকে হাজার মাইল দূরে সরিয়ে দেবে।

এক ব্যক্তি পায়ের কাঁটা বের করতে ব্যস্ত হলো। আর তখন ডুলিটি তার চোখের অন্তরালে হারিয়ে গেল

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, মরুভূমিতে চলতে চলতে এক ব্যক্তি পথ হারিয়ে ফেললো। হঠাৎ দূরে একটি ডুলি দেখতে পেয়ে সেখানে নিশ্চয়ই কোনো মানুষ থাকবে ভেবে নিজের মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠলো। তখন সে খুব দ্রুত হাঁপাতে হাঁপাতে সেই ডুলিটির দিকে এগোল। তার মনে আশার আলো জ্বলছে, সেখানে পৌঁছতে পারলেই তার মুক্তি। তখন তার পায়ে একটি কাঁটা বিঁধলো। সে ডুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মুহূর্তের জন্য পায়ের কাঁটা বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এর মধ্যে ডুলিটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখে তা আর নেই। তখন তার আশার আলো নিভে গেল। আফসোস ও অনুতাপ তাকে ঘিরে ধরল।

সুতরাং যার কোনো লক্ষ আছে তার উচিত, যত বিপদ আসুক, পরিস্থিতি যত প্রতিকূল হোক, লক্ষ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্য তা থেকে উদাসীন না হওয়া।

১৭৫. জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন,

مَثَلُ بَيْتٍ لَهُ سِتَّةُ أَبْوَابٍ ثُمَّ قِيْلَ لَكَ اِحْذَرْ أَلَا يَدْخُلَ عَلَيْكَ مِنْ أَحَدِ الْأَبْوَابِ شَيْءٌ فَيُفْسِدُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ فَالْقَلْبُ هُوَ الْبَيْتُ وَالْأَبْوَابُ: اَللِّسَانُ، وَالْبَصَرُ، وَالسَّمْعُ وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ فَمَتَى انْفَتَحَ بَابٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ضَاعَ الْبَيْتُ.

ক্বলব বা অন্তরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি ঘরের মতো যার মধ্যে ৬টি দরজা আছে। কাজেই তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে এই ৬টি দরজার কোনো একটি দরজা দিয়ে যেন কোনো কিছু প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে সেই ঘরে সংরক্ষিত মূল্যবান সম্পদসমূহ নষ্ট করে ফেলবে। আর অন্তর হচ্ছে সেই ঘর। আর দরজা ৬টি হচ্ছে- জিহ্বা, চোখ, কান, নাক, দু'হাত এবং দু'পা। এই ৬টি দরজার কোনো একটি দরজা যদি অজ্ঞাতসারে খুলে রাখো, তাহলে ঘর (অন্তর) বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

জিহ্বার কর্তব্য হচ্ছে সন্তুষ্টি ও রাগের সময় সততা বজায় রাখা, গোপনে বা প্রকাশ্যে কাউকে কষ্ট না দেওয়া এবং মানুষের সামনে ভালো ও মন্দকে অতিরঞ্জন করে উপস্থাপন না করা। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ ضَمِنَ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ.

যে আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ অর্থাৎ, জবান এবং দুই পায়ের মাঝের অঙ্গের (সঠিক ব্যবহারের) যামানত দিবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব নিব।[১৪৮]

---

[১৪৮] *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৪৭৪। ইমাম বুখারি *সহিহ বুখারির* দাসমুক্তি অধ্যায়ের জবানের হেফাজত পরিচ্ছেদে (১১/২৬৪) হাদিসটি সাহল বিন সাদ সাইদি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন,

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয বিন জাবাল রা.-কে বলেন,

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

একমাত্র জিহ্বার কর্তিত ফসলই মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে।[১৪৯]

مَنْ ضَمِنَ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْـجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি তার দু চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই উরুর মাঝের বস্তুর (লজ্জাস্থানের) জামানত আমাকে দেবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার।

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারিতে বলেন, اللَّحْيَانِ শব্দের অর্থ হচ্ছে মুখের দুই পাশের হাড় অর্থাৎ, চোয়ালের হাড়। উদ্দেশ্য এই চোয়ালের হাড়ের মাঝখানে যে জবান থাকে সেই জবান এবং তা দ্বারা মানুষের বলা কথা। আর দুই উরুর মাঝখানে অঙ্গের দ্বারা উদ্দেশ্য গুপ্তাঙ্গ, লজ্জাস্থান। ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, দুনিয়াতে একজন মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থান। এ দুটির অনিষ্ট থেকে যে নিজেকে রক্ষা করল সে সবচেয়ে বড়ো অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেল।

[১৪৯] এটি দীর্ঘ একটি হাদিসের চুম্বকাংশ। হাদিসটি ইমাম আহমদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি মুআয বিন জাবাল রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি র. *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম* গ্রন্থের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় বলেন, জিহ্বার কর্তিত ফসল দ্বারা উদ্দেশ্য হারাম কথাবার্তার শাস্তি। কারণ মানুষ তার কথা ও কাজের দ্বারা নেক ও বদ আমলের চাষ করেছে। তারপর কেয়ামতের দিন সে তার চাষ করা ফসল কাটবে। সুতরাং যে উত্তম কথার ও সৎকাজের চাষ করেছে, সে সম্মানের ফসল গড়ে তুলবে আর যে খারাপ কথা বা কাজ চাষ করেছে সে আফসোস ও লজ্জার ফসল ঘরে তুলবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أُنْذِرُكُم فُضُوْلَ الْكَلَامِ. حَسْبُ أَحَدِكُمْ ما يَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَهُ، فإِنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عَنْ فُضُوْلِ الْكَلَامِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْ فُضُوْلِ مَالِهِ.

অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে আমি তোমাদের সতর্ক করছি। তোমাদের যে কারও জন্য প্রয়োজনীয় কথা বলাই যথেষ্ট। কারণ মানুষকে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যেমন তাকে অপ্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৫০]

---

[১৫০] এটি হাদিস নয়। বরং বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি, যেমনটি ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে (৮/২১২) বর্ণনা করেছেন। সেখানে কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

অর্থ: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أُنْذِرُكُمْ فُضُوْلَ كَلَامِكُمْ، حَسْبُ امْرِئٍ مِّنَ الْكَلَامِ مَا بَلَغَ بِهِ حَاجَتَهُ.

আমি তোমাদের অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে সতর্ক করছি। তোমাদের কারও এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট, যতটুকু দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়।

ইহইয়া উলুমিদ্দিন গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা যাবিদি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'ইবনে আবিদ দুনিয়া এই উক্তিটি তার কিতাবুত সামত নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবনে উলাইয়া লাইস থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أُنْذِرُكُمْ فُضُولَ الكَلَامِ، بِحَسْبِ أَحَدِكُمْ مَا بَلَغَ بِهِ حَاجَتَهُ

আমি তোমাদের অর্থহীন কথা থেকে সতর্ক করছি। তোমাদের কারও এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট যতটুকু দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়।'

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অনর্থক কথা অর্থাৎ, প্রয়োজন অতিরিক্ত কথাকে গুনাহ বলেছেন, যে গুনাহের শাস্তি মানুষকে ভোগ করতে হবে। এ কারণে তিনি সতর্ক করেছেন। সাবধান করেছেন।

শায়খ আবু আলি দাককা রহিমাহুল্লাহ এমন এক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে মানুষকে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে সতর্ক করেছেন, যা দুনিয়ালোভী ও সবসময় সম্পদ সঞ্চয়ে লিপ্ত ব্যক্তিরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারে। তিনি বলেন,

لَو كُنْتُمْ تَشْتَرُوْنَ الكاغِذَ-أَي الوَرَقَ- للحَفَظَةِ لَسَكَتُّم عَنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْكَلَامِ.

যদি কিরামান কাতিবিন ফেরেশতাদের জন্য তোমাদের কাগজ কিনে দিতে হতো তাহলে তোমরা অধিকাংশ কথা না বলে চুপ থাকতে। (যেমনটি ইমাম নববির শারহুল আরবায়িনান নাবাবিয়্যাহ গ্রন্থের পনেরো নং হাদিসের ব্যাখ্যায় এসেছে।)

হক কথা না বলে যে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান

আবু আলি দাককাক বলেন,

السَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ.

হক কথা না বলে যে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান।

আবুল কসেম কুশাইরি র. বলেন,

اَلسُّكُوْتُ فِيْ وَقْتِهِ صِفَةُ الرِّجَالِ، كَمَا أَنَّ النُّطْقَ فِيْ مَوْضِعِهِ مِنْ أَشْرَفِ الْخِصَالِ.

যথাসময়ে চুপ থাকা যেমন পুরুষের গুণ তেমনি যথাস্থানে কথা বলাও একটি মহৎ গুণ।

নিম্নের এই দোয়াটি যিনি করেছেন বড়ো সুন্দর দোয়া করেছেন!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ، فَاتَّقَى اللهَ امْرُؤٌ عَلِمَ ما يَقُوْلُ.

প্রত্যেক কথকের জিহ্বার নিকট আল্লাহ তায়ালা থাকেন। এজন্য যে জেনে বুঝে কথা বলল, সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করল।[১৫১]

দৃষ্টির জন্য আবশ্যক হলো হারাম বিষয় দেখা থেকে বিরত থাকা ও গোপনীয় জিনিস দেখার চেষ্টা না করা।[১৫২]

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَمْتِيْ فِكْرًا، و نُطْقِيْ ذِكْرًا، أَيْ مُرْضِيًا لَكَ أُثَابُ عَلَيْهِ.

হে আল্লাহ, আপনি আমার নিরবতাকে আখেরাতের চিন্তা এবং সরবতাকে আপনার যিকিরে পরিণত করে দিন। অর্থাৎ, আমি যেন এমন কথা বলি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে এর সওয়াব প্রদান করা হয়।

[১৫১] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে আবু নুয়াইম *হিলইয়াতুল আউলিয়া* নামক গ্রন্থে (৮/১৬০) এবং হাকিম তিরমিযি ইবনে আব্বাস রা. থেকে নাওয়াদিরুল উসুল নামক গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আল্লামা মুনাবি ব্যাখ্যাকৃত ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহি আলাইহিকৃত জামে সগির গ্রন্থে (২/২৪০) আছে। আর আল্লামা মুনাবি হাদিসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ সনদে এমন একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি গ্রহণযোগ্য নন।

নিষিদ্ধ নারীদের শয়তান তোমার সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে।

১. ইবনুল মুকাফফা পুরুষ থেকে যেসব নারীকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে ও যাদেরকে পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করা থেকে সতর্ক করে বলেন, মানুষের চোখে ও অন্তরে পরনারীর যেসব গুণ সুন্দর লাগে তা সম্পূর্ণ শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা। অনেক মানুষ নিজের স্ত্রীর এমন গুণের প্রতি উদাসীন থাকে যা পরনারীর মধ্যে থাকে না। কিন্তু তার চোখে স্ত্রীর সেসব গুণ ধরা পড়ে না।

আল-আদাবুল কাবির, পৃষ্ঠা নং ৯৯।

ইমাম ইবনে মুফলিহ হাম্বলি র. বলেন, জ্ঞানীর উচিত দৃষ্টির স্বাধীন ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা। কারণ চোখ সাধারণত হালালের পরিবর্তে হারামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে। (অর্থাৎ, চোখ সেই মানুষে গিয়ে আটকায় যার সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশা হারাম করা হয়েছে,

নিজের হালাল, পবিত্র, সুন্দর, কোমল, উদার, সহনশীল ও উপযুক্ত সঙ্গীর চেয়ে সেই নিষিদ্ধ মানুষটিকে তার চোখে তখন অনেক সুন্দর, কোমলবচন, সঙ্গী হওয়ার উপযোগী, রুচিসম্পন্ন ও আন্তরিক মনে হয়। শয়তান এই কাজটি করে থাকে। সে নিষিদ্ধ মানুষটিকে তার চোখে এমন সুন্দর ও আকৃষ্ট করে তুলে (যাতে আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন)। আর এভাবে সে মানুষকে হালাল ও পবিত্র সঙ্গী থেকে হারাম ও অপবিত্র সঙ্গীর দিকে নিয়ে যায় এবং হালালকে তার কাছে অপ্রিয় করে হারামকে প্রিয় করে তুলে। কারণ মানুষের মন নিজের কাছে থাকা বস্তুতে আকৃষ্ট হতে চায় না। অচেনার প্রতি তার থাকে তীব্র আকর্ষণ। নতুনের মাঝে সে এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য দেখতে পায়, যা সে নিজের কাছে থাকা বস্তুর মাঝে দেখতে পায় না। কারণ শয়তান ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য তোমাকে দেখায়, যা তোমার কাছে নেই তা তোমার কাছে থাকা বস্তুর চেয়ে অধিক সুন্দর ও ভালো।

আর এভাবেই মানুষের মাঝে নিষিদ্ধ প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যা তার দিন ও দুনিয়া বরবাদ করে দেয়। অনেক দৃষ্টি আছে দৃষ্টিপাতকারীর অন্তরে দাগের সৃষ্টি করে। (অনেক চোখে খঞ্জর থাকে, যা অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়)।

হাকেম তার তারিখে ইবনে উয়াইনাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক শামের শায়খদের থেকে বর্ণনা করেন, শুরুতেই যার নফসে ফেতনার যাবতীয় উপকরণ দিয়ে রাখা হয়েছে, সে যত মুজাহাদা ও সাধনা করুক, তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

ইবনে মুফলিহ হাম্বলিকৃত *আল-ফুরু*: ৫/১৫১।

হিন্দ বিনতে খুসের নিজ গোলামের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ

দৃষ্টির স্বাধীন ব্যবহার ও অবাধ মেলামেশা অসংখ্য মানুষের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তাদের চরিত্রে কলঙ্কের এমন দাগ বসিয়ে দিয়েছে, যা আর কখনও তারা মুছতে পারেনি। হিন্দ বিনতে খুস আল-ইয়াদিয়্যা- জাহেলি যুগে আরবের বিখ্যাত নারীদের একজন। বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, বিশুদ্ধ ভাষা ও প্রজ্ঞায় আরবদের মাঝে যার প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু সে নিজ গোলামের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, নিজ গোত্রের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তুমি গোলামের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হলে? করবেই যখন, গোলামের সঙ্গে কেন, কোনো স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে করতে? (অন্তত কিছু সম্মান রক্ষা হত)। তখন সে উত্তর দিল, কাছাকাছি থাকা, অধিক মেলামেশা ও আলাপচারিতা।

দুটি বিষয় তাকে এই কুকর্মে-তাও একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে-লিপ্ত হতে প্ররোচিত করেছে: এক. অধিক মেলামেশা, কাছাকাছি অবস্থান যেমন সে শোবার ঘরের পাশে ক্রীতদাসের থাকার ব্যবস্থা করেছিল। দুই. একাকী তার সঙ্গে অধিক আলাপচারিতা। এ দুটি ধীরে ধীরে তার লজ্জাশীলতা ও সম্ভ্রমের সমস্ত পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছে। তাকে তার গোত্রের নেত্রী হওয়ার ও নিজের মান-সম্মানের কথা এমনভাবে ভুলিয়ে দিয়েছে যে সে একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

সে এই হেকমতের কথা বলল।

তার জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা তার কোনো কাজে আসেনি। সে জানত এটা কত খারাপ ও কলঙ্কজনক কাজ! জানত এটি তার চরিত্রে কালিমা লেপন করে দেবে, তার দুর্নাম ডেকে আনবে। তা সত্ত্বেও সে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। একটু একটু করে পা বাড়াতে বাড়াতে কুকর্মে গিয়ে লিপ্ত হয়েছে। আর এর কারণ ছিল শুধু নিষিদ্ধ মানুষের কাছাকাছি অবস্থান ও তার সঙ্গে খোশগল্প। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে এই গুনাহ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করি।

(কুকর্ম তো কুকর্মই। সে স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে হোক আর ক্রীতদাসের সঙ্গে হোক।) কিন্তু আরবরা স্বাধীন নারী হয়ে ক্রীতদাসের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টিকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখেছে, কারণ আরবের স্বাধীন নারীরা ব্যভিচারের পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখত। এর প্রমাণ আমরা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের একটি উক্তির মাঝে পাই। যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব নারীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের সময় বায়আতের আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে এ পর্যন্ত পৌঁছলেন,

(মুসলমান নারীরা ব্যভিচার লিপ্ত হবে না)। তখন হিন্দ বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসুল! স্বাধীনা নারীও কি ব্যভিচার করতে পারে? আমরা তো জাহেলি যুগেই এসব করতে লজ্জাবোধ করতাম। আর এখন তো ইসলামের আগমন ঘটেছে। এটি সাইদ বিন মানসুর এবং ইবনে সাদ শাবি থেকে সহিহ সনদে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি হাফেয ইবনে হাজার র. বলেছেন। দেখুন আল-ইসাবাহ: ৪/৪২৫।

আর ক্রীতদাসের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি তারা এ কারণে ঘৃণ্য মনে করত, ক্রীতদাসরা নীচু জাত, তাদের বাজারে বেচা-কেনা হয়, কাজ করানো হয়, তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। সমাজে তাদের কোনো মর্যাদা নেই। তাই হিন্দের ক্রীতদাসের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াটা ছিল আরও নিকৃষ্ট, গর্হিত ও লাঞ্ছনার। আর এসব কিছু এ কারণে হয়েছিল, ক্রীতদাসের সঙ্গে দিনের পর দিন খোশগল্প ও মেলামেশা তার দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

জাহেজ কাছাকাছি অবস্থান করা, পরিচিত হওয়া, বারবার দৃষ্টিপাত করা মানুষের মন-মানসিকতার উপর এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করার আরও একটি কারণ হচ্ছে, এমন কারও প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করা যার মাঝে আকর্ষণ করার কোনো না কোনো গুণ আছে।

কাছাকাছি থাকা, বারবার দেখা-এ দুটিই হচ্ছে মূল আপদ। যেমন হিন্দ বিনতে খুসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তুমি একজন স্বাধীন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়ে একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে কেন লিপ্ত হলে? তার প্রতি তুমি কী করে আকৃষ্ট হলে? তখন সে বলেছিল, কাছাকাছি থাকা, অধিক মেলামেশা ও আলাপচারিতা।

(আলাপচারিতা মুখোমুখি হতে হবে এমন নয়। বিভিন্ন ডিভাইস যেমন মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে কথা বলা, চ্যাট করা, এগুলোও ফেতনার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এসব প্রযুক্তি মানুষকে সরাসরি দেখার ও কথা বলার সুযোগ করে দেয়। দূরত্বকে

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

النَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ، فَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ خَوْفِ اللهِ آتَاهُ اللهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ.

দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের তিরসমূহের মধ্যে একটি তির। সুতরাং আল্লাহর ভয়ে যে হারাম দৃষ্টি বর্জন করবে আল্লাহ

ঘুচিয়ে দেয়। তাই দেখা যায়, অসংখ্য মানুষ এগুলোর মাধ্যমে ফেতনার শিকার হচ্ছে। অনৈতিক কাজে জড়াচ্ছে। সমাজের নৈতিক অবক্ষয় চরমে পৌঁছেছে। অনুবাদক।)

তিনি বলেন, প্রথম বিষয়টি হচ্ছে অপরিচিত মানুষের সৌন্দর্য-এমন অপরিচিত যার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। যোগাযোগেরও কোনো সুযোগ নেই-এই সৌন্দর্য তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তুমি যখন তাকে দেখছ, তার প্রতি মুগ্ধ হচ্ছ, সঙ্গে সঙ্গে তুমি এটাও বুঝতে পারছ যে, তার সঙ্গে দেখা করার, চিঠি কিংবা দূত মারফত যোগাযোগ করার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে তোমার স্বপ্নে কাউকে দেখার মতো হলো। কিংবা কল্পনায় কারও ছবি আঁকার মতো হলো। যখন কল্পনার জগৎ থেকে তুমি বাস্তবতায় ফিরে আসবে, তখন তাকে না পাওয়ায় তোমার ঠিক ততটুকু কষ্ট হবে, যতটুকু স্বপ্নে দেখা কিংবা কল্পনা করা কোনো জিনিস না পেলে কষ্ট হয়।

তবে কাছাকাছি থাকা নারীর বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তখন ফেতনার প্রবল আশঙ্কা থাকে এবং শয়তান দ্রুত তোমাকে কঠিনভাবে পেয়ে বসতে পারে।

সুতরাং বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে, ফেতনা ও ফেতনার কারণসমূহ থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও ক্ষমার আশা করে।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বড়ো সুন্দর বলেছেন,

إِنَّ السَّلَامَةَ مِنْ سَلْمٰى وَ جَارَتِهَا ... أَنْ لَّا تَمُرَّ عَلٰى حَالٍ بَوَادِيْهَا

সালমা ও তার বান্ধবীর কাছ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায়, তাদের উপত্যকার উপর দিয়ে যাতায়াত না করা।

তায়ালা তাকে এমন ইমান দান করবেন যার মিষ্টতা সে তার অন্তরে অনুভব করবে।[১৫৩]

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

مَنْ غَضَّ بَصَرَه عَنِ النَّظْرِ الْحَرَامِ: زَوَّجَهُ اللهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ حَيْثُ أَحَبَّ، و مَنْ اطَّلَعَ فَوْقَ بُيُوْتَ النَّاسِ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى.

হারাম জিনিস থেকে যে তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখবে, জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার পছন্দের হুরের সঙ্গে বিবাহ দিবেন। আর যে মানুষের ঘরে উঁকি দিবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্ধভাবে উপস্থিত করবেন।

---

[১৫৩] ইমাম হাকেম তার মুসতাদরাকে (৪/৩১৪) হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে সহিহ বলেছেন। তবে হাফেয যাহাবি *মিযানুল ইতিদালে* (১/১৯৪) তার কথাকে খণ্ডন করে বলেন, সনদে ইসহাক বিন আবদুল ওয়াহিদ আলমাওসিলি নামে একজন ভ্রান্ত রাবি রয়েছেন এবং অপর একজন দুর্বল রয়েছেন। তাবারানি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাফেয মুনযিরি রহমতুল্লাহি আলাইহি *তারগিব ওয়াত তারহিব* গ্রন্থে (৩/৩১৭) বলেন, সনদে একজন ভ্রান্ত রাবি রয়েছেন। তবে তাবারানি এবং হাকিমের বর্ণনার মধ্যে হাকিমের বর্ণনাটি উপরোল্লিখিত হাদিসের কাছাকাছি। *মুসতাদরাকে হাকেমে* হাদিসটি এভাবে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ، فَمَنْ تَرَكَهَا لِلّٰهِ آتَاهُ اللهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ.

অর্থ: দৃষ্টি ইবলিশের তিরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তির। যে আল্লাহর ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত না করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিদান হিসেবে এমন ইমান দান করবেন যার স্বাদ সে তার অন্তরে অনুভব করবে।

দাউদ তায়ি এক ব্যক্তিকে বলেন, যে কারও দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, হে অমুক, তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। কেননা, আমি শুনেছি যে, মানুষকে অনর্থক কাজের ব্যাপারে যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তেমনি অনর্থক দৃষ্টিদানের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

বলা হয়,

لَكَ النَّظْرَةُ الأُوْلَى وَ لَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

তোমার প্রথম দৃষ্টিকে ক্ষমা করা হবে, পরের দৃষ্টিকে নয়।[১৫৪]

---

[১৫৪] এটি একটি মারফু হাদিস, যা বুরাইদা বিন হুসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি হাদিসটি তাদের কিতাবে এনেছেন। ইমাম তিরমিযি বলেন, এ হাদিসটি হাসান গরিব। আমরা এটি শুধু শারিকের রিওয়ায়াত হিসেবে জেনেছি। তিরমিযি শরিফে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ "يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.

বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত,

বুরাইদা রা. হতে মারফু হিসেবে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে আলি, বারবার (বৈধ নয় এমন জিনিসের প্রতি) তাকাবে না। তোমার প্রথম দৃষ্টি জায়েয (ও ক্ষমাযোগ্য) হলেও পরের দৃষ্টি (ক্ষমাযোগ্য) নয়। তিরমিযি, হাদিস নং ২৭৭৭।

হাদিসে প্রথম দৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য, হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো জিনিসের দিকে চলে যাওয়া দৃষ্টি। আর পরের দৃষ্টি ক্ষমার যোগ্য না হওয়ার কারণ, সে দৃষ্টি তোমার ইচ্ছায় এবং সজ্ঞানে হয়েছে। তাই তার গুনাহ তোমার উপর এসে পড়বে।

অর্থাৎ, হঠাৎ কোনো কিছুর দিকে প্রথমবার দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ক্ষমার যোগ্য কিন্তু জেনে বুঝে হারাম কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকলে বান্দাকে সেজন্য পাকড়াও করা হবে।[১৫৫]

কানের ব্যাপারটি হলো, সে কথা ও দৃষ্টির অনুগামী। সুতরাং যা বলা ও দেখা জায়েয নেই তা শোনা ও শুনে স্বাদ লাভ করাও জায়েয নেই।

গোপন কোনো কথা শুনতে চাওয়া হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি। অশ্লীল, অনর্থক কথাবার্তা, গান-বাদ্য এবং মুসলমানদের কষ্ট দেয় এমন কোনো কথা শোনা মৃত লাশ ও রক্তের ন্যায় হারাম। [১৫৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

نُهِينَا عَنِ الْغِيْبَةِ وَ الْاِسْتِمَاعِ إِلَيْهَا. وَعَنِ النَّمِيْمَةِ وَ الْاِسْتِمَاعِ إِلَيْهَا.

> আমাদের গিবত করা ও শোনা, চুগলখোরি করা ও শোনা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

কাসেম বিন মোহাম্মদকে গান শোনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন হক ও বাতিলের মাঝে যখন পার্থক্য করে দিবেন তখন গানের পরিণতি কী হবে? উত্তরে বলা হলো, বাতিলের জায়গায়। তখন তিনি বললেন, সুতরাং তুমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও।[১৫৭]

---

[১৫৫] অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে নাজায়েয কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকলে তার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

[১৫৬] ইনি হলেন কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ি ও সে যুগে মদিনার সাতজন ফকিহদের একজন ছিলেন। ৩৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

[১৫৭] ইবনু আবিদ দুনিয়া *যাম্মুল মালাহি* নামক গ্রন্থে হাদিসটি কাসেম বিন মুহাম্মদের সূত্রে অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর বাইহাকি *সুনানে কুবরায়* (১০/২২৪) ইবনু আবিদ দুনিয়ার সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

গান-বাদ্য শোনার হুকুম ও তার কুফল

বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করে হাদিস শরিফে এটিকে الْمَعَازِف শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। সহিহ বুখারির ৫৫৯০ নং হাদিসে পানীয় দ্রব্যসমূহের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ-يعني الزنى-وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

'আবদুর রহমান ইবনু গানাম আশআরি র. থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, আমার নিকট আবু মালিক আশআরি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেননি। তিনি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।

এই হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন যে এ সকল অশ্লীল কাজসমূহের মাঝে শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। কারণ এগুলোর প্রত্যেকটি অপরটিকে টেনে আনে। যেমন ব্যভিচার একজন পুরুষের মাঝে রেশমি কাপড়কে হালাল মনে করে তা দ্বারা সাজ-সজ্জা গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। অথচ তা তার জন্য হারাম। এমনিভাবে ব্যভিচার তার মাঝে মদ্যপান ও গান-বাদ্যকেও হালাল মনে করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। কারণ মদ্যপান ও গান-বাদ্যের দ্বারা তার মাঝে ব্যভিচারের নেশা আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং কখনো নেশার আগুন নিভে গেলে পুনরায় তা জ্বালাতে সাহায্য করে।

এ সকল পাপ থেকে আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জেনে রাখো যে, গান মানুষের মাঝে দুটি জিনিস সৃষ্টি করে। ১. অন্তরকে উদাসীন করে দেয়। মানুষ তখন আল্লাহর বড়োত্ব নিয়ে ভাবে না ও কেয়ামতের দিন

জবানের পর কান সবচেয়ে ক্ষতিকারক অঙ্গ। কারণ কানের মাধ্যমে কোনো কিছু খুব দ্রুত অন্তরে পৌঁছে যায় এবং মানুষ খুব দ্রুত ফেতনায় পতিত হয়।

সাইয়েদুনা ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ্ র.[১৫৮] বলেন,

তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা চিন্তা করে না। ২. গান মানুষের মাঝে পার্থিব জীবন উপভোগের নেশা সৃষ্টি করে। পূর্ণরূপে উপভোগ। সেজন্য তাকে কুপ্রবৃত্তির সমস্ত চাহিদা পূরণের দিকে আহ্বান করে। আর সবচেয়ে বড়ো কুপ্রবৃত্তি হল ব্যভিচার। একজন ব্যভিচারী নতুন নতুন নারী সঙ্গ না পেলে ব্যভিচারে সে তৃপ্ত হয় না। আর হালাল পন্থায় প্রতিদিন নতুন নতুন নারীসঙ্গ লাভ করা সম্ভব নয়। একারণে গান-বাজনা মানুষকে ব্যভিচারে প্ররোচিত করে। আরেকটি বিষয় হলো, গান-বাজনা ও ব্যভিচারের মাঝে একদিক থেকে সামঞ্জস্যতা আছে। গান শোনার দ্বারা মানুষ আত্মিক স্বাদ লাভ করে আর ব্যভিচারের দ্বারা দৈহিক স্বাদ।

(দেখুন আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকৃত *রিসালাতুন ফিসসামায়ি ওয়াররাকসি*: ২/৩১১, *মাজমুয়াতুর রাসাইলিল কুবরা* থেকে।)

[১৫৮] **ইরাকের বিখ্যাত যাহেদ সাইয়েদুনা ওকি ইবনুল জাররা রহমাতুল্লাহি আলাইহি**

ইনি হলেন ইমাম, হাফেযে হাদিস, ইরাকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আবু সুফিয়ান ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রুআসি কুফি। ১২৯ হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭ হিজরিতে হজের সফর থেকে ফেরার সময় কুফা ও মক্কার মাঝামাঝি অবস্থিত ছোট্ট ফাইদ শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যুগের অন্যতম বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ইলমের কারণে খ্যাতি লাভ করেন। ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়া তার সম্পর্কে বলেন, তার মুখস্থ ও মেধা শক্তি ছিল স্বভাবগত আর আমাদের ছিল স্বচেষ্টায় অর্জিত। ইমাম আহমদ বলেন, আমি ওয়াকির চেয়ে বড়ো কোনো আলেম ও হাদিসের বড়ো কোনো হাফেয দেখিনি। তিনি আল্লাহর ভয় ও প্রচেষ্টার সঙ্গে ফিকহের অনেক সুন্দর আলোচনা করতেন। কারও সমালোচনা করতেন না। যুগের ইমাম ছিলেন।

سَمِعْتُ كَلِمَةً مِنْ مُبْتَدِعٍ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً مَا أَسْتَطِيْعُ إِخْرَاجُهَا مِنْ أُذُنِيْ.

আমি বিশ বছর আগে এক বিদআতির কাছ থেকে একটি কথা শুনেছিলাম। কিন্তু কথাটি আমি আজ পর্যন্ত আমার কান থেকে বের করে দিতে পারিনি। (অর্থাৎ, তার প্রভাব এখনো রয়েছে।)

বাদশাহ হারুনুর রশিদ তাকে কুফার প্রধান বিচারপতি বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকওয়ার কারণে তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাইন তার সম্পর্কে বলেন, আওযায়ি তার যুগে যেমন ছিলেন, ওয়াকিও তার যুগে তেমন ছিলেন। আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখিনি। রাতভর নামাজ পড়তেন। দিনভর রোযা রাখতেন। আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, ওয়াকি ইবনুল জাররাহ বর্তমানে কুফা ও বসরার ইমাম। সালম বিন জুনাদাহ বলেন, আমি ওয়াকির সঙ্গে সাত বছর উঠাবসা করেছি। কিন্তু তাকে কখনো থুতু ফেলতে, কংকর দিয়ে খেলতে, মজলিসে বসে নড়াচড়া করতে দেখিনি। সবসময় কেবলামুখী হয়ে বসতেন। কখনো আল্লাহর নামে কসম করতেন না। আমি দেখিনি কসম করতে।

সাইদ বিন মনসুর বলেন, ওয়াকি যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন তিনি অনেক মোটা ছিলেন। একদিন ফুজাইল বিন ইয়াজ তাকে বললেন, আপনি তো ইরাকের সবচেয়ে বড়ো সাধু, কিন্তু আপনার দেহ এত মোটা কেন? তিনি বললেন, মুসলমান হওয়ার কারণে আমি এত খুশি যে, এই খুশিতে মুটিয়ে গেছি। এমন জওয়াব শুনে ফুজাইলের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একবার তিনি এক ব্যক্তির দোয়াতের কালি নিয়ে লিখেছিলেন। এর বিনিময়ে তিনি তার কাছে পূর্ণ এক থলি স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে বললেন, আমাকে ক্ষমা করো। আমার কাছে এর চেয়ে বেশি নেই।

দেখুন ইমাম যাহাবিকৃত *তাযকিরাতুল হুফফাজ* (১/৩০৬) ও হাফেয ইবনে হাজারকৃত *তাহযিবুত তাহযিব*: ১১/১২৩-১৩০।

সাইয়েদুনা হযরত ইমাম তাউস রহমতুল্লাহি আলাইহির[১৫৯] কাছে যখন কোনো বিদআতি লোক আসতো, তখন তিনি তাঁর কর্ণদ্বয় বন্ধ করে দিতেন; যাতে তার কোনো কথা তিনি শুনতে না পান।[১৬০]

---

[১৫৯] সাইয়েদুনা ইমাম তাউস বিন কাইসান ইয়ামানি র.-এর পরিচয়

ইনি হলেন ইমাম আবু আব্দুর রহমান তাউস বিন কায়সান আল ইয়ামানি আল জানাদি। একজন বিখ্যাত তাবেয়ি। তাফাক্কুহ ফিদ্দিন তথা দিনের অন্তর্জ্ঞান, হাদিস বর্ণনা, মুজাহাদার সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ, দিন আঁকড়ে থাকা, দুনিয়াবিমুখতা, কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিকতায় অনন্য ছিলেন। তার মাঝে খলিফা ও বাদশাদের নসিহত করার দুঃসাহস ছিল। ৩৩ হিজরিতে ইয়ামানের জানাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে ছিলেন। লাইস বিন আবি সুলাইম বলেন, তাউস হাদিসের এক একটি অক্ষর গণনা করতেন। ইবনে হিব্বান বলেন, তিনি ইয়ামানের অন্যতম আবেদ ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ি ছিলেন। ৪০ বার হজ করেছেন। মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। (অর্থাৎ, যিনি দোয়া করলে দোয়া কবুল হত)

মহান সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সম্পর্কে বলেন,

إِنِّي لَأَظُنُّ طَاوُوْسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

আমি মনে করি তাউস জান্নাতের অধিবাসী।

কায়েস বিন সাদ বলেন, বসরার অধিবাসীদের মাঝে ইবনে সিরিন যেমন ইয়ামানের অধিবাসীদের মাঝে তাউস তেমন। সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, তিন ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ যুগে বাদশাদের দরবার বর্জনকারী ছিলেন, আবু জার, তাউস ও সুফিয়ান সাওরি।

হাফেয যাহাবি বলেন, তাউস ইয়ামানের শায়খ ও মুফতি ছিলেন। তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য বরকতস্বরূপ ছিলেন। বিরাট সম্মানের অধিকারী ছিলেন। বহুবার হজ করেছেন। তার মৃত্যুও হয়েছে হজের মৌসুমে। ১০৬ হিজরিতে। ইয়াওমুত তারবিয়া তথা মিনায় গমন করার আগের দিন। তার লাশ দেখতে মানুষ এত ভিড় করেছিল যে জানাজা পড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। তখন মক্কার শাসক ইবরাহিম বিন হিশাম তার লাশের সুরক্ষায় কয়েকজন সেনা পাঠালেন। তার খাটিয়া

যারা বহন করেছেন, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। তিনি কাঁধে করে তার খাটিয়া বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা থেকে তার টুপি পড়ে যায় এবং পিছন থেকে তার চাদর ছিঁড়ে যায়। খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক তার জানাজা পড়িয়েছেন।

ইমাম তাউস র. সম্পর্কে একটি বানোয়াট ইতিহাস

ঘটনাটি ইবনে খাল্লিকান সাইয়েদুনা ইমাম তাউস র.-এর জীবনীতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমাম মালেক বিন আনাস র.-এর উপস্থিতিতে খলিফা আবু জাফর মানসুরকে শক্ত ভাষায় নসিহত করেছেন। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। বানোয়াট ইতিহাস। এই ঘটনাটি না তার সঙ্গে ঘটেছিল আর না তার পুত্র আবদুল্লাহ বিন তাউসের সঙ্গে। কারণ, ইমাম তাউস র. ১০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আর মালেক বিন আনাস র.-এর জন্ম হয়েছিল ৯৩ হিজরিতে। আবু জাফর মানসুরের ৯৫ হিজরিতে। ইমাম তাউস র.-এর মৃত্যুর সময় যথাক্রমে তাদের দুজনের বয়স হয়েছিল তেরো ও এগারো। তারা দুজনই ছোটো ছিলেন। এটি ভিত্তিহীন হওয়ার আরেকটি দলিল হলো, আবু জাফর খলিফা হয়েছিলেন ১৩৬ হিজরিতে তার ভাই সাফফাহর ইন্তেকালের পর। তিনি খলিফা হওয়ার ত্রিশ বছর আগে ইমাম তাউস র. ইন্তেকাল করেছিলেন। তাহলে ত্রিশ বছর আগে মারা যাওয়া একজন ব্যক্তি তার দরবারে এসে কীভাবে তাকে নসিহত করল? তার পুত্রের সঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটেনি। কারণ, তিনি ১৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন, যেমনটি *তাহযিবুত তাহযিবে* এসেছে। অর্থাৎ, আবু জাফরের খলিফা হওয়ারও চার বছর আগে। সুতরাং খলিফা মানসুরকে ইমাম তাউসের নসিহত করার ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

[১৬০] পূর্ববর্তীদের বিদআতি থেকে বেঁচে থাকার কিছু উদাহরণ

ইমাম মালেক র. বলেন, একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে যে, বক্র হৃদয়ের মানুষদের তোমার কানে প্রভাব ফেলতে দিয়ো না। কারণ, তুমি জানো না, তার কোন কথাটা তোমার অন্তর গ্রহণ করে ফেলবে। মদিনার একজন আনসারি ব্যক্তি কাদেরিয়া মতবাদের এক বিদআতির কাছ থেকে একটি কথা শুনেছিল। কথাটি তার অন্তরে বসে যায়। সে অন্যদের নিকট কথাটি প্রচার করলে তারা তাকে নসিহত করল এবং বিদআতির ব্যাপারে নিষেধ করল। তখন সে বলল, সে বিদআতি হলে তার কথা আমার অন্তরে বসে গেল কেন? আমি যদি জানতাম যে, আমি এই উঁচু মিনার থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেলে আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তাহলে আমি তাই করতাম।

(ইমাম ইবনু আবি যায়েদ কাইরুওয়ানি র.কৃত *আল-জামে* পৃষ্ঠা নং, ১২০।)
হাফেয আহমদ বিন আবদুল্লাহ রাজি সানআনি তার *তারিখে মাদিনাতি সানআইল ইয়ামান* নামক গ্রন্থের ৩২৮ নং পৃষ্ঠায় এবং হাফেয ইবনুল জাওযি র. তার *তালবিসু ইবলিস* নামক গ্রন্থের ১২ নং পৃষ্ঠায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আবদুর রাজ্জাক আমাকে বর্ণনা করে বলেন, মামার আমাকে বর্ণনা করে বলেন যে,

তাউস র. একদিন বসা ছিলেন, তার নিকট তখন তার সন্তান ছিল। মুতাযিলাদের এক লোক এসে একটি প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ইমাম তাউস কানে আঙুল দিলেন। আর বললেন, বেটা! কানে আঙুল দাও, যাতে তার কোনো কথা তুমি শুনতে না পাও। কারণ মানুষের অন্তর খুব দুর্বল। বেটা, সঠিক পথে অবিচল থাকো। এই কথাটি তিনি বারবার বলতে থাকলেন। একপর্যায়ে সেই লোকটি উঠে চলে গেল।

ইবনে আওন থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এক লোক মুহাম্মদ বিন সিরিন র.-এর কাছে এসে কাদেরিয়্যাদের আকিদা প্রসঙ্গে কিছু কথা বলল, তখন মুহাম্মদ বিন সিরিন র. এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

> নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন থেকে, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। (সুরা নাহল, ৯০)

তারপর কানে আঙুল দিয়ে বললেন, হয় তুমি এখান থেকে চলে যাও, না হয় আমি উঠে চলে যাচ্ছি। তখন লোকটি উঠে চলে গেল। তিনি বললেন, অন্তরের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার আশঙ্কা তার কোনো কথা হয়ত আমার অন্তরে পৌঁছে যাবে, যা আমি আর বের করতে পারব না। তাই আমি আমার জন্য তার কথা না শোনাই উত্তম মনে করি।

নাকের বিষয়টি হচ্ছে, নাক কান ও চোখের অনুগামী। যা কিছু শোনা ও দেখা জায়েয তার ঘ্রাণ নেওয়াও জায়েয।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট মেশক আনা হলো। তখন তিনি নাক চেপে ধরলেন। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, শুধু ঘ্রাণ নিয়েই এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।[১৬১]

হাত ও পায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, নিষিদ্ধ কোনো বস্তুর দিকে তা প্রসারিত না করা এবং ভাল কিছু থেকে তা গুটিয়ে না রাখা। মাসরুক বলেন,

ما خَطَا الْعَبْدُ خَطْوَةً إِلَّا كُتِبَتْ حَسَنَةً أو سَيِّئَةً.

বান্দার প্রতি কদমে হয় নেকি কিংবা গুনাহ লেখা হয়।

বাদশাহ সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের কন্যা[১৬২] খালেদ বিন মাদানের কন্যা আবদার নিকট চিঠি লিখলেন[১৬৩] কখনো সময় পেলে আমার সঙ্গে

---

[১৬১] এটি প্রকাশ্য যে এই মেশক বাইতুল মালের ছিল। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিয তাকওয়া পরহেযগারির কারণে তার ঘ্রাণ নেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

[১৬২] ইনি হচ্ছেন উমাইয়া খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক। খুব উত্তম শাসক ছিলেন। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৯ হিজরিতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তার মেয়ের জীবনী আমি জানতে পারিনি। তাই তার সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য সংক্ষেপে তার বাবার পরিচয় তুলে ধরা হলো।

[১৬৩] খালেদ বিন মাদান একজন তাবেয়ি ছিলেন। হাদিসের বিশ্বস্ত রাবি ও অন্যতম আবেদ ছিলেন। মূলত ইয়ামানি। পরবর্তীতে শামের হিমস শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। অধিক যিকির ও ইবাদতকারী বীর মুজাহিদ ছিলেন। ১০৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। যেহেতু তার মেয়ের জীবনী জানা যায়নি, তাই তার পরিচয় তুলে ধরা হলো। *তাহযিবুত তাহযিবে* (৩/১১৯) খালেদ বিন মাদানের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে তার সম্পর্কে তার মেয়ের একটি বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া বর্ণনাটি আপনি পাবেন *তাফসিরে ইবনে আবি হাতেমের* হস্তলিখিত কপিতে, যা মিশরের দারুল কুতুবে সংরক্ষিত আছে। সেই তাফসিরের প্রথম পারার ছয় নং পৃষ্ঠায় أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً এই আয়াতের তাফসিরে বর্ণনাটি আছে।

সাক্ষাৎ করতে আসুন। উত্তরে আবদা লিখলেন, আমার মরহুম পিতা এমন পথে চলা অপছন্দ করতেন, যে পথে আল্লাহ তায়ালার কোনো জামিন নেই। কিংবা এমন কোনো খাবার খাওয়া তিনি অপছন্দ করতেন, যে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনো উত্তর দিতে পারবেন না। আর আমার পিতা যা অপছন্দ করতেন আমিও তা অপছন্দ করি। আসসালামু আলাইকুম।

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, এভাবে আমল করার পদ্ধতি কী? উত্তরে বলা হবে, আইম্মায়ে মুত্তাকিনদের পথ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা এবং এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সত্যানুসন্ধানীদের আদবের প্রতি লক্ষ রাখা।[১৬৪] সর্বদা নিজের হিসাব গ্রহণের মাধ্যমে সচেতন থাকা।[১৬৫] ইনসাফের সঙ্গে কাজ করা এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

---

[১৬৪] তাহলে তোমার সঠিক রাস্তায় চলার জ্ঞান হাসিল হবে।

[১৬৫] পূর্ববর্তীদের আত্মসচেতনতার ছয়টি দৃষ্টান্ত

নফসের হিসাব গ্রহণে সজাগ, সতর্ক ও সচেতন কেবল তারাই থাকতে পারে যারা সুখে-দুঃখে, সচ্ছল-অসচ্ছল, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার হুকুমের প্রতি লক্ষ রাখে এবং যারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে তাওফিকপ্রাপ্ত। এমন তাওফিকপ্রাপ্ত ছয়জন মহান ব্যক্তির নফসের হিসাব গ্রহণ বিষয়ক ঘটনা আমরা এখানে তুলে ধরছি, এগুলো পড়ে আপনি এ বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। একটু আগে আমরা খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিয র.-এর যে ঘটনা বর্ণনা করেছি, তা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। তার কাছে বাইতুল মালের সুগন্ধি নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি তখন তার নাক চেপে ধরেছিলেন। যাতে তাকে ঘ্রাণ নিতে না হয়। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, শুধু ঘ্রাণের মাধ্যমেই এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। আত্মসচেতনতার এটি অবশ্যই চূড়ান্ত স্তর।

১. তাকওয়ার কারণে হযরত উমর রা. তার স্ত্রীকে বাইতুল মালের মেশক-এ হাত লাগানো ও তা ওজন করা থেকে বিরত রেখেছিলেন

ইমাম আহমদ র. হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর রা.-এর নিকট বাহরাইন থেকে মেশক ও আম্বর সুগন্ধি এল, তখন তিনি বললেন, ভালো ওজন করতে পারে এমন কোনো মহিলা যদি পেতাম, যে আমাকে এই সুগন্ধি ওজন করে দেবে। তাহলে আমি মুসলমানদের মাঝে তা বণ্টন করে দিতে পারতাম। তখন তার স্ত্রী আতেকা বললেন, আমি ভালো ওজন করতে পারি। আসুন, আমি আপনাকে ওজন করে দিই। উমর রা. বললেন, না। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? তিনি বললেন, আমার ভয় হয়, ওজন করার সময় তোমাকে তা হাত দিয়ে ধরতে হবে। তারপর কানে আঙুল প্রবেশ করাবে, হাত দিয়ে গলা ডলবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানের চেয়ে তোমার ভাগে বেশি পড়ে যাবে।

(কিতাবুয যুহদ: ১১৯ নং পৃষ্ঠায়।)

২. উমর বিন আবদুল আযিয র.-এর কথা বলার সময় ডান হাতে ইশারা করতে বলা

হযরত উমর বিন আবদুল আযিয র.-এর জীবনী বর্ণনায় এসেছে, তিনি এক লোককে বাম হাতে ইশারা করে কথা বলতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে অমুক, কথা বলার সময় বাম হাতে ইশারা করো না, ডান হাতে ইশারা করো। তখন লোকটি বলল, আমি আজকের মতো দৃশ্য আর কখনো দেখিনি, এক ব্যক্তি নিজের সবচেয়ে প্রিয়জনকে-অর্থাৎ, তার যুবক বয়সী ইবাদতগুজার সন্তান আবদুল মালেককে- দাফন করে এসেছে। অথচ আমি ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে ইশারায় কথা বলছি, এ বিষয়টি তার চোখে ধরা পড়ছে। তখন উমর বললেন, আল্লাহ তায়ালা যখন তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়ে যান, তখন তুমি তার চিন্তা ছেড়ে দাও। (অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যখন সন্তানকে নিয়ে গেছেন, তখন তার চিন্তা ও শোকে এমনভাবে ডুবে থাকা উচিত না যে, দিনের ক্ষতি হয়)। তখন লোকটি তার শুকরিয়া আদায় করে বলল, ইসলামের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম

প্রতিদান দান করুন। উমর ইবনে আবদুল আযিয র. তাকে বললেন, না, বরং এভাবে বলো, আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে ইসলামকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কারণ ইসলামের বদৌলতেই আমরা এমন চিন্তা ও বোধ লাভ করতে পেরেছি।

ঘটনাটি হাফেয আবু নুআইম *হিলয়াতুল আউলিয়ায়* (৫/৩২৬) ও ইমাম আহমদ *কিতাবুল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল*-এ (১/৩৮১) এবং কিতাবুয যুহদের ৩০১ ও ৩০২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

তার এই কথাটির অনুসরণ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও করেছেন। এক ব্যক্তি তাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার উত্তর দিলেন। তখন লোকটি তাকে বলল, আল্লাহ আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এই উত্তর শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, না বরং এভাবে বল, আল্লাহ ইসলামকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি কে? আমি কী যে ইসলামের পক্ষ থেকে আল্লাহ আমাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন)?

ইবনুল জাওযিকৃত মানাকিবুল ইমাম আহমদ: পৃষ্ঠা নং ২৭৫।

৩. ইমাম মুনযিরি র.-এর রাস্তায় বসে পড়া এবং অনুমতি ব্যতীত রাস্তার পাশে বন্ধ দোকানের চেয়ারে বসতে রাজি না হওয়া

দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত, মুত্তাকি, বিখ্যাত আত তারগিব ওয়াত তারহিব গ্রন্থের লেখক, ইমাম হাফেয আব্দুল আজিম মুনযিরি রহমতুল্লাহি আলাইহির জীবনী বর্ণনায় শায়খ তাজউদ্দিন ইবনুস সুবকি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আমার পিতাকে হাফেয দিমইয়াতি থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, শায়খ মুনযিরি একবার গোসলখানা থেকে বের হলেন। প্রচণ্ড গরমের কারণে তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। তখন তিনি রাস্তার উপর বসে পড়লেন। পাশেই একটি বন্ধ দোকান ছিল। হাফেয দিমইয়াতি বললেন, উঠুন; আপনাকে দোকানের সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিই। এমন প্রচণ্ড কষ্টের মাঝেও তিনি তাকে উত্তরে বললেন, দোকানদারের অনুমতি ব্যতীত কীভাবে আমি তা ব্যবহার করতে পারি? তিনি তাতে রাজি হলেন না।

তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাতিল কুবরা: ৫/১০৯

৪. কুকুরকেও তাচ্ছিল্যভরে ধমকাতে নিষেধ করা:

শায়খ মুরতাযা যাবিদি ফাসেকের গিবত করা জায়েয প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ফাসেকের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, সওয়াব লাভের উদ্দেশ্য ও নসিহতের ইচ্ছা থাকতে হবে। কিন্তু কেউ যদি নিজের ক্রোধকে তৃপ্ত কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ফাসেকের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে কিংবা অন্য কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন সুবকি তার পিতা তাকি উদ্দিন সুবকির একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তাজউদ্দিন বলেন, আমরা একদিন আমাদের ঘরের বারান্দায় বসা ছিলাম। একটি কুকুর আমাদের দিকে আসলে আমি তাকে এই বলে ধমক দিয়ে তাড়াতে গেলাম, কুকুরের বাচ্চা দূর হয়ে যা। তখন আমার পিতা ঘরের ভেতর থেকে আমাকে শাসালে আমি বললাম, সে কি কুকুরের বাচ্চা কুকুর নয়? তিনি বললেন, এভাবে বলা জায়েয আছে যদি কুকুরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা তোমার উদ্দেশ্য না হয়। আমি বললাম, এটা তো খুবই উপকারী একটি কথা।

শারহুল ইয়াহইয়া: ৭:৫৬৬।

৫. মৃত্যুর সময় বাদশা হারুনুর রশিদের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফের আত্মসমালোচনা

আল্লামা আলাউদ্দিন হিসনি রহিমাহুল্লাহ রদ্দুল মুহতারের টীকা সম্বলিত আদদুররুল মুখতারে (৪/৩১৩) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহির শাগরেদ, বাদশা হারুনুর রশিদের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ, বাদশার সঙ্গে এক খ্রিষ্টানের ঝামেলা হলে তারা উভয়ে তার কাছে বিচার নিয়ে এলো। বিচারের রায় খ্রিষ্টানের পক্ষে গেল। ইমাম আবু ইউসুফ বাদশার বিপক্ষে রায় দিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আপনি খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, আমাকে বিচারকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি কখনো কোনো পক্ষের সামান্য পক্ষপাত করিনি। এমনকি অন্তরে অন্তরেও নয়। তবে বাদশা হারুনুর রশিদের সঙ্গে এক খ্রিষ্টানের মামলার বিষয়টি ভিন্ন। এই মামলায় আমার অন্তর হারুনুর রশিদের দিকে ঝুঁকে ছিল-আমি মনে মনে চেয়েছিলাম মামলার রায় তার পক্ষে যাক। তবে আমি রায় তার বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানের পক্ষেই দিয়েছিলাম।

৬. ইবনে হামেদ ওয়াররাক মৃত্যুর সময় শুধু এ কারণে পানি পান করতে চাননি যে, তার পানির উৎস জানা ছিল না

ইবনে হামেদ ওয়াররাক। আসল নাম আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন হামেদ বাগদাদি। কাজি ইবনু আবি ইয়ালা তার জীবনী বর্ণনায় বলেন, তিনি লিপিকার ছিলেন। হাতে কিতাব লিখে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাই তাকে ইবনে হামেদ ওয়াররাক বলা হয়। (ওয়াররাক মানে হচ্ছে নকল-নবিস)। বহুবার হজ করেছেন। বার্ধক্য বয়সেও অধিক পরিমাণে সফর ও হজ করার কারণে লোকেরা তাকে ভর্ৎসনা করত। তখন তিনি বলতেন, হয়তো জাল মুদ্রা ভালো মুদ্রার সঙ্গে চলে যাবে। (অর্থাৎ, হজে আগমন করা অসংখ্য নেককার মানুষের সঙ্গে আমার মতো গুনাহগারকেও হয়ত মাফ করে দেওয়া হবে)।

কাজি ইবনু আবি ইয়ালা বলেন, ৪০৬ হিজরিতে ইবনে হামেদ হজের সফরে বের হলেন। পথে তার প্রচণ্ড পিপাসা পেল। এক হাজি তার কাছে সামান্য পানি নিয়ে এলো, তিনি পাথরের সাথে হেলান দেওয়া ছিলেন। তার তখন মুমূর্ষু অবস্থা। ইবনে হামেদ পানি নিয়ে আসা ব্যক্তিটিকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, পানি কোত্থেকে আনা হয়েছে? এর উৎস কী? লোকটি বলল, এখন কি এই প্রশ্ন করার সময়? তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। এখন এই প্রশ্ন করার সময়। কারণ এখন আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। তাই এই মুহূর্তে আমার পানির উৎস সম্পর্কে জানা বড়ো প্রয়োজন। ৪০৩ হিজরিতে মক্কা থেকে ফেরার সময় তিনি পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহম করুন।

তাবাকাতুল হানাবিলা: ২/১৭৭।

প্রিয় পাঠক,-আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন-এ সকল আইম্মায়ে কেরাম কতটা আত্মসচেতন ছিলেন তার প্রতি লক্ষ করুন। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আশঙ্কা করছিলেন যে, তার স্ত্রী মেশকের ওজন করতে গিয়ে তার আঙ্গুলে যতটুকু মেশক লেগে থাকবে, তা মুসলমানদের চেয়ে তার ভাগে বেশি যাবে। তাই তিনি তাকে মেশকের ওজন ও তা বণ্টন করার দায়িত্ব প্রদান করেননি। তাকে তা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

আর খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযিয রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে দাফন করার মতো শোকাবহ দিনেও একজন ব্যক্তির সামান্য ভুল তার দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি তা সংশোধন করিয়ে দিতে ভুললেন না। এই সামান্য

ভুলে চুপ থাকতে তার মন সায় দিল না। ভুলটি হচ্ছে কথা বলার সময় লোকটি বাম হাতে ইশারা করে কথা বলছিল। তখন তিনি তাকে সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, ইসলামের আদব হলো ডান হাতে ইশারা করে কথা বলা।

লোকটি যখন তার প্রশংসা করল এবং ইসলামের উপর তার অনুগ্রহের দিকে ইঙ্গিত করল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার কথাটি খণ্ডন করলেন এবং তাকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র ইসলামের। কারণ ইসলাম-ই আমাদের এ সমস্ত আদব ও আখলাক শিক্ষা দিয়েছে এবং ইসলাম-ই মুসলমানদের অন্তরে বিস্ময়কর গুণাবলি ও মহৎ কর্মের জন্ম দিয়েছে।

হাফেয মুনযিরি র. প্রচণ্ড গরমে এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তার পাও চলছিল না। তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। তাই রাস্তাতেই বসে পড়েছিলেন। তার শক্তি এতটাই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গী তাকে বলল, আমি আপনাকে দোকানের বসার স্থানে বসিয়ে দিচ্ছি। দোকান যেহেতু বন্ধ, তাই এখানে বসলে কারও কোনো ক্ষতি হবে না। প্রচণ্ড ক্লান্তি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি বললেন, দোকানদারের অনুমতি ব্যতীত কীভাবে? তিনি রাজি হলেন না। বরং রাস্তায় বসে রইলেন। এটাকে ভালো মনে করলেন। অথচ তিনি সেই যুগের সবচেয়ে বড়ো আলেম ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।

চতুর্থ ঘটনায় তাকিউদ্দিন সুবকি র. যখন দেখলেন যে, তার ছেলে একটি কুকুরকে তাড়ানোর জন্য তাচ্ছিল্যভরে ধমকাচ্ছে। তখন তিনি তাকে বললেন যে, এভাবে বলা ঠিক নয়, যদিও তা জানোয়ার ও কুকুরকে হোক।

পঞ্চম ঘটনায় ইমাম কাজি আবু ইউসুফ র. অন্তরের সাধারণ একটু ঝোঁক, বিচারের রায় যেন খ্রিষ্টানের পক্ষে না গিয়ে বাদশা হারুনুর রশিদের পক্ষে যায়, এটাকে তিনি এমন বিচ্যুতি হিসেবে দেখেছেন যে, এর জন্য তিনি আল্লাহর শাস্তির ভয় করতেন। অন্তরের সামান্য এ টানকে তিনি এত বড়ো গুনাহ বলে মনে করেছিলেন যে, জীবনকে বিদায় জানানোর মুহূর্তে তিনি অশ্রুসজল ছিলেন।

ষষ্ঠ ঘটনায় ফকিহ ইবনে হামেদ হাম্বলি র. জীবনের অন্তিম লগ্নে এক ফোঁটা পানির জন্য ছটফট করে মৃত্যুবরণ করাকে অধিক পছন্দনীয় মনে করেছিলেন। তার এক সঙ্গী তার জন্য পানি নিয়েও এসেছিল, কিন্তু এই পানির উৎস জানা না থাকায় তিনি তা পান করতে রাজি হননি। কারণ তিনি আল্লাহর সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হতে চেয়েছিলেন, তাকে যেসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেসব বিষয়ে তার ভেতর-বাহির সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পবিত্র থাকবে।

অনুগ্রহ না ফলিয়ে প্রয়োজনের অধিক বস্তু দান করে দেওয়া। ভালো মানুষদের হিংসাবিহীন প্রশংসা করা। নিজেকে অখ্যাত রেখে অল্পে তুষ্ট থাকা। জবান ও কানের হেফাজতের জন্য দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করা।[১৬৬] মানুষের সঙ্গ ত্যাগ না করে বিনয়ের সঙ্গে তাদের সামনে উপস্থিত হওয়া।[১৬৭] নির্জনে ধ্যানের সঙ্গে

এই ব্যক্তিগণ আসলেই কত মহান! নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিটি যিনি বলেছেন, সত্য বলেছেন,

هُمُ الرِّجَالُ وَعَيْبٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ   لَمْ يَتَّصِفْ بِمَعَانِيْ وَصْفِهِمْ: رَجُلٌ!

এরাই আসলে প্রকৃত পুরুষ। যারা পুরুষের গুণে গুণান্বিত নয় তাদেরকে আসলে প্রকৃত পুরুষ বলে ডাকা যায় না।

[১৬৬] তুমি যখন কোনো মজলিশে বসলে আর তা দীর্ঘায়িত হলো এবং তোমার কাছে মনে হলো মজলিশটি কল্যাণশূন্য, তখন নিজেকে নিরাপদ রাখতে সেখান থেকে উঠে যাও। কারণ মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরি র. বলেছেন,

إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ نَصِيْبٌ.

মজলিশ দীর্ঘায়িত হলে শয়তান তাতে ভাগ বসায়।

ঘটনাটি ইমাম যুহরি র.-এর জীবনী বর্ণনায় এসেছে। দেখুন *তারিখে ইবনে আসাকির:* পৃষ্ঠা নং ১৫২ এবং *মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ:* পৃষ্ঠা নং ২১১, আটাশ নং প্রকার।

[১৬৭] বিনয় শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে অনেক মতভেদ আছে। সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা আমরা পাই হাসান বসরি-এর কাছ থেকে, যা ইমাম আহমদ র. হাসান বসরি র.-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। হিশাম বিন হাসসান বলেন, লোকেরা হাসান বসরি র.-এর সামনে বিনয় নিয়ে আলোচনা করছিল। তিনি চুপ করে শুধু শুনছিলেন। যখন এ বিষয়ে তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হতে লাগল, তখন তিনি বললেন, আমি দেখছি তোমরা বিনয় নিয়ে অনেক বেশি মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছ। তারা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, বিনয় কাকে বলে হে আবু সাইদ, তিনি তখন বললেন,

يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَلْقَى مُسْلِمًا إِلَّا ظَنَّ أَنَّه خَيْرٌ مِّنْهُ.

মানুষ ঘর থেকে বের হবে এবং যে কোনো মুসলমানের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হবে তাকে নিজের চেয়ে উত্তম জ্ঞান করবে।

আল্লাহর যিকির করা। মানবসেবার জন্য অন্তর শূন্য করা। সার্বক্ষণিক আল্লাহর ধ্যান অন্তরে জাগ্রত রাখার মাধ্যমে চিন্তাভাবনাকে একমুখী রাখা। অবিচলভাবে মুক্তির সন্ধান করতে থাকা।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে তাদের কোনো ভয় থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। (সুরা আহকাফ : আয়াত নং ১৩)

সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সাকাফি বলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ! حَدِّثْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ (قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ)

হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যা আমি আঁকড়ে ধরে থাকবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম। এখন এর উপর অবিচল থাকো।[১৬৮]

---

[১৬৮] সহিহ মুসলিম: ১/৯। মুসলিমের হাদিসটি হলো,

قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: "قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ"

ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন যে, আমাকে এ সম্পর্কে আপনি ছাড়া আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তিনি বললেন, বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম, অতঃপর এর উপর অবিচল থাক।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকো; শিয়ালের মতো ডানে-বামে যেতে থেকো না। আবুল আলিয়া রিয়াহি বলেন, অবিচল থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর জন্য তোমরা তোমাদের দিন, দাওয়াত ও আমলকে খাঁটি করো।

ইস্তেকামাতের মূল হলো তিনটি বিষয়, কুরআনের অনুসরণ করা, সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং জামাতকে আঁকড়ে থাকা।[১৬৯]

অপর একটি বর্ণনায় এই শব্দে আছে,

لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ

আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না।

ইমাম নববি র. শারহু সহিহ মুসলিম গ্রন্থে বলেন, কাজি ইয়াজ র. বলেন, এই হাদিসটি আল্লাহর রাসুলের জাওয়ামিউল কালিমের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ: নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে তাদের কোনো ভয় থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। (সুরা আহকাফ: আয়াত নং ১৩)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করো, তাঁর প্রতি ইমান আনো। তারপর এমনভাবে অবিচল থাকো যে, এ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে যেয়ো না। আর মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকো।

[১৬৯] কোন জামাতকে আঁকড়ে থাকা আবশ্যক?

জামাতকে আঁকড়ে থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হক ও আহলে হকদের আঁকড়ে থাকা। যদিও তারা সংখ্যায় অল্প হয়। যাদের দলভারি, যারা সংখ্যায় বেশি, তাদের আঁকড়ে থাকা নয়। অনেকে এটি বুঝতে ভুল করেন। তাই তা স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। ইমাম ইবনে হাজাম র. তার কিতাব *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম* গ্রন্থে (৫/৮৭) জামাত আঁকড়ে থাকা ও বিচ্ছিন্ন থাকা শিরোনামে বলেন,

জামাত ও সঙ্ঘ দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে হকের জামাত, হকের সঙ্ঘ। যদি পৃথিবীতে আহলে হক মাত্র একজন থাকে, তাহলে তাকেই হকের জামাত বলা হবে। যখন (নবিজির দাওয়াত পেয়ে) শুধু আবু বকর এবং খাদিজা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তারা দুজন মিলেই ছিলেন হকের জামাত। আর আল্লাহর রাসুল ও তারা দুজন ছাড়া সমস্ত পৃথিবীবাসী ছিল বিচ্ছিন্ন ও বাতিল জামাত। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। (অর্থাৎ, সকলেই একমত)।

ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা র. বলেন, আবু শামা র. *আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদাআহ* গ্রন্থে জামাতকে আঁকড়ে থাকা প্রসঙ্গে অনেক চমৎকার একটি কথা বলেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হককে আঁকড়ে থাকা ও হকের অনুসরণ করা। যদিও হকপন্থিদের সংখ্যা অল্প হয়। আর তার বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা অধিক হয়। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে তারাই ছিলেন আহলে হক। অথচ তারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাই বাতিলপন্থিদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

আমর বিন মাইমুন আল আওদি র. বলেন, আমি ইয়ামানে হযরত মুআয বিন জাবাল রা.-এর সঙ্গে ছিলাম এবং শামে তিনি মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত আমি তার সঙ্গেই ছিলাম। তার মৃত্যুর পর আমি শ্রেষ্ঠ ফকিহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, জামাতকে আঁকড়ে থাকো। কারণ, আল্লাহর হাত (সাহায্য) জামাতের উপর থাকে। তারপর একদিন আমি তাকে বলতে শুনলাম, খুব শীঘ্রই তোমরা এমন শাসক পাবে যারা নামাজকে যথাসময়ে আদায় না করে বিলম্বে আদায় করবে। সুতরাং তোমরা যথাসময়ে নামাজ আদায় করবে। কারণ এটাই ফরয। তারপর তোমরা আবার তাদের সঙ্গে নামাজ পড়বে। এটি তোমাদের জন্য নফল হবে।

আমর বিন মাইমুন বলেন, আমি বললাম, হে মুহাম্মদের সঙ্গীরা, আপনারা আমাদের যা বলেন, তা আমার বুঝে আসে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী সেটা? আমি বললাম, আপনি আমাকে জামাত আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেন, জামাতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন, তারপর আবার বলেন, একা নামাজ পড়ে নিবে, কারণ এটা ফরয। তারপর জামাতে পড়বে, কারণ তা নফল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হে আমর বিন মাইমুন! আমি তোমাকে এই অঞ্চলের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফকিহ মনে করতাম। তুমি কি জান জামাত কাকে বলে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, জামাত তাকে বলে যে সত্যের উপর থাকে, যদিও সে একা হয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি আমার উরুর উপর জোরে আঘাত করে বললেন, আশ্চর্য! অধিকাংশ মানুষও যদি জামাতকে (হককে) বর্জন করে, তাহলেও (তাদের জামাত বলা হবে না। বরং) জামাত সেটাই যা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের উপর আছে।

হযরত নুআইম বিন হাম্মাদ বলেন, জামাতের মাঝে কোনো খারাবি দেখা দিলে তোমার উচিত খারাবি দেখা দেওয়ার আগে জামাত যে অবস্থানে ছিল সে অবস্থানে থাকা। যদিও তুমি একা হও। এমতাবস্থায় তোমাকেই জামাত বলা হবে। ইমাম বায়হাকি ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয লালিকাই *আস-সুন্নাহ* গ্রন্থে (১/১০৯) অনুরূপ শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি পরবর্তীতে *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ* নামে ছাপা হয়েছে।

খতিব বাগদাদি র. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জামাত কুরআন ও সুন্নাহর নাম। যদিও তার আমলকারী মাত্র একজন হয়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জামাত আহলে হকের নাম। যদিও সে একজন হয়। ইবরাহিম নাখয়ি র. বলেন, জামাত হকের নাম। যদিও হকের অনুসারী মাত্র একজন হয়।

(দেখুন খতিবে বাগদাদিকৃত *আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*: ২/১৯১।)

ইবনুল কায়্যিম র.-ও অনুরূপ কথা বলেছেন, তবে তিনি এর সঙ্গে অতিরিক্ত এ কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন, সুন্নত ও সৎকাজের অনুসারী কম থাকায় কিছু মানুষ সুন্নতকে বিদআত এবং সৎকাজকে অসৎকাজ বানিয়ে ফেলেছে। তারা দলিল হিসেবে এ হাদিসটি পেশ করে, যে (জামাত থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে। অথচ তারা জানে না, বিচ্ছিন্নতাবাদি সে-ই, যে হকবিরোধী। একজন ছাড়া যদি সবাই হকের বিরোধী হয়, তাহলে তারা সকলেই বিচ্ছিন্নতাবাদি। আর সেই একজনই হচ্ছে হকের জামাত।

ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন: ৩/৪০৯।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের যুগে অল্প কয়েকজন মানুষ ছাড়া সবাই বিচ্ছিন্নতা তথা হকের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। তাই সেই অল্প কজনই ছিলেন হকের জামাত। আর এর বিপরীতে থাকা সমস্ত বিচারক, মুফতি, খলিফা ও তার অনুসারীরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন তথা হক বিরোধী। ইমাম আহমদ তখন একাই হকের জামাত ছিলেন। আর এ বিষয়টি মানুষ বুঝতে না পারায় তারা ইমাম আহমদকে খলিফার কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলত, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি, আপনার বিচারক, গভর্নর ও মুফতি সকলেই বাতিলের উপর আছেন। আর আহমদ একা হকের উপর আছে?! (অর্থাৎ,

খুব ভালো করে জেনে রাখো, বান্দার জন্য সবচেয়ে বড়ো মুক্তির রাস্তা হলো ইলম অনুযায়ী আমল করা, আল্লাহর ভয়ে গুনাহমুক্ত থাকা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে অমুখাপেক্ষী হওয়া। এজন্য আত্মসংশোধনে প্রয়াসী হও, আপন রবের প্রতি মুখাপেক্ষী হও ও যাবতীয় দ্বিধা-সংশয় থেকে বেঁচে থাক।[১৭০]

সে একা হক চিনতে পারল। আর আপনারা কেউ চিনতে পারলেন না।) খলিফা নিজেও হকের জামাতের বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তাই তিনি ইমাম আহমদকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন বন্দি করে রাখেন এবং তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার ও নির্যাতন করেন। অতঃপর হক ও আহলে হকের বিজয় হয়। আর বাতিলের সমস্ত দাবি অসাড়ে পরিণত হয়। যেমনটি ইতোপূর্বে ইমাম আহমদ র. সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখেছি।

[১৭০] শায়খ ইবনুল কায়্যিম র. বলেন, সন্দেহ, এটি মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং তার ও হক বুঝতে পারার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ সন্দেহ সৃষ্টি হতেই সংশয়ে নিপতিত হয়। এটি তার জ্ঞানস্বল্পতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের কারণে হয়ে থাকে। তাই অন্তরে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হতেই সে সংশয়ে পড়ে যায় কিন্তু দৃঢ় ইলমের অধিকারী ব্যক্তি এমন নয়। তার অন্তরে যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ সন্দেহ জমা হয়, তাহলেও তা তার বিশ্বাসকে টলাতে পারে না এবং তাতে কোনো সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ তার ইলম এতটাই দৃঢ় যে, সন্দেহ তাতে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। বরং ইলম সন্দেহকে অপনোদন করে ও তার অসাড়তা জানতে পেরে আরও দৃঢ় হয়ে যায়।

কিন্তু অন্তরে যখন ইলমের হাকিকত না থাকে, তখন প্রথম ধাক্কাতেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি বুঝতে পারে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ, অন্যথায় অন্তরে আরও অনেক সন্দেহ একের পর এক সৃষ্টি হতে থাকে। একসময় সে সন্দেহপোষণকারী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

অন্তরের উপর বাতিল দুভাবে হামলা করে থাকে। এক. খারাপ ও নগ্ন মানসিকতার হামলা। দুই. ভ্রান্ত সংশয়-সন্দেহের হামলা। দুটির যে কোনো একটির দিকে অন্তর ঝুঁকে পড়লে তা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। তখন জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে থাকে। যদি ভ্রান্ত সন্দেহের দ্বারা অন্তর পূর্ণ থাকে, তাহলে জবান দিয়ে শুধু সন্দেহ ও সংশয়ের কথা বের হবে। মূর্খ ব্যক্তি মনে করে, সে গভীর জ্ঞানের অধিকারী বলেই এসব প্রশ্ন তার মনে জাগছে, তার মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ বিষয়টি তেমন নয়, বরং জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সে সন্দেহের শিকার হচ্ছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র.-কে আমি একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেন, স্পঞ্জ যেমন তরল পদার্থকে নিজের ভেতর শুঁষে নেয়, বিভিন্ন আপত্তি ও সন্দেহের ক্ষেত্রে তোমার অন্তর যেন তেমন না হয়। তাহলে সে তা নিজের ভেতর শুঁষে নিবে এবং চিপলে শুধু তা-ই বের হবে। বরং তোমার অন্তর যেন হয় বদ্ধ কাঁচের শিশির মতো। সন্দেহ তার উপরে এসে পড়লেও ভেতরে ঢুকতে পারে না। শিশিটি স্বচ্ছ কাঁচের হওয়ায় তোমার চোখে সেগুলো ধরা পড়বে এবং মজবুত হওয়ার কারণে তুমি সেগুলো দূর করতে পারবে। অন্যথায় সমস্ত সন্দেহকে তুমি যদি তোমার অন্তরে স্থান দাও, তাহলে তা সন্দেহের বসবাসের ঠিকানায় পরিণত হবে। কিংবা তিনি এরূপ বলেছেন, আমার জানা নেই, অন্তরকে যাবতীয় সংশয়মুক্ত রাখতে কোনো উপদেশ দ্বারা আমি এত উপকৃত হয়েছি কিনা যতটুকু তার এই কথার মাধ্যমে হয়েছি।

(সন্দেহ শব্দের আরবি হলো شُبْهَةٌ, এটি شَبَّهَ শব্দ থেকে উদ্ভূত, অর্থ সদৃশ হওয়া। মিল হওয়া। তাহলে সন্দেহকে আরবিতে شُبْهَةٌ বলার কারণ কী?) সন্দেহকে আরবিতে এ কারণে شُبْهَةٌ বলা হয়, যেহেতু তাতে বাতিলকে হকসদৃশ মনে হয়। কারণ সন্দেহ বাতিলের গায়ে হকের সুন্দর পোশাক পরিয়ে দেয়। তখন বাতিলকে দেখতে হকের মতো লাগে, কিন্তু আসলে বাতিল। অধিকাংশ মানুষ যেহেতু বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। তাই তারা সন্দেহের গায়ের সুন্দর পোশাকটি দেখে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু ইলম ও ইয়াকিনের অধিকারী ব্যক্তি বাহ্যিক এই সৌন্দর্যে প্রতারিত হয় না। বরং তার দৃষ্টি চলে যায় এর ভেতরে। তখন পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত বিষয় তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এর দৃষ্টান্ত ভেজাল রৌপ্য মুদ্রার মতো। অজ্ঞ ব্যক্তি এর উপরের রূপার ঝিলিক দেখে ধোঁকা খায়, কিন্তু বিচক্ষণ ও সঠিকভাবে পরখকারী ব্যক্তির দৃষ্টি মুদ্রার উপরের ঝিলিকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল অবস্থাকেও দেখতে পায়। সে তখন ধরতে পারে যে, মুদ্রাটি জাল।

তাই সন্দেহপূর্ণ কথার সুন্দর শব্দ ও বিশুদ্ধ ভাষা হচ্ছে সন্দেহের গায়ের পোশাক। যেমন জাল মুদ্রার উপর প্রলেপ দেওয়া রূপার রঙ। অথচ এর নিচের পুরোটাই তামা। বাহ্যিক সৌন্দর্যের এই ধোঁকা কত অসংখ্য মানুষকে যে ধ্বংস করে দিয়েছে, তাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন।

(মিফতাহু দারিস সাআদাহ: ১৫২ নং পৃষ্ঠা।)

মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা কম বলো।[১৭১] নিজের জন্য যা পছন্দ করো তাদের জন্য তাই পছন্দ করো। নিজের জন্য যা অপছন্দ করো তাদের জন্য তা অপছন্দ করো। কোনো গুনাহকে ছোটো মনে করো না। কোনো রহস্য ফাঁস করো না। কারও দোষ প্রকাশ করো না। অন্তরে গুনাহের কথা চিন্তা করো না। অব্যাহতভাবে কোনো সগিরা গুনাহ করতে থেকো না।

যে কোনো প্রয়োজনে আল্লাহমুখী হও। সর্বাবস্থায় তাঁর মুখাপেক্ষী হও। সমস্ত বিষয়ে তাঁর উপর ভরসা করো।[১৭২] প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকো। নেক আমল

---

[১৭১] একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, মানুষের সম্মান মানুষ থেকে বিমুখ থাকার (অর্থাৎ, তাদের কারও কাছে কোনো কিছু না চাওয়ার) মাঝে নিহিত।

[১৭২] তাওয়াক্কুলের হাকিকত হলো, বিভিন্ন আসবাব তথা উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে নিজের কার্য সমাধা করা। আসবাব সৃষ্টিকে যে অস্বীকার করে তার তাওয়াক্কুল হচ্ছে তামাশা ও ঠাট্টা। বাহ্য দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, আসবাব তথা উপায় উপকরণ গ্রহণ করার দ্বারা তাওয়াক্কুল ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু প্রকৃত বিষয় এমন নয়। কারণ আসবাবকে অস্বীকার করলে তাওয়াক্কুল অর্জিত হয় না। তাওয়াক্কুল নিজেও যে জিনিসের জন্য তাওয়াক্কুল করা হচ্ছে তা অর্জনের শক্তিশালী একটি আসবাব, কারণ। তাওয়াক্কুল হচ্ছে প্রার্থনার মতো, প্রার্থিত বিষয় লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালা যাকে কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

দেখুন আল্লামা ফিরুয আবাদিকৃত *বাসাইরু যাবিত তাময়িয:* ২/৩১৮।

এ কথার প্রমাণস্বরূপ আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদিস উল্লেখ করতে পারি। এক বেদুইন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কি আমার উটকে বাঁধব নাকি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

اَعْقِلْهَا وَ تَوَكَّلْ.

প্রথমে বাঁধ, তারপর তাওয়াক্কুল করো।

আমর বিন উমাইয়া যামরি রা.-এর সূত্রে ইবনে হিব্বান তার সহিহতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ সহিহ যেমনটি *ফায়জুল কাদিরে* (২/৭-৮) আছে।

করবে এই অপেক্ষায় থেকো না। অর্থাৎ, সঙ্গে সঙ্গে নেক আমল শুরু করে দাও। নিজেকে অখ্যাত রাখো। সর্বদা আল্লাহর শোকর আদায় করো। বেশি বেশি ইস্তেগফার করো। চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করো।[১৭৩] ফেতনার মুকাবেলা করার জন্য ইলম অর্জনের মাধ্যমে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

তাড়াহুড়ো করো না, ধীরস্থিরতা বজায় রাখো। মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষেত্রে উত্তম শিষ্টাচার অবলম্বন করো।[১৭৪] নিজের স্বার্থে কখনো কারও সঙ্গে রাগ করো না। তবে আল্লাহর হক নষ্ট হলে নিজের উপর রাগ করতে পারো। কাউকে মন্দ প্রতিদান দিয়ো না। মূর্খের প্রশংসাকে ভয় করো। কারও কাছ থেকে নিজের প্রশংসা কামনা করো না। কম হাসো। ঠাট্টা-মশকরা থেকে বেঁচে থাকো।[১৭৫]

---

[১৭৩] কী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছো সে বিষয়েও চিন্তা করবে; যাতে তোমার চিন্তা-ভাবনাগুলো ফলশূন্য না হয়।

[১৭৪] অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে উঠাবসার ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও উত্তম শিষ্টাচার অবলম্বন করো। রুআইম বিন আহমদ বাগদাদি তার ছেলেকে বলেন, হে বৎস, তোমার আমলকে লবণ আর ভদ্রতা ও শিষ্টাচারকে আটা বানাও। এত অধিক পরিমাণে শিষ্টাচার অবলম্বন করো যাতে তোমার আচার-আচরণে রুটি বানানোর জন্য আটার যে খামির তৈরি করা হয়, সে খামিরে লবণের তুলনায় আটা যে পরিমাণ থাকে, সে পরিমাণ হয়। অল্প নেক আমলের সঙ্গে অধিক আদব, অল্প আদবের সঙ্গে অধিক আমলের তুলনায় উত্তম।

ইমাম কারাফিকৃত *আল-ফুরুক*: ৩/৯৬।

[১৭৫] মহান তাবেয়ি হাসান বসরি র. বলেন, দুঃখ-কষ্ট নেক আমলের কারণ। হাসাহাসি অন্তরে গাফলত সৃষ্টি করে। আর অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।

আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*: ২:১৩৩, ১৫২।

সাহাবায়ে কেরাম রা. হাসি-ঠাট্টা করতেন, একে অপরের দিকে তরমুজের টুকরা ছুঁড়ে মারতেন, কিন্তু দায়িত্ব পালনের সময় তারা প্রকৃত পুরুষের পরিচয় দিতেন।

নিজের কষ্টকে লুকিয়ে রাখো। নিজের অভাব ও দরিদ্রতাকে প্রকাশ করো না। মনে মনে আল্লাহ তায়ালার উপর আস্থা রাখো।[১৭৬] দরিদ্রতা থেকে বেঁচে থাকো। কষ্টে ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো। আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস রাখো। তাঁর আযাবকে ভয় করো। সাধ্যাতিত কোনো কিছুর পেছনে পড়ো না। আর যা অর্জনের দায়িত্ব তোমার উপর আরোপ করা হয়েছে তা নষ্ট করো না। আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি দানের ক্ষেত্রে তাঁর মুখাপেক্ষী হও। তাঁর কাছে মুক্তির আশা রাখো। কেউ জুলুম করলে তাকে ক্ষমা করে দাও। কেউ বঞ্চিত করলে তাকে দান করো। যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো।[১৭৭]

আপনি যদি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. তো হাসি-ঠাট্টা করতেন, তাহলে আমি বলব, হ্যাঁ। কিন্তু এসব তারা গাফেল, খেল-তামাশায় মত্ত ও পাগল হয়ে করতেন না। তারা হাস্যরসিকতা করতেন, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ কিংবা নিষেধ বাস্তবায়নের কোনো বিষয় আসলে তারা প্রকৃত পুরুষে পরিণত হতেন।

মহান তাবেয়ি বকর বিন আবদুল্লাহ মুযানি রা. তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ হাসি-ঠাট্টা করতেন, পরস্পরকে তরমুজ ছুঁড়ে মারতেন। কিন্তু কোনো বাস্তবতা সামনে চলে আসলে তারা প্রকৃত পুরুষে পরিণত হতেন।

ইবনে আসিরকৃত আন-নিহায়াহ।

আল্লামা ইবনুল জাওযি র. হযরত আবু সালামা বিন আবদুর রহমান বিন আওফ রা. থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অনেকে এমন ছিলেন, কোনো দিনি দায়িত্ব সামনে এলে তাদের চোখ চেহারার উপর এমনভাবে ঘুরতে থাকত, পাগল মনে হত।

মানাকিবুল ইমাম আহমদ: পৃষ্ঠা নং ৩১১।

[১৭৬] অর্থাৎ, অন্তরে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা রাখো। আল্লাহ অবশ্যই এমন বান্দার আস্থার খেলাপ করেন না।

[১৭৭] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, যে তোমাকে হাদিয়া দেয় না তুমি তাকে হাদিয়া দাও। অসুস্থ হলে যে তোমাকে দেখতে আসে না তুমি তাকে দেখতে যাও।

কিতাবুল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল: ১/৯৭।

যে তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে তাকে প্রাধান্য দাও।[১৭৮] নিজের ভাইদের জন্য নিজের জান-মাল খরচ করো।

নিজের ক্ষেত্রে আল্লাহর হকের প্রতি লক্ষ রাখো। তুমি যত মহান পুণ্যের কাজই করো না কেন, সেটা যেন তোমার চোখে বড়ো না হয়। যত ছোটো গুনাহই করো না কেন সেটাকে ছোটো মনে করো না।[১৭৯] অন্তরের ভাবনা-

[১৭৮] মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন মুনকাদির র.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন কাজটি করতে আপনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? তিনি বলেন, মুমিনকে খুশি করতে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার আকাঙ্ক্ষা কী? বললেন, বন্ধুদের সঙ্গে সদাচার করা। *আল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল*: ১/৩৩।

মেহমানের রিযিক তার সঙ্গে আসে

হাফেয সিলাফি র. বলেন, আহমদ বিন ইউসুফ বিন নাম ইয়ামুরি বাইয়াসি আমাকে উযির আবুল হাসান জাফর বিন ইবরাহিমের নিম্নোক্ত কবিতাটি শুনিয়েছেন:

لِمَ لَا أُحِبُّ الضَّيْفَ أَوِ ... ارْتَاحُ مِنْ طَرَبٍ إِلَيْهِ؟

وَالضَّيْفُ يَأْكُلُ رِزْقَهُ ... عِنْدِيْ وَيَشْكُرُنِيْ عَلَيْهِ

অর্থ: আমি কেন মেহমানকে অপছন্দ করব কিংবা তার আগমনে আনন্দিত হব না?

সে আমার কাছে এসে তার রিযিক খায়। অথচ শুকরিয়া আদায় করে আমার।

ডক্টর এহসান মুজামুস সাফার গ্রন্থের ১৫৬ নং পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে *আখবার ওয়া তারাজিমু আন্দালুসিয়্যাহ* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

[১৭৯] অথবা ছোটো কোনো গুনাহ দেখলেও তুমি সেটাকে ছোটো মনে করো না। কারণ বারবার গুনাহের কাজ হতে দেখা তাতে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য। এতে অন্তর থেকে ভালো ও খারাপের মাঝে পার্থক্য করার গুণ নষ্ট হয়ে যায়। কারণ মনে যখন অধিক পরিমাণে গুনাহের কথা আসে, চারপাশে তা বারবার হতে দেখে, তখন অন্তর থেকে তার গুরুতরতা কমতে থাকে। ধীরে ধীরে তা সামান্য ও স্বাভাবিক মনে হতে থাকে। একপর্যায়ে তা তার কাছে আর খারাপ মনে হয় না। এমনকি একসময় সে সেটাকে কোনো গুনাহের কাজ বলে মনেই করে না। কারণ অন্তরের সঙ্গে তখন তা মিশে গেছে। আল্লামা মুনাবিকৃত *ফাইযুল কাদির*: ২/৩৯৯।

চিন্তাগুলো গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করো। কারণ এগুলোর জন্য আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

নিজের আমলের প্রতি মুগ্ধ হওয়া থেকে তুমি যেভাবে সতর্ক থাকো, সেভাবে নিজের ইলমের প্রতি মুগ্ধতা থেকে সতর্ক থাকো। বাহ্যিক ইলম যার পরিপন্থি এমন বাতেনি বিশ্বাস পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকবে।

মানুষের নাফরমানি করে হলেও আল্লাহর আনুগত্য করবে। কিন্তু আল্লাহর নাফরমানি করে মানুষের আনুগত্য করবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের কোনো চেষ্টাই অবশিষ্ট রাখবে না। আল্লাহর জন্য করা নিজের কোনো আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। নামাজে তাঁর সামনে দেহ-মনে সবকিছু নিয়ে দাঁড়াবে।[১৮০]

---

[১৮০] পবিত্র কুরআনে নামাজের হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে أَقِيمُوا الصَّلَاةَ বাক্যটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

ইমাম মুহাসেবি র.-এর এই কথার উদ্দেশ্য, নামাজে নিজের দেহ-মন, সম্পূর্ণ সত্তা নিয়ে দাঁড়াও। পাশাপাশি নামাজের যাবতীয় আদব ও আহকাম নিখুঁতভাবে পালন করো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা যে বারবার أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (তোমরা নামাজ কায়েম করো) বলেছেন, এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় তিনি নামাজ কায়েম করার কথা বলেছেন, কিন্তু একটি বারের জন্যও বলেননি (তোমরা নামাজ পড়ো)।

নামাজ কায়েম করার অর্থ হচ্ছে, নামাজের ভেতর ও বাইরের সমস্ত রুকন ও শর্তগুলো পূর্ণ করে নামাজ আদায় করা। এভাবে নামাজ আদায়ের অনেক উপকারিতা আছে। সে উপকারিতাগুলো লাভের জন্য আমাদের করণীয় সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

নামাজের উপকারিতা লাভের জন্য শর্ত হলো, নামাজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, আকৃতিগত ও মর্মগত দিকের প্রতি লক্ষ রেখে যথাযথ হক আদায় করে নামাজ পড়া। নামাজের বাহ্যিক দিক হলো, রুকু সেজদায় স্থিরতা ও খুশু-খুজু বজায় রাখা। নামাজে কেরাত, দোয়া ও তাসবিহ যেগুলো পড়তে হয় সেগুলো অনুধাবন করে পড়া। ইমামের পেছনে থাকলে মনোযোগের সঙ্গে কেরাত শ্রবণ করা। অভ্যন্তরীণ দিক হলো, অন্তরে আল্লাহর ভয়ের অনুভূতি রাখা। সে নামাজে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং কোনো কিছু-চাই তা যত বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ হোক- যেন নামাজ থেকে তার মনোযোগ সরাতে না পারে।

ইবরাহিম আ. আপন রবের কাছে এমন নামাজের প্রার্থনাই সর্বপ্রথম করেছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে দোয়া করে বলেছিলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي.

হে প্রভু! আপনি আমাকে এবং আমার বংশধরের মধ্য থেকে নামাজ কায়েমকারী বানান।

আর পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামাজের এমন মর্যাদার কারণেই আদেশ করেছেন, তিনি যেন নিজের পরিবারকে নামাজের আদেশ দেন এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাকেন।

ইরশাদ হচ্ছে:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.

হে নবি! আপনি আপনার পরিবারকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই আপনাকে দান করি। আর উত্তম পরিণতি তো মুত্তাকিদের জন্য।

নামাজের একটি উপকারিতা হচ্ছে, নামাজকে যখন যথাযথভাবে আদায় করা হবে তখন তা নামাজিকে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। যেমনটি পবিত্র কুরআনে এসেছে:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

অর্থ: আর আপনি নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

নামাজের একটি উপকারিতা হলো, নামাজি ব্যক্তি বিপদাপদে স্বাভাবিক থাকে এবং শান্ত-স্থির ও দৃঢ় মনোবলের মাধ্যমে তা মুকাবেলা করে। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

হে ইমানদারগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।

নামাজের আরেকটি উপকারিতা হলো তা যাবতীয় গুনাহ ও মন্দ কাজগুলোকে মিটিয়ে দেয়। আর নবি-রাসুল ও ফেরেশতাগণ ছাড়া এমন কে আছে যার কোনো গুনাহ নেই? তাই আমরা প্রত্যেকেই গুনাহ মাফের জন্য নামাজের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.

তোমরা দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের কিছু অংশে নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ আমলসমূহকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটি তাদের জন্য একটি উপদেশ। (সুরা হুদ, আয়াত নং ১১৪)

নামাজের আরও উপকারিতা হলো, তা নামাজি ব্যক্তিকে যাবতীয় পেরেশানি ও কৃপণ স্বভাব থেকে রক্ষা করে। তার চিত্ত সর্বদা স্থির থাকে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.

মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন সে কল্যাণ লাভ করে, তখন সে হয় কৃপণ। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত। (সুরা মাআরিজ, আয়াত নং ১৯-২৩)

এরপর যখন আমরা দেখি যে, কেউ নিয়মিত নামাজ পড়লেও নামাজের এসব ফলাফল তার মাঝে পরিলক্ষিত নয়। তখন নিশ্চিতভাবেই আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে যেভাবে নামাজ পড়তে আদেশ করেছেন সে সেভাবে

খুশি মনে আগ্রহের সাথে যাকাত আদায় করবে। মিথ্যা ও গিবত থেকে তোমার রোজাকে হেফাজত করবে। প্রতিবেশি, মিসকিন ও নিকটাত্মীয়ের হকের প্রতি লক্ষ রাখবে। [১৮১]

নামাজ পড়ে না। বরং তার নামাজ অনেকটা মুনাফেকের নামাজের মতো, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا.

আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। (সুরা নিসা, আয়াত নং ১৪২)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ অনুগ্রহ ও দানে আমাদেরকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

[১৮১] উত্তম প্রতিবেশি হওয়া মুসলমানের গুণ।

১. তুমি এমন ভালো ও প্রিয় প্রতিবেশি হওয়ার চেষ্টা করো যার সম্পর্কে কবি নিম্নোক্ত কবিতায় বলেছেন,

إِنِّي لَأَحْسُدُ جَارَكُمْ لِجِوَارِكُمْ   طُوبَى لِمَنْ أَمْسَى لِدَارِكَ جَارًا

يَا لَيْتَ جَارَكَ بَاعَنِيْ مِنْ دَارِهِ   شِبْرًا فَأُعْطِيَهُ بِشِبْرٍ دَارًا

তোমার প্রতিবেশি হওয়ার কারণে আমি তোমার প্রতিবেশিকে হিংসা করি।

সে কতই না ভাগ্যবান যে তোমার প্রতিবেশি!

হায়! তোমার প্রতিবেশি যদি তার ঘরের অন্তত এক বিগত জায়গা বিক্রি করত।

তাহলে আমি তাকে এর বিনিময়ে সম্পূর্ণ একটি বাড়ি লিখে দিতাম।

এবার তোমাকে তিনটি আশ্চর্যজনক ঘটনা শোনাচ্ছি, যেখানে প্রতিবেশি ভালো হওয়ায় বাড়ির দাম বাড়িয়ে চাওয়া হয়।

আবদুল্লাহ বিন তাহেরের এক বৃদ্ধা প্রতিবেশি

১. তিনটি ঘটনার প্রথম দুটি ঘটনা আবু বকর খাওয়ারেজমির বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধা মহিলা ছিল আবদুল্লাহ বিন তাহেরের প্রতিবেশি। আর এই আবদুল্লাহ আব্বাসি খেলাফতের সময় খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। ২৩০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। বৃদ্ধা মহিলার চার মেয়ে ছিল। তাকে বলা হলো, আপনি তো গরিব মানুষ। আপনি যদি আপনার বাড়িটি বিক্রি করে দিতেন তাহলে এতে আপনার ও আপনার পরিবারের অভাব দূর হয়ে যেত। তখন সে বলল, হাঁ। তবে আমি আবদুল্লাহ বিন তাহেরের প্রতিবেশি হওয়াকে দিনারের মূল্যে বিক্রি করতে পারব না। কথাটি আবদুল্লাহ যখন শুনলেন, তখন তিনি ঘটককে ডেকে (বৃদ্ধার চার মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে) বললেন, আমার চারজন মেয়ে। তুমি তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত চারজন পাত্র খুঁজে বের করো। তারপর তিনি তার কোষাগার থেকে প্রত্যেক মেয়েকে (তাদের বিয়ের সময়) এক লক্ষ দিনার করে দিলেন।

আবদুল্লাহ বিন মুবারকের এক ইহুদি প্রতিবেশি

২. আবদুল্লাহ বিন মুবারকের প্রতিবেশি ছিল এক ইহুদি। সে তার বাড়িটি বিক্রি করে দিতে চাইল। তাকে দাম জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, দুই হাজার। তখন তাকে বলা হলো, এর দাম তো এক হাজারের বেশি হবে না। সে বলল, তুমি সত্য বলেছো। এক হাজার বাড়ির দাম। আর এক হাজার আবদুল্লাহ বিন মুবারকের প্রতিবেশি হওয়ার। কথাটি ইবনুল মুবারক যখন শুনলেন, তখন তাকে ডেকে তার বাড়ির দাম দিয়ে দিলেন। আর বললেন, বাড়িটি বিক্রি করো না।

সাইদ বিন আস-এর প্রতিবেশিত্ব ফিরিয়ে নেওয়া প্রতিবেশি আবুল জাহমের

৩. মহান তাবেয়ি আবুল জাহম সুলায়মান বিন জাহম আনসারি কুফি তার বাড়িটি এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন। তারপর ক্রেতাকে বললেন, সাইদ বিন আস-এর প্রতিবেশি হওয়ার জন্য কত দিরহাম দেবে? ক্রেতা বলল, প্রতিবেশি হওয়ার আবার কিসের দাম? আবু জাহম বললেন, তুমি তোমার টাকা নিয়ে যাও। আমাকে আমার

বাড়ি ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! আমি এমন ব্যক্তির প্রতিবেশি হওয়াকে ছাড়তে পারি না, আমি বেকার থাকলে থাকলে যে আমার খোঁজ-খবর নেয়। দেখা হলে অভিবাদন জানায়। আমি বাড়িতে না থাকলে আমার বাড়ি-ঘরের দেখাশোনা করে। তার বাসায় গেলে কাছে নিয়ে বসায়। কোনো কিছু চাইলে তা প্রদান করে, আর না চাইলে নিজে থেকে এসে দিয়ে যায়। আমি কোনো বিপদে পড়লে আমাকে উদ্ধার করে। কথাটি যখন সাইদ বিন আস শুনতে পেলেন তখন তিনি তার জন্য এক লাখ দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

তুমি এমন প্রতিবেশি হয়ো না মানুষ যাকে ঘৃণা করে এবং যার প্রতিবেশিত্ব কম মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ, যে খারাপ হওয়ার কারণে মানুষ বাড়ি কম মূল্যে বিক্রি করে চলে যায়।) যেমন মন্দ প্রতিবেশির যন্ত্রণার শিকার হওয়া জনৈক ব্যক্তি বলেছেন,

يَلُوْمُوْنَنِيْ أَنْ بِعْتُ بِالرُّخَصِ مَنْزِلِيْ   وَلَمْ يَعْلَمُوْا جَارًا هُنَاكَ يُنَغِّصُ

فَقُلْتُ لَهُمْ: كُفُّوا الْمَلَامَ فَإِنَّهَا   بِجِيْرَانِهَا تَغْلُو الدِّيَارُ وَتَرْخُصُ

অর্থ: আমি কম দামে বাড়ি বিক্রি করায় মানুষ আমাকে ভর্ৎসনা করে। অথচ তারা জানে না, সেখানের এক প্রতিবেশি বাড়ির দাম কমিয়ে দিয়েছে। তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা ভর্ৎসনা করা বন্ধ করো। কারণ প্রতিবেশির কারণে বাড়ির দাম কম-বেশি হয়ে থাকে।

মহান তাবেয়ি আবুল আসওয়াদ দুওয়ালির জীবনী বর্ণনায় এসেছে, আবুল আসওয়াদের বসরায় একটি বাড়ি ছিল। তার এক প্রতিবেশি ছিল যে সবসময় তাকে কষ্ট দিত। তাই তিনি বাড়িটি বিক্রি করে দিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বাড়ি বিক্রি করে দিলেন? তিনি বললেন, বরং আমি আমার প্রতিবেশিকে বিক্রি করেছি। তারপর থেকে এই কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়।

দেখুন ইবনে খাল্লিকানকৃত *ওফায়াতুল আ'য়ান*: ১/২৪১।

মায়দানি বলেন, একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে: আমি আমার প্রতিবেশিকে বিক্রি করেছি। বাড়ি বিক্রি করিনি। অর্থাৎ, বাড়ি বিক্রি করার আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু প্রতিবেশি খারাপ হওয়ায় আমি তা বিক্রি করে দিয়েছি। দেখুন মাজমাউল আমসাল: পৃষ্ঠা নং ৬৮।

পরিবারের সদস্যদের আদব শিক্ষা দিবে। অধীনস্থদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করবে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হবে। ভাল কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করবে। কোনো কিছু সন্দেহপূর্ণ মনে হলে তা বর্জন করবে।[১৮২] গুনাহগার ও পাপীদের সঙ্গে দয়ার আচরণ করবে। মুমিনদের কল্যাণকামনা ছেড়ে দিবে না। যেখানেই থাক হক কথা বলবে। অধিক কসম খাবে না, যদিও তুমি সত্য ও ন্যায়ের উপর থাক।[১৮৩]

---

[১৮২] মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন সিরিন র.-এর সামনে দুটি বিষয় এলে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েযের অধিক নিকটবর্তী বিষয়কে গ্রহণ করতেন। একবার তিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে খাদ্যশস্য কিনলেন, কিন্তু যখন তাকে এই খাদ্যশস্য সম্পর্কে এমন কিছু জানানো হলো যা তিনি অপছন্দ করেন। তখন তিনি সেগুলো বিক্রি না করে সব সদকা করে দিলেন। তার ছাত্র হিশাম বিন হাসসান বলেন, মুহাম্মদ বিন সিরিন র. এতটুকু কারণে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছেড়ে দিয়েছেন, আজকাল তো তোমরা এটাকে কোনো সমস্যাই মনে করো না।

ইমাম যাহাবিকৃত *তারিখুল ইসলাম*: ৪/১৯৪-১৯৫।

গ্রন্থকার আল্লামা হারেস মুহাসেবি র.-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ৭০ হাজার দিরহাম এ কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার পিতার আকিদার ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল। (সামান্য সন্দেহ। নিশ্চিত কিছু নয়।)

[১৮৩] একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, মিথ্যাবাদী হওয়ার আলামত হলো কেউ কসম করতে না বললেও কসম খাওয়া। কসম না করে থাকা সম্ভব হলে কসম করবে না। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الحَلِفُ حِنْثٌ أَو نَدَمٌ.

কসম হয় ভেঙ্গে যায় না হয় লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়। (*সুনানে ইবনে মাজাহ*: ১/৬৮০, *তারিখে বুখারি*, *মুসতাদরাকে হাকেম*: ৪/৩০৩।)

হকের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ করবে না। বাক্‌নিপুণতার অধিকারী হলেও কথা বেশি বলবে না। দিনের ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিবে না, যদিও তুমি দিনের আলেম হও। কোনো কিছু বলার আগে তা ভালোভাবে জেনে নিবে।[১৮৪]

কারণ কসমকারী হয় কসমের বিপরীত কাজ করে তা ভেঙ্গে ফেলে। যার ফলে সে গুনাহগার হয়। অথবা কসমের উপর অটল থেকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। কসমের উপর অটল থাকতে গিয়ে তাকে হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হয় যা তার করা উচিত ছিল। কিংবা এমন কাজ করতে হয় যা তার করা উচিত নয়, কিন্তু কসমের কারণে সে তা করতে বাধ্য হচ্ছে। কসম করতে গিয়ে সে যদি এভাবে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তা করিনি। অথবা আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তা করব। তাহলে আল্লাহ তায়ালার নামে কসম হয়ে যায়। এখন সে যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে আল্লাহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়। অথবা অনুতাপের অনলে পুরে নিজেকে কষ্ট দেওয়া হয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যথাসম্ভব কসম থেকে বেঁচে থাকা। ভুলে মুখ দিয়ে কসমের কথা বের হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বলে নিবে, তাহলে শপথ ভঙ্গের গুনাহ তার উপর আসবে না। আর এভাবে তার দিন ও কসম উভয়টাই রক্ষা হবে। আর যে আল্লাহ তায়ালার কাছে হেদায়েত চায় আল্লাহ অবশ্যই তাকে হেদায়েত দান করেন।

[১৮৪] কোনো কথা বলা কিংবা কোনো কাজ করার আগে তার হুকুম সম্পর্কে জেনে নেওয়া উচিত।

ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, জেনে রাখো, আমল ইলমের অনুসারী, যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টির অনুসারী। ইলম অনুযায়ী অল্প আমল ইলমবিহীন অধিক আমলের চেয়ে উত্তম। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায়: মরুভূমিতে পথ চলার সময় কারও কাছে সামান্য পাথেয় থাকে। কিন্তু যদি তার রাস্তা জানা থাকে, তাহলে এই সামান্য পাথেয় অধিক পাথেয় নিয়ে অচেনা পথে সফর করার চেয়ে উত্তম। এ কারণে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(হে নবি,) আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?

ইমাম আবু হানিফা র. থেকে এটি আবু মুকাতিল সামারকান্দি র. *রিওয়ায়াতুল ইলম* (পৃষ্ঠা নং ৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমলের মাধ্যমে সৌভাগ্য অর্জনের তিনটি শর্ত
সকল আমলের ক্ষেত্রে কথাগুলো প্রযোজ্য

পবিত্র কুরআনে সুরা ফাতেহার আয়াত:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

অর্থ: আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই। আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। (সূরা ফাতেহা : ৫-৬)

শায়খ ইবনুল কায়্যিম র. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, শরয়ি কোনো আমল সফল ও স্বার্থকভাবে করার জন্য তিনটি শর্ত।

১. বান্দা যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে তার জেনে নেওয়া উচিত, কাজটি আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত কি না। যদি না হয়; তাহলে তা করা যাবে না। তবে যদি এমন বৈধ কাজ হয় যা আল্লাহর আনুগত্যে সহায়ক, তাহলে তা আনুগত্য বলে গণ্য হবে।

২. যখন সে জানতে পারল কাজটি আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত, তখনও সে অগ্রসর হবে না। বরং নিশ্চিতভাবে জেনে নিবে বৈধ এই কাজটি করার দ্বারা আসলে আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে কি না। যদি না হয়, তাহলে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজেকে অপদস্থ করবে না। আর যদি সহায়ক হয়, তাহলেও আরেকটি কথা আছে।

৩. আর তা হচ্ছে, কাজটিকে যথাযথ তরিকায় করতে হবে। যদি যথাযথ তরিকায় না করে, তাহলে সে কাজটিকে নষ্ট করে ফেলবে। কিংবা তাতে কোনো ত্রুটি করবে। অথবা বিদআতের সৃষ্টি করবে।

এই হলো তিনটি শর্ত: ১. আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। ২. আনুগত্যে সহায়ক হতে হবে। ৩. সহিহ তরিকায় হতে হবে। বান্দার সৌভাগ্য ও সফলতা লাভের এই তিনটি হলো মূলনীতি। সুরা ফাতেহার নিম্নোক্ত দুটি আয়াতদ্বয়ের অর্থ এটাই।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

সবচেয়ে সৌভাগ্যবান তারাই যারা এই তিন শর্ত মেনে আমল করে। আর সবচেয়ে দুর্ভাগা তারা যারা তা মানে না। (সূরা ফাতেহা : ৫-৬)

কেউ কেউ শুধু (إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ) ইবাদতের তাওফিক লাভ করে। কিন্তু وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো সাহায্য সে পায় না। পেলেও তা যৎসামান্য। এমন ব্যক্তি হীন, অপদস্থ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত।

আর কেউ কেউ আল্লাহর সাহায্য অনেক লাভ করে। (যেমন তাদের কাছে ধন-সম্পদ, সুস্থতা, ক্ষমতা ইত্যাদি প্রচুর থাকে)। কিন্তু তার ইবাদতের তাওফিক হয় না। হলেও তা খুব সামান্য। এমন লোকদের দুনিয়াতে অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে, তবে এদের শেষ পরিণতি বড়ো মন্দ।

আর কেউ কেউ ইবাদতের তাওফিক এবং আল্লাহর সাহায্য উভয়টাই লাভ করে, তবে সে ইবাদতের সহিহ তরিকা থেকে বঞ্চিত থাকে। (অধিকাংশ সময় হয় বিদআতি কাজে লিপ্ত থাকে কিংবা ইবাদতকে বিদআত বানিয়ে ফেলে)। যেমন অধিকাংশ আবেদ ও যাহেদদের অবস্থা, যাদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুলকে যে হেদায়েত ও সত্য দিন দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার প্রকৃত ইলম কম থাকে।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, আল্লাহর শপথ! এটি একটি মহানীতি। এর উপর নবুয়তের প্রদীপের নুর আছে। প্রত্যেক নেক আমলকারীর নিজের ও উম্মতের সংশোধনের জন্য এটি খুবই প্রয়োজন। সুতরাং তুমি কথাটির শব্দ ও মর্ম দুটোই হৃদয়ে গেঁথে নাও। আল্লাহর হুকুমে এর দ্বারা তুমি অনেক উপকৃত হবে।

ফকিহ বুহলুল কাইরুয়ানির কোনো বিদআতি কাজ করে ফেলার ভয়

আমলের পূর্বে ইলমকে প্রাধান্য দেওয়ার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত আল্লামা কাজি ইয়াজ ইমাম মালেক র.-এর শাগরেদ ইমাম বুহলুল বিন রাশেদ কাইরুওয়ানির জীবনীতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুহলুল ১৮৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। অনেক বড়ো মাপের আবেদ, যাহেদ ও মুত্তাকি ছিলেন।

কাজি ইয়াজ র. তার সম্পর্কে বলেন, একদিন বুহলুল বাড়ি থেকে বের হয়ে শাগরেদদের নিকট গেলেন। তিনি তার কনিষ্ঠাঙ্গুলি হাত দ্বারা ঢেকে রেখেছিলেন। তার স্ত্রী তাকে কোনো কাজের কথা বলেছিল। যাতে ভুলে না যান তাই কনিষ্ঠাঙ্গুলি সুতা দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হলো, আমি কোনো

কষ্ট করে কোনো আমল করার পরও আল্লাহর ভয় রাখো যে, হয়ত তা কবুল হবে না। মানুষের সঙ্গে এমনভাবে চলাফেরা করবে যাতে তোমার দিন হেফাজতে থাকে। কোনোপ্রকার মুদাহানাত অর্থাৎ, তোষামোদি করবে না।[১৮৫]

বিদআত কাজ করছি না তো। তাই তিনি মুষ্ঠি করে আঙুলটি ঢেকে রেখেছিলেন; যাতে কেউ দেখে তার অনুসরণ না করে। তিনি তার এক শাগরেদকে গোপনে ইবনে ফররুখের কাছে পাঠালেন, এ বিষয়ে শরিয়তের হুকুম জানার জন্য। শাগরেদ জেনে এসে তাকে বলল, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এমনটি করতেন। তখন তিনি আঙুল মুষ্ঠির ভেতর থেকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর; যিনি আমাকে ইসলামে বিদআত সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! দেখুন এই মহান ইমাম কোনো কিছু মনে রাখার সুবিধার্থে সুতা বেঁধে রাখা আঙুলকে কীভাবে মুষ্ঠি করে লুকিয়ে রেখেছেন, যতক্ষণ এ বিষয়ে শরিয়তের হুকুম তার জানা না হয়। আর তার মনে এই ভয়ও কাজ করছিল, তিনি কোনো বিদআত বা শরিয়তবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ছেন না তো।

তারতিবুল মাদারেক: ৩/৮৩।

[১৮৫] এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার র.-এর কথার সারসংক্ষেপ হলো: মুদারাত এবং মুদাহানাত শব্দের মাঝে পার্থক্য হলো, মুদারাত হচ্ছে মানুষের সামনে নিজেকে নরম করা। অজ্ঞ ব্যক্তিকে শেখানো, পাপিষ্ঠকে পাপ কাজ থেকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করা এবং এমন কঠোরতা অবলম্বন না করা; যাতে সে নিজের খারাপ চরিত্র প্রকাশ করে দেয়। নম্রভাবে তার দোষগুলো তুলে ধরা। বিশেষ করে যখন সে মহব্বত ও ভালোবাসা পেতে চায়। এগুলো একজন উত্তম চরিত্রবান মুমিনের গুণ, যা অবলম্বন করা তার জন্য মুস্তাহাব।

মুদাহানাত, শব্দটি আরবি দিহান শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থা ভেতরের অবস্থাকে লুকিয়ে ফেলা। (অভিধানে এর একটি অর্থ আছে রং, বার্নিশ। আর আমরা জানি, রং-বার্নিশ এসব কোনো কিছুর উপরে করে তার ভেতরের অবস্থাকে গোপন করে ফেলা হয়। তখন ভেতরের আসল অবস্থা কী তা আর জানা যায় না। (অনুবাদক)

মুদাহানাত শব্দের অর্থ হচ্ছে, ফাসেকের সঙ্গে মেশা ও তার খারাপ বিষয়গুলো ধরিয়ে না দিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। সমর্থন দেওয়া। এটি সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ। *ফাতহুল বারি*: ১০/৪২৮।

মুদারাত এবং মুদাহানাতের মাঝে আরও পার্থক্য হলো, মুদারাত হচ্ছে, দুনিয়াকে দিন কিংবা দুনিয়া, অথবা উভয়টির স্বার্থে ব্যবহার করা। আর মুদাহানাত হচ্ছে, দুনিয়ার স্বার্থে দিনকে ব্যবহার করা।

ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযি রহিমাহুল্লাহ এ দুটি শব্দের পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মুদারাত শব্দের অর্থ হচ্ছে কারও কাছ থেকে নিজের হক আদায় করার জন্য অথবা কাউকে ভ্রান্ত পথ থেকে সরল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তার সঙ্গে স্নেহ-ভালোবাসার আচরণ করা। আর মুদাহানাত হচ্ছে কারও অন্যায়কে স্বীকৃতি দেওয়া অথবা তাকে তার প্রবৃত্তির উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে চাটুকারিতার আশ্রয় নেওয়া। এর উদাহরণ হলো, এক লোকের ফোঁড়া হয়েছে। তখন কোমল হৃদয়ের অধিকারী এক ডাক্তার এসে ফোঁড়াটি ভালোভাবে দেখলেন। তারপর ফোঁড়াকে নরম করে পাকিয়ে এর ভেতরের দূষিত রক্ত-পুঁজ বের করে দিলেন। সেখানে কিছু মেডিসিন দিয়ে দিলেন, যাতে ফোঁড়াটি আর কোনো ক্ষতি না করে একেবারে সেরে যায়। একটি বিশেষ মলম ব্যবহার করলেন যা ফোঁড়ার জায়গায় গোশত ভরে উঠতে সাহায্য করবে। তারপর সেখানে এমন কিছু ছিটিয়ে দিলেন যাতে ভেজা জায়গাটা শুকিয়ে যায়। তারপর পট্টি বেঁধে দিলেন। তারপর লোকটি সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত ডাক্তার নিয়মিত তার খোঁজ-খবর নিতে থাকে। এই ডাক্তার হলো মুদারি।

আর লোকটি মুদাহিন হলে তার সঙ্গীকে বলবে, সামান্য ফোঁড়া। কোনো সমস্যা নেই। তুমি এটিকে পট্টি দিয়ে বেঁধে রাখো, যাতে চোখের আড়ালে থাকে। নজরে না পড়ে। আর এটা নিয়ে চিন্তা করো না। সে তাকে ফোঁড়া গালার বিষয়টিকে ভয় পেতে দেখে এমন পরামর্শ দেয়। এভাবে দিন দিন ফোঁড়াটি পুঁজভর্তি ও বড়ো হয়ে একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তার বিরাট ক্ষতি ডেকে আনে। (ইবনুল কায়্যিম র.কৃত *রুহ:* পৃষ্ঠা নং ২৮১)।

মহান সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একজন মানুষ তার ঘর থেকে দিন নিয়ে বের হয়। তারপর সে গিয়ে এমন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, যার কাছে তার কোনো প্রয়োজন আছে। স্বার্থ আছে। সে তখন তার প্রশংসা করে বলে, আপনি তো এমন ও এমন, কিন্তু প্রশংসা করেও সে তার স্বার্থ হাসিল করতে পারে না। (তার প্রয়োজন পূরণ হয় না।) সে তখন আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে আসে। আর তার সঙ্গে তার দিনের কিছুই বাকি থাকে না।

(দেখুন ইমাম আহমদকৃত *আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল:* ১/২৬৮।)

মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। কোনো বিষয় তোমার জানা না থাকলে 'আল্লাহ অধিক জানেন'- কথাটি বলতে লজ্জাবোধ করো না।[১৮৬] কেউ কথা শুনতে না চাইলে তাকে কথা শোনানোর চেষ্টা করো না। দিনকে তোমার কাছে যে ঘৃণিত করে তুলতে চায় তার সামনে তুমি তোমার দিন পেশ করো না। যে বিপদ মুকাবেলার তোমার সামর্থ্য নেই তা মাথায় নিয়ো না। যে তোমাকে অপমানিত করতে চায় তার সামনে তুমি তোমার সম্মান বজায় রাখো। মন্দ স্বভাব-চরিত্র থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে ভাই বানিয়ো না।

সবার কাছে নিজের গোপন বিষয় প্রকাশ করো না। কারও সামনে তার অবস্থাকে অতিক্রম করো না। তার বোঝার সাধ্যের বাইরে এমন কোনো জ্ঞানের কথা তার সঙ্গে বলো না। যে বিষয় তোমাকে আহ্বান করা হয়নি এমন বিষয়ে নিযুক্ত হয়ো না।

উলামায়ে কেরামের মজলিসকে সম্মান করবে। বিজ্ঞদের মর্যাদা বোঝার চেষ্টা করবে।[১৮৭] অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে কখনো ভুলো না। যদি না পারো তাহলে অনুগ্রহকারীর জন্য দুআ করবে।

---

১৮৬ এই আদব সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে ৩৭ নং টীকায় 'জ্ঞানার্জনের জন্য জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা না করা' শিরোনামে গত হয়েছে। সে অংশটি দেখে নিন।

১৮৭ কত উত্তম আদব! এবং কত সুন্দর আবেদন!
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. তার শায়খ হুশাইম বিন বশির ওয়াসিতির খেদমতে পাঁচ বছর ছিলেন। তিনি বলেন, ভয়ের কারণে (এই পাঁচ বছরে) আমি তাকে মাত্র দুবার কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেয়েছিলাম।

ইমাম আহমদ র.কৃত আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল: ১/১৪৫।

উস্তাযের সামনে বিনয় ও আদব অবলম্বন এবং এক্ষেত্রে পূর্ববর্তীগণের কতিপয় দৃষ্টান্ত

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، و تَعَلَّمُوْا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَ الْوَقَارَ، و تَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ.

তোমরা ইলম শিখো এবং ইলমের জন্য স্থির ও ভাবগম্ভীর হও এবং যার কাছ থেকে ইলম শিখছো তার সামনে বিনয়াবনত হও।

হাদিসটি ইমাম মুনাবির ব্যাখ্যাকৃত *জামে সগিরে* (৩/২৫৩) তাবারানি এবং ইবনে আদির উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে তাবারানি *আওসাতে* এবং ইবনে আদি তার *কামেল* গ্রন্থে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

'যার কাছ থেকে ইলম শিখছো তার সামনে বিনয়াবনত হও' হাদিসের এই অংশবিশেষের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুনাবি বলেন, বিনয়াবনত হওয়া এবং মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা ব্যতীত ইলম অর্জিত হয় না। আর শিক্ষাগুরুর সামনে বিনয়াবনত হওয়া ও নিজেকে ছোটো করার দ্বারা ছাত্রের মর্তবা ও সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং অক্ষমতা প্রকাশ করার দ্বারা গৌরব প্রকাশ পায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও হযরত যায়েদ বিন সাবেত রা.-এর বাহন জন্তুর লাগাম চেপে ধরলেন এবং বললেন, আমরা আমাদের উলামায়ে কেরামের সঙ্গে এমনি আদবপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ পেয়েছি। তখন যায়েদ বিন সাবেত রা. তার হাতে চুমু খেয়ে বললেন, আমরাও আমাদের নবির পরিবার-পরিজনের সঙ্গে এমনি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শনের নির্দেশ পেয়েছি।

সুলাইমি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহিমাহুল্লাহ-কে কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেত না, যাবত না বাদশাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনার মতো তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করা হতো।

ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ-এর সামনে এত আস্তে আস্তে পৃষ্ঠা উল্টাতাম যাতে তিনি তার আওয়াজ শুনতে না পান।

ইমাম শাফেয়ি র.-এর ছাত্র রবি বলেন, ইমাম শাফেয়ি র. তাকিয়ে থাকলে আমি পানি পান করার সাহস পেতাম না।

আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

مَا مَدَدْتُ رِجْلِيْ نَحْوَ دَارِ أُسْتَاذِيْ حَمَّادًا إجْلالاً له، وَ كَانَ بَيْنَ
دَارِيْ وَ دَارِهِ سَبْعُ سِككٍ.وَ مَا صَلَّيْتُ صَلاةً مُنْذُ مَاتَ حَمَّادًا
إِلَّا استغفرتُ له مَعَ وَالِدَيَّ، وَ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ لمن تعلَّمْتُ منه أو
عَلَّمَنِيْ عِلْمًا.

> আমি আমার উস্তায হাম্মাদের সম্মানে কখনো তার বাড়ির দিকে পা বিছাইনি। অথচ আমার ও তার বাড়ির মাঝে সাত কিলোমিটারের দূরত্ব ছিল। হাম্মাদ র.-এর মৃত্যুর পর আমি এমন কোনো নামাজ পড়িনি, যে নামাজের পর আমার পিতা মাতার সঙ্গে আমি তার জন্যও মাগফেরাত কামনা করিনি। আমি যাদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছি কিংবা যারা আমাকে শিখিয়েছেন এমন প্রত্যেকের জন্যেই আমি মাগফেরাত কামনা করি।

ইমাম আবু হানিফা র.-এর ছাত্র আবু ইউসুফ র. বলেন, আমি আমার পিতা মাতার আগে ইমাম আবু হানিফা র.-এর জন্য দোয়া করি। আমি আবু হানিফা র.-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতা মাতার সঙ্গে হাম্মাদ র.-এর জন্যও দোয়া করি।

মুওয়াফফাক খাওয়ারেজমিকৃত মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.: ২/৭।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এর ইমাম শাফেয়ি-এর প্রতি আদব

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. বলেন, গত ত্রিশ বছর যাবৎ আমি প্রতি রাতে আমার উস্তায ইমাম শাফেয়ি র.-এর জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করছি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.-এর ছেলে আবদুল্লাহ র. বলেন, আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, শাফেয়ি র. কে, যার জন্য আপনি অনেক দোয়া করেন? তখন তিনি বললেন, বৎস, শাফেয়ি র. ছিলেন দুনিয়ার জন্য সূর্য এবং মানুষের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। এখন তুমি ভেবে দেখো, এ দুটির কোনো বিকল্প আছে? কিংবা এর পরিবর্তে অন্য কোনো কিছু কাজে আসে?

(খতিব বাগদাদিকৃত *তারিখে বাগদাদ:* ২/৬২,৬৬।)

শিক্ষকের মহান মর্যাদা

ইমাম গাজালি র. শিক্ষককের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, শিক্ষকের হক পিতামাতার চেয়ে বেশি। কারণ, পিতামাতা সন্তানের বর্তমান অস্তিত্ব ও ধ্বংসশীল জীবনের কারণ। আর শিক্ষক-যিনি কল্যাণ ও আখেরাতের পথ দেখান- চিরস্থায়ী জীবনের কারণ। শিক্ষক না থাকলে পিতামাতার কাছ থেকে অর্জিত বিষয় সন্তানকে স্থায়ী ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিত। আর শিক্ষক তো সেই যে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের শিক্ষা দেয়। অথবা দুনিয়ার শাস্ত্র আখেরাতের নিয়তে শিক্ষা দেয়। দুনিয়ার নিয়তে নয়। *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন:* ১/৫৫।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, তাই ইলম শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি জন্মদাতা পিতার চেয়ে অনেক উত্তম।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মাশায়েখ এবং যারা আমাদের শিক্ষা দান করেছেন তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের প্রতি রহম করুন। তাদেরকে আপনার নিকট সম্মানের আসনে বসিয়ে আপনার মহান সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করুন। আপনি আমাদেরকে তাদের সঙ্গে আপনার রহমতের ঠিকানায় একত্র করুন এবং এই গ্রন্থকারের জন্য যে রহমত ও মাগফেরাতের দোয়া করবে তাকে ক্ষমা করুন।

সদাচারের প্রতিদান দেওয়া

সানায়ে এটি সানিয়া শব্দের বহুবচন। অর্থ: অন্যের কাছ থেকে লাভ করা সদাচার। সদাচারের উত্তম প্রতিদান এবং অনুগ্রহের পরিবর্তে অনুগ্রহ করতে ভুলো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ তোমাদের প্রতি সদাচার (বা সদ্ব্যবহার) করলে, তোমরা তার প্রতিদান দিয়ে দাও। যদি প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য দোয়া করো, যতক্ষণ না তোমরা অনুধাবন করতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, *নাসায়ি:* ২৫৬৭, *আবু দাউদ:* অধ্যায়, কেউ আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাইলে তাকে দান করা: হাদিস নং ১৬৭২। গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসের শব্দটি আবু দাউদ শরিফের।

সদাচার বা অনুগ্রহের প্রতিদান এটাও যে, যার কাছ থেকে তুমি ইলম অর্জন করেছো অথবা কোনো উপকার লাভ করেছো তার জন্য দোয়া করা যেমন পূর্বোক্ত

মূর্খদের এড়িয়ে চলো। নির্বোধের আচরণে সহনশীল হও। তোমার যাবতীয় বিষয়ে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো।

মজলুম ভাইকে সাহায্য করো। সে জালিম হলে তাকে ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। তোমার কাছে তার কোনো হক থাকলে তা তাকে প্রদান করো। তার কাছে তুমি তোমার নিজের হক দাবি করো না। ঋণগ্রহীতার সঙ্গে সহজ আচরণ করো। বিধবা ও এতিমদের সঙ্গে কোমল আচরণ করো। ধৈর্যশীল দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্মান করো। সচ্ছল কিন্তু বিপদগ্রস্ত এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে দয়ার আচরণ করো।

আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হওয়ার ভয়ে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের দরজা বন্ধ রাখো।[১৮৮] সুন্দর ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণের দরজা উন্মুক্ত রাখো। নিরাশার মাধ্যমে লোভ লালসার দরজা বন্ধ রাখো। অল্পেতুষ্টির মাধ্যমে অমুখাপেক্ষিতার দরজা উন্মুক্ত রাখো।[১৮৯]

টীকায় আমরা জেনেছি, ইমাম আবু হানিফা তাঁর শায়খ হাম্মাদের জন্য, আবু ইউসুফ তার উস্তায আবু হানিফার জন্য এবং ইমাম আহমদ তার উস্তায ইমাম শাফেয়ির জন্য দোয়া করতেন।

ইমাম শাফেয়ি র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহৎ ব্যক্তি সে যে এক মুহূর্তের ভালোবাসার কথাও মনে রাখে কিংবা যার কাছ থেকে সে একটি শব্দ শিখেছে, শব্দটি উল্লেখ করার সময় সে তার নাম উল্লেখ করে।

(দেখুন *শারহুল বাজুরি আলাস সানুসিয়্যা*।)

[১৮৮] অর্থাৎ, এই ভয়ে তুমি অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকো যে, তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং এই মন্দ ধারণা সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

[১৮৯] কানাআত তথা অল্পেতুষ্টি হচ্ছে সচ্ছলতা, অফুরন্ত ভাণ্ডার, চিরস্থায়ী সম্মান ও মর্যাদা এবং অন্তরের স্থায়ী প্রশান্তি। আর লোভ-লালসা হচ্ছে চিরসঙ্গী ব্যাধি, স্থায়ী দুশ্চিন্তা যা চিত্তকে সবসময় অস্থির ও অশান্ত রাখে। মৃত্যুপর্যন্ত এ থেকে সে নিষ্কৃতি পায় না। অল্পেতুষ্টির ব্যাপারে অনেক হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তা গ্রহণের আহ্বান করা হয়েছে।

তন্মধ্যে একটি হাদিস যা সাহাবি আবু দারদা রা. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى.

যা অল্প ও যথেষ্ট তা সেই সম্পদ থেকে উত্তম যা অধিক ও আল্লাহর যিকির থেকে গাফেলকারী। (*মুসনাদে আহমদ* ৫: ১৯৭।)

জনৈক ব্যক্তি বলেন, তুমি দুনিয়া যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু তোমাকে এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে। এজন্য জ্ঞানীগণ নিজেদের জন্য অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করেছেন। এতে তাদের অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়েছে এবং নিজেদের দিন-ধর্মও সুরক্ষিত থেকেছে।

বসরার অধিবাসী শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী ইমাম হাফেয কবি ও সাহিত্যিক আবুল হাসান আলি বিন আহমদ নুআইমি বাসরি। মৃত্যু ৪২৩ হিজরি। তিনি তার এক প্রসিদ্ধ কবিতায় গর্বের সঙ্গে বলেছেন,

إِذَا أَظْمَأَتْكَ أَكُفُّ اللِّئَامِ   كَفَتْكَ الْقَنَاعَةُ شِبْعاً وَرِيًّا

فَكُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ فِي الثَّرَى   وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِي الثُّرَيَّا

أَبِيًّا لِنَائِلِ ذِي ثَرْوَةٍ   تَرَاهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ أَبِيًّا

فَإِنَّ إِرَاقَةَ الْحَيَاةِ   دُوْنَ إِرَاقَةِ مَاءِ الْمُحَيَّا

ইতর লোকেরা যখন তোমাকে নিরাশ করে দেয়, তখন তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত থাকার জন্য অল্পেতুষ্টিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

তুমি এমন মানুষ হও, যার পা মাটির নিচে থাকলেও মনোবল থাকে আকাশের তারার উচ্চতায়।

ধনীদের দান গ্রহণে যে অনিচ্ছুক। তাদের ধন-সম্পদকে যে ঘৃণা ও করুণার চোখে দেখে।

কারণ জীবনে (পরিশ্রম করে) কপালের ঘাম ঝরানো উচিত। চোখের অশ্রু নয়।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৭/৪৪৭।)

আল্লাহ তায়ালার যিকিরকে মাকরুহ বিষয় থেকে মুক্ত রাখো।[১৯০] সময়কে কাজে লাগাও। তোমার দিন ও রাত তোমার কাছ থেকে যা নিয়ে চলে যাচ্ছে তার মূল্য বোঝার চেষ্টা করো। অর্থাৎ, তোমার জীবন ও সময়।[১৯১]

---

[১৯০] মহান আল্লাহর দিকে কোনো কিছু সম্পৃক্ত করার আদব

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজে দাঁড়িয়ে তাকবির বলার পর এই দোয়া পড়তেন,

لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ، وَالْخَيرُ كُلُّه فِي يَدَيْكَ، وَ الشَّرُّ ليسَ إِلَيْكَ.

> হে আল্লাহ, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, আপনার আনুগত্যের সৌভাগ্য আমি বারবার লাভ করতে চাই। সমস্ত কল্যাণ আপনার পক্ষ থেকেই আসে এবং মন্দ ও খারাপ কিছু আপনার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

ইবনুল আসির নবিজির এই হাদিসাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ, মন্দ ও খারাপ কাজের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না এবং তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করা যায় না। কিংবা মন্দ ও খারাপ কিছু তাঁর পর্যন্ত পৌঁছে না। যেসব কথা ও কাজ ভালো ও মঙ্গলজনক তাঁর কাছে শুধু সেগুলো পৌঁছে।

এই হাদিসের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার আদব সম্পর্কে জানতে পারি। মহান আল্লাহর দিকে শুধু ভালো ও উত্তম বিষয় সম্পৃক্ত করা যাবে। খারাপ ও মন্দ বিষয় সম্পৃক্ত করা যাবে না। এর দ্বারা মন্দ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও ক্ষমতা থাকা না থাকা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, দোয়া করার সময় এই আদবের প্রতি লক্ষ রাখা মুস্তাহাব। তাই আমরা দেখি যে, এভাবে দোয়া করা হয়, হে আসমান ও জমিনের প্রভু! কিন্তু এভাবে নয়, হে কুকুর ও শূকরের প্রভু! যদিও আল্লাহ তাদেরও প্রভু এবং সমস্ত কিছুর প্রভু।

উলামায়ে কেরামের নিকট সময়ের গুরুত্ব, খতিব বাগদাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘটনা

১৯১ সময়কে কাজে লাগাও, নিজের উপকারে আসে কিংবা অন্যের উপকারে-এমন অর্থবহ কোনো কাজ ছাড়া সময়কে এমনি এমনি নষ্ট করো না। বিশেষ করে তুমি যদি তালেবে ইলম হও। কারণ সময়ই হলো তোমার মূলধন। খতিবে বাগদাদি র. হাঁটা-চলা করার সময়ও হাতে কিতাব রাখতেন, যাতে এই সময়টুকুও তার কাজে লাগে। যেমনটি তার জীবনী বর্ণনায় এসেছে। (দেখুন ইমাম যাহাবি র.কৃত *তাযকিরাতুল হুফফাজ*: ৩/১১৪১।)

আবুল ওফা বিন আকিলের বিস্ময়কর ঘটনা

ইমাম আবুল ওফা ইবনে আকিল হাম্বলি র.। জন্ম: ৪৩১ হিজরি। মৃত্যু: ৫১৩ হিজরি। ইসলামের একজন মহামনীষী। জগতের অন্যতম সেরা মেধাবী ও শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি বলতেন, আমি জীবনের একটি মুহূর্তও নষ্ট করা জায়েয মনে করি না। আমার জিহ্বা যখন ইলমি আলোচনা ও মুনাযারা এবং আমার চোখ যখন অধ্যয়ন করা থেকে অবসর থাকে, তখন আমি শুয়ে শুয়ে আমার চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করি। তারপর শোয়া থেকে উঠা মাত্রই আমার মাথায় সেই বিষয়টি চলে আসে যা আমি লিখতে চাচ্ছিলাম। বিশ বছর বয়সে ইলমের প্রতি আমার যে আগ্রহ ছিল, জীবনের এই আশি বছর বয়সে এসে তা আরও বেড়েছে। আমি আরও বেশি আগ্রহ পাচ্ছি।

আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি খাবারে কম সময় লাগানোর জন্য। রুটি গুঁড়ো করে পানিতে গুলিয়ে খাই। কারণ আমি দেখেছি এতে রুটি চিবিয়ে খেতে যে সময় লাগে সে সময়টুকু বেঁচে যায়। এই সময়ে আমি আরেকটু বেশি অধ্যয়ন করতে পারি কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখতে পারি। সকল জ্ঞানীদের নিকট সবচেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে সময়। এটি অনেক বড়ো একটি নেয়ামত, যা কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু করা যায়। অবশ্য জীবনের সমস্যাও প্রচুর।

শায়খ ইবনুল জাওযি র. বলেন, ইমাম ইবনে আকিল সবসময় ইলম হাসিলে মগ্ন থাকতেন। প্রকৃতিগতভাবেই তার ছিল পড়ুয়া মন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে গবেষণা করার মানসিকতা। *ফুনুন* নামক গ্রন্থটিতে তিনি তার বিভিন্ন চিন্তা ও ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি র. বলেন, জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম ইবনে আকিলের অনেক গ্রন্থ আছে। প্রায় বিশটির মতো। তার সর্ববৃহৎ রচিত গ্রন্থ হচ্ছে *ফুনুন*। এটি একটি সুবিশাল গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। যেমন নসিহত, তাফসির, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, উসুলে দিন, নাহু তথা আরবি ব্যাকরণ, ভাষা, কবিতা, ইতিহাস ও বিভিন্ন ঘটনাবলি। আছে তার অংশগ্রহণ করা বিতর্ক ও মজলিশগুলোর আলোচনা। নিজের চিন্তা-দর্শন ও সেগুলোর ফলাফলের কথাও আছে।

হাফেয যাহাবি র. বলেন, পৃথিবীতে এই গ্রন্থের চেয়ে বিশাল কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। কথাটি আমাকে এমন এক ব্যক্তি বলেছেন যিনি গ্রন্থটির চারশর পরবর্তী কোনো একটি খণ্ড দেখেছেন। ইবনে রজব হাম্বলি র. বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলেন, গ্রন্থটি আটশ খণ্ডের।

ইবনুল জাওযি র. বলেন, ইমাম ইবনে আকিলের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসে যখন তার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলো। তখন পরিবারের নারীরা কান্না জুড়ে দিল। তিনি বললেন, আমি পঞ্চাশ বছর- মানুষের জানতে চাওয়া বিভিন্ন ফতোয়ার উত্তর লিখে- আল্লাহর পক্ষ থেকে দস্তখত করেছি। সুতরাং তোমরা এখন আমাকে তাঁর মিলনের সুখ লাভ করতে দাও। মৃত্যুর সময় তিনি তার সংগৃহিত কিতাবাদি ও গায়ের কাপড় ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। এগুলোর মূল্য তার কাফনের কাপড় ও ঋণের সমপরিমাণ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহম করুন। ইলম, দিন ও ইসলামের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ফকিহ আবদুল্লাহ বিন মুবারক উকবারি র. ইমাম ইবনে আকিলের কাছ থেকে ফিকহ অর্জন করেছিলেন। তাই শাফে হাম্বলি র. তাকে উস্তাযের কিতাবগুলো ক্রয় করার পরামর্শ দিলেন। তখন তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে শুধু *ফুনুন* ও *ফুসুল* নামক গ্রন্থ দুটি ক্রয় করেন। তারপর তা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

(হাফেয ইবনে রজবকৃত *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা*: ১/১৪২,-১৬৫, ১৮৫।)

লক্ষ করুন, নিজের মেধাকে কাজে লাগানো, সময়ের হেফাজত করা এবং নিজেকে ভালো ও ইলমি কাজে নিয়োজিত রাখা কী বিরাট সুফল বয়ে আনে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এত বড়ো সুফল। অথচ তা সম্পূর্ণ বাস্তব। একটু কল্পনা করুন, ইমাম ইবনে আকিলের শুধু একটি গ্রন্থই আটশ খণ্ডের। এটা তো মাত্র একটি গ্রন্থের কথা। এছাড়া তার আরও প্রায় বিশটি গ্রন্থ আছে, যার কোনোটি দশ খণ্ডের।

ইলম হচ্ছে পানির ঢলের মতো, যা বিন্দু বিন্দু জমা হয়ে সিন্ধুতে পরিণত হয়।

সিরিয়ার হালব শহরের অধিবাসী ব্যাকরণবিদ ইমাম বাহাউদ্দিন ইবনুন নুহাস: মৃত্যু ৬৯৮ হিজরি। তিনি বড়ো উত্তম ও বাস্তব কথা বলেছেন,

ইলমের শ্রেষ্ঠ কথাগুলো এখান সেখান থেকে কিছু আজ, কিছু কাল এভাবে সংগ্রহ করা হয়।

এভাবে মানুষ হেকমত অর্জন করে। আর বিন্দু বিন্দু জমা হয়েই সিন্ধু হয়।

প্রিয় পাঠক, টীকাটির আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ায় ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে আশা করি, আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তোমাকে সময়ের মূল্য বোঝার তাওফিক দান করবেন। কারণ অজ্ঞ লোকদের নিকট সময় সবচেয়ে মূল্যহীন। আর জ্ঞানীদের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান। সময়ই তাদের জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি এবং জীবনের খুঁটি। আপনি ইমাম আকিলের অবস্থা জেনেছেন, কীভাবে তিনি সময়ের হেফাজত করতেন এবং প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। সময় বাঁচানোর জন্য তিনি রুটি গুঁড়ো করে পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন। এতে তার রুটি চিবিয়ে খেতে যে সময় লাগে, সে সময়টুকু বেঁচে যেত। সে সময়ে তিনি আরও অধ্যয়ন কিংবা কয়েকটি লাইন লিখতে পারেন অথবা ইবাদত করতে পারেন।

এখন তোমাকে ইমাম ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ-এর অবস্থা বর্ণনা করছি। তিনি ইমাম আবুল ওফা ইবনে আকিলের ছাত্রের ছাত্র ছিলেন। ইবনুল জাওযি সময়ের হেফাজতের ক্ষেত্রে তার এমন অনুসরণ করতেন যেন তিনি তার মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তার ঘটনা পড়লে তুমি জানতে পারবে, তিনি সময়কে কত মূল্যবান মনে করতেন এবং তার কাছে কোনো মেহমান কিংবা অলস ও অকর্মণ্য লোকেরা এলে তিনি কীভাবে সময় বাঁচাতেন। ইবনুল জাওযি র. বলেন, মানুষের সময়ের মর্যাদা এবং তার মূল্য বোঝা উচিত। যাতে একটি মুহূর্তও আল্লাহর ইবাদত ছাড়া না কাটে এবং কথা ও কাজের মধ্যে যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটি আগে করতে পারে। তার মাঝে সর্বদা মানব দেহের পক্ষে সম্ভব এমন যে কোনো ভালো কাজ করার নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকবে। এ ক্ষেত্রে তার ভেতর কোনো প্রকারের অলসতা কাজ

করবে না। কারণ হাদিসে এসেছে, মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। পূর্ববর্তীগণের মাঝে অনেকে ছিলেন যারা প্রতিটি মুহূর্তের হেফাজত করতেন। আমের বিন আবদ বিন কায়স-তাবেয়ি, আবেদ ও যাহেদ- থেকে বর্ণিত আছে, এক লোক তাকে বলল, আমার সঙ্গে কথা বলুন। তখন তিনি বলেন, তাহলে তুমি সূর্যকে ধরে রাখো।' (কারণ সূর্যতো থেমে নেই। তার সঙ্গে সময়ও থেমে নেই যে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।)

সাধারণ মানুষকে এমনভাবে সময় নষ্ট করতে দেখি যে আশ্চর্য লাগে। একটু রাত হলে অনর্থক আলাপ-আলোচনায় ও গল্প-গুজবে মত্ত হয়ে যায়। অথবা কবিতা ও গল্পের বই পড়ে। দিবস লম্বা হলে ঘুমিয়ে অথবা দজলা নদীর তীরে কিংবা বাজারে ঘোরাঘুরি করে-ইবনুল জাওযি বাগদাদে বসবাস করতেন, তাই দজলা নদীর কথা বলেছেন-। আমি তাদের উপমা জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে দেব, যারা জাহাজে বসে গল্পে মেতে আছে, আর জাহাজ তাদের নিয়ে এগিয়ে চলছে। অথচ তারা সে সম্পর্কে বে-খবর।

(সময়ও যেন জাহাজের ন্যায়। আর তার উপর চরে বসেছি। আর সে আমাদের নিয়ে একটু একটু করে মৃত্যুর ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ সে সম্পর্কে আমরা বেখবর। আমাদের কোনো অনুভূতি নেই। অনুবাদক)

আমি পৃথিবীবাসীকে দেখেছি, তারা যদিও নিজ গৃহে অবস্থান করছে। মূলত তারা সফরে পথ অতিক্রম করে চলছে। কিন্তু তারা সেটা জানে না।

পৃথিবীতে আমরা জাহাজে আরোহীর মতো। আমরা মনে করি তা থেমে আছে। অথচ সময় আমাদের নিয়ে ঠিকই এগিয়ে চলছে। (আর আমাদের জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে)।

খুব কম মানুষই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। যারা বুঝতে পারে তারা সর্বদা অনন্ত পথে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। জীবনের মুহূর্তগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং সময় শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত তাকে কাজে লাগাও।

অকর্মণ্য লোকদের সঙ্গে মেশা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমি অনেক মানুষকে দেখেছি আমার সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারা এটাকে খেদমত নাম দিয়ে থাকে। এসে দীর্ঘ সময় বসে থাকে। মানুষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনর্থক আলাপ-আলোচনা করতে থাকে, যাতে অনেক সময় গিবত থাকে। এ যুগের অনেক মানুষ এমন কাজে লিপ্ত। অনেক সময় মেজবানও তাদের সঙ্গে শরিক হয়।

তারও এসবে আগ্রহ থাকে। সে নিজের নিঃসঙ্গতাকে এর মাধ্যমে দূর করতে চায়। বিশেষ করে ইদ ও বিভিন্ন উৎসবের দিনগুলোতে এই রোগ অনেক বেড়ে যায়। আপনি তাদের একজনকে অপরজনের কাছে যেতে দেখবেন। তারা গিয়ে যে শুধু সালাম ও অভিবাদনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এর সঙ্গে সময় নষ্ট করার মতো আরও অনেক কিছু যেমন গিবত ও অনর্থক কথার গুনাহে লিপ্ত হয়।

যখন আমি দেখলাম যে সময় সবচেয়ে মূল্যবান ও দামি জিনিস এবং ভালো কাজ করে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। তাই আমি মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া অপছন্দ করলাম। তখন আমি উভয় সংকটে পড়লাম। যদি আমি তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে অপছন্দ করি, তাহলে সম্পর্ক ও ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ব। আর যদি তা না করি, তাহলে সময় নষ্ট হবে। তখন আমি কী করলাম, যথাসম্ভব দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। যখন না পারতাম, প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপে বলে দ্রুত বিদায় জানাতাম। আর সাক্ষাতের এ সময়টুকুও যাতে নষ্ট না হয় তাই আমি এমন কিছু কাজ রেডি করে রাখলাম, যা কথা বলতে বলতে করা যায়। যেমন সে সময় কাগজ কাটা কিংবা কলম বানানো অথবা খাতা-পত্র ঠিক করা-এসব করতে করতে কথা বলতাম। এগুলো প্রয়োজনীয় কাজ। আবার এগুলো করার জন্য আলাদা মনোযোগ দিয়ে করার প্রয়োজন নেই। তাই আমি এসব কাজ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়গুলোতে করার জন্য রেখে দিতাম, যাতে আমার সামান্য সময়ও নষ্ট না হয়।

আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যারা জীবনের অর্থ জানে না। তন্মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, আল্লাহ যাদের এত সচ্ছলতা দান করেছেন যে, উপার্জন করতে হয় না। দিনের অধিকাংশ সময় তারা বাজারে বসে বসে মানুষ কি করে সেসব দেখে। কত বিপদ তাদের পাশ দিয়ে যায়! কত গুনাহ তাদের দ্বারা হয়! অনেকে বসে বসে দাবা খেলে সময় নষ্ট করে। কেউ কেউ সরকার, রাজা-বাদশাহ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতি নিয়ে আলোচনা করে সময় পার করে দেয়। এসব অবস্থা দেখে একটি বিষয় আমি জানতে পারলাম যে, জীবনের দাম ও মূল্য একমাত্র তারাই বুঝতে পারে যাদের আল্লাহ তাওফিক ও জীবনকে কাজে লাগানোর সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। আর তা খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই লাভ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সময়ের মূল্য বোঝার তাওফিক এবং সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন।

প্রতি মুহূর্তে তোমার তাওবাকে নবায়ন করো। জীবনের সময়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে নাও। একভাগ ইলম অর্জনের জন্য। একভাগ আমলের জন্য। আরেকবার নিজের হক ও আবশ্যকীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য।[১৯২] নিজের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহ তায়ালার সামনে

(সাইদুল খাতির: পৃষ্ঠা নং ১/৪৬, ২০১-২০২; ২/৩১৮-৩১৯।)

সময়ের মূল্য বিষয়ের উপর খুব চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত একটি গ্রন্থে আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। গ্রন্থটি মাত্র একশত চল্লিশ পৃষ্ঠার। এর ছয়টিরও অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেখানে উলামায়ে কেরামের সময়ের মূল্যের অনেক বিস্ময়কর ঘটনা তুলে ধরেছি। গ্রন্থটির নাম ক্বি-মাতুয যামান ইনদাল উলামা (উলামায়ে কেরামের নিকট সময়ের মূল্য)। আপনি চাইলে সেটি অধ্যয়ন করে নিতে পারেন।

[১৯২] হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ঘণ্টা আল্লাহর যিকিরে আর এক ঘণ্টা দুনিয়াবি কাজে ব্যয় করতে বললেন। অর্থাৎ, আস্তে আস্তে চেষ্টা করতে বললেন।

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওহি লেখক সাহাবি হযরত হানযালা বিন রবি উসাইদি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাওবা অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করেন,

> 'আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকি, তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনিয়ে দেন, যেন আমরা উভয়টি চাক্ষুষ দেখছি। তারপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে বাড়িতে এসে আপন স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশায় মত্ত হই। তারপর আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে আবু বকর রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে আমার এই অবস্থা তুলে ধরি। তিনি তখন বললেন, আমারও তো তোমার মতো একই অবস্থা।
>
> তখন আমি এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চুপ করো, (অর্থাৎ, এমন কথা বলো না, তা কী? আমি বললাম, আমরা আপনার কাছে থাকি, আপনি আমাদের জান্নাত-

এসেই দুই দলের পরিণতির ব্যাপারে চিন্তা করো একদল যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে জান্নাতে যাবে, আরেকদল যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে জাহান্নামে যাবে। জেনে রাখবে, আল্লাহ তোমার খুবই নিকটবর্তী। তোমার হেফাজতকারী ফেরেশতা ও আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের তুমি

> জাহান্নামের কথা মনে করিয়ে দেন, যেন আমরা তা সরাসরি দেখতে পাই। তারপর আমরা যখন আপনার নিকট হতে বের হই এবং স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের মধ্যে নিমগ্ন হই সে সময় আমরা এর অনেক বিষয় ভুলে যাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন আমি তাঁর কসম করে বলছি। আমার কাছে থাকাকালে তোমাদের যে অবস্থা হয়, যদি তোমরা সবসময় এ অবস্থায় অনড় থাকতে এবং সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকিরে পড়ে থাকতে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। জান্নাত জাহান্নামের আলোচনার সময় তোমাদের অন্তরের যে অবস্থা হয় যদি সর্বদা সে অবস্থা থাকত তাহলে ফেরেশতাগণ রাস্তায় তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করে তোমাদের সালাম করত। কিন্তু হে হানযালাহ! এক ঘণ্টা (আল্লাহর যিকিরে) আর এক ঘণ্টা (দুনিয়াবি কাজে ব্যয় করবে) অর্থাৎ, আস্তে আস্তে (চেষ্টা করো)। এ কথাটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বললেন। (*সহিহ মুসলিম*: ১৭/৬৫।)

এই হাদিসে সর্বদা আল্লাহর যিকির এবং আখেরাতের চিন্তার ফযিলতের কথা জানতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দিনের কিছু কিছু সময়ে এগুলো ছেড়ে দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত হওয়া জায়েয-এ কথাটিও বলা হয়েছে। ইমাম নববিকৃত *শারহু সহিহ মুসলিম*: ১৭/৬৫।

আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, এই হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানো ও বৈধ দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত হওয়া অন্তরে আখেরাতের বিষয়ে গাফলত সৃষ্টি করে। তবে এ গাফলতি সৃষ্টি হওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। এই গাফলতি জায়েয ও শরিয়ত অনুমোদিত। এতে কোনো গুনাহ ও পাকড়াও হবে না। আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক অবগত।

সম্মান করো।[১৯৩] আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহকে জেনে-বুঝে সঠিকভাবে ব্যবহার করো এবং এর জন্য আল্লাহ তায়ালার উত্তম প্রশংসা ও শোকর

---

১৯৩ হেফাজতকারী ফেরেশতাদের হকের প্রতি লক্ষ রাখা

আমি বলি, জি, হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ অধিক সম্মান ও মর্যাদার হকদার। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবেশির হকের প্রতি লক্ষ রাখতে বলেছেন। বুখারি শরিফের হাদিস (৬০১৪)। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিবরাইল আ. আমাকে সর্বদা প্রতিবেশির (হকের প্রতি লক্ষ রাখার) ব্যাপারে অসিয়ত করতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হয়, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশিকে সম্পদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দেবেন। এখানে সেই প্রতিবেশির হকের কথা বলা হয়েছে, তোমার এবং যার বাড়ির মাঝে দেয়াল ও পাথরের আড়াল আছে। তাহলে সেই মহান প্রতিবেশি ফেরেশতার হকের কী অবস্থা, যে সবসময় তোমার দুই কাঁধে থাকে এবং তোমার ভালো ও খারাপ প্রতিটি কাজ তারা প্রত্যক্ষ করে। তোমার উপর এই প্রতিবেশিদের হক আরও অধিক। এদের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখা তোমার আরও অধিক কর্তব্য।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শায়খ ইবনু আবি জামরাহ আন্দালুসি র. বলেন, যখন তোমাকে তোমার বাড়ির প্রতিবেশি, তোমার এবং যার মাঝে দেয়াল আছে, তার হকের ব্যাপারে এত গুরুত্বের সঙ্গে বলা হচ্ছে, তাকে কোনোরূপ কষ্ট না দেওয়া, তাকে সুরক্ষা দান করা ও তার হিতকামনার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তখন তোমাকে হেফাজতকারী সেই ফেরেশতাগণ, তোমার এবং যাদের মাঝে কোনো অন্তরায় নেই, তাদের হকের কী অবস্থা! তুমি সবসময় আল্লাহর নাফরমানি করে তাদের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছ। তাদের হক নষ্ট করছ।

একটু চিন্তা করুন, ফেরেশতাগণের হক নষ্ট করে তুমি কি ইমানের হাকিকত লাভ করতে পারবে? যদি না পারো তাহলে তোমার কি অবস্থা হবে? কারণ, বর্ণিত আছে, বান্দা তার নেক আমলের সওয়াব দেখে কেয়ামতের দিন যতটা খুশি হবে, ফেরেশতারা তা দেখে তার চেয়ে বেশি খুশি হবে। আর বান্দা তার বদ আমলের শাস্তি দেখে কেয়ামতের দিন যতটা কষ্ট পাবে ও দুঃখ ভরাক্রান্ত হবে, ফেরেশতার তা দেখে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাবে ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে।

আদায় করো।[১৯৪] তোমার নফস তোমাকে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তোমার যে মাকাম দেখায় তা দেখে কিংবা মানুষের মুখ থেকে তোমার বুযুর্গির প্রশংসা শুনে

তুমি গুনাহ করে করে তাদের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছ, অথচ এ নিয়ে তোমার মাঝে কোনো লজ্জাবোধ নেই এবং বিরত থাকার কোনো চেষ্টাও নেই। সুতরাং হে নিষ্কর্মা! পর্দা সরে যাওয়ার ও তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই তুমি সতর্ক হও। যখন তুমি নিজে নিজেকে হেফাজত করতে পারছো না এবং তোমার প্রতিবেশিরাও তোমার থেকে নিরাপদ থাকছে না, তখন তোমার থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যাওয়া উচিত, পালিয়ে যাওয়া উচিত, পালিয়ে যাওয়া উচিত।

বাহজাতুন নুফুস ওয়া তাহাল্লিহা বি-মারিফাতি মা-লাহা ওয়া মা-আলাইহা: ৪/১৬৫।

নির্জনেও ফেরেশতাদের দেখার কথা স্মরণে রাখা

বনু শায়বানের প্রতিভাধর ব্যক্তি, মহান তাবেয়ি আবদুল্লাহ বিন মুখারিক তার এক কবিতায় বলেন,

যে একাকী গোপনে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়,

সে কীভাবে নিজেকে একা মনে করে, অথচ তখন আমলনামা লেখার দুজন ফেরেশতা সাক্ষী হিসেবে এবং তার মহাশক্তিধর প্রভু তার সঙ্গে থাকে।

[১৯৪] অন্যকে প্রলুব্ধকারিণী এক সুন্দরী নারীকে উবায়েদ বিন উমাইর মাক্কির দিনের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা

মক্কাবাসীদের মাঝে প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ বিখ্যাত তাবেয়ি উমায়ের মাক্কি। মৃত্যু ৬৮ হিজরি। অত্যন্ত দিনদার সৎকর্মপরায়ণ বুজুর্গ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশুদ্ধ ও মর্মস্পর্শী ভাষার অধিকারী ছিলেন। বিখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মজলিসে বসতেন এবং তার কথা ও বুজুর্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাঁদতে থাকতেন।

একবার এক মহিলা উবায়েদ বিন উমায়ের মাক্কির কাছে এলো। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে মহিলার খুব বড়াই ছিলো। সে তাকে তার সৌন্দর্যের জালে ফাঁসাতে চাচ্ছিল, কিন্তু উবায়েদ তাকে অন্যকে আকৃষ্টকারিণী নারী থেকে মুত্তাকি ও ইবাদতগুজার

নারীতে পরিণত করলেন এবং তার মাঝে আল্লাহর নেয়ামতের অনুভূতি ও তার শুকরিয়া আদায়ের বোধ সৃষ্টি করলেন।

ইজলি র. বলেন, মক্কায় বিবাহিতা এক সুন্দরী নারী ছিল। একদিন সে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে স্বামীকে বলল, আপনি কি মনে করেন, আমার এই চেহারা দেখে কেউ কি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারবে? সে বললো, হ্যাঁ। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, কে?

বলল, উবায়েদ বিন উমায়ের। সে বলল, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করে দেখাবো। লোকটি বলল, ঠিক আছে, অনুমতি দিলাম।

সে তখন মসজিদে হারামে উবায়েদ র.-এর কাছে এসে একটি মাসআলা জানতে চাইলো। তিনি তাকে মসজিদের এক কোণায় নিয়ে গেলেন। আবু আবদুল্লাহ বলেন, তখন মহিলাটি তার চাঁদের মতো সুন্দর চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে ফেলল। এই অবস্থা দেখে উবায়েদ তাকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দি, আল্লাহকে ভয় করো। তখন সে বলল, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। সুতরাং আপনি আমার বিষয়টি ভেবে দেখুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব, যদি তুমি সঠিক উত্তর দাও, তাহলে আমি তোমার বিষয়টি ভেবে দেখব। সে বলল, ঠিক আছে, আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি অবশ্যই আপনার সঠিক উত্তর দেব।

তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আমাকে বল দেখি, মালাকুল মউত যদি তোমার রুহ কবজ করতে আসে, তুমি কি চাইবে যে আমি তোমার এই পাপের ইচ্ছাটি পূরণ করি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, যদি মানুষকে তাদের আমলনামা দেওয়া হয়। আর তুমি জানো না, তোমার আমলনামা তোমার ডান হাতে দেওয়া হবে নাকি বাম হাতে? তখন তুমি কি এতে আনন্দিত হবে যে আমি তোমার মনের এই ইচ্ছাটি পূরণ করি? সে বলল, না। তিনি বললেন, ঠিক বলেছ।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি পুলসিরাত পার হতে চাও, অথচ তুমি জানো না তুমি তা পার হতে পারবে কি পারবে না, তখন আমি তোমার এই চাহিদাটি পূরণ করে দিলে তুমি কি আনন্দিত হবে? সে বলল, আল্লাহর শপথ, না। তিনি বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, মিজানের পাল্লা স্থাপন করার পর যদি

ধোঁকায় পড়ো না।[১৯৫] মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সত্যকে অস্বীকার করো না। এটি প্রাণসংহারক বিষ। আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে মানুষের চোখ থেকে

তোমাকে ডাকা হয়, আর তোমার জানা না থাকে তোমার আমলের পাল্লা হালকা হবে না ভারি, তখন আমি তোমার মনের এই প্রয়োজনটি পূরণ করে দিলে তুমি কি আনন্দিত হবে? সে বলল, আল্লাহর শপথ! না। তিনি বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। তারপর বললেন, যদি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আল্লাহর সামনে তোমাকে দাঁড় করানো হয়, তখন তুমি কি চাইবে আমি তোমার এই নাজায়েয ইচ্ছা পূরণ করে দিই? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

তারপর বললেন, হে আল্লাহর বান্দি, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাকে নেয়ামত দান করেছেন এবং তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন।

আবু আবদুল্লাহ বলেন, তারপর মহিলাটি তার স্বামীর কাছে ফিরে এলো। স্বামী জিজ্ঞেস করল, কী করে এসেছো? মহিলাটি বলল, তুমি অকর্মা, আমরা সবাই অকর্মা। তারপর সে আজীবনের জন্য নামাজ রোযা ও ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেল। তার স্বামী বলতো, আমি উবায়েদ বিন উমায়েরের কী ক্ষতি করে ছিলাম যে, সে আমার স্ত্রীর মাথা এভাবে বিগড়ে দিল? আগে প্রতিদিন রাতে আমাদের বাসর হতো। আর সে এখন একজন সন্ন্যাসিনীতে পরিণত হয়েছে।

ইজলিকৃত *সিকাত*: ২/১১৯।

যিনি বলেছেন বড়ো সত্য বলেছেন

স্বর্ণায়নবিদ্যা তা নয় যা পাথরকে স্বর্ণে পরিণত করে। বরং স্বর্ণায়নবিদ্যা হলো অন্ধকারকে আলোতে রূপান্তর করা।

[১৯৫] **সমরকন্দের পাপিষ্ঠা নারীর বুহলুল কাইরুয়ানের নিকট তওবার ওপর অবিচল থাকার দোয়ার দরখাস্ত**

১. তোমার নফস যদি তোমার মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, তুমি তো আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ মাকাম হাসিল করেছো, সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার নফসকে শাসন করো এবং নফসের এই প্রতারণা ও তোমার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসাবাণীর ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কারণ, এটি আল্লাহর মারেফাত হাসিলকারী ও সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞানীকে ভয়কারীদের অবস্থা নয়।

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহির শাগরেদ মুত্তাকি, আবেদ, যাহেদ বুহলুল বিন রাশেদ কাইরুয়ানি। মৃত্যু ১৮৩ হিজরি। সাদুন বিন আবান দুহইয়ুন বিন রাশেদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মদিনায় ছিলাম, তখন এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, এখানে আফ্রিকার বাসিন্দা কেউ আছেন? আমি বললাম, আমি আফ্রিকার বাসিন্দা। তখন সে বলল, কাইরুয়ানের অধিবাসী? আমি বললাম হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি বুহলুল বিন রাশেদকে চিনো? জি হ্যাঁ। তখন সে আমার কাছে একটি চিঠি দিয়ে বলল, চিঠিটি তুমি তার কাছে পৌঁছে দেবে। আমি চিঠিটি তার কাছে পৌঁছে দিলাম। তিনি চিঠি খুললেন। তাতে লেখা দেখলেন, এক নারীর পক্ষ থেকে যে খোরাসানের শহর সমরকন্দের অধিবাসিনী।

আমি এমন এক নারী যে জীবনে সবচেয়ে বেশি পাপ করেছে। তার মতো এত পাপ আর কেউ করেনি। তারপর আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে তওবা করেছি। অনেকভাবে জমিনে আল্লাহর ইবাদতগুজার বান্দাদের খোঁজ করেছি। তখন তারা আমাকে চারজনের নাম বলেছে, তাদের একজন ছিল আফ্রিকার অধিবাসী বুহলুল। হে বুহলুল! আল্লাহর ওয়াস্তে আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি, আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করবেন, তিনি যেন আমাকে এই তওবার উপর অটল অবিচল থাকার তাওফিক দান করেন।

দুহইয়ুন বিন রাশেদ বলেন, তখন চিঠিটি তার হাত থেকে পড়ে গেল। আর তিনি জমিনে উপুড় হয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এত কাঁদলেন এবং এত কাঁদলেন যে, চোখের জলে ভিজে যাওয়া মাটির সঙ্গে চিঠিটি লেপ্টে গেল। তারপর তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে বুহলুল! খোরাসানের শহর সমরকন্দেও তোমার আলোচনা হয়! আল্লাহর শপথ! কেয়ামতের দিন যদি তিনি তোমার দোষ ত্রুটি ঢেকে না রাখেন তাহলে তো তুমি ধ্বংস। নিজের মর্যাদা দেখে আল্লাহর প্রতি তার ভয় আরও বেড়ে গেল।

সুবহানাল্লাহ! তিনি কত বড়ো জ্ঞানী ছিলেন এবং মারেফাতের কত উচ্চ স্তরে তাঁর বিচরণ ছিল।

(তথ্যসূত্র: আবুল আরাবকৃত *তাবাকাতু উলামায়ে ইফরিকিয়্যাহ ও তিউনিস*: ১৩০ নং পৃষ্ঠা, আল্লামা কাজি ইয়াজকৃত *তারতিবুল মাদারিক*: ৩/৮৯, দাব্বাগ এবং ইবনু নাজিকৃত *মাআলিমুল ইমান*: ১/২৬৭।)

পড়ে যাওয়ার ভয় থেকে দূরে থাকো। দারিদ্র্যের ভয় থেকে দূরে থাকো। কারণ মৃত্যু তোমার খুবই নিকটবর্তী। যথাসম্ভব তোমার ভেতরের নেক কাজের চিহ্নকে গোপন রাখো।[১৯৬]

---

[১৯৬] পূর্ববর্তীগণের নেক আমল গোপন রাখার প্রচেষ্টা

২. তোমার নেক আমলসমূহকে যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করো যাতে ইখলাস ও আল্লাহ তায়ালার কাছে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এখন তোমার সামনে দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

এক. ইবনে সাদ বিখ্যাত তাবেয়ি ইরাকের ফকিহ ইবরাহিম নাখয়ি রহমতুল্লাহি আলাইহির জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ফযল বিন দুকাইন আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া বিন আবদুল্লাহ ইয়ামামি আমাকে বর্ণনা করেন, তাকে তালহা বর্ণনা করে বলেন, মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়তো তখন ইবরাহিম নাখয়ি সুন্দর একটি জামা পড়ে সুগন্ধি লাগাতেন। তারপর ভোর পর্যন্ত অথবা আল্লাহ যতক্ষণ চান ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মসজিদে গিয়ে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ভোর হতেই তিনি সেই পোশাক খুলে অন্য পোশাক পড়ে নিতেন। (তাবাকাতে কুবরা: ৬/২৭৬।)

হাফেয যাহাবি রহমতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মানসুর বিন মুতামার সুলামি কুফি- মৃত্যু ১৩২ হিজরি-তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মানসুরের শাগরেদ যায়েদা বিন কুদামা বলেন, মনসুর ৪০ বছর পর্যন্ত রোযা রেখেছেন এবং রাত জেগে ইবাদত করেছেন। তিনি সারারাত ক্রন্দন করতে থাকতেন। ভোর হতেই চোখে সুরমা, ঠোঁটে ও চুলে তেল লাগিয়ে নিতেন। তাঁর আম্মা তাকে এমন করতে দেখে বলতেন, তুমি কি কাউকে হত্যা করেছ? (অধিক ক্রন্দন, ভয় এবং আল্লাহর ইবাদত করার কারণে তিনি তাকে এই কথা বলতেন)। উত্তরে তিনি বলতেন, আমার নফসেরকৃতকর্ম সম্পর্কে আমি অধিক অবগত।

অধিক ক্রন্দনের ফলে তার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল।

তার ইন্তেকালের পর এক মেয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, মানসুরের ঘরে যে খুঁটিটি ছিল সেই খুঁটিটি কোথায় গেলো? বাবা বললো, মা আমার, তুমি যা দেখেতে তা কোনো খুঁটি ছিল না। বরং মানসুর সারা রাত তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। তিনি মারা গিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

কেউ কোনো বিষয়ে তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে খুব চেষ্টা করবে ভালো পরামর্শ দেওয়ার। কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর ওয়াস্তে দৃঢ়ভাবে ভালোবাসবে। সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহর ওয়াস্তে সতর্কতার সঙ্গে ছিন্ন করবে।[১৯৭]

لَو رأَيْتَ منصُوْرًا يُصَلِّ، قُلْتَ: يَمُوْتُ السَّاعَةَ.

> তুমি যদি মানসুরকে নামাজ পড়তে দেখতে তাহলে বলতে সে এখনই মারা যাবে।

(*তাজকিরাতুল হুফফাজ* প্রথম খণ্ডের ১৪২ নং পৃষ্ঠা।)

মানসুর বিন মুতামারের নামাজ সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরির এই উক্তিটি ৯৪ নং পৃষ্ঠায় গত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তার ভয়ে ভীত ও গোপনে আমলকারী এ সকল মুমিনদের উপর রহম করুন। তারা দুনিয়াতে যদিও মহান প্রভুর ভয়ে ভীত ছিলেন। কিন্তু আখেরাতে তাঁর দিদার লাভ করে প্রশান্ত ও আনন্দিত। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, আর তিনিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

[১৯৭] 'আযম' এবং 'হাযম' শব্দদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য

'আযম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শক্তি, ধৈর্য, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কোনো কাজ করার ইচ্ছা অথবা নিয়ত। আর 'হাযম' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিলম্ব করলে ছুটে যেতে পারে এই আশঙ্কায় কোনো কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার পর দ্রুত তা করে ফেলা।

আল্লাম ইবনুল আসির বলেন, হাযম অর্থ হচ্ছে, কোনো কাজ সুষ্ঠুরূপে করা ও তা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করা। আযম অর্থ হচ্ছে, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ধৈর্য ও শক্তি।

(দেখুন আন-নিহায়াহ ফি গরিবিল হাদিস ওয়াল আসার।)

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাযম। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযম।

> হাদিসে আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রা.-কে বলেন, তুমি বিতর নামাজ কখন পড়? তিনি বললেন, রাতের প্রথমাংশে-অর্থাৎ, ঘুমানোর আগে-। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বিতর কখন পড়? তিনি

বললেন, রাতের শেষাংশে-অর্থাৎ, শেষ রাত্রিতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে-। তখন তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তুমি হাযম (সতর্কতা) অবলম্বন করেছো। আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তুমি আযম (শক্তভাবে ধারণ) করেছো।

নবিজির এ কথার উদ্দেশ্য ছিল, আবু বকর রা. ঘুমের কারণে শেষ রাত্রে যাতে বিতর ছুটে না যায়, তাই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে ঘুমানোর আগেই পড়ে নিয়েছিলেন। আর হযরত উমর রা.-এর মাঝে আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি শেষ রাত্রে উঠতে পারবেন। তাই তিনি শেষ রাত্রে পড়েছেন। হাযম ছাড়া আযমের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। কারণ শক্তির সঙ্গে যদি সতর্কতা অবলম্বন না করা হয়, তাহলে তা মানুষকে বিপদে ফেলে দেয়।''

(*আন-নিহায়াহ ফি গরিবিল হাদিস ওয়াল আসার*।)

আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-থেকে উল্লিখিত হাদিসটি *আবু দাউদ শরিফে* (২/৮৯) ঘুমানোর আগে বিতর পড়া অধ্যায়ে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي بَكْرٍ "مَتَى تُوتِرُ" قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ . وَقَالَ لِعُمَرَ "مَتَى تُوتِرُ" . قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ . فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ "أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ" . وَقَالَ لِعُمَرَ "أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ" .

আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

একদা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, বিতর নামাজ তুমি কোন সময়ে আদায় করো? তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথমাংশে বিতর আদায় করি। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিতর কোন সময়ে আদায় করো? তিনি বললেন, আমি বিতর শেষ রাতে আদায় করি।

অতঃপর তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, সে সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে।

মুত্তাকি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানিয়ো না।[১৯৮] আলেম ছাড়া কারও সাথে উঠাবসা করো না। জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান ছাড়া কারও সাথে মিশো না। পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরামকে অনুসরণ করো। পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দান করো। মুত্তাকিদের ইমাম হও। পথসন্ধানীদের জন্য হও পথের দিশারী। কারও কাছে কোন অভিযোগ করো না। দিনের বিনিময়ে দুনিয়া ভোগ করো না।[১৯৯]

ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও তার মুয়াত্তায় অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন। দেখুন ইমাম যুরকানির ব্যাখ্যাসহ মুয়াত্তা মালেক: ২/৮৯।

'وَأَحَبُّ فِي اللهِ بِعَزْمٍ وَاقْطَعُ فِي اللهِ بِحَزْمٍ' গ্রন্থকার ইমাম হারেস আল-মুহাসেবি র.-এর এই উক্তিটি দ্বারা তার উদ্দেশ্য, তুমি যাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসো তার প্রতি তোমার ভালোবাসা শক্তিশালী, অকৃত্রিম ও দৃঢ় হতে হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যদি কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো, তাহলে তা হতে হবে কঠোরতা, দ্রুততা ও সতর্কতার সঙ্গে। যাতে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে কোনোরূপ শিথিলতা ও অলসতা দেখা না দেয়। এভাবে যদি করতে পারো, তাহলে তা তার জন্য আল্লাহর নাফরমানি থেকে সতর্ক ও শাসনকারী হবে। আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক অবগত। এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যেত। তবে এখানে আর নয়।

[১৯৮] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিন ছাড়া অন্য কাউকে তোমার সঙ্গী বানাবে না। আর শুধু মুত্তাকি ব্যক্তিরাই যেন তোমার খাবার আহার করে।

(আবু দাউদ : ৪/২৫৯; তিরমিযি: ৯/২৪২। ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি একটি হাসান হাদিস।)

[১৯৯] কায়রুয়ানের অধিবাসী ফকিহ বুহলুল –এর তাকওয়ার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত

এখন তোমার সামনে সে সমস্ত লোকদের মধ্য থেকে একজনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরব, যারা দিনকে পুঁজি করে দুনিয়া অর্জন করেননি। আল্লামা কাজি ইয়াজ র. ইমাম মালেক র.-এর শাগরেদ ইমাম বুহলুল বিন রাশেদ কাইরুয়ানির জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বুহলুল তার কোনো এক সাথীকে দুই দিরহাম দিয়ে বাজারে পাঠালো তার জন্য যাইতুনের মিষ্টি তেল কিনে আনার জন্য। তাকে কেউ একজন

নির্জনবাসের জন্য নিজের কিছু সময় রেখো।[২০০] হালাল ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না।[২০১] অপচয় থেকে দূরে থাকো এবং প্রয়োজন পরিমাণে দুনিয়াতে তুষ্ট থাকো।

বলেছিল, এক খৃষ্টান ব্যক্তি আছে, তার কাছে সবচেয়ে মিষ্টি যাইতুন তেল আছে। সে তখন দুই দিনার নিয়ে তার কাছে গেল এবং তাকে বলল, সে বুহলুলের জন্য মিষ্টি যাইতুন তেল কিনতে এসেছে। তখন খৃষ্টান ব্যক্তিটি বলল, যেভাবে তোমরা বুহলুলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ করো, সেভাবে আমরাও তার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করি। এ কথা বলে সে দুই দিনারের বিনিময়ে চার দিনার সমপরিমাণ তেল দিয়ে দিল। তেল নিয়ে সেই সাথী বুহলুলের নিকট এলো। তারপর তাকে ঘটনাটি বলল। তখন বুহলুল তাকে বলল, তুমি আমার একটি কাজ করে দিয়েছো। এখন আমার আরেকটি কাজ করে দাও। সেই দুই দিনার ফিরিয়ে নিয়ে এসো। (আর তেল ফিরিয়ে দিয়ে এসো। সে (বিস্ময় নিয়ে) জিজ্ঞাসা করল, কেন? বললেন, আমার আল্লাহ্ তায়ালার এই আয়াতটি স্মরণে এসেছে,

> অর্থ: তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচারীগণকে।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই যাইতুন তেল খেলে আমার অন্তরে সেই খ্রিষ্টানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর এভাবে আমি সামান্য পার্থিব লাভের জন্য তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী।' সুবহানাল্লাহ! দিনের প্রতি তারা কতটা আগ্রহী ছিলেন!

২০০ প্রশংসনীয় নির্জনতা

সমস্ত মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে নির্জনবাস অবলম্বন করা শুধু অসম্ভবই নয়। বরং শরিয়তবিরোধী। কারণ সৃষ্টিগতভাবে মানুষ সামাজিক জীব। তার পক্ষে সম্পূর্ণ একাকী জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। তবে কিছু সময় নির্জনবাস আর কিছু সময় মানুষের সংস্পর্শে আসা, এভাবে হতে পারে। খারাপ সময়ে কিংবা ফেতনার যুগে এমনটি করা ভাল। এ সময় মানুষ শুধু এমন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গে মিশবে যাদের সঙ্গে মেশার দ্বারা তার দিনের উপকার হয়। দিনের উপর চলা তার জন্য সহজ হয়। সেও তাদের দ্বারা উপকৃত হবে আর তারাও তার দ্বারা উপকৃত হবে। গ্রন্থকার র. নির্জনতা অবলম্বনের কথা বলে এটাকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযির নির্জনতা

ইমাম ইবনুল জাওযি র. তার মূল্যবান ও উপকারী গ্রন্থ সাইদুল খাতিরের বিভিন্ন জায়গায় এই নির্জনতার কথাই বলেছেন।

যে নিজের মনোযোগকে কেন্দ্রী ভূত এবং অন্তরকে সংশোধন করতে চায়, বর্তমান যুগে তার উচিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কম করা। (ইবনুল জাওযি র. এ কথাটি আজ থেকে আটশ বছর আগে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দিতে বলেছেন)। কারণ অতিতে-সালাফদের সময়ে-মানুষ কল্যাণকর বিষয়ে একত্র হতো। আর এখন ক্ষতিকারক বিষয়ে হয়।

আমি আমার নিজের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, কোনো একটি ঘরে যখন আমি নিজেকে আবদ্ধ করে নিই, তখন আমার মনোসংযোগ ঘটে। সেই সময় যদি আমি পূর্ববর্তীগণের জীবন চরিত অধ্যয়ন করি, তখন নির্জনতাকে আমার আত্মসংযম এবং জীবনচরিত অধ্যয়নকে (আত্মার ব্যাধির) ঔষধ মনে হয়। আর লোকদের সঙ্গ থেকে নিজেকে নিরাপদ রেখে ঔষধ গ্রহণ করা খুবই কার্যকরী।

আমি যখন সাক্ষাৎ ও মেলামেশায় মানুষকে পর্যাপ্ত সময় দেই তখন আমার মন আবার বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। আমি চিন্তাগত বিচ্ছিন্নতার শিকার হই। যেসব বিষয় থেকে এতদিন বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছি, সেসব বিষয়ে অলসতা দেখা দেয়। চোখে যা দেখি এবং কানে যা শুনি তার চিত্র অন্তরে আঁকা হয়ে যায়। আমি গভীর থেকে আরও গভীরে চলে যাই। অন্তরে সেসব দুনিয়াবি জিনিস লাভের আগ্রহ তৈরি হয়। মানুষ যাদের সঙ্গে মিশে তাদের অধিকাংশ যদি আখেরাতের বিষয়ে গাফেল হয়, তাহল তার প্রকৃতি তার অজান্তেই তাদের স্বভাব প্রকৃতি গ্রহণ করে নেয়।

এরপর আমি যখন চিন্তা-ভাবনাকে একত্র করতে চাই, তখন তা আর হয়ে উঠে না। অন্তরের উপস্থিতি খুঁজতে গিয়ে কোথায় যেন তাকে হারিয়ে ফেলি। কারণ, অন্তরের গভীরে মানুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রভাব কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কুপ্রবৃত্তি তৃপ্ত না হয়। সুতরাং শুধু ভেঙ্গে ফেলার জন্য ভবন নির্মাণ করে কী লাভ? কারণ, ধারাবাহিক নির্জনতা ভবনের মতো। সালাফের জীবন চরিত অধ্যয়ন তাকে উচ্চতা দান করে। মানুষের সঙ্গে মিশলে এই ভবন মুহূর্তে এমনভাবে ধসে পড়ে, যা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। অন্তর তখন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইবাদত, যুহদ এবং আখেরাতের কাজে মশগুল হওয়া তখনই স্বচ্ছ ও নির্মল হয় যখন মানুষ সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। আর তা এভাবে যে, সে প্রয়োজন

ছাড়া তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলবে না। যেমন জুমুআ বা জামাতে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময়। তখনও তাদের পরিহার করে চলতে হবে। আর যদি সে এমন কোনো আলেম হয়, যার কথার দ্বারা মানুষের উপকার হয়, তাহলে তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে নেবে। সে সময়েও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করতে হবে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে উপভোগ্য জীবন তার, যে সমস্ত পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে জ্ঞানমগ্ন থাকে। ইলমই তার সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। এমন কিছু বৈধ কাজে সে সন্তুষ্ট থাকে যেগুলো করতে তেমন কোনো কষ্ট হয় না এবং তার দিনও হেফাজতে থাকে, নষ্ট হয় না। দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীদের সামনে অপদস্থ না হয়ে নিজের গায়ে ইজ্জত ও সম্মানের পোশাক চরিয়ে রাখে। অধিক সম্পদ হাসিলে সক্ষম না হলে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে।

নিজেকে এভাবে পবিত্র রাখার দ্বারা তার দিন ও দুনিয়া উভয়টিই নিরাপদ থাকে। সেই সঙ্গে তার জ্ঞানমগ্নতা তাকে কল্যাণের দিশা দান করে এবং তার সামনে বিভিন্ন বাগানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। নির্জনবাসের কারণে সে শয়তান, সুলতান ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে। তবে আলেম ছাড়া অন্য কারও তা অবলম্বন করা উচিত নয়। কারণ অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তি নির্জনবাসে গেলে, ইলম থেকে বঞ্চিত হবে এবং পথ হারিয়ে ফেলবে। এমন নির্জনবাস কত অজ্ঞ ব্যক্তিকে দিনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা থেকে বঞ্চিত রেখেছে এবং এমন বিপদে নিয়ে ফেলেছে, যার ফলে তার দিন নষ্ট হয়ে গেছে। তবে দুনিয়ার খারাবি থেকে নিজেকে পৃথক রাখাটা ফলদায়ক।'

(*সাইদুল খাতির*: পৃষ্ঠা নং ১৩২,৩৫৩,৩৭৩,৩৯৮।)

হালাল খাওয়ার ফায়েদা

[২০১] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অন্তর কিসের দ্বারা নরম হয়? তিনি বললেন, হালাল খাওয়ার দ্বারা।

(ইবনু আবি ইয়ালাকৃত তাবাকাতুল হানাবিলাহ: ১/২১৯।)

সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি সিদ্দিকগণের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে চায় সে যেন হালাল ছাড়া অন্য কিছু না খায় এবং শুধু সুন্নতের উপর আমল করে।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. বলেন, সন্দেহের কারণে এক দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়া আমার কাছে এক লক্ষ দিরহাম সদকা করার চেয়ে অধিক উত্তম।

ইলমের বাগানসমূহে আদব তালাশ করো।[২০২] নির্জনে অন্তরঙ্গতা লাভ করো। ইয়াকিন অবিশ্বাসের শাখাসমূহে লজ্জা অন্বেষণ করো। চিন্তার উপত্যকায় শিক্ষা এবং আল্লাহর ভয়ের উদ্যানসমূহে প্রজ্ঞা অর্জন করো।

পূর্ববর্তীগণের স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের বলতেন আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন আমাদের হারাম খাওয়াবেন না

পূর্ববর্তীগণের স্ত্রীগণ তাদের স্বামীরা যখন উপার্জনের জন্য বাইরে যেতেন, তখন তাদের বলতেন, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আমাদের হারাম কামাই খাওয়াবেন না। কারণ আমরা ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করে নিতে পারব। কিন্তু জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারব না।

ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: বিয়ে-শাদি অধ্যায়ের শেষের দিকে।

মহান তাবেয়ি ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাউকে বিদায় জানানোর সময় বলতেন, আল্লাহকে ভয় করবে, আর আল্লাহ তোমার জন্য যে হালাল রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন, শুধু তা তালাশ করবে। কারণ, যদি হারাম গ্রহণ করো, তাহলে তাকদিরে যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশি পাবে না।

ইবনে সাদকৃত তাবাকাতে কুবরা : ৭/২০১।

তাকওয়া ও যুহদের ইমাম বিশর হাফি র. বলেন, দশজন মানুষ ছিলেন যারা শুধু হালাল খেতেন, হালাল ছাড়া তাদের পেটে অন্য কিছু প্রবেশ করতো না, যদিও তাদের মাটি খেতে হতো। ফুযাইল বিন ইয়াজ তাদের একজন।

(হাফেয ইবনে হাজারকৃত *তাহযিবুত তাহযিব*: ৮/২৯৬।)

[২০২] সমস্ত বাগানের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বাগান হলো কুরআনের বাগান। বিখ্যাত আবেদ ও যাহেদ মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন ওয়াসি বাসরি র. বলেন, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর মারেফাত হাসিলকারীদের বাগান। তারা যেখানেই অবতরণ করুক, যেন আনন্দ পেতে থাকে।

(আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া*: ২/৩৪৭।)

আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি কাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহ অনবরত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে যাচ্ছেন এ বিষয়টি জেনে রাখো। আরও জেনে রাখো, তুমি তাঁর যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও তিনি তোমার প্রতি সহনশীল। তাঁর সঙ্গে তোমার নির্লজ্জ আচরণ করা সত্ত্বেও তিনি তোমার দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছেন[২০৩] এবং তাঁর প্রতি তুমি মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তোমার প্রতি অমুখাপেক্ষী।

নিজের রবকে চিনে এমন ব্যক্তি কোথায়? নিজের গুনাহ নিয়ে ভীত এমন ব্যক্তি কোথায়?[২০৪] আল্লাহর নৈকট্য লাভে আনন্দিত এমন ব্যক্তি কোথায়?

---

[২০৩] **আল্লাহর নাফরমানির দুর্গন্ধ এবং তাঁর আনুগত্যের সুগন্ধি**

৩. নিশ্চিতরূপে জেনে রাখো যে, আল্লাহর নাফরমানি তথা গুনাহ হচ্ছে বিষ, যা সবসময় ক্ষতি করে। কি বেশি আর কি অল্প! কি ভেতর আর কি বাহির! সুতরাং বিভিন্ন কৌশল করে তা গোপন রাখার ধোঁকায় পড়ো না। কারণ আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্যের চোখ সর্বদা তোমাকে দেখছে।

এ কথাও খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতের সুগন্ধি আছে, যা গোপন করা হলেও বান্দার কাছে এলে তার সুগন্ধ পাওয়া যায়। তেমনি আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহেরও দুর্গন্ধ আছে, যা লুকিয়ে রাখলেও তার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। গুনাহ ও ভ্রষ্টতার কোনো পথ ছাড়লে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছাড়ো, কোনো মানুষের জন্য নয়। তাহলে তুমি এর প্রতিদান পাবে। হাদিস শরিফে আছে, বান্দা যখন কোনো গুনাহ করার ইচ্ছা করে, তা-আল্লাহর ভয়ে-না করে, তখন এর সওয়াব তাকে প্রদান করা হয়।

[২০৪] তাবারানি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জাহান্নাম ও জান্নাতের অনুরূপ আর কিছু দেখিনি, জাহান্নাম থেকে যার পলায়ন করার কথা সে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর জান্নাতকে যার তালাশ করার কথা, সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

হাইসামি *মাজমাউয যাওয়ায়েদ* (১০/২৩০) বলেন, এই হাদিসের সনদ হাসান।

আল্লামা মুনাবি র. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন খুবই ভীষণ। অথচ এর থেকে মানুষ না পালিয়ে ঘুমিয়ে আছে। গাফলতে ডুবে আছে।

আল্লাহর যিকিরে মশগুল এমন ব্যক্তি কোথায়? আল্লাহর সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে শঙ্কিত এমন ব্যক্তি কোথায়? যে দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আছে তার জন্যই তো ক্ষমা হে প্রতারিত, তুমি যখন গুনাহের সমস্ত পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছো সেই মহান সত্তা কি তোমাকে দেখেনি?

আমার প্রিয় ভাই, জেনে রাখো, গুনাহ মানুষের মাঝে উদাসীনতা সৃষ্টি করে[২০৫] আর উদাসীনতা নির্দয়তা সৃষ্টি করে আর নির্দয়তা মানুষকে আল্লাহ

একজন পলায়নকারীর কাজ এটা নয়। বরং তার কাজ হলো, আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহ থেকে পালিয়ে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে ফিরে আসা। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্চর্য প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, একদিকে জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা, অপরদিকে তা থেকে পলায়ন না করে মানুষের ঘুমিয়ে থাকা, গাফলতে ডুবে থাকা, বেপরোয়া আচরণ করা বড়ো আশ্চর্যের!

জান্নাতের অবস্থাও অনুরূপ। একদিকে জান্নাতের নায-নেয়ামত, অপরদিকে তা লাভের চেষ্টা না করে মানুষের ঘুমিয়ে থাকা, গাফেল থাকা।

২০৫ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমার বিশ্বাস, মানুষ তারকৃত গুনাহের কারণে তার শিক্ষা করা ইলম ভুলে যায়। -ইবনে আবদুল বারকৃত *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*: ১/১৯৬।

কোনো মাসআলা জটিল হয়ে গেলে ইমাম আবু হানিফা র.-এর ইস্তেগফার করা অথবা নামাজে মশগুল হওয়া

ইমাম আবু হানিফা র.-এর সামনে কোনো মাসআলা যখন জটিল হয়ে যেত এবং তার সমাধান বের হত না তখন তিনি সাথীদের বলতেন, আমি নিশ্চিত, আমার কোনো গুনাহের কারণে এমনটি হচ্ছে। তিনি তখন ইস্তেগফার করতেন, কখনো কখনো নামাজে মশগুল হয়ে যেতেন। তারপর সমাধান বের হওয়ার পর বলতেন, আশা করি আমার তওবা কবুল হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহিআলাই হির এই আমলের কথা যখন হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌঁছল, তখন তিনি ভীষণ কাঁদলেন এবং বললেন, এটা তার গুনাহ কম হওয়ার প্রমাণ। অন্যরা তো এদিকে ভ্রুক্ষেপও করে না।- মোল্লা আলি কারি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকৃত *তাবাকাতে হানাফিয়্যাহ*: ২/৪৮৭।

থেকে দূরে সরিয়ে দেয় আর আল্লাহ থেকে দূরত্ব মানুষকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়। আর এসব বিষয় নিয়ে যারা প্রকৃত অর্থে জীবিত তারা চিন্তা ফিকির করে। আর প্রকৃত মৃত তো তারাই যারা দুনিয়ার ভালোবাসা দিয়ে তাদের অন্তরকে মেরে ফেলেছে।[২০৬]

বিখ্যাত ইমাম ও হাফিযে হাদিস ওয়াকি ইবনুল জাররাহ আলকুফি রা. সম্পর্কে হযরত ইসহাক ইবনে রাহুইয়া রহমাতুল্লাহিআলাই হি বলেন, মানুষ কষ্ট করে মুখস্থ করে, কিন্তু তার মুখস্থ হয়ে যায় স্বভাবগত স্মৃতিশক্তির কারণে। আলি ইবনে খাশরাম র. বলেন, আমি ওয়াকি-এর হাতে কোনোদিন কিতাব দেখিনি। কিতাব ছাড়াই তার সব মুখস্থ হয়ে যেত। আমি তাকে এ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির রহস্য জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা। স্মৃতিশক্তির পক্ষে এর মতো কার্যকর আমি আর কিছু দেখিনি।

ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার এক কবিতায় এ কথাটিই বলেছেন,

আমি ওয়াকি রহিমাহুল্লাহর নিকট স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তখন তিনি আমাকে গুনাহ ছেড়ে দিতে বললেন। আর বললেন, ইলম হচ্ছে নুর। আর আল্লাহ তার নুর কোনো গুনাহগারকে দান করেন না।

[২০৬] নেক আমল ও বদ আমলের প্রভাব সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াআল্লাহু আনহুর উক্তি

গ্রন্থকার ইমাম হারেস আল-মুহাসেবি র. এখানে গুনাহের কিছু খারাপ প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু মানুষের বাহির ও ভিতরে নেককাজ ও অসৎকাজ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার মাঝে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন, নেক আমলের কারণে অন্তরে নুর পয়দা হয়, দেহের শক্তি বাড়ে, চেহারায় শোভা বৃদ্ধি পায়, রিযিক প্রশস্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে তার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে গুনাহ অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, চেহারাকে বিবর্ণ ও মলিন করে, দেহকে শক্তিহীন ও অলস করে দেয়। রিযিক সঙ্কুচিত করে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

গুনাহের ক্ষতি এবং তা থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা সম্পর্কে ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য

ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা র. তার বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় কিতাবুল ফাওয়ায়েদ ও আল-জাওয়াবুল কাফিতে আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব এবং তা থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতার মাঝে খুব সূক্ষ্মতা ও যথার্থতার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করেছেন, যা পড়ামাত্র প্রত্যেক সচেতন ও জ্ঞানী ব্যক্তি গুনাহ ও তার কারণসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে, নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের রঙে রাঙাতে উদ্বুদ্ধ হবে। আমরা এখানে সেই আলোচনাটি-দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও-বিস্তারিত তুলে ধরছি। কারণ, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তবতাসম্পন্ন।

তিনি বলেন, একেকটি গুনাহ হচ্ছে একেকটি ক্ষত। অনেক ক্ষত মৃত্যুর কারণ হয়। গুনাহের কারণে বান্দাকে সবচেয়ে বড়ো যে শাস্তি দেওয়া হয় তা হচ্ছে, তার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং সে আল্লাহ আযাব থেকে দূরে সরে যায়। আর যার অন্তর কঠিন, সেই আল্লাহর রহমত থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী। অন্তর যখন কঠিন হয়ে যায়, তখন চোখ শুকিয়ে যায়। আর অন্তর তখন কঠিন হয়, যখন চারটি কাজ স্বাভাবিকের চেয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়। চারটি কাজ হচ্ছে, আহার, নিদ্রা, কথাবার্তা ও মানুষের সঙ্গে মেলামেশা।

জেনে রাখো, কুপ্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে যে কুফল ভোগ করতে হয়, তার চেয়ে তা থেকে বেঁচে থেকে ধৈর্যধারণ করা আরও সহজ। কারণ, কিছু গুনাহ আছে যা তোমার জন্য যন্ত্রণা ও শাস্তি কিংবাকৃত গুনাহের স্বাদের চেয়ে অধিক উপভোগ্য নেয়ামত থেকে বঞ্চনার কারণ হবে। অথবা তা জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিয়ে লজ্জা ও অনুতাপ বয়ে নিয়ে আসবে। কিংবা তা তোমার মান-সম্মান নষ্ট করে দেবে, যা না হারালে তোমার জন্য ভালো হতো। অথবা তা তোমার মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করে ফেলবে, যা নষ্ট না হয়ে থেকে যাওয়া উত্তম ছিল। কিংবা মানুষের মাঝে তোমার খ্যাতি ও মর্যাদা কমিয়ে দেবে, যা না কমা ছিল কল্যাণকর। বা তোমার কোনো নেয়ামত ছিনিয়ে নিবে, যা গুনাহের স্বাদের চেয়ে অনেক সুখকর ও উত্তম ছিল। অথবা কোনো অপদস্থ ও নীচ মানুষের তোমার ইজ্জত নিয়ে টান দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে, যে সুযোগ সে আগে পায়নি। কিংবা তোমাকে এমন দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-যাতনায় নিক্ষেপ

করবে যা ভোগের স্বাদের চেয়ে মারাত্মক। অথবা তুমি এমন ইলম ভুলে যাবে যা মনে রাখার স্বাদকৃত গুনাহের চেয়ে অধিক। কিংবা তুমি এমন কোনো কাজ করবে যা তোমার শত্রুকে আনন্দিত করবে আর বন্ধুকে করবে ব্যথিত। অথবা তোমার যে নেয়ামত লাভ করার কথা ছিল তার আসার রাস্তা বন্ধ করে দেবে। বা তোমার ব্যক্তিত্বে কলঙ্কের এমন কোনো দাগ বসিয়ে দেবে যে দাগ আর কখনো মুছবে না। কারণ কর্ম অনুযায়ী মানুষের চরিত্র ও গুণ বিশেষিত হয়। (অর্থাৎ, কর্ম ভালো হলে তাকে ভালো বলা হয়। আর কর্ম মন্দ হলে তাকে মন্দ বলা হয়।)

ইবনুল জাওযি র. বলেন, গুনাহ বা পাপকাজ থেকে বিরত থাকার উপকারিতাগুলো হচ্ছে,

১. ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. মান-সম্মান রক্ষা পায়।
৩. আল্লাহ তায়ালা ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণ লাভের জন্য যে সম্পদ নির্ধারণ করেছেন তা সুরক্ষিত থাকে।
৪. মানুষেরা তাকে ভালোবাসে।
৫. তারা তার কথা গ্রহণ করে। অর্থাৎ, তাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।
৬. উত্তম জীবন,
৭. দেহের প্রশান্তি,
৮. অন্তরের শক্তি,
৯. আত্মার পবিত্রতা,
১০. আত্মিক সুখ,
১১. ও সঠিক জ্ঞান লাভ হয়।
১২. পাপিষ্ঠদের অনিষ্টের ভয় থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
১৩. দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট হ্রাস পায়।
১৪. লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে মুক্ত থাকা যায়।
১৫. গুনাহের অন্ধকার মুত্তাকির অন্তরের নুরকে নিভিয়ে দিতে পারে না।
১৬. সমস্ত বিপদাপদ থেকে উদ্ধারের পথ তার জন্য প্রশস্ত হয়ে যায় এবং গুনাহগার ও পাপিষ্ঠদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।
১৭. ধারণাতীত উৎস থেকে সহজে রিযিক লাভ হয়।
১৮. আল্লাহর নাফরমান ও গুনাহগারদের জন্য যা কঠিন তা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।
১৯. আল্লাহর আনুগত্য করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

২০. সে অধিক পরিমাণে ইবাদত, ইলম অর্জন এবং প্রার্থনা করতে পারে।
২১. সবাই তার প্রশংসা করে।
২২. তার ইমানের মিষ্টতা লাভ হয়।
২৩. মানুষের অন্তরে তার ভয় সৃষ্টি হয়।
২৪. কেউ তাকে কষ্ট দিলে কিংবা তার উপর জুলুম করলে মানুষ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাকে নিরাপত্তা দান করে।
২৫. কেউ তার গিবত করলে তার হয়ে তারা উত্তর দিয়ে দেয়।
২৬. আল্লাহ দ্রুত তার দোয়া কবুল করেন।
২৭. সে আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকায় একাকীত্ব অনুভব করে না।
২৮. তার ফেরেশতাদের নৈকট্য লাভ হয়।
২৯. মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে যারা শয়তান তারা তার থেকে দূরে সরে যায়।
৩০. লোকেরা তাকে সাহায্য করার জন্য, তার চাহিদা পূরণ করার জন্য এবং তার সাহচর্য ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে।
৩১. সে মৃত্যুকে ভয় পায় না।
৩২. বরং মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য ও তার কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য খুশি হয়।
৩৩. সে দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে।
৩৪. আখেরাতকে বড়ো মনে করে।
৩৫. এবং আখেরাতের বিশাল রাজত্ব ও সফলতা লাভের জন্য চেষ্টা করে।
৩৬. আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ লাভ করে।
৩৭. ইমানের মিষ্টতা অনুভব করে।
৩৮. আরশ বহনকারী এবং তার চারপাশে আল্লাহর প্রশংসাকারী ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে।
৩৯. আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের তার প্রতি খুশি থাক ও সর্বদা তার জন্য দোয়া করা,
৪০. জ্ঞান, বুদ্ধি, ইমান ও আল্লাহর মারেফাত বৃদ্ধি পায়।
৪১. আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর রহমতের দৃষ্টি লাভ হয়।
৪২. তার তওবার কারণে আল্লাহ তায়ালার খুশি হওয়া,
৪৩. আল্লাহ তাকে এমন সুখ ও শান্তি দান করেন যা সে যখন পাপ কাজে লিপ্ত ছিলো তা থেকে বঞ্চিত ছিলো।

সুবহানাল্লাহ-গুনাহ ও পাপাচার ছেড়ে দেওয়ার মাঝে শুধু যদি এসব উপকারিতা থাকত, অন্য কোনো উপকারিতা নাও থাকত, তাহলেও তা থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য যথেষ্ট হত।

এগুলো হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কিছু পার্থিব উপকারিতা। অপার্থিব উপকারিতাগুলো হচ্ছে, সে যখন মারা যায় তখন ফেরেশতারা তার কাছে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে জান্নাতের, তার কোনো ভয় ও দুঃখ না থাকার এবং দুনিয়া নামক কারাগার ও তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত জান্নাতের উদ্যানসমূহের মধ্য হতে একটি উদ্যানে নেয়ামত লাভের সুসংবাদ নিয়ে আসে। তারপর কেয়ামতের ভয়াবহ দিন যখন আসবে, যেদিন মানুষ প্রচণ্ড গরম ও ঘামে ডুবে থাকবে, সেদিন সে আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে। তারপর যখন জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ডান দিকে অবস্থানকারী তার নেক, মুত্তাকি ও সফল বান্দাদের সঙ্গে রাখবেন। আর তা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান, তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহের অধিকারী। কিতাবুল ফাওয়ায়েদ: পৃষ্ঠা নং ৪১,৯৭,১৩৯,১৫০,১৫১।

গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব এবং তার বিভিন্ন আপদ ও যন্ত্রণা

ইবনুল জাওযি র. তার মূল্যবান ও বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-জাওয়াবুল কাফি লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফিয়ি-তে গুনাহ ও নাফরমানির ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে প্রতিটি প্রভাবের উপর দলিল-প্রমাণ ও কারণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা ৫২-১৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একশ পৃষ্ঠারও অধিক। আমরা এখানে সংক্ষেপে শুধু শিরোনামগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি। তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের দেহ ও অন্তরের উপর গুনাহের মন্দ, নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর প্রভাব এত অধিক যে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

১. গুনাহগার ও পাপী ব্যক্তি ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।
২. রিযিক থেকে মাহরুম হয়।
৩. অন্তরে একাকীত্ব অনুভব করে। আল্লাহর সঙ্গে গুনাহগারের তার সম্পর্ক ভালো থাকে না, মানুষের সঙ্গেও না।
৪. তার যাবতীয় কাজ কঠিন হয়ে যায়।
৫. অন্তর ও চেহারার নুর চলে যায়। কবর অন্ধকার হয়ে যায়।
৬. অন্তর ও শরীর দুর্বল হয়ে যায়।
৭. সে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়।

৮. তার আয়ু হ্রাস পায়।
৯. গুনাহ ও পাপকাজ তার অভ্যাসে পরিণত হয়।
১০. আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে অন্তরের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।
১১. গুনাহকে তার কাছে খারাপ মনে হয় না।
১২. আল্লাহর ব্যাপারে তার মাঝে অনাসক্তি সৃষ্টি হয়।
১৩. সে মানুষের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়।
১৪. তার জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়।
১৫. সে অপরাপর মানুষ ও প্রাণীদের ক্ষতির কারণ হয়।
১৬. সর্বদা অপমানিত হতে থাকে।
১৭. তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়।
১৮. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের লানতের পাত্র হয়।
১৯. আল্লাহর অনুগত এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণকারীদের জন্য ফেরেশতাগণ যে দোয়া করেন, সে তা থেকে বঞ্চিত থাকে।
২০. পরকালে বিভিন্ন আযাবের সম্মুখীন হয়।
২১. জমিনের পানি, বাতাস, ফল-ফসল ও বসবাসস্থলে বিভিন্ন বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
২২. তার ভেতর থেকে লজ্জা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আল্লাহর বড়োত্বের অনুভূতি চলে যায়।
২৩. আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভুলে যান। আর তখন বান্দার জন্য শুধু ধ্বংস অপেক্ষা করে।
২৪. পাপী ব্যক্তি সদাচারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গিয়ে সদাচারীদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।
২৫. নেয়ামত চলে যায়।
২৬. আজাব নেমে আসে।
২৭. পাপীর অন্তরে সর্বদা ভয় সৃষ্টি হয়। সে সবসময় আতঙ্কে থাকে।
২৮. তার অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয় কিংবা মরে যায়।
২৯. অন্তর্দৃষ্টি চলে যায়।
৩০. সে শয়তান এবং নফসে আম্মারার দোসরে পরিণত হয়।
৩১. কুপ্রবৃত্তির হাতে বন্দি থাকে।
৩২. খ্যাতি ও মর্যাদা হারায়।
৩৩. প্রশংসনীয় হওয়ার পরিবর্তে নিন্দার যোগ্য হয়।
৩৪. ইলম, আমল, রিযিক, জীবন এবং সমস্ত জিনিসের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।
৩৫. নিজের সঙ্গে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

৩৬. পাপ পাপী ব্যক্তির কাছ থেকে তার বন্ধু ও কল্যাণকামী ফেরেশতাদের দূরে সরিয়ে দেয়।
৩৭. এবং তার প্রকাশ্য শত্রু শয়তানকে নিকটবর্তী করে দেয়।
৩৮. অন্তরের কুপ্রভাব, যেমন-গুনাহ্ করতে করতে মরিচা পড়ে যাওয়া, গুনাহ স্বভাবে পরিণত হওয়া, মোহর লেগে যাওয়া, নেফাক, বদ আখলাক, সন্দেহ-সংশয়কে দ্রুত গ্রহণ করা এবং এ ছাড়া আরও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে।

মোটকথা, মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে দৈহিক ও আত্মিক সাধারণ কিংবা বিশেষ যে সমস্ত ক্ষতি ও বিপদের শিকার হয়, সাধারণ হোক কিংবা বিশেষ-এসবের পেছনের কারণ হলো গুনাহ্ ও আল্লাহর নাফরমানি।

মহান তাবেয়ি, হাফেযে হাদিস, ইমাম, শাইখুল ইসলাম, বসরার বিখ্যাত আবেদ ও আলেম সুলাইমান বিন তারখান তাইমি র. -মৃত্যু ১৪৩ হিজরি- আল্লাহর নাফরমানির ক্ষতি ও তাঁর আনুগত্যের উপকারিতাকে সংক্ষেপে খুবই চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, নেককাজ অন্তরে নুর সৃষ্টি করে, আমলের শক্তি বৃদ্ধি করে। আর গুনাহ্ অন্তরে জুলমাত এবং আমলে দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

যেমনটি *হিলয়াতুল আউলিয়ায়* (৩/৩০) তার জীবনী বর্ণনায় এসেছে। আমার পরামর্শ থাকবে, তুমি সেখান থেকে এবং ইমাম যাহাবিকৃত *তাযকিরাতুল হুফফাজ* (১/১৫০) থেকে তুমি তার জীবনী পড়ে নেবে। তাহলে তোমার মাঝে নেক কাজ এবং আল্লাহর আনুগত্যের ইচ্ছাশক্তি আরও দৃঢ় হবে।

গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিতে বলা হয়েছে,

যখন কোনো শহরের উপর দিয়ে প্রচুর পানি নিয়ে মেঘমালা অতিক্রম করে, তখন সে সেখানে বর্ষিত হতে চায়, কিন্তু সেখানের মানুষের গুনাহের কারণে বর্ষিত হতে পারে না।

আলোচনা অনেক দীর্ঘ হওয়ায় ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এটি অনেক বড়ো একটি ব্যাধি (গুনাহ) থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা। আমরা দুর্বল। অনেক গুনাহ করি, অধিক নাফরমানি করি। তাই আমাদের এ সংক্রান্ত প্রচুর নসিহতের প্রয়োজন; যাতে আমরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারি এবং সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞানী মহান আল্লাহর নিকট তওবা করতে পারি।

ইমাম ইবনুল জাওযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর গুনাহ থেকে সতর্ক করে যা বলেছেন

গুনাহ বর্জনের বিষয়ে ইমাম ইবনুল জাওযি র.-এর নিম্নোক্ত কথাটি খুবই দামী। তিনি বলেন, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তার পরিণতি খুবই খারাপ। গুনাহ থেকে দূরে থাকো, বিশেষ করে নির্জনে মানুষ যেসব গুনাহ করে সেসব গুনাহ থেকে। কারণ গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে লড়াই করার দ্বারা বান্দা তাঁর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়।

গুনাহের স্বাদ একমাত্র সে-ই লাভ করে যে সর্বদা গাফলতের মধ্যে ডুবে থাকে। আর যে মুমিনের অন্তরে সর্বদা আল্লাহ ও আখেরাতের স্মরণ জাগ্রত থাকে সে গুনাহের কোনো স্বাদ লাভ করে না। কারণ কোনো জিনিস হারাম হওয়ার জ্ঞান মানুষকে তা উপভোগ করতে বাধা দান করে এবং তার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে। যদি তার জ্ঞান দৃঢ় হয়, তাহলে সে গুনাহ করার সময় তা থেকে নিষেধকারী মহান আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পায়। তখন গুনাহ তার কাছে বিষের মতো মনে হয়। যদি তার মাঝে কুপ্রবৃত্তির নেশা প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে তার বিবেক তাকে দংশন করতে থাকে। আর যদি তা তার স্বভাব-প্রকৃতিতে মিশে যায়, তাহলেও তা মুহূর্তের জন্য হয়ে থাকে। তারপর সে স্থায়ী লাঞ্ছনা, লজ্জা, অনুতাপ বোধ করতে থাকে। সর্বদা চোখের পানি ফেলতে থাকে। অতীতকৃতকর্মের কারণে দীর্ঘদিন আফসোস করতে থাকে। যদি কোনো দিন গুনাহ মাফের ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে যায়, তথাপি আল্লাহর ভর্ৎসনার শিকার হওয়ার ভয় তার মাঝে কাজ করে।

গুনাহের পরিণতি কত নিকৃষ্ট! তার বর্ণনাও কত মন্দ! আর অন্তরে গাফলত প্রবল হওয়া ছাড়া গুনাহের স্বাদ লাভ করা যায় না। সাইদুল খাতির: ১/১৮৫।

পাপকাজে দৃঢ় ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়

আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদ, মহান দায়ি, অধ্যাপক শায়খ মুস্তফা সিবায়ির প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন, তোমার মনে যখন কোনো গুনাহ করার ইচ্ছা উঁকি দেবে, তখন তুমি আল্লাহর কথা স্মরণ করবে, তাতে কাজ না হলে মহান ব্যক্তিদের চরিত্রের কথা স্মরণ করো। তাতেও মন না ফিরলে, তাকে বলো, মানুষ তা জানতে পারলে কেমন কলঙ্ক হবে। তারপরও যদি মন না ফিরে তাহলে মনে করবে তুমি আর এখন মানুষ নও, জানোয়ারে পরিণত হয়েছো। দেখুন তার গ্রন্থ হাকাযা আল্লামাতনিয়াল হায়াতি: পৃষ্ঠা নং ৩২।

হে অন্তর ও দৃষ্টিসমূহকে পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দিনের উপর অটল-অবিচল রাখুন।

জেনে রাখো, দিনের আলো অন্ধ ব্যক্তির যেমন কোনো কাজে আসে না, তেমনি মুত্তাকি ছাড়া কেউ ইলমের নুর দ্বারা আলোকিত হতে পারে না। আর মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওষুধ যেমন কোনো কাজে আসে না, তদ্রূপ শুধু দাবিদার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আদব কোনো কাজে আসে না। কঠিন পাথরের উপর বৃষ্টি যেমন কোনো কিছু উৎপন্ন করতে পারে না। অনুরূপ দুনিয়ার ভালোবাসায় পূর্ণ অন্তরে প্রজ্ঞা কোনো প্রভাব ফেলে না।[২০৭] যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায় তার আদব কমে যায়। ইলমের দেখানো পথে যে চলে না তার মূর্খতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, আইন অনুযায়ী যে আমল করে না তার মুর্খতা বৃদ্ধি পায়। যে নিজে অসুস্থ, কোনো ওষুধ যাকে সারিয়ে তুলতে পারে না, সে কীভাবে অন্যের চিকিৎসা করবে? জেনে রাখো, মানুষের মাঝে সবচেয়ে প্রশান্ত এবং দুশ্চিন্তামুক্ত তারাই যারা দুনিয়াবিমুখ।[২০৮]

---

[২০৭] মালেক বিন দিনার রহিমাহুল্লাহ হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুনিয়াকে মহব্বতকারী আলেমের শাস্তি কী? তিনি বললেন, তার অন্তর মরে যায়। সে যখন দুনিয়াকে ভালোবাসে, তখন দিনকে ব্যবহার করে তা লাভ করতে চাইবে। আর তখন ইলমের বরকত তার থেকে চলে গিয়ে শুধু শব্দগুলো থেকে যাবে।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: ৯/২৬৮।

[২০৮] বাদশার চেয়ে সুখী জীবন যার

দুনিয়াবিমুখ মানুষ সবচেয়ে দৈহিক আরাম ও প্রশান্তিতে থাকে। এক ব্যক্তি বসরার অধিবাসী তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন ওয়াসি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে বলল, আমাকে উপদেশ দান করুন। তখন তিনি বললেন, আমি দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশা হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। সে বলল, তা কীভাবে? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি বিমুখ থাকো।

ইমাম যাহাবিকৃত *তারিখুল ইসলাম*: ৫/১৫৯।

হ্যাঁ, দুনিয়াবিমুখ মানুষরাই রাজা-বাদশাহদের চেয়ে সুখী ও পবিত্র জীবন-যাপন করে। আব্বাসী খলিফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (জাফর বিন মুতাসিম বিন রশিদ)। মৃত্যু: ২৪৭ হিজরি।

(খলিফা মুতাওয়াক্কিলের উযির ফাতহ বিন খাকান বলেন, আমি একদিন মুতাওয়াক্কিলের কাছে গেলাম। দেখলাম, মাথা নিচু করে চিন্তায় মগ্ন আছেন। তখন আমি বললাম, আমিরুল মুমিনিন, কী ভাবছেন? আল্লাহর শপথ! পৃথিবীতে আপনার চেয়ে উত্তম ও সুখের জীবন আর কারও নেই।

তিনি বললেন, কেন থাকবে না। অবশ্যই আছে, আমার চেয়ে উত্তম জীবন তার, যার একটি প্রশস্ত ঘর, নেককার স্ত্রী ও আজকের দিনের জীবিকা আছে। সে আমাদেরকে চিনে না, তাই আমরা তাকে কষ্ট দিতে পারি না। সে আমাদের মুখাপেক্ষী নয়, তাই আমরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারি না।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৫১।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, খলিফা মুতাওয়াক্কিল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বড়ো সত্য বলেছেন। পুরনো দিনের মানুষরা একটি কথা বলত, বাদশা তো সে যাকে বাদশারা চিনে না। আমি উত্তর পাকিস্তানের জনৈক আলেমের কাছ থেকে একটি ঘটনা শুনেছি, সেখানের এক সাধারণ লোকের সঙ্গে একবার এক বাদশার দেখা হলো। বাদশা তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তখন তার কাছে অভিযোগ করে বলল, বিভিন্ন পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তারপর বাদশাকে বলল, আপনি তো বড়ো সুখে আছেন। আপনার জীবন কত সুন্দর! কোনো পেরেশানি ও দুঃখ-কষ্ট নেই। আপনার আহার-নিদ্রা সবই সুখময়। আপনি বাদশা, আপনার খেদমতে সবকিছু উপস্থিত করা হয়। বাদশা তখন তার কথা শুনে চুপ রইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

পরে একদিন বাদশা লোকটিকে তার প্রাসাদে দাওয়াত করলেন এবং লোকটি যেখানে খেতে বসবে, ঠিক সেখানে তার মাথার উপর একটি কোষমুক্ত তরবারি হালকা সুতা দিয়ে বেঁধে রাখলেন। যে কোনো সময় তা ছিঁড়ে মাথার উপর পড়তে পারে। লোকটি যখন মাথার উপর এমনভাবে তরবারি ঝুলানো দেখল, যা যে কোনো সময় তার উপর পড়তে পারে, তখন সে ভয়ে সামনে রাখা বাদশার শাহি খাবারের কথা ভুলে গেল।

বাদশাহ তাকে বললেন, নিন না। সবধরনের সুস্বাদু ও উত্তম খাবার আপনার সামনে রাখা আছে। তখন লোকটি বলল, মাথার উপর তরবারি ছিঁড়ে পড়ার ভয় আমাকে খাবারের স্বাদ এবং তা গ্রহণ করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

তখন বাদশা তাকে বললেন, আমার জীবনটাও এমন, যে জীবন দেখে তুমি আমাকে ঈর্ষা করছো এবং অজ্ঞতাবশত তা কামনা করছ। সবসময় তরবারি ছিঁড়ে পড়ে মাথা কাটা যাওয়ার ভয়। কারণ আমার ভেতর সর্বদা আমার শত্রু বা আমার সিংহাসনলোভী কোনো নিকটাত্মীয়ের আমাকে মেরে ফেলার কিংবা আমার সিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়ার অথবা খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার, বা ঘুমের সময় অতর্কিত হামলা করার কিংবা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ভয় কাজ করে।

২২৪. মানসিকভাবে সবচেয়ে ক্লান্ত এবং অধিক ব্যস্ত তারাই যারা দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী গুণ হলো নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছোটো রাখা।[২০৯] আর আল্লাহর মারেফাত লাভকারীদের সবচেয়ে নিকটবর্তী হালত হলো সর্বদা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এ কথা মনে করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন। (সুরা নিসা: ১)

জেনে রাখো, সত্যের চেয়ে নিকটবর্তী কোনো রাস্তা এবং ইলমের চেয়ে সফল কোনো প্রমাণ এবং তাকওয়ার চেয়ে বড় কোনো পাথেয় নেই।[২১০]

তাই আমি সর্বদা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়-আতঙ্কের মাঝে থাকি। নিজের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতা ও সুরক্ষা গ্রহণ করে থাকি। সুখের জীবন তো তোমার। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, চলাফেরা করো, আহার করো, আবাসে ও প্রবাসে প্রশান্ত চিত্তে থাকো। এমন জীবনের জন্য তোমাকে ঈর্ষা করা যায়, আমাকে নয়। তখন লোকটি বাদশার কথা মেনে নিল এবং আল্লাহর এই নেয়ামতের জন্য তাঁর শোকর আদায় করল।

[২০৯] সাইয়েদুনা হযরত আলি রা. বলেন, যুহদ সম্পূর্ণই পবিত্র কুরআনের এই দুই কথার মাঝে নিহিত, যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে আফসোস করো না, আর যা পেয়েছো তা নিয়ে উৎফুল্ল হয়ো না। আর যে অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না এবং ভবিষ্যত নিয়ে উৎফুল্ল হয় না, সে যুহদের উভয় প্রান্তকে ধারণ করেছে।

নাহজুল বালাগা: ৪/১৯৯।

[২১০] তাকওয়া সর্বোত্তম গুণ

হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন, আর তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো। (সুরা বাকারা, আয়াত নং ৯৭।)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন, তাকওয়া অর্জনের হুকুম সমস্ত শরিয়তেই ছিল। ইরশাদ হচ্ছে, আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দান করা হয়েছিল, তাদের এবং তোমাদের আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছি।

আল্লামা ফিরোজাবাদি র. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জগতে যদি তাকওয়া অবলম্বনের চেয়ে বান্দার জন্য অধিক উপযুক্ত, কল্যাণকর, প্রতিদান ও মর্যাদাপূর্ণ,

অন্তরের ওয়াসওয়াসাকে দূর করার জন্য অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করার চেয়ে কার্যকর কোনো কিছু আমি দেখিনি, সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতির চেয়ে হৃদয়কে অধিক আলোকিতকারী আমি আর কিছু দেখিনি।[২১১]

মহৎ ইবাদত, উত্তম ও আখেরাতে মুক্তি দানকারী কিছু থাকত তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই বান্দাকে তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশেষ বান্দাদের তা গ্রহণের উপদেশ দিতেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান ও দয়াশীল।

তিনি যেহেতু পূর্বাপর সকল বান্দাকে একমাত্র তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমরা বুঝতে পারি তাকওয়াই চূড়ান্ত সীমা এবং একমাত্র অবলম্বন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত নসিহত ও ওসিয়ত, পথনির্দেশনা, সুন্নত ও আদব, জ্ঞান, সভ্যতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দান তাকওয়ার মাঝে সন্নিবেশিত করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, অবশ্যই তিনি মুত্তাকিদের আমল কবুল করেন। *সুরা মায়িদা*, আয়াত নং ২৭

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, যে কোনো কাজ কবুল হওয়ার মূলে হলো তাকওয়া।

বাসাইরু যাবিত তাময়িজ ফি লাতাইফিল কিতাবিল আযিয: ২/১১৬।

[২১১] **কলবে সালিম মুমিনের জান্নাতে যাওয়ার কারণ**

অর্থাৎ, অন্তর হিংসা, দ্বেষ, ধোঁকা, প্রতারণা ও অন্য সকল বাতেনি ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা মুমিনের জান্নাতে যাওয়ার কারণ। ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্তে উন্নীত সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন,

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতি লোক আগমন করবে। তখন এক লোক আগমন করল, যার দাড়ি থেকে অজুর পানি টপটপ করে পড়ছিল আর তার জুতোজোড়া তার হাতে ছিল। পরদিন ঠিক একই কথা বললেন, এবং প্রথম দিনের মতো সেই লোকটি এলো। তৃতীয় দিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বললেন, সেদিনও প্রথম দিনের মতো সেই লোকটি এল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস তাকে অনুসরণ করলেন এবং বললেন, আমি আমার বাবার সাথে রাগ করেছি এবং কসম খেয়েছি যে আমি তিনদিন পর্যন্ত ঘরে যাব না। আপনি আমাকে যদি এই তিনদিন আপনার

আমি দেখেছি মুমিনের সম্মান তাকওয়ার মাঝে। তার সহনশীলতা তার সবরের মাঝে। বুদ্ধি তার সৌন্দর্য। তার ভালোবাসা ক্ষমা ও মার্জনা করে দেওয়ার মাঝে।[২১২] তার ভদ্রতা বিনয় ও নম্রতার মাঝে। আল্লাহ্ তায়ালা যদি তার কোন বান্দার জন্য দরিদ্রতার ফয়সালা করে রাখেন আর তার মাঝে যদি সচ্ছলতা প্রীতি থাকে তাহলে তা আল্লাহ্ তায়ালার অসন্তুষ্টি জনক। আর যদি আল্লাহ্ তায়ালা তার

ঘরে আশ্রয় দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো। লোকটি বলল, ঠিক আছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণনা করেন, তিনি তার সাথে সেই তিন রাত অবস্থান করলেন কিন্তু তিনি তাকে রাতে উঠে কোন আমল করতে দেখেননি। তবে তিনি ঘুম না এলে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেন আর আল্লাহর যিকির করতে থাকতেন, আল্লাহু আকবার বলতেন, ফজর নামাজের আগ পর্যন্ত তিনি এরকম করতেন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকে এই তিনদিন কেবল ভাল কথা বলতে শুনেছি। তিন রাত চলে গেলে তার সব কাজ আমার কাছে খুব ছোটো মনে হতে লাগল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমার এবং বাবার মাঝে মূলত কোন রাগ ও ছাড়াছাড়ি নেই। তবে আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরপর তিনদিন তোমার সম্পর্কে এই কথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সামনে এখন একজন জান্নাতি লোক আসবে। তখন এই তিনদিন তুমি এসেছ। তাই আমি চাইলাম যে তোমার কাছে এসে তোমার আমল প্রত্যক্ষ করে তোমাকে অনুসরণ করতে। কিন্তু আমি তোমাকে অধিক কোন আমল করতে দেখিনি। তাহলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথা বললেন, এই মর্যাদা তুমি কিভাবে লাভ করলে? তখন সে বলল, আমাকে তুমি যতটুকু আমল করতে দেখেছো কেবল ততটুকুই করি। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেsন, যখন আমি চলে যাচ্ছিলাম, তখন সে আমাকে পিছন থেকে ডেকে বলল, তুমি যা দেখেছ এর বাইরে আমার কোন আমল নেই। তবে কোন মুসলমানের প্রতি আমার মনে কোন হিংসা-দ্বেষ নেই। আর আল্লাহ তায়ালা কাউকে কল্যাণ দান করলে সে কল্যাণের জন্য তাকে হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, এই সেই গুণ যার কারণে তুমি মর্যাদা লাভ করেছো। আর এই গুণটি আমাদের মধ্যে নেই।

মুসনাদে আহমদ: ৩/১৬৬।

[২১২] দুনিয়ায় অপদস্থ হওয়া আখেরাতে অপদস্থ হওয়ার চেয়ে উত্তম

আলেম, আবেদ, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ, তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন ওয়াসি র. বলেন, দুনিয়াতে অপদস্থ হওয়া আখেরাতে অপদস্থ হওয়ার চেয়ে উত্তম।

ইমাম যাহাবিকৃত *তারিখুল ইসলাম*: ৫/১৬১।

কোন বান্দার জন্য সচ্ছলতার ফয়সালা করে রাখেন আর সে বান্দার মাঝে দরিদ্রতার প্রীতি থাকে তাহলে তা তার নিজের উপর জুলুম। আর এসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জাত ও সত্তা সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শুকরিয়া আদায় থেকে পলায়ন করা এবং স্বল্প জ্ঞানের কারণে সময়কে নষ্ট করা।

কারণ দরিদ্রতা সম্পদশালী ব্যক্তির ইমানকে সংশোধন করতে পারে না আর দরিদ্র ব্যক্তির ইমানকে সংশোধন করতে পারে না। যেমনটি হাদিস কুদসিতে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ مِنْ عِبادِيْ مَنْ لَّا يُصْلِحُ إِيْمَانَهٗ إِلَّا الفَقْرُ، وَ لَوْ أَغْنَيْتُهٗ لَافْسَدَهٗ ذٰلِكَ، وَ إِنَّ مِنْ عِبادِيْ مَنْ لَّا يُصْلِحُ إِيْمَانَهٗ إِلَّا الْغِنَى، وَ لَوْ أَفْقَرْتُهٗ لَافْسَدَهٗ ذٰلِكَ.

আমার কিছু বান্দা আছে একমাত্র দরিদ্রতা তার ইমানকে সংশোধন করতে পারে। আমি যদি তাকে সচ্ছলতা দান করি তাহলে তা তার ইমানকে নষ্ট করে দিবে।[২১৩] আমার কিছু বান্দা আছে একমাত্র সচ্ছলতা তার ইমানকে সংশোধন করতে পারে।

---

[২১৩] একটি প্রবাদ আছে,

مِنْ العِصْمَةِ أَنْ لاَ تَجِدَ

অর্থ: গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার একটি উপায় হলো সম্পদ হাতে না আসা।

প্রজ্ঞাপূর্ণ এ কথাটির অর্থ হলো, দারিদ্র্য ও অভাব কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে কিংবা কোনো কোনো সময়ে আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণ হয়। যেমন, ৫০৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী কবি ইবনে হাব্বারিয়্যাহ (মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আব্বাসি) প্রথমে মদ পান করলেও পরে তা ছেড়ে দেন। তিনি তার কবিতা পঙক্তিতে বলেন,

আবু সাইদ যখন আমাকে দেখল যে, আমি এক বছর ধরে মদ পান ছেড়ে দিয়েছি, তখন সে আমাকে বলল, কোনো শায়খের হাতে বায়আত গ্রহণ করে তুমি তওবা করেছো? আমি বললাম, আমি দারিদ্র্য ও অভাবের হাতে তওবা করেছি। (অর্থাৎ, দারিদ্র্যের কারণে মদ কিনতে পারি না। তাই মদ পান করাই ছেড়ে দিয়েছি।)

আমি যদি তাকে দরিদ্রতা দান করি তাহলে দরিদ্রতা তার ইমানকে নষ্ট করে দিবে।[২১৪] সুস্থতা অসুস্থতার বিষয়টিও

---

[২১৪] আল্লাহ তায়ালা বলেন,

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করেন ও সংকীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।

এই আয়াতে কারিমায় এদিকে ইঙ্গিত আছে, রিযিক প্রশস্ত ও সংকীর্ণ হওয়া-উভয়টিই বান্দাদের কল্যাণের জন্য। তাই কারও রিযিক প্রশস্ত, আর কারও সংকীর্ণ।

ধনাঢ্যতা ও সচ্ছলতা একটি ফেতনা। এর কিছু খারাপ ও ক্ষতিকর দিক আছে, যেমন অহংকার, সীমালঙ্ঘন, অবৈধ পথে সম্পদ আয় করা ও অবৈধ পথে ব্যয় করা, সম্পদ ও তা দ্বারা অর্জিত মান-সম্মান নিয়ে অন্যদের সঙ্গে গর্ব করা, আল্লাহ তায়ালার হক আদায়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা, এ ছাড়া আরও অন্যান্য খারাপ ও ক্ষতিকর দিক আছে।

অনুরূপভাবে অভাব ও দারিদ্র্যও একটি ফেতনা। এরও কিছু খারাপ ও ক্ষতিকর দিক আছে। যেমন, সম্পদশালীদের হিংসা করা, তাদের সম্পদের প্রতি লোভ করা, অভাবের তাড়নায় এমন কোনো গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া যা নিজের মান-সম্মান ও দিন উভয়টিই নষ্ট করে দেয়, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট না থাকা, এ ছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলোর পরিণাম ভালো হয় না। দারিদ্র্য ফেতনাস্বরূপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তা মানুষকে ঘুষ গ্রহণ, চুরি ইত্যাদি গর্হিত কাজের দিকে ঠেলে দেয়।

আমরা এভাবেও বলতে পারি, সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য উভয়টিই আপন আপন স্থানে প্রশংসনীয়। যদিও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও নিজের দিনকে হেফাজত রাখার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য সচ্ছলতার চেয়ে অধিক নিরাপদ। তবে উভয়টি প্রশংসনীয় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, দরিদ্র ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল ও ধনী ব্যক্তিকে শোকরগুজার হতে হবে। যদি তারা তা না হয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা ফেতনায় নিপতিত হওয়ার কারণ হবে।

মোটকথা, যা তোমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে তা শুভ ও কল্যাণকর। আর যা তোমাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা অশুভ ও অকল্যাণকর। চাই তা দারিদ্র্য হোক কিংবা সচ্ছলতা।

অনুরূপ।[২১৫] সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করেছে তাকে দোষারোপ করো না। আর আল্লাহ তায়ালা

মোল্লা আলি কারি র.কৃত মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ *মিরকাতুল মাফাতিহ* ৩/১৩৬।

গ্রন্থকার র. যে হাদিসে কুদসির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করেছেন, তা একটি দুর্বল হাদিস, যা হযরত আনাস রা. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এবং তিনি জিবরাইল আ. থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের শুরুর অংশটি হলো,

যে আমার কোনো অলিকে (বন্ধুকে) হেয় প্রতিপন্ন করবে, সে যেন আমার সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দিল)

এই হাদিসটি আবু ইয়ালা, বাযযার, তাবারানি, ইবনু আবিদ দুনিয়া কিতাবুল আউলিয়া গ্রন্থের ১০০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম, তিরমিযি, ইবনু মারদুইয়া, আবু নুআইম, বাইহাকি *আল-আসমা ওয়াস সিফাত* গ্রন্থের ১২১ নং পৃষ্ঠায় এবং ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হাফেয ইবনে হাজারের *ফাতহুর বারি* (১১/২৯৩) এবং আল্লামা মুহাম্মদ মাদানি র.কৃত *ইতহাফাতুস সানিয়্যাহ ফিল-আহাদিসিল কুদসিয়্যাহর* ৩৫-৩৬ নং পৃষ্ঠায় আছে।

হাফেয ইবনে হাজার র. বলেন, এর সূত্রে দুর্বলতা আছে।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি র. বলেন, সূত্রে হাসান বিন ইয়াহইয়া খুশানি আছেন। তিনি সাদাকাহ বিন আবদুল্লাহ দিমাশকি র. থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা দুজনই দুর্বল। অনুরূপভাবে হিশাম কিনানি হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হিশামের পরিচয় জানা যায় না। ইয়াহইয়া ইবনে মাইনকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই হিশাম কে? তখন তিনি বললেন, কেউ নয়। অর্থাৎ, তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: পৃষ্ঠা নং ৩১৪।

হাফেয ইবনে হাজার র. বলেন, আল্লাহর অলি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর মারেফাত হাসিলকারী, তাঁর অনুগত ও ইখলাসের সঙ্গে তাঁর ইবাদতকারী ব্যক্তি।

[২১৫] গ্রন্থকার র.-এর উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী হাদিসে যেমনটি এসেছে, ঠিক অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো বান্দাকে তার ভালোর জন্য সুস্থতা দান করেন। কারণ তার সংশোধন সুস্থতার মাঝে। আর কোনো বান্দাকে তার ভালোর জন্য অসুস্থতা দান করেন। কারণ তার সংশোধন অসুস্থতার মাঝে। নিম্নোক্ত হাদিসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে:

যাকে সঠিক বুঝ দান করেছেন সে তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে।[২১৬]

জ্ঞানীদের জন্য যদি শুধু এই একটি আয়াত থাকতো তাহলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.

আমার কিছু বান্দা আছে, একমাত্র অসুস্থতা যাদের ইমানকে ঠিক করতে পারে। আমি যদি তাদের সুস্থতা দান করি তাহলে তা তাদের ইমানকে নষ্ট করে ফেলবে। আর আমার কিছু বান্দা আছে, একমাত্র সুস্থতা যাদের ইমানকে ঠিক করতে পারে। আমি যদি তাদের অসুস্থতা দান করি তাহলে তা তাদের ইমানকে নষ্ট করে ফেলবে। আর আমি বান্দাদের কর্মসমূহ তাদের অন্তরের কথা অবগত হয়ে সে অনুযায়ী পরিচালনা করি। আর নিশ্চয় আমি মহাজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

একটু আগে আমাদের আলোচনা পড়ে তুমি জেনেছো যে, হাদিসটি দুর্বল।

২১৬ সে আল্লাহ্ তায়ালাকে কীভাবে দোষারোপ করে! অথচ তিনি তার নিজের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

আর আল্লাহ্ তায়ালার ইলম সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

আর কোনো কিছুকে জানার মাধ্যমে বেষ্টন করার অর্থ হলো, তার শুরু থেকে শেষ, অর্থাৎ, তার অস্তিত্ব লাভ, সে কোন জাতি ও শ্রেণির, তার অবস্থা, ভাগ্য, তাকে ও তা থেকে যা সৃষ্টি হবে-সেগুলো সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, তার ভালো-মন্দ এবং তার শেষ পরিণাম সম্পর্কে জানা।

আর এমন সার্বিক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। একমাত্র তিনিই এমন জ্ঞানের অধিকারী। আর তর এই গুণের প্রতি যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে কখনো তাঁকে দোষারোপ করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি (সৃষ্টির ভালো-মন্দ সম্পর্কে) জানেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবগত। (সুরা মুলক, আয়াত নং ১৪)

আর তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচন করেন। তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার নেই।[২১৭]

মূর্খ ব্যক্তিদের স্বভাব-চরিত্র; পাপীদের সঙ্গে উঠাবসা,[২১৮] আত্মমুগ্ধ ব্যক্তিদের কথাবার্তা, দুনিয়ার ধোঁকায় লিপ্ত ব্যক্তিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশ ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকো।

হকের উপর আমলকারী, আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল, সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎকাজে নিষেধকারী হও।[২১৯]

---

[২১৭] সুরা কাসাস আয়াত নং ৬৮

[২১৮] কারণ, গুনাহের ফলে তাদের অন্তর কঠিন ও অন্ধকার হয়ে যায়। সাইয়েদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, তোমরা অধিক তওবাকারীদের সঙ্গে উঠাবসা করো। কারণ, তারা সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে।

ইবনে হিব্বানকৃত *রওযাতুল উকালা:* পৃষ্ঠা নং ১৮।

ইবনুল জাওযি র. এটিকে মহান তাবেয়ি আওন বিন আবদুল্লাহ র.-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমরা অধিক তওবাকারীদের সঙ্গে উঠাবসা করো। কারণ, তারা সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে।

কিতাবুল কুসসাস ওয়াল মুযাক্কিরিন, পৃষ্ঠা নং ৬৬।

[২১৯] সহিহ বুখারিতে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, আমর বিন মাইমুন থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে যখন আবু লু'লুআ মাজুসি ছুরিকাঘাত করল এবং সকলেই যখন বুঝতে পারলেন যে, মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী, তখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনিন! আপনার জন্য আল্লাহর সু-সংবাদ আছে; আপনি তা গ্রহণ করুন।

যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। 'উমর রা. বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বললেন, হে ভাতিজা, তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এতে তোমার কাপড় অধিক পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং তা তোমার রবের নিকট অধিক পছন্দনীয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার জন্য ইখলাসকে আপন করে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন এবং তাকে সাহায্য করেছেন। যে অন্যের জন্য নিজেকে সজ্জিত করেছে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। যে আল্লাহর উপর ভরসা করেছে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। যে অন্যের উপর আস্থা রেখেছে সে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে। যে আল্লাহকে ভয় করেছে, আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। যে তার শুকরিয়া আদায় করেছে, তিনি তার নেয়ামত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যে তাঁর আনুগত্য করেছে, তিনি তাকে সম্মানিত করেছেন। যে তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছে তিনি তাকে ভালোবেসেছেন। আর মাওলা যাকে ভালোবেসেছে, সে তো সফলকাম।

যুক্তি দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা,[২২০] নিজের খাহেশাতের উপর আমল করা, সত্যকে বর্জন করা, বাতিলের দিকে গমন করা থেকে বিরত থাকো। তওবার কথা বিস্মৃত হয়ে ক্ষমার আশা থেকে দূরে থাকো।

সহিহ বুখারি: সাহাবিগণের মর্যাদা অধ্যায়: উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত গ্রহণ ও তার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য হওয়া পরিচ্ছেদ: ৭/৫২-৫৩।

হাদিসটি লক্ষ করুন-আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হেফাজত করুন- সাইয়েদুনা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাণবায়ু বের হয়ে যাচ্ছে। তিনি মৃত্যুর একেবারে সন্নিকটে আছেন। তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এমন কঠিন বিপদের সময়ও তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে যাচ্ছেন। যুবককে ডেকে অধিক পরিচ্ছন্নতা ও তাকওয়ার কথা শুনাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

[২২০] বাহ্যিকভাবে গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহর কথাটির এ অর্থ বুঝে আসে যে, তুমি যেন হিসাব কিতাব করো অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের তুলনায় তাঁর কতটুকু ইবাদত করছো, তা স্মরণে রাখো। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি তোমার ইমান ও আনুগত্য যেন যুক্তির ভিত্তিতে না হয়। অর্থাৎ, তুমি কেবল তাঁর সেসব হুকুমগুলো পালন করলে যা তোমার যুক্তিতে ও বুদ্ধিতে ধরে। কারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি শরিয়তের অনুগামী, শরিয়ত জ্ঞান-বুদ্ধির অনুগামী নয়। তাই শরিয়তের কোনো হুকুম তোমার বুঝে আসুক বা না আসুক তোমাকে তা মানতে হবে। তবে একটি কথা সত্য যে, শরিয়ত তার প্রতিটি হুকুম মানুষের সুস্থ বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রদান করে। তবে অনেক সময় তা সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে আমাদের বুঝে আসে না।

জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কেবল সেই ইলম ও আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হন যার শেকড় ইমান ও ইয়াকিনের দ্বারা মজবুত থাকে। ইখলাসের দ্বারা যার শাখা-প্রশাখা উঁচু থাকে। তাকওয়ার মাধ্যমে ফলবতী হয়। যার প্রমাণ আল্লাহর ভয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যার মাঝে আল্লাহর ভয়ের পর্দা ঝুলানো। নিজের নফসের অলসতায় সন্তুষ্ট থেকো না।। কারণ আমলে অলসতা হলে কোনো ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। আর আল্লাহ তায়ালা থেকে কেউ মুখাপেক্ষী হতে পারে না।

জেনে রাখা উচিত, মানুষের সৌভাগ্য হল আল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে সে ব্যাপারে ইখলাসপূর্ণ নিয়ত[২২১] ও তাঁর পছন্দনীয় আমলের তৌফিক লাভ করার মাঝে।। আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন এবং তার অন্তরে ইলমের মহব্বত ও ভালোবাসা ঢেলে দেন।[২২২]

---

[২২১] নিয়ত সংক্রান্ত আলোচনা ২৮ এবং ২৯ নং টীকায় গিয়েছে।

[২২২] চার ইমামের নফল ইবাদতের চেয়ে নফল ইলম হাসিল করাকে উত্তম মনে করা

জেনে রাখো, নফল ইলমে মগ্ন হওয়া নফল ইবাদতে মগ্ন হওয়ার চেয়ে উত্তম। চার ইমাম ও অন্যান্য বড়ো বড়ো উলামায়ে কেরামের অভিমত এটিই।

হাফেয যাহাবি র. বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কিছুক্ষণ ইলমি মুযাকারা করা সারা রাত নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

তাযকিরাতুল হুফফাজ: ১/৪১।

হাফেয ইবনে আবদিল বার ইমাম শাফেয়ি র.-এর ছাত্র রবি বিন সুলাইমান মুরাদির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি শাফেয়ি র.-কে বলতে শুনেছি, ইলম অন্বেষণ করা নফল নামাজের চেয়ে উত্তম।

আল-ইনতিকা: পৃষ্ঠা নং ৮৪।

ইমাম কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইলমের ফযিলতকে অস্বীকার করো না। কারণ ইমাম মালেক এবং আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা উভয়েই নফল

ইবাদতের চেয়ে জ্ঞানমগ্নতাকে উত্তম বলেছেন। ইমাম আহমদ থেকে দুটি বর্ণনা আছে, একটি ইলমের ফযিলতের ব্যাপারে। অপরটি জিহাদের। যেমনটি ইবনে তাইমিয়া র. *মিনহাযুস সুন্নায়* উল্লেখ করেছেন।

ফায়যুল বারি আলা সহিহিল বুখারি: ইলম অধ্যায়: ১/১৬২। এই বিষয়ে চার ইমামের মাযহাব আমরা এই গ্রন্থের ভূমিকার টীকায় আগেই বর্ণনা করেছি।

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নফল নামাজ না পড়ে দিনব্যাপী ইমাম আবু যুরআর সঙ্গে ইলমি আলোচনা করা

ইমাম আবু যুরআ, যিনি হাদিসশাস্ত্রের একজন ইমাম এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সামসময়িক ছিলেন। তার জীবনী বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল র. বলেন, আবু যুরআ বাগদাদে আগমন করে আমার পিতার নিকট এসে উঠলেন। আমার পিতা তার সঙ্গে অনেক ইলমি আলোচনা করতেন। একদিন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনলাম, আমি আজ ফরয নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ পড়িনি। আমি নফল নামাজের চেয়ে আবু যুরআর সঙ্গে ইলমি আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছি।

ইবনু আবি ইয়ালাকৃত *তাবাকাতুল হানাবিলাহ:* ১/২৯৯; ইবনুল জাওযি র.কৃত *মানাকিবুল ইমাম* আহমদ: ২৮৯ নং পৃষ্ঠা।

হাফেয ইবনু আবদিল বার র. নবিজির পবিত্র হাদিস ও পূর্ববর্তীগণের বিভিন্ন উক্তি তুলে ধরার মাধ্যমে এ বিষয়ে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দেখুন *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি* গ্রন্থের ২১-২৭ নং পৃষ্ঠা। ইবাদতের চেয়ে ইলমের ফযিলত অধ্যায়।

ইমাম ইবনে ওয়াহব র.-এর নফল ইলম পাঠদানের উদ্দেশ্যে নফল ইবাদত ছেড়ে দেওয়া

এ সংক্রান্ত একটি বিস্ময়কর ঘটনা আছে, জনৈক ইমাম নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য পাঠদান ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তার একজন ভক্ত একটি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে সে ইমামকে নফল ইবাদত ছেড়ে পাঠদান ও ইলমের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত হওয়ার কথা বলা হলো।

মিশরের অধিবাসী ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকিহ, আবেদ ও যাহেদ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব কুরশী, যিনি ইমাম মালেক, লাইস, সুফিয়ান সাওরি ও অন্যান্য বড়ো বড়ো ইমামের শাগরেদ ছিলেন। মৃত্যু ১৯৭ হিজরি। তার জীবনী বর্ণনায় এসেছে, সুহনুন বলেন, ইবনে ওয়াহব তার জীবনের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য। এক ভাগ মিশরের মানুষকে ইলম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। আর এক ভাগ হজ করার উদ্দেশ্যে। তিনি ছত্রিশ বার হজ করেছেন।

তার ভাতিজা বলেন, আমি তার সঙ্গে ইস্কান্দারিয়্যায় জিহাদে ছিলাম। মানুষ তার কাছে এসে তাদেরকে ইলম শেখানোর আবেদন করল। তখন তিনি আমাকে বললেন, এটি ইবাদতের শহর। তাই মানুষকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার জন্য আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত না। এই বলে যেই সময়ে তার মজলিস হতো, তিনি লোকদের নিয়ে বসতেন, সেই মজলিস ছেড়ে দিলেন এবং ইবাদত ও যুদ্ধের ময়দানে পাহারায় নিয়োজিত হলেন।

দুদিন পর এক লোক তার কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মসজিদে হারামের মতো বিরাট একটি মসজিদে আছি। সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার ডান পাশে। আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার বামে। আপনি তাঁর সামনে বসে আছেন। মসজিদে কিছু প্রদীপ জ্বলছে, যার আলো খুব উজ্জ্বল ও সুন্দর। হঠাৎ একটি প্রদীপ নিভে গেলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! যাও প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিয়ে এসো। আপনি গিয়ে তা জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর আরেকটি প্রদীপ নিভে গেল। কিছু দিন অবস্থান করার পর আপনি দেখলেন যে, সমস্ত প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। তখন আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি প্রদীপগুলোর ব্যাপারটি লক্ষ করেছেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলো হচ্ছে আবদুল্লাহর আমল, যা সে নিভিয়ে ফেলতে চায়।

এই ঘটনা শুনে ইবনে ওয়াহব খুব ক্রন্দন করলেন। সেই লোকটি তাকে বলল, আমি আপনাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি। আমি যদি জানতাম তা আপনাকে কষ্ট দেবে, তাহলে আপনার কাছে আসতাম না। তিনি বললেন, এসে ভালোই করেছো। এই স্বপ্ন আমাকে একটি বার্তা দিয়ে গেছে, আমার ধারণা ছিল ইলমের প্রচার-প্রসারের চেয়ে নফল ইবাদত উত্তম। তারপর তিনি মানুষকে পড়ানোর জন্য নিজের অনেক নফল ইবাদত ছেড়ে দিলেন এবং নিজেকে তাদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। তারা তার কাছে পড়ত, তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত।

তাকে তাঁর ভয় দান করেন।[২২৩] তার সঙ্গে নম্র আচরণ করেন। অল্পে তুষ্টির দ্বারা তার অন্তরের সচ্ছলতা দান করেন এবং তার নিজের দোষগুলো তার চোখের সামনে তুলে ধরেন।

ইবনে ওয়াহব বলেন, আমি ইমাম মালেক র.-এর সামনে বসে লিখছিলাম। নামাজ দাঁড়িয়ে গেল-এক বর্ণনায় আছে, মুয়াজ্জিন আযান দিল- আমার সামনে কিতাবপত্র ছড়ানো ছিল। আমি দ্রুত সেগুলো গোছাতে লাগলাম। তখন মালেক র. আমাকে বললেন, ধীরে, ধীরে। তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার চেয়ে যে কাজে মশগুল আছো তা উত্তম।

আন্দালুসের বিখ্যাত আলেম এবং ইমাম মালেক র.-এর শিষ্য ইমাম ইয়াহইয়া লাইসি র. বলেন, ইলম অন্বেষণে মগ্ন থাকা অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, জান্নাতে তার এবং নবিদের মাঝে শুধু এক স্তরের (নবুয়তের) ব্যবধান থাকবে।

[২২৩] সেই ব্যক্তির জন্য মুহাম্মদ বিন ওয়াসির দোয়া করা, যে তাকে বলেছিল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি'

অর্থাৎ, তিনি তাকে তাঁর ভয় দান করলেন। আল্লাহর ভয় ছিল সালাফে সালেহিনের ভূষণ। এক ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ওয়াসি র.[২২৩] -কে (তিনি মহান তাবেয়ি এবং হাসান বসরি র.-এর ছাত্র ছিলেন। হাসান বসরি র. তাঁর নাম দিয়েছিলেন, যাইনুল কুররা (অর্থাৎ, উলামায়ে কেরামের ভূষণ)। অনেক বড়ো আবেদ, মুহাদ্দিস এবং সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী মুজাহিদ ছিলেন।) বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তখন তিনি তাকে এই বলে দোয়া দিলেন, যে আল্লাহর জন্য তুমি আমাকে ভালোবাস, তিনি তোমাকে ভালোবাসুন। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মানুষ আমাকে আপনার জন্য ভালোবাসবে আর আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। (আবু নুআইমকৃত *হিলয়াতুল আউলিয়া:* ২/৩৪৯)

আমি এখানে মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন ওয়াসি সম্পর্কে তোমার অবগতি লাভের জন্য আরও কিছু কথা উল্লেখ করছি। অবশ্য ইতোপূর্বে তার আলোচনা গিয়েছে। সামনেও তার আলোচনা আসবে।

আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি রহম করুন -জেনে রাখো, সততা এবং ইখলাস হচ্ছে সর্বাবস্থার মূল। সততা থেকে সবর-ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, দুনিয়াবিমুখতা,

---

ইমাম যাহাবি *তারিখুল ইসলামে* (৫-১৫৯-১৬১) এবং ইবনুল জাওযি *আল-মিসবাহুল মুজি* নামক গ্রন্থে (১/১৮৪) বলেন, হযরত জাফর বিন সুলাইমান বলেন, আমি যখনই আমার অন্তরে কাঠিন্য অনুভব করতাম, মুহাম্মদ বিন ওয়াসির নিকট গিয়ে তার চেহারার দিকে তাকাতাম। তাকে দেখলে মনে হতো, যেন সন্তানহারা শোকার্ত মা।

ইমাম আসমায়ি বলেন, যখন কুতাইবা বিন মুসলিম[২২৩] সমর অভিযানে বের হয়ে তুর্কিদের মুকাবেলায় যুদ্ধের কাতার ঠিক করছিলেন এবং তুর্কিদের নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, তখন তিনি মুহাম্মদ বিন ওয়াসি-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোথায়? লোকেরা বলল, সে বাহিনীর ডান প্রান্তে একেবারে শেষ কোণায় নিজের ধনুক নিয়ে ব্যস্ত আছে এবং সেটাকে আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে করে নাড়াচ্ছে। কুতায়বা বললেন, (রণক্ষেত্রে) তার এই একটিমাত্র আঙুল আমার নিকট লক্ষ উন্মুক্ত তরবারি এবং ক্ষীপ্র বর্শার ফলার চেয়ে অধিক প্রিয়।

১২৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস সুলাইমান বিন বেলাল তাইমি বলেন, মুহাম্মদ বিন ওয়াসির মতো আমলনামা ছাড়া অন্য কারও আমলনামা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হতে চাই না।

এই কাফনে জড়ানো যেই দেহটি আছে সেই দেহের প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

(আরবদের গর্ব ও গৌরব, মহান বিজেতা কুতাইবা বিন মুসলিম বাহেলি র.। (জন্ম ৪৯ হিজরিতে। হযরত আমিরে মুআবিয়া রা.-এর শাসনকালে। অনুবাদক) খলিফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের শাসনামলে রায় শহরের এবং খলিফার পুত্র অলিদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে তিনি খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। মা-ওয়ারাউন নাহর (মধ্য এশিয়া) এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং সে অঞ্চলের ভেতরে প্রবেশ করেন। খাওয়ারিজম, সিজিস্তান, সমরকন্দ সহ বহু শহর জয় করে চিনের সীমান্ত এলাকাগুলো জয় করেন এবং তাদের উপর করারোপ করেন। মা-ওয়ারাউন নাহরের পুরো অঞ্চল তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তার বিজয়গুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেখানে তিনি তেরো বছর শাসন করেছেন। ৯৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।) (দেখুন যিরিকলিকৃত *আলাম*, ৫: ১৮৯)

আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আর ইখলাস থেকে সৃষ্টি হয় ইয়াকিন বিশ্বাস; আল্লাহ তায়ালার ভয়, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর আজমত, লজ্জা এবং বুযুর্গদের সম্মান।

এ সমস্ত অবস্থার সঙ্গে মুমিনের সম্পর্ক হল, মুমিনকে এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় এবং এর মাধ্যমেই তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। মুমিনকে বলা হয় আল্লাহর ভয়ে ভীত অথচ তার মাঝে আশা থাকে। বলা হয়, সে আশাবাদী অথচ তার ভেতর ভয় থাকে। আল্লাহর ভয়। সে ধৈর্যশীল অথচ সে সন্তুষ্ট। সে মহব্বতকারী অথচ লজ্জাশীল। এ সমস্ত অবস্থা তার মাঝে ইমান ও আল্লাহ তায়ালার সত্তার জ্ঞান অনুযায়ী কমবেশি হয়ে থাকে।

এ সমস্ত গুণের প্রতিটি মূলের জন্য তিনটি করে আলামত রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে সেই গুণের সঠিক পরিচয় লাভ করা যায়।

সততা তিনটি বস্তুর মাঝে নিহিত। সেগুলো ছাড়া তা পূর্ণতা পায় না। অন্তরের সততা ইমানের মাঝে পাওয়া যায়। নিয়তের সততা আমলের মধ্যে পাওয়া যায়। জবানের সততা কথার মধ্যে পাওয়া যায়।

সবর ও ধৈর্য তিনটি বস্তুর মাঝে নিহিত। সেগুলো ছাড়া সবর পূর্ণতা লাভ করে না। এক. আল্লাহ তায়ালার হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। দুই. আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, পাবন্দির সাথে তাঁর হুকুম পালন করে যাওয়া। তিন. পুণ্য লাভের আশায় বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ করা।

অল্পেতুষ্টি তিনটি বিষয়ের মাঝে নিহিত। এক. সচ্ছলতার পর তা হ্রাস পাওয়ার সময় তুষ্ট থাকা। দুই. একেবারে নিঃস্ব ও দরিদ্র অবস্থায় দরিদ্রতা ও নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করা।[২২৪] তিন. অভাব নেমে আসার সময় আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে প্রশান্তি লাভ করা।

---

[২২৪] অর্থাৎ, কোনো নেয়ামত হারিয়ে যাওয়া এবং রিযিকের স্বল্পতার সময় মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা ও আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

অল্পেতুষ্টির শুরু ও শেষ আছে। প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও অপচয় ও অপব্যয় না করা। আর চূড়ান্ত অবস্থা হচ্ছে সম্পদের স্বল্পতা দরিদ্রতা সত্ত্বেও অন্তরে সচ্ছলতা অনুভব করা। এ কারণে কেউ কেউ বলেন, অল্পে তুষ্টি সন্তুষ্টির চেয়েও অনেক উঁচু স্তরের। এ কথার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় অল্পে তুষ্টি বিদ্যমান থাকা। কারণ, আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে সর্বাবস্থায়- চাই আল্লাহ তায়ালা তাকে কিছু দান করুক বা না করুক- সন্তুষ্ট থাকে। আর অল্পে তুষ্ট (ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো কিছু না পাওয়া অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। কারণ অল্পে তুষ্টি শুধু এমতাবস্থায় হয়ে থাকে) ব্যক্তি শুধু তার রবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে। অন্য কারও প্রতি নয়। সে অধিক কামনা করে না। হাঁ, তবে এটা বলা যায় যে, অল্পে তুষ্টি রেযা তথা সন্তুষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত এবং সন্তুষ্টির দিকেই তার প্রত্যাবর্তন।

তিনটি বস্তুর মাঝে দুনিয়াবিমুখতা নিহিত। এগুলো কারও মাঝে না থাকলে তাকে যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ বলা হবে না। এক. নিজের মালিকানাধীন বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। (অর্থাৎ, সেগুলোকে নিজের মনে না করা। কিংবা সেগুলোকে নিজের মালিকানা মুক্ত করে দেওয়া) দুই. নিজেকে শুধু হালাল দ্বারা পবিত্র রাখা। (হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকা)। তিন. আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে অধিক লিপ্ত থাকার কারণে দুনিয়াকে ভুলে যাওয়া। [২২৫]

আরও তিনটি বিষয় রয়েছে, যার দ্বারা মানুষ যাহেদ হতে পারে। এক. বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা জাগ্রত হওয়ার সময় নফসকে রক্ষা করা। সম্পদ ও প্রাচুর্য যেখানে আছে সেখান থেকে পলায়ন করা। প্রয়োজনের সময় সেই বস্তু গ্রহণ করা, যার হালাল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত।

---

[২২৫] ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির পরিচয়ে বলেন, ওই ব্যক্তি প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ মূলত যে দুনিয়া পেলে উৎফুল্ল হয় না এবং হাতছাড়া হলে দুঃখিত হয় না। (আল্লামা কাজি ইয়ায রহিমাহুল্লাহকৃত *তারতিবুল মাদারিক* ৩/৪০)।

অন্তরঙ্গতা তিনটি বিষয়ের মাঝে নিহিত। ইলম এবং নির্জনে আল্লাহর যিকিরের প্রতি। নির্জনতার সঙ্গে ইয়াকিন ও আল্লাহর মারেফাতের প্রতি অন্তরঙ্গতা। তিন. সর্বাবস্থায় অন্তর আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যুক্ত থাকা।[২২৬]

সন্তুষ্টি তিনটি বিষয়ের মাঝে নিহিত থাকে। এক. আল্লাহর যাবতীর হুকুম আহকাম গ্রহণ করে নেওয়া। দুই. তাঁর হুকুমের সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়া। তিন. তাঁর ফয়সালার ব্যাপারে নিজের কোনো পছন্দ না থাকা।

রেযা তথা সন্তুষ্টি হচ্ছে ভালোবাসার শক্ত বাঁধন, এর অপর নাম তাওয়াক্কুল, এটি ইয়াকিনের রুহ। হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানি এবং ফুযাইল বিন ইয়াজ র. থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা দুজন বলতেন, রেযা হচ্ছে তাওয়াক্কুলের নাম। অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ভরসা করার নামই হচ্ছে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

এ সবগুলো হচ্ছে সততার বিভিন্ন শাখা, যা বিস্তারিতরূপে আমরা জানতে পারলাম। সুফিয়ান সাওরি র. বলেন, যখন সত্যবাদীর সততা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে নিজের কোনো কিছুর মালিক থাকে না।[২২৭]

---

[২২৬] ১১৭ নং টীকায় এই বিষয় সংশ্লিষ্ট ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। 'বন্দি জীবনের উপর ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.-এর ধৈর্য এবং তার বিস্ময়কর আত্মিক প্রশান্তি শিরোনামে'। আপনি সে আলোচনাটি পড়ে দেখতে পারেন।

[২২৭] বুহলুল বিন রাশেদ কাইরুয়ানি মালেকি, যিনি একজন বিখ্যাত আলেম ও যাহেদ ছিলেন। তার জীবনীতে এসেছে, একবার তিনি জানতে পারলেন যে তৎকালিন আফ্রিকার বাদশা মুহাম্মদ বিন মুকাতিল আক্কী স্পেনের সম্রাটের সঙ্গে খুব নম্র ও কোমল আচরণ করতেন। সম্রাট তার কাছে একবার কিছু লোহা, তামা ও অস্ত্র চাইলেন। তিনি তা প্রদানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বুহলুল বিন রাশেদ এতে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাকে উপদেশ দিলেন এবং এমনটি করা থেকে বিরত থাকতে খুব করে বারণ করলেন। যেহেতু এতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করা হয়, তাই এটি নাজায়েয।

বাদশাহ তখন তাকে গ্রেফতার করে তার দরবারে উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ বুহলুলের পাশে এসে দাঁড়াল এবং তাকে গ্রেফতারে বাধা প্রদান করল। এতে বাদশা তার প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সৈন্য পাঠিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন (এবং বুহলুলকে গ্রেফতার করলেন)। তারপর তাকে খালি গায়ে চাবুকাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। তখন এক দল লোক চাবুকের আঘাত থেকে তাকে রক্ষায় তার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের সবাইকে তখন পেটানো হল।

তাকে বিশটির মতো চাবুক মারা হলো। তারপর তাকে বন্দি করা হয়। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। চাবুকের আঘাতে তার শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ক্ষতের দাগ অবশ্য পড়ে চলে যায়। কিন্তু এই আঘাতের কারণেই তার মৃত্যু হয়। ১৮৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কারাগারে নিক্ষেপ করার পর কারারক্ষী এলো তার ক্ষতের চিকিৎসা করার জন্য। বুহলুল তাকে এক দিনার এবং তার সঙ্গে আসা অন্যান্যদের এক দিরহাম করে দিয়ে বললেন, নিজেদের প্রয়োজনে এটি খরচ করো। তিন দিন পর্যন্ত তিনি এভাবে দিলেন। যখনই কারারক্ষী আসত তিনি তাকে এক দিনার দিতেন। তাই তার সঙ্গীরা আশংকা করল, সুস্থ হওয়ার আগেই তার সঙ্গে থাকা সব অর্থ শেষ হয়ে যাবে। তখন তারা কারারক্ষী ও তার সঙ্গীদের এই বলে নিষেধ করে দিল যে, ক্ষত সেরে গেছে। আর আসার দরকার নেই। এরপর যখন তারা আসা বন্ধ করে দিল, তখন বুহলুল তার সঙ্গীদের কারারক্ষী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং অভিযোগের সুরে বলল যে, তোমরাই তাকে আসতে বারণ করেছ। সঙ্গীরা তখন তাকে বলল, হে আবু উমর, প্রতিদিন এক দিনার?! (অর্থাৎ, পারিশ্রমিক হিসেবে এটা তো অনেক বেশি)। উত্তরে তিনি তাদের বললেন, এতে সমস্যা কি? তখন তার সমর্থনে সঙ্গীদের মধ্য থেকে হাফস বিন উমারা তাকে বলল, আমি সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যখন সত্যবাদীর সততা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে নিজের কোনো কিছুর মালিক থাকে না। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুহলুল তার হাতের উপর পড়ে চুমু খেতে লাগল। আর বলতে লাগল, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি আসলেই সুফিয়ান সাওরিকে এ কথা বলতে শুনেছ? তখন তিনি শপথ করে বললেন যে, হাঁ, তিনি সুফিয়ান সাওরিকে এ কথা বলতে শুনেছেন। যেন বুহলুল সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ-এর এই কথাটিকে অনেক দামি মনে করলেন এবং খুব আশ্চর্য হলেন। এ কারণে তিনি তার সঙ্গী ও শিষ্য হাফস বিন উমারার হস্তচুম্বন করেছেন। (কাজি ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ-কৃত *তারতিবুল মাদারিক*: ৩/৯৮-১০১, জারকালি রহিমাহুল্লাহ-কৃত *আলাম*: ২/৫৫, আবুল আরাব কাইরুয়ানি রহিমাহুল্লাহ-কৃত *তাবাকাতু উলামায়ে আফ্রিকিয়া ও তিউনিস*: ১৪০ নং পৃ.) আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন।

ধনসম্পদ-যা দুনিয়াদারদের নিকট প্রিয় ও মূল্যবান- সত্যবাদী আহলুল্লাহদের নিকট এমনই নগণ্য হয়ে থাকে। তারা সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেওয়ার চেয়ে তা খরচ করে ফেলাকেই অন্তরের পবিত্রতার জন্য অধিক উত্তম জ্ঞান করেন, যাতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সততা বজায় রাখার দ্বারা তাদের অন্তর্দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের জীবনাচরণ, কথাবার্তা ও তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণের দ্বারা উপকৃত করুন।

আর ইখলাসের শাখা-প্রশাখা হচ্ছে, মুখলিসকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুখলিস বলা হবে না, যতক্ষণ সে আল্লাহকে সমস্ত শরিক ও সমকক্ষ, স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পবিত্র জ্ঞান না করবে।[২২৮]

---

২২৮ ইখলাসের পাঁচটি বিস্ময়কর ঘটনা

আমরা এখন পাঁচটি ঘটনা বর্ণনা করব, যা পড়ে তুমি ইখলাসের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানেতে পারবে এবং কোনো কাজ ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার বিষয়টি বুঝতে পারবে।

আমের বিন আবদ কায়েস এবং মণি-মুক্তার সিন্দুক

১. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম ইবনে জারির তাবারি রহিমাহুল্লাহ ১৬ হিজরির ঘটনা বর্ণনায় লিখেন, যখন মুসলিমগণ মাদায়েন জয় করল এবং সমস্ত গনিমত একত্র করল তখন একজন ব্যক্তি বড়ো একটি সিন্দুক নিয়ে এল, সিন্দুকটি মণি-মুক্তা ও বিভিন্ন উপঢৌকনে পরিপূর্ণ ছিল। সে তা গণিমতের মাল সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দিল। লোকেরা বলল, আমরা এত বড়ো খাজানা আজ পর্যন্ত দেখিনি। আমাদের কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা এর সমপরিমাণ তো দূরের কথা এর কাছাকাছিও না। তারা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এখানে থেকে কিছু নিয়েছ? সে বলল, আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস আমার মাঝে না থাকত, তাহলে আমি তা তোমাদের কাছে জমা দিতে নিয়ে আসতাম না। তারা বুঝতে পারল যে, এই লোকটি উঁচু মাপের দিনদার। তারা তার পরিচয় জানতে চাইল। তখন সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের আমার পরিচয় বলব না। তাহলে তোমরা আমার প্রশংসা করা শুরু করবে, অন্য কাউকেও বলব না। তবে আমি শুধু আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি এবং তাঁর প্রতিদানেই সন্তুষ্টি আছি। (এ কথা বলে সে চলে গেল)।
তারা তার পেছনে একজন লোক লাগিয়ে দিল। সে তার পিছু পিছু গিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তখন সে জানতে পারল যে, ইনি আমের বিন আবদ কায়েস হাযরামি। যিনি দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুজার তাবেয়িদের অন্তর্ভুক্ত। একজন ইবাদতগুজার বান্দা হিসেবে বসরায় সর্বপ্রথম তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (*তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*: ৪/১৭৬)

আখেরাতে সুড়ঙ্গে প্রবেশকারী ব্যক্তির থাকার জন্য মাসলামার প্রার্থনা

২. ইবনে কুতাইবা রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, মাসলামা বিন আবদুল মালেক* একটি দুর্গ অবরোধ করলেন, সেই দুর্গের প্রাচীরে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন যে, লোকেরা সেখান দিয়ে প্রবেশ করুক। কিন্তু কেউ প্রবেশ করল না। সাধারণের মধ্য থেকে তখন একজন অপিরিচিত ব্যক্তি এগিয়ে এল এবং সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল। তার কারণেই আল্লাহ্ তাদের দুর্গের বিজয় দান করেছিলেন। মাসলামা ঘোষণা করলেন, সুড়ঙ্গে প্রবেশকারী ব্যক্তিটি কোথায়? কিন্তু কেউ তার কাছে এল না। তিনি তখন বললেন, আমি দরবারের প্রহরীকে বলে দিয়েছি, ওই ব্যক্তি আসলে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমি কসম খেয়েছি তার আসার ব্যাপারে। তাই সে যেন অবশ্যই আমার কাছে আসে।

তখন এক ব্যক্তি এসে প্রহরীকে বলল, আমাকে বাদশার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। প্রহরী তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সুড়ঙ্গে প্রবেশকারী? সে বলল, আমি আপনাদের তার খবর দিতে এসেছি। প্রহরী মাসলামার কাছে এসে তাকে তার সম্পর্কে বলল। তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। লোকটি মাসলামাকে বলল, সুড়ঙ্গে প্রবেশকারী লোকটি তিনটি শর্ত দিয়েছে। ১. আপনারা তার নাম লিপিবদ্ধ করে খলিফার কাছে পাঠাবেন না। ২. তার জন্য কোনো পুরস্কার ঘোষণা করবেন না। ৩. তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না সে কোন গোত্রের। মাসলামা বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। তখন লোকটি বলল, আমিই সেই লোক।

এই ঘটনার পর মাসলামা যখনই নামাজ পড়তেন, নামাজ শেষে এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, হাশরের দিন আপনি আমাকে সুড়ঙ্গে প্রবেশকারী ব্যক্তির সঙ্গে রাখুন। (*উয়ুনুল আখবার*: ১/১৭২)।

*মাসলামা বিন আবদুল মালেক বিন মারওয়ান বিন হাকাম উমাবী। শামে বসবাসকারী একজন তাবেয়ি। সামরিক কমাণ্ডার ও বীর সিপাহসালার। তার অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধ জয় আছে। ৯৬ হিজরিতে তিনি কনস্টান্টিনোপল জয় করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটির নাম মসজিদে মাসলামা। ১০৯ হিজরিতে তিনি তুরস্ক এবং সিন্ধু জয় করেন। তার মৃত্যু ১২০ হিজরিতে। ইমাম যাহাবি বলেন, তিনি তার সকল ভাইয়ের চেয়ে খেলাফতের অধিক যোগ্য ছিলেন।))। (যিরিকলিকৃত *আলাম*: ৮/১২২)

ইবনে আওন বাসরি কর্তৃক নিজের পরিচয় গোপন রেখে একজন রোমক সৈন্যকে হত্যা করা

বিখ্যাত ইমাম, ফকিহ ও মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ বিন আওন বাসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। জন্ম ৬৬ হিজরিতে। মৃত্যু ১৫১ হিজরিতে। তার জীবনী বর্ণনায় এসেছে, মুফাযযাল বিন লাহেক বলেন, আমরা রোমে (জিহাদে নিয়োজিত) ছিলাম। একজন রোমক সৈন্য মুখোমুখি লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়লে এক লোক গিয়ে তাকে হত্যা করে-নিজের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে-মুসলিম সৈন্যদের মাঝে মিশে গেল। আমি তার পেছন পেছন গেলাম দেখার জন্য যে, লোকটি কে? তার মাথায় একটি বর্ম ছিল। চেহারা মোছার জন্য মাথা থেকে বর্মটি খুললে দেখলাম যে তিনি ইবনে আওন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (ইমাম যাহাবিকৃত *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৬/৩৬৮)

ইয়াকুব বিন জাফর কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গালিগালাজকারী এক রোমককে তির মেরে হত্যা করা

৪. সুলি বর্ণনা করেন, ইয়াকুব ইবনে জাফর ইবনে সুলাইমান আমাদের বর্ণনা করেন যে, আম্মুরিয়ার যুদ্ধে আমি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর** সঙ্গে ছিলাম। লোকদের পানির ভীষণ প্রয়োজন দেখা দিল। মুতাসিম তাদের জন্য দশ মাইল দূর থেকে পানির নহর প্রবাহিত করে আম্মুরিয়ার প্রাচীর পর্যন্ত নিয়ে এলেন। আর এই পুরো নহরটি ছিল চামড়া দিয়ে বানানো। বলা হয়, তার বাহিনীতে আশি হাজার সাদা-কালো বর্ণের ঘোড়া এবং আশি হাজার কালো ঘোড়া ছিল।

এক রোমক প্রতিদিন প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও বংশ নিয়ে আরবিতে গালিগালাজ করত। এটি সহ্য করা ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টের। (কিন্তু সে এত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল যে) তির তার পর্যন্ত পৌঁছত না। ইয়াকুব বলেন, আমি খুব দক্ষ তিরন্দাজ ছিলাম। এক দিন আমি তাকে লক্ষ করে তির ছুড়লাম। তিরটি তার গলায় গিয়ে বিদ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মুসলমানগণ আল্লাহু আকবার বলে তাকবির দিল। খলিফা মুতাসিম খুব খুশি হলেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন আমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? আমি আমার বংশ পরিচয় তুলে ধরলাম। তিনি তা শুনে শোকর আদায়স্বরূপ বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার, যিনি এই তির নিক্ষেপের সওয়াব এমন ব্যক্তির ভাগ্যে রেখেছেন যে আমার বংশের লোক। অর্থাৎ, বনু আব্বাসের।

তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে তুমি এই তিরের সওয়াব বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন, সওয়াব কি বিক্রি করা যায়? আমি তোমাকে বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ করছি। তখন তিনি আমাকে এক লক্ষ দিরহাম দিলেন। আমি বললাম, আমি আমার সওয়াব বিক্রি করব না। তিনি তখন আমাকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম দিলেন। আমি বললাম, দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুর বিনিময়ে হলেও আমি এর সওয়াব বিক্রি করব না। তবে আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনাকে এর অর্ধেক সওয়াব দান করে দিচ্ছি। খলিফা বললেন, জাযাকাল্লাহু খাইরান (আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।) আমি এতেই সন্তুষ্ট।

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিরন্দাজি তুমি কোত্থেকে শিখেছো? আমি বললাম, বসরায়। নিজ বাড়িতে। তিনি বললেন, বাড়িটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, আমি বাড়িটি তাদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম যারা তিরন্দাজি শিখতে চায়। তারপর তার পক্ষ থেকে আমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হলো।

কতই না সৌভাগ্যবান ওই বাদশা যে এই তিরের সওয়াব হাসিল করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। আর সেই তিরন্দাজও কতই না সৌভাগ্যবান, যে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময়েও তার তিরের সওয়াব বিক্রি করতে চান না।

কবি বলেন,

তাদের উপর কম ভর্ৎসনা করো, (তোমার কোনো পিতা না থাকুক)

অন্যথায় তুমি সেই কীর্তি দেখাও, যেই কীর্তি তারা দেখিয়েছিল।

আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর পুরো নাম আবু ইসহাক মুহাম্মদ বিন হারুনুর রশিদ বিন মাহদি বিন মানসুর। আব্বাসি খেলাফতের বড়ো খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ২১৮ হিজরিতে তার ভাই খলিফা মামুনের মৃত্যুর দিন খলিফা হিসেবে মানুষ তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। মুতাসিম বীর বাহাদুর ও শক্তিধর ছিলেন। তিনি দুই আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে মানুষের হাতের হাড় ভেঙে ফেলতে পারতেন। কেউ দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে তার শরীরে দাগ বসাতে পারত না। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শহর আম্মুরিয়া* জয় করেন যা ইতোপূর্বে অজেয় ছিল। নরম স্বভাবের ছিলেন। সবার প্রিয় ছিলেন। তার সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত ছিল। সুন্দর দেহাবয়বের অধিকারী ছিলেন। গাত্র বর্ণ ছিল ফর্সা। দাড়ি ছিল লম্বা। ১৭৯ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ২২৭ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।) (*যিরিকলিকৃত আলাম:* ৭/৩৫১)

***আম্মুরিয়া জয়ের কারণ

আম্মুরিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত অনেক বড়ো একটি শহর। বর্তমানে এটি তুরস্কের ফ্রিজিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। (এর বর্তমান নাম আমোরিয়াম)। শহরটি সুদৃঢ় প্রাচীর ঘেরা ও বড়ো বড়ো উঁচু প্রাসাদবিশিষ্ট ছিল। সমরাস্ত্র ও শক্তির দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত শহর। আব্বাসী খলিফা মুতাসিমের আম্মুরিয়া অভিযানের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনুল আসির *কামেল* গ্রন্থে (৫/২৪৭) বলেন, খলিফা মুতাসিমের কাছে সংবাদপৌঁ ছল যে, রোমান বাহিনীর হাতে বন্দি এক মুসলিম হাশেমী নারী ওয়া মুতাসিমা, ওয়া মুতাসিমা (হায় মুতাসিম, হায় মুতাসিম) বলে সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছে। খলিফা তখন সিংহাসনে বসা ছিলেন। এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাব্বাইক লাব্বাইক বলে সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে যান এবং চিৎকার করে যুদ্ধের প্রস্তুতির ঘোষণা দেন। তারপর ঘোড়ায় চড়ে তিনি প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসেন। (গণ্যমান্য আলেম ও বাগদাদের আবদুর রহমান বিন ইসহাককেও ডাকেন। সবার সামনে) তিনি মৃত ব্যক্তির ন্যায় ওসিয়ত করে তা লিপিদ্ধ করান। (ধন সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করেন।) সৈন্যদের সমবেত করেন এবং তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সাধারণ লোকদের মাঝেই অবস্থান করেন। শাহীমহলে আর ফিরে যাননি।

তিনি সভাসদদের জিজ্ঞাসা করেন, রোমানদের সবচেয়ে সুরক্ষিত শহর কোনটি? তারা বলল, আম্মুরিয়া। আজ পর্যন্ত মুসলমানরা এই শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি। এই শহর তাদের নিকট কনস্টান্টিনোপলের চেয়েও সম্মানিত। ২২৩ হিজরিতে খলিফা মুতাসিম তার বাহিনী নিয়ে আম্মুরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ ৫৫ দিন অবরোধ এবং ভীষণ যুদ্ধ করার পর তিনি তা জয় করতে সমর্থ হন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাদের সম্পর্কে কবি হুতাইয়া বলেন,

তারা এমন মানুষ যারা কোনো কিছু নির্মাণ করলে সুনিপুণভাবে করে। ওয়াদা করলে পূরণ করে, চুক্তি করলে দৃঢ়ভাবে করে।)

(দেখুন, ফিলিস্তিনের গাজার বাসিন্দা এবং সেখানকার মুফতি ইবরাহিম বিন অলি আল-হানাফি আস-সিবাহির *রেসালায়ে সুদুর ওয়ার রিমায়াহ ওয়াল খাইল*, এটি মক্কা মুকাররমার আল-হারামুল মাক্কী লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত আকারে সংরক্ষিত আছে, ৯৫৯ হিজরিতে তিনি এটি লেখা সমাপ্ত করেন।)

আবু আমর নুজাইদের নিজের পরিচয় গোপন রেখে রাতের বেলায় দান করা

৫. ইখলাসের পঞ্চম ঘটনাটি বিশিষ্ট আলেম, ইবাদতগুজার, দুনিয়াবিমুখ, মুহাদ্দিস, আধ্যাত্মিক গুরু আবু আমর বিন নুজাইদ (ইসমাইল বিন নুজাইদ সুলামি নিসাপুরি)-এর। তার ছাত্র হাকেম তার সম্পর্কে বলেন, ইনি হলেন শায়খ, আবেদ, যাহেদ, তাসাউফ, ইবাদত ও মুআমালার ক্ষেত্রে সে যুগের ইমাম। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে খুরাসানের মুহাদ্দিসিনদের মাঝে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তার পিতার কাছ থেকে অনেক সম্পদ লাভ করেছিলেন, যা তিনি উলামা ও দুনিয়াবিমুখ মাশায়েখে কেরামের পিছনে ব্যয় করেছিলেন। তিনি তাসাউফের শায়খ জুনাইদ, আবু উসমান হিরী ও অন্যান্য বুজুর্গের সান্নিধ্যে ছিলেন।

হাকেম উল্লেখ করেন যে, তিনি আবু সাইদ বিন আবু বকর বিন আবু উসমানকে বলতে শুনেছেন তার দাদা আবু উসমান হিরি সীমান্ত প্রহরা চৌকি নির্মাণের জন্য মানুষের কাছে কিছু চাঁদা চাইলেন। কিন্তু সাহায্য আসতে বিলম্ব হল। এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে, শত্রুরা না আবার আক্রমণ করে বসে এবং মানুষের সামনেই কেঁদে ফেললেন। এশার নামাজের পর অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার পর আবু আমর ইবনে নুজাইদ দু হাজার দিরহামের একটি থলে নিয়ে এলেন। আবু উসমান অনেক খুশি হলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। পরদিন সকালে মজলিসে বসে আবু উসমান লোকদের বললেন, আমি আবু আমরের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে অনেক আজর ও সওয়াবের আশা রাখি। কারণ সে সকলের পক্ষ থেকে একাই পুরো দায়িত্ব আদায় করেছে এবং এত দিরহাম নিয়ে এসেছে৷ আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আবু উমর তখন উপস্থিত লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তা আমার আম্মার সম্পদ থেকে এনেছি৷ তিনি তা দিতে নারাজ ছিলেন। তাই ভালো হয়, আপনি যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমি তা তাকে ফেরত দিতে পারি। আবু উসমান থলিটি বের করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর লোকেরা চলে গেল।

রাত যখন গভীর হল, তখন আবু আমর গতকালের মতো আবু উসমানের নিকট এলো। এসে বলল, আপনাকে এই সম্পদ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে আমরা দুজন ছাড়া অন্য কেউ জানতে না পারে। এ কথা শুনে আবু উসমান কেঁদে ফেললেন। এ ঘটনার পর আবু উসমান বলতেন, আমি আবু আমরের হিম্মতকে ভয় পাই। ৩৬৫ হিজরিতে আবু আমর নিসাপুরে পরলোক গমন করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

আবদুল ফাত্তাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, হয়ত এমনটি করার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল, কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে যেই সাত শ্রেণির লোক স্থান পাবে তাদের

তারপর তাওহিদের আকিদাকে সঠিক করে আল্লাহর জাতের ইরাদা করবে এবং নিজের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যয় করবে এবং সমস্ত ফরজ ও নফল আমলসমূহে তাঁর আহকামের প্রতি খেয়াল রাখবে।

ইয়াকিন সঠিক হওয়া তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে। **এক.** আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করার ক্ষেত্রে অন্তর প্রশান্ত থাকা। **দুই.** তাঁর হুকুমের সামনে নত হওয়া। **তিন.** অন্তরে তাঁর ভয় রাখা। যেহেতু তিনি পূর্ব থেকে সবকিছু জানেন। (অর্থাৎ, এই মনে করা যে, হয়ত আল্লাহ তায়ালার ইলমে আমার অবস্থা ভালো নয়।)

ইয়াকিনের শুরু ও শেষ আছে। এর প্রাথমিক অবস্থা হলো ইতমিনান তথা আশ্বস্তি। আর শেষ অবস্থা হলো, সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে মনে করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? (সুরা যুমার : ৩৬)

তিনি আরও বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

হে নবি, আপনি এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সুরা আনফাল : ৬৪)

হাসব বলা হয় যথেষ্টকে। আর মুকতাফি ওই বান্দাকে বলা হয়, যে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট।

আমরা বলেছি, ইয়াকিনের চূড়ান্ত ও শেষ স্তর হচ্ছে ইমানের ক্ষেত্রে বান্দার সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকা। ইলমের ক্ষেত্রে ইয়াকিনের শেষ স্তর উদ্দেশ্য নয়। আর আল্লাহর কোনো মাখলুক সেই স্তরে পৌঁছতে পারে না। যেমনটি রাসুল

অন্তর্ভুক্ত হওয়া। সেই সাত শ্রেণির মাঝে এক শ্রেণির লোক এমন থাকবে, যারা এমন গোপনে দান-সদকা করত যে, তাদের বাম হাত জানত না ডান হাত কী দান করেছে। (তাজুদ্দিন সুবকি র.কৃত *তাবাকাতুস শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা:* ৩/৩২৩)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ আল্লাহ তায়ালার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা শুনেছি যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পানির উপর দিয়ে হাঁটতেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَوِ ازْدَادَ يَقِينًا وَخَوْفًا لَمَشَى فِي الْهَوَاءِ.

তিনি যদি আরও অধিক ইয়াকিন ও আল্লাহর ভয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তিনি বাতাসে চলতেন।[২২৯]

আর একমাত্র ইয়াকিন ও বিশ্বাস আসার পর আল্লাহর ভয় তৈরি হয়। তুমি কি এমন কাউকে দেখেছো, যে এমন কিছুকে ভয় পায় যাকে সে বিশ্বাস করে না?

---

[২২৯] এটি একটি মওজু হাদিস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে একে সম্পৃক্ত করা মিথ্যা। *ইহইয়া উলুমুদ্দিন* (১২/৯৪) গ্রন্থেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। হাফেয ইরাকি র. হাদিসটি তাহকিক করতে গিয়ে বলেন, জানা বিষয় যে, এটি বকর বিন আবদুল্লাহ মুযানি-এর উক্তি, যা ইবনু আবিদ দুনিয়া কিতাবুল ইয়াকিন-এ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাওয়ারিগণ তাদের নবিকে হারিয়ে ফেলেছিল। তখন তাদের বলা হল, সমুদ্রের দিকে যাও। তারা তাঁকে খুঁজতে সেদিকে গেল। সমুদ্রের কাছ পৌঁছলে তারা দেখতে পেল তিনি পানির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছেন। তখন ইবনু আবিদ দুনিয়া একটি হাদিস উল্লেখ করেন যে, হযরত ইসা আ. বলেন, যদি বনি আদমের চুল পরিমাণ ইয়াকিন থাকত, তাহলে সে পানির উপর দিয়ে হাঁটত।

ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, বকর বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, হাওয়ারিগণ তাদের নবিকে হারিয়ে ফেলেছিল। তখন তারা তাকে খুঁজতে বের হল। খুঁজতে গিয়ে দেখল যে তিনি পানির উপর দিয়ে হাঁটছেন। তখন একজন বলল, হে আল্লাহর নবি, আমরাও কি আপনার মতো পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারব? তিনি বললেন, হাঁ। তখন লোকটি এক পা পানির উপর রেখে আরেক পা উঠাতে গেলে ডুবে গেল। তখন আল্লাহর নবি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে দুর্বল ইমানের অধিকারী! হাত বাড়াও। যদি বনি আদমের শস্যের দানা কিংবা যাররা পরিমাণ ইমান থাকত তাহলে সে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারত। (*কিতাবুয যুহদ:* ৫৬-৫৭)

আমি বলি, এটি ইসরাইলি রেওয়ায়েত, আমাদেরকে যা বিশ্বাসও করতে বলা হয়নি, অবিশ্বাসও না। অবশ্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তা বর্ণনা করা জায়েয আছে।

ভয় তিনটি জিনিসের মাঝে নিহিত

এক. ইমানের ভয়। এর আলামত হলো গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানি ছাড়ার ব্যাপারে মেহনত মুজাহাদা করা।[২৩০] মুরিদদের ভেতর এই ভয় থাকে।

দুই. ইমান ও আমল হারা হয়ে যাওয়ার ভয়। এর আলামত হলো, অন্তরে সদা আল্লাহর ভয় থাকা। আল্লাহ তায়ালার মারেফাত হাসিলকারী আলেমদের মাঝে এই ভয় থাকে।

তিন. ফউত হয়ে যাওয়ার ভয়। এর আলামত হলো, অন্তরে আল্লাহ তায়ালার আযমত ও বড়ত্বের অনুভূতি রেখে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে মেহনত মুজাহাদা করা। সিদ্দিকগণের অন্তরে এই স্তরের ভয় থাকে।

চার. ভয়ের চতুর্থ স্তরটি শুধু ফেরেশতা ও নবিদের জন্য। আল্লাহ তায়ালা শুধু তাদের এই ভয় দান করেন। তা হলো, তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্বের ভয়। যদিও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার গুণে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিরাপদ থাকেন। কিন্তু তাদের ভয় আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের বিচারে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

মহব্বত তিনটি জিনিসের মাঝে নিহিত। যেগুলো ব্যতীত কাউকে আল্লাহ তায়ালাকে মহব্বতকারী বলা হয় না।

---

[২৩০] অর্থাৎ, বাহ্যিক ও আত্মিক গুনাহ বর্জন করা। মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ বিন ওয়াসি র. বলেন, যদি গুনাহের কোনো গন্ধ থাকত, তাহলে দুর্গন্ধের কারণে তোমরা আমার কাছে আসতে পারতে না। (আবু নুআইমকৃত হিলয়াতুল আউলিয়া, ২:৩৪৯)

গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ২০৬ নং টীকায় করা হয়েছে।

এক. মুমিনদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা।[২৩১] এর আলামত হলো, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরিয়ত মোতাবেক মানুষের উপকার করার চেষ্টা করা।

দুই. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করা, ভালোবাসা।[২৩২] এর আলামত হলো, তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা।[২৩৩] আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি বলুন,

---

[২৩১] আল্লাহর তায়ালার মহব্বতের সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা মহান তাবেয়ি মাসরুক বিন আজদা রহিমাহুল্লাহ করেছেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। মাসরুক বললেন, তুমি মূলত আল্লাহকে ভালোবাসো। তাই আল্লাহ যাকে ভালোবাসে তুমি তাকেও ভালোবাসো। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহকৃত *আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল,* ১:৭৩।)

[২৩২] অর্থাৎ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এজন্য মহব্বত করা যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মহব্বত করার হুকুম দিয়েছেন।

[২৩৩] অর্থাৎ, প্রতিটি কাজে-কর্মে, আচরণে-উচ্চারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণ করা, তাঁর আদর্শ আঁকড়ে ধরা। তিনি যা করেছেন তা করা এবং যেভাবে করেছেন সেভাবে করা। আর যা না করেছেন তা না করা। তিনি যা বলেছেন তা বলা এবং যা নিষেধ করেছেন তা না বলা। এ ব্যাপারে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আছে যা সামনে আসছে। কিন্তু যদি কোনো কাজ আপনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়ার কারণে না ছাড়েন। বরং অন্য কোনো কারণে ছাড়েন, তাহলে এটা হবে সামঞ্জস্যতা, তাঁর অনুসরণ নয়। সামঞ্জস্য বা মিল বলা হয় কোনো বিষয় উভয়ের একরকম হওয়া, অংশীদারত্ব। যদিও আদর্শের দিক থেকে তাদের মাঝে বৈপরীত্ব থাকুক। তাই মুওয়াফাকাত বা সামঞ্জস্যতা বিষয়টি অনুসরণের চেয়ে ব্যাপক। কারণ মুওয়াফাকাত কখনো অনুসরণ ছাড়াও হতে পারে।

(দেখুন আল্লামা, ফকিহ, উসূলবিদ আবুল বাকা আল-ফুতুহী হাম্বলি র.কৃত *আল-কাওকাবুল মুনীর শারহু মুখাতাসারিত তাহরির,* ২/১৯৬।)

তাকলিদ সম্পর্কে কিছু কথা

সাধারণ মানুষ যখন কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করে তখন সেটাকে ইত্তেবা বলে। কারণ শরিয়তের মুকাল্লাফ ব্যক্তি হয় মুজতাহিদ হবে, তখন সে শরিয়তের দলিলের অনুসরণ করবে। অথবা সে মুকাল্লিদ হবে, তখন মুজতাহিদের দলিলই তার দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা তার ক্ষেত্রে মুজতাহিদকে অনুসরণ করা আবশ্যক করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা না জেনে থাক, তাহলে কুরআনের জ্ঞান যারা রাখে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। আর মুজতাহিদের ক্ষেত্রে আবশ্যক হল ইজতেহাদ করা। ইমাম শাফেয়ি র. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণকেই তাকলিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (সংক্ষিপ্তাকারে আল্লামা ইবনে আমির হাজ্জকৃত *আত-তাকরির ওয়াত তাহবির* গ্রন্থ থেকে, ৩: ৩৪০।)

সুন্নতের অনুসরণের অনেক সুরত আছে। নিজের জান-মাল ব্যয় করা, যদিও তাতে অনেক কষ্ট হয়। অথবা অনেক অর্থ-সম্পদ ব্যয় হয়। এই অবস্থায় জান-মাল ব্যয় করে সুন্নতের উপর আমল করে তুমি তোমার ব্যয় করা জান-মালের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সওয়াব হাসিল করবে।

তোমার সামনে এখন সুন্নত অনুসরণে সম্পদ ব্যয়ের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। হয়ত এমনটি তোমার কল্পনাতেও কখনো আসেনি। আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবি হুসাইন বলেন, উসমান বিন আফফান রাদিআল্লাহু আনহু এক লোকের কাছ থেকে একটি বাগান কিনলেন। দরদাম করার পর একটি মূল্য নির্ধারণ করা হলো। উসমান রা. বিক্রেতাকে বললেন, আমাকে তোমার হাত দাও। (আরবদের মধ্যে একটি রীতি ছিল, ক্রেতা-বিক্রেতা হাতের উপর হাত রেখে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি পাকা করত। এ ছাড়া চুক্তি মজবুত হত না।) বিক্রেতা উসমান রাদিআল্লাহু আনহুকে হাত বাড়াতে দেখে বলল, আল্লাহর কসম, আপনি আরও দশ হাজার দিরহাম না দিলে আমি বিক্রি করব না। তখন উসমান রাদিআল্লাহু আনহু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু আনহুর দিকে ফিরে বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে ক্রয়-বিক্রয় এবং বিচার করা ও বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে উদার।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.

যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। (*সুরা আলে ইমরান* : ৩১)

তিন. আল্লাহর নাফরমানির পরিবর্তে তাঁর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে মহব্বত করা। আর প্রসিদ্ধ কথা, কারও অনুগ্রহের আলোচনা অন্তরে তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে।[২৩৪]

---

[২৩৪] **অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টিকারী দশটি আমল**

আল্লামা ফিরোজাবাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টিকারী আমল দশটি। যথা-

১. কুরআনের আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে গভীর চিন্তা-ফিকিরের সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত করা।

২. ফরযসমূহ আদায়ের পর নফলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল করা। কারণ, নফল আমলসমূহ বান্দার অন্তরে শুধু আল্লাহ তায়ালার মহব্বতই সৃষ্টি করে না। বান্দাকে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় করে তোলে।

৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার যিকির করা। চাই তা সশব্দে হোক কিংবা মনে মনে। কেননা মানুষ প্রিয় সত্তার যিকির যত করে, অন্তরে তার প্রতি মহব্বতও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৪. প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নার সময় নিজের ইচ্ছার উপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া।

৫. মনে মনে আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলিসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তা-ফিকির করা এবং অন্তর্চক্ষু দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করা। সর্বদা তার মারেফাত ও পরিচয় লাভের চেষ্টা করা। যে আল্লাহ তায়ালার নাম, গুণাবলি ও কর্মের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় লাভ করল, সে অবশ্যই আল্লাহকে ভালোবাসবে। তাঁর প্রেমে পড়বে।

৬. আল্লাহ তায়ালার ইহসান-অনুগ্রহ, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নেয়ামত প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করা।

মহব্বতের শুরু, মাঝামাঝি এবং শেষ তিনটি স্তর রয়েছে। মহব্বতের সূচনা, অনুগ্রহ ও নেয়ামত লাভের মাধ্যমে হয়। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রকৃতিগতভাবে অন্তরে সেই সমস্ত ব্যক্তির মহব্বত স্থান করে নেয়, যারা তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। আর চির সহনশীল মহান আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, দয়ার্দ্র, কোমল ও ক্ষমাকারী আর কে আছে!

মধ্যম স্তর হচ্ছে: আল্লাহ তায়ালার আদেশসমূহ পালন করা, নিষেধসমূহ থেকে এমনভাবে বেঁচে থাকা যেন তিনি তোমাকে তার আদিষ্ট বিষয়সমূহে অনুপস্থিত এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে উপস্থিত দেখতে না পান। কখনো তাঁর কোনো হুকুম লঙ্ঘন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে সেখান থেকে সরে আসা।

সর্বোচ্চ স্তর: মহান আল্লাহর জাতের প্রতি মহব্বত। আলি বিন ফুযাইল র. বলেন, আল্লাহ তায়ালাকে শুধু এ কারণেই ভালোবাসা যায় যে, তিনি আল্লাহ।

---

৭. ভগ্ন হৃদয়ে আল্লাহর সামনে নিজের হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা। মহব্বত লাভের সবচেয়ে চমৎকার উপায় এটি।

৮. শেষ রাত্রে আল্লাহর বিশেষ তাজাল্লি নাযিলের সময় নির্জনে তাঁকে ডাকা, কুরআন তেলাওয়াত করা, একনিষ্ঠমনে নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া। দু হাত তুলে দোয়া কান্নাকাটি করা এবং সবশেষে তওবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে নির্জনবাস সমাপ্ত করা।

৯. আল্লাহর প্রকৃত আশেকদের নিকট বসে তাঁর কুদরত ও সিফাতের কথা শোনা। তাদের উত্তম কথাগুলো সংগ্রহ করা। বিশেষ কোনো কল্যাণ না থাকলে কোনো কথা না বলা এবং এটা মনে করা যে, এর মাঝেই অন্তরের বিশেষ অবস্থার উন্নতি আছে।

১০. বান্দা ও আল্লাহর মাঝে অন্তরাল সৃষ্টিকারী যাবতীয় বিষয় থেকে দূরে থাকা। আর অন্তরে আল্লাহ তায়ালার মহব্বত সৃষ্টি করে, এমন কাজগুলো করা। (*বাসাইরু যাবিত তাময়িজ*, ২/৪২১-৪২২)।

জনৈক ব্যক্তি হযরত তাউস রহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে এমনভাবে ভালোবাসার নসিহত করছি, এরপর যেন তোমার কাছে তাঁর চেয়ে প্রিয় আর কোনো কিছু না থাকে এবং তাঁকে এমনভাবে ভয় করবে যাতে তোমার কাছে তাঁর চেয়ে ভয়ের আর কোনো কিছু না থাকে। তাঁর কাছে তুমি এমনভাবে আশা করবে, যেন তা তোমার মাঝে এবং সেই ভয়ের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নিজের জন্য যা পছন্দ করবে মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করবে। এখন যাও। আমি তাওরাত ইঞ্জিল যাবুর এবং কুরআনের সমস্ত ইলম একত্র করে একসঙ্গে তোমার সামনে রেখে দিয়েছি।

জেনে রাখো, দেহের জন্য মাথা যেমন, হায়া ও লজ্জার জন্য অন্তরে আল্লাহ তায়ালার আযমত ও সম্মান তেমন। দুটির একটি অপরটি ব্যতীত হতে পারে না। কোনো বান্দা যখন তার রবকে লজ্জা করে তখন সে অবশ্যই তাঁর তাযিম ও সম্মান করে। আর লজ্জার মূল কথা হলো সবসময় আল্লাহ তায়ালার ধ্যান-খেয়ালের মাঝে থাকা। [২৩৫]

---

[২৩৫] সুফিয়ান সাওরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষ বলত, আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাযিমের কারণে কায়স বিন মুসলিম এত বছর আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাননি। (ইমাম আহমদকৃত *আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল*: ১/৩৪০)। এই গ্রন্থে আরও আছে মহান তাবেয়ি সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ত্রিশ বছর ধরে মুআযযিন আযান দেওয়ার সময় আমি মসজিদে উপস্থিত থাকি।

আমি বলি, এটি মুরাকাবার চূড়ান্ত স্তর। গোলামের উপর হক যে, সে সবসময় মালিক ডাকার আগেই তার সামনে উপস্থিত থাকবে। এমন নয় যে, মালিক ডাকলে সে উপস্থিত হবে।

নামাজের অপেক্ষা করা হয়, নামাজ কারও অপেক্ষা করে না

এ বিষয়ে একটি সুন্দর ঘটনা আছে। ঘটনাটি মিসরের কাজি আলি বিন হুসাইন বিন হারবের সঙ্গে সেখানকার এক মসজিদের ইমামের। মিসরের কাজি আলি বিন হুসাইন বিন হারব বাগদাদি। তিনি একজন মুহাদ্দিস, ফকিহ ও শাফেয়ি ছিলেন। তাকে ইবনে হারবাওয়াই বলা হয়। আবু উবায়েদ তার উপনাম। জন্ম ২১২ হিজরিতে। মৃত্যু ৩১৯ হিজরিতে। বাগদাদে।

মুরাকাবা তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে। দুই. তাঁর নাফরমানি বর্জনের ক্ষেত্রে। তিন. চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে।[২৩৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি এমন ভাব মনে না আসে, তাহলে এই মনে করবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন।[২৩৭]

অন্তরে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তায়ালার ধ্যান জাগ্রত রাখা মানুষের জন্য রাত জেগে ইবাদত, দিনভর রোজা এবং আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করার চেয়েও অধিক কষ্টকর।

ইবনে যুলাক বলেন, আবু উবায়েদ (আলি বিন হুসাইন) যখন প্রথম মিসর এসেছিলেন, তখন ইসমাইল বিন হুসাইনের বাড়িতে থাকতেন। তার বাড়িটি মসজিদে ইবনে আমরুসের নিকট ছিল। তারপর অবশ্য কাজি সাহেব সেখান থেকে দারুল মাদায়িনে চলে যান। তিনি আযানের আওয়াজ শুনলে নামাজে যেতেন। কখনো গিয়ে দেখতেন দু-এক রাকাত হয়ে গেছে কিংবা নামাজ শেষ হয়ে গেছে। তখন তিনি মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট পয়গাম পাঠালেন, যেন তার জন্য অপেক্ষা করা হয়। কয়েকবার এমন হলে ইমাম সাহেব তাকে বললেন, নামাজের অপেক্ষা করা হয়, নামাজ কারও অপেক্ষা করে না। কাজি সাহেব তখন বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে ইমাম সাহেব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। লোকেরা তার অনেক প্রশংসা করল। তখন তিনি তাকে তার ঘনিষ্ট বানিয়ে নিলেন এবং নিজের বিশেষ সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (দেখুন, ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহিকৃত *রফউল ইসর আন কুযাতি মিসর* গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইমাম কিন্দি রহমাতুল্লাহি আলাইহির *আল-উলাত ওয়াল কুযাত লি-মিসর*, পৃষ্ঠা নং ৫২৬)

[২৩৬] এ সংক্রান্ত আলোচনা ৩১ নং টীকায় গত হয়েছে।

[২৩৭] এই হাদিসের তাহকিক দেখুন ১২০নং টীকায়।

আলি বিন আবি তালেব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, জমিনে আল্লাহ তায়ালার পাত্র আছে, আর সে পাত্রে অন্তরসমূহ রাখা আছে।[২৩৮] সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল সেই অন্তরগুলোই গ্রহণ করা হয়, যেগুলো স্বচ্ছ, কঠিন ও নরম।[২৩৯]

অন্তরের স্বচ্ছ হওয়ার অর্থ হচ্ছে,

১. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানা।

২. সততা রক্ষা করা ও আল্লাহ তায়ালার ভয়ের অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

৩. কথা-কাজ ও নিয়তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দিনের অনুসরণ করা।

---

[২৩৮] ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই পাত্রগুলোর কিছু কল্যাণে পরিপূর্ণ থাকে আর কিছু অকল্যাণে। যেমন পূর্ববর্তী জনৈক আলেম বলেন, পুণ্যবান লোকদের অন্তরে পুণ্যে পরিপূর্ণ থাকে। আর পাপাচারী লোকদের অন্তর পাপে পূর্ণ হতে থাকে। (দেখুন *মিফতাহু দারিস সাআদাহ:* পৃষ্ঠা নং ১৩৫।

[২৩৯] ইমাম আহমদ *কিতাবুয যুহদ*-এর ৩৮৪ নং পৃষ্ঠায় মহান তাবেয়ি খালেদ বিন মাদান থেকে এই শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর কাছাকাছি শব্দে আবু ইনবাহ খাওলানি মারফু সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হচ্ছে,

'জমিনবাসীদের মধ্যে আল্লাহর পাত্র আছে। আর তোমাদের রবের সেই পাত্র হচ্ছে নেক বান্দাদের অন্তর। তন্মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে নরম ও কোমল অন্তরগুলো।

হাইসামি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হাদিসের সনদ হাসান পর্যায়ের। তার শায়েখ ইরাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সনদে বাকিয়্যাহ অলিদ আছেন। তিনি মুদাল্লিস। তবে তিনি এই হাদিসে তাদলিস করেননি। (দেখুন আল্লামা মুনাবিকৃত *ফাইজুল কাদির*, ২: ৪৯৬)

আল্লামা ইরাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি *তাখরিজু আহাদিসিল ইহইয়া* গ্রন্থে এই হাদিসের সনদকে জায়্যিদ বলেছেন।

৪. অনুরূপভাবে মুমিনদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা
৫. এবং তাদের কল্যাণ সাধন করা।

আর অন্তর কঠিন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

অন্তর নরম হওয়ার দুটি সুরত,

১. কান্নার দ্বারা।
২. উদারতা ও দয়ার্দ্রতার দ্বারা।[২৪০]

তাওফিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।

---

[২৪০] অর্থাৎ, অন্তর নম্র ও দয়াশীল হওয়ার কারণে ক্রন্দন করা। গ্রন্থকার র. রা'ফাত শব্দ উল্লেখ করেছেন। রা'ফাত বলা হয় নম্রতাকে, যা রহমত তথা দয়ার্দ্রতার চেয়ে অধিক। ক্রন্দন করার কারণে অন্তরে সৃষ্ট রা'ফাত (নম্রতার) দ্বারা আল্লাহর ভয়, তাঁর আযমত ও সুলতান, তথা বড়োত্ব ও ক্ষমতার অনুভূতি লাভ হয়।

আল্লাহর ভয়ে ইয়াযিদ বিন মারসাদের ক্রন্দন

ইয়াযিদ বিন মারসাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে অধিক ক্রন্দন করতেন। তার ছাত্র আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ বিন জাবের একদিন তাকে বললেন, হযরত, আপনার এত অধিক ক্রন্দনের কারণ কী বলুন তো, আমি কখনো আপনার চোখ শুকনো দেখিনি? তিনি বললেন, তা জেনে তোমার কী কাজ? সে বলল, আমি তাকে বললাম, হয়ত আল্লাহ আমাকে তা দ্বারা উপকৃত করবেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা, মহান আল্লাহ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছেন, যদি তার নাফরমানি করি তাহলে তিনি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। যদি আল্লাহ আমাকে শুধু গোসলখানায় বন্দি করার ভয় দেখাতেন, তাহলেও আমি আমার দু চোখ শুকনো রাখার উপযুক্ত ছিলাম না।

শেষ কথা

রিসালাতুল মুসতারশিদিনের টীকাকার শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বিন মুহাম্মদ আবু গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, *রিসালাতুল মুসতারশিদিন* কিতাবে আমি প্রথমবার টীকা সংযোজনের কাজ সমাপ্ত করি ১৩৮৪ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে। আমি তখন সিরিয়ার হালব শহরে। পরবর্তিতে এতে আমি আরও কিছু টীকা সংযোজন করি। সেগুলোতে আমি এ সময়ের যুবক-যুবতী, যারা এই নষ্ট সমাজে বসবাস করছে, চাই তারা মুসলিম দেশে বাস করুক কিংবা অমুসলিম দেশে, তাদের আত্মার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং তাদের সকলকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন এবং কল্যাণ ও হেদায়েতের পথ লাভের তৌফিক দান করুন।

মহান আল্লাহর কাছে আমি উত্তম প্রতিদানের আশা করছি এবং এই কিতাবটি দ্বারা যারা উপকৃত হবে তাদের কাছে নেক দুআ ও উত্তম প্রশংসা কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তৌফিকদাতা। তাঁর সাহায্যেই সবকিছু হয়। তাঁর উপরই আমি ভরসা করলাম এবং তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হলাম।

এই কিতাবে আমি দ্বিতীয়বারের মতো টীকা সংযোজনের কাজ সমাপ্ত করি ১৩৯১ হিজরির ৫-ই জুমাদাল উলা, রবিবার সকালে। আমি তখন লেবাননের বৈরুত শহরে। সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রভু একমাত্র আল্লাহর জন্য।

তারপর এই অষ্টম সংস্করণে এসে আমি তৃতীয়বারের মতো এতে টীকা সংযোজনের কাজ করেছি। এটি সমাপ্ত হয় ১৪১২ হিজরির ১২-ই সফর, রোজ বৃহস্পতিবার। আমি তখন সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে। তৃতীয় মাত্রায় সংযোজনের এ কাজটি আমি করেছি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। সেই সাথে কিতাবটি যাতে সর্বমহলে সমাদৃত হয়, এর দ্বারা পাঠক আরও অধিক উপকৃত হতে পারে এবং আমি তাদের নেক দোয়া লাভ করতে পারি, সে লক্ষ্যেই মূলত বারবার এই সংযোজন। নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারীদের উত্তম প্রতিদান দান করেন। সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রভু একমাত্র আল্লাহর জন্য।

সম্পূরক আলোচনা

আমি লক্ষ করেছি, এই গ্রন্থের কিছু টীকায় সূক্ষ্ম জ্ঞানভিত্তিক কিছু আলোচনা এসেছে। কিছু আলোচনা আবার দীর্ঘ হয়েছে। যার ফলে অনেক পাঠক হয়ত মূল বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে সরে পড়তে পারে; তাই আমি মনে করলাম, সেসব টীকা নিয়ে কিতাবের শেষে আলোচনা করলে ভাল হয়।

মূল কিতাবের খুতবায় ইমাম মুহাসেবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তায়ালার সিফাত বর্ণনায় একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন 'কদিম'। 'কদিম' মানে আদি, প্রাচীন, পুরনো। এই শব্দটি মূলত আল্লাহ তায়ালার আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি কালামশাস্ত্রবিদ উলামায়ে কেরামের ব্যবহৃত শব্দ, যা তারা ব্যবহার করতেন 'আউয়াল' (প্রথম) শব্দটির অর্থ স্পষ্টরূপে মানুষের যেহেনে বসানোর জন্য। কারণ আরবি অভিধানে কদিম শব্দটির অর্থ অন্যের চেয়ে অগ্রগামী। 'অস্তিত্বহীন' অর্থে আরবরা 'কদিম' শব্দটি ব্যবহার করত না। অস্তিত্বহীন বলার দ্বারা উদ্দেশ্য যা পূর্বে ছিল না, পরবর্তীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই অর্থে আরবরা 'কদিম' শব্দটি ব্যবহার করত না। 'কদিম' শব্দটি তারা ব্যবহার করত 'পুরনো' অর্থে। 'নতুন' অর্থে তারা ব্যবহার করে 'হাদিস' শব্দটি। আর 'পুরনো' মানে যা পূর্বে। এমন নয়, তা অস্তিত্বহীন ছিল পরে অস্তিত্বে এসেছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ.

> এমনকি তা পুরনো খেজুর শাখের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায়। (সুরা ইয়াসিন, আয়াত নং ৩৯)

আর পুরনো খেজুর শাখা সেটাকে বলে যেটা নতুন শাখা আসা পর্যন্ত থাকে। নতুনটা এলে প্রথমটাকে পুরনো বলা হয়। উলামায়ে কেরাম মূলত এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন আরও ভালভাবে বোঝানোর জন্য।

এক দল আলেম অবশ্য আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে 'কদিম' শব্দ ব্যবহারের বিরোধী। কেননা এটি কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত মহান আল্লাহর আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে শুধু 'আউয়াল' শব্দটি এসেছে। যেমন সুরা হাদিদে আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিজের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

তিনি প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনি সকল বিষয়ে অবগত। (সুরা হাদিদ, আয়াত নং ৩)

ইমাম নববি রহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যাকৃত *সহিহ মুসলিম*-এ ঘুমানোর সময় দোয়া পড়ার অধ্যায়ে এসেছে,

....اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর সময় এই দোয়া পড়তেন, হে আল্লাহ, আপনি প্রথম, আপনার পূর্বে কোনো কিছু নেই। আপনি শেষ, আপনার পরে কিছু নেই। আপনি প্রকাশ্য, আপনার ঊর্ধ্বে কিছু নেই। আপনি অপ্রকাশ্য, আপনার নিম্নে কিছু নেই। আপনি আমাদের ঋণগুলো পরিশোধ করে দিন এবং আমাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দান করুন। (আলোচনাটি সংক্ষিপ্তাকারে শায়খ আহমাদ শাকের তাহকিককৃত *শারহুত তাহাবি* কিতাবের ৫১-৫২ পৃষ্ঠা থেকে তুলে ধরা হলো। উদ্দেশ্য, কদিম শব্দটি আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, এ বিষয়টি অবগত হওয়া।)

এবার ভূমিকার অপর একটি বাক্যের ব্যাখ্যা:

এরপর ভূমিকায় নিম্নোক্ত বাক্যটি এসেছে,

حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهٗ وَيَبْلُغُ مَدٰى نَعْمَائِهٖ.

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এমন প্রশংসা যা তাঁর নেয়ামতসম এবং নেয়ামতের যাবতীয় হক আদায় করে দেয়।

এই শব্দে, এই অর্থে এভাবে হামদ পড়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তা হাদিসের পরিপন্থি। তাই তা বলা অনুচিত। নিম্নোক্ত আলোচনার দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এভাবে দোয়া ও হামদটি মুহাম্মাদ বিন নদর হারেসি থেকে আবু নাসর তাম্মার বর্ণনা করেছেন,

وَعَنْ أَبِيْ نَصْرِ التَّمارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى قَالَ: قَالَ آدَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَبِّ شَغَلْتَنِيْ بِكَسْبِ يَدِيْ، فَعَلِّمْنِيْ شَيْئاً فِيْهِ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ، فَأَوْحَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى إِلَيْهِ: يَا آدَمُ إِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثاً، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَقُلْ ثَلَاثاً: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْداً يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ،

মুহাম্মাদ বিন নদর বলেন, 'আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বললেন, প্রভু, আপনি আমাকে উপার্জনে ব্যস্ত রেখেছেন, তাই আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যাতে সমস্ত হামদ ও তাসবিহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ওহি পাঠিয়ে বললেন, হে আদম, সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে। এটি সমস্ত হামদ ও তাসবিহকে অন্তর্ভুক্তকারী।

দোআটি হচ্ছে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَ يُكَافِئُ مَزِيْدَهُ،

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এমন প্রশংসা যা তাঁর নেয়ামতসম এবং নেয়ামতের যাবতীয় হক আদায় করে দেয় এবং তিনি অতিরিক্ত যে নেয়ামত দান করেছেন সেগুলোর শোকর আদায়েও যথেষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম নববি কিতাবুল আযকারের ৯৬ নং পৃষ্ঠায় কোনো উদ্ধৃতি ব্যতীত উপরোল্লিখিত সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

এই বর্ণনাটির সনদ মুনকাতি ও মুদাল। ভীষণ দুর্বল। কারণ এর রাবি মুহাম্মাদ বিন নদর তাবে তাবেয়িনের পরের স্তরের। কিন্তু উপরোল্লিখিত সনদে দেখা যাচ্ছে, তিনি হাদিসটি সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বলাই বাহুল্য, তার এবং আল্লাহর রাসুলের মাঝে অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যম ছাড়া তার পক্ষে এটি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। আর এ ধরনের হাদিস আল্লাহর রাসুল থেকেই বর্ণিত হবে, যেহেতু আদম আলাইহিস সালাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম বা পরবর্তী কারও বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আর মুহাম্মাদ বিন নদরের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরতে গিয়ে আবু নুআইম ইস্পাহানি *হিলয়াতুল আউলিয়া* গ্রন্থে (৮: ২১৭-২২৪) বলেন, তিনি কুফার বিশিষ্ট আবেদ ছিলেন। তবে হাদিসশাস্ত্রের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। (অর্থাৎ হাদিস পঠন-পাঠন, বর্ণনা করা ইত্যাদি)। মানুষ তার বাণীগুলো লিখে রাখত।

ইবনুস সালাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সম্পর্কে বলেন, তিনি হাদিসের মানুষ ছিলেন না। কোনো মারফু হাদিস তার থেকে বর্ণিত হয়নি। (*ফুতুহাতে রাব্বানিয়া আলাল-আযকারিন নাবাবিয়্যাহ* গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে, ৩:২৯৭)

আবু নুআইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার জীবনী আলোচনায় অনেকগুলো ইসরাইলি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই হাদিসটি তিনি কোথায় পেয়েছেন তা আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে, এটি একটি ইসরাইলি রেওয়ায়েত।

এতক্ষণ আলোচনা হলো হাদিসের সনদ ও বর্ণনা নিয়ে। এখন এর অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক, অর্থের দিকে তাকালেও আমরা বুঝতে পারি, হাদিসটি সহিহ নয়। কারণ তা অকাট্য সত্যের পরিপন্থি। কারণ কারও পক্ষে আল্লাহ তায়ালার তারিফ তাঁর নেয়ামত সম করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালার অতিরিক্ত ফযল ও অনুগ্রহের বরাবরও নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সমস্ত সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে

অধিক অবগত এবং তাঁর অধিক শোকর আদায়কারী। অথচ তিনি এভাবে দোয়া করেছেন,

...لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ"

> ...আপনার পরিপূর্ণ প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিজে আপনার যেমন প্রশংসা বর্ণনা করেছেন, আপনি ঠিক তেমনই। (এটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত মুসলিম শরিফের ৯৭৭ নং হাদিস)

মোল্লা আলি কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মেশকাত শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ *মিরকাতুল মাফাতিহ* নামক কিতাবে (১:৫১৪) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি প্রাণান্ত চেষ্টা করি, তথাপি প্রতি লমহায় ও প্রতি মুহূর্তে আমার ওপর আপনার যে সকল নেয়ামতের শোকর আদায় ওয়াজিব, সেগুলোর একটিও পূর্ণরূপে আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ প্রতি মুহূর্তেই আমার ওপর আপনার অগণিত নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। সময়ের প্রতি অণুতে আমি যে নেয়ামতপ্রাপ্ত হচ্ছি, তা গণনা করতে গেলেও অক্ষম হয়ে পড়ব। এত অধিক! আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও গণনা করতে পারবে না। তাই আমি আপনার শোকর আদায় করতে অক্ষম।'

এ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হল যে, ভূমিকায় গ্রন্থকারের ব্যবহৃত উপরিউক্ত হামদ বাক্যটি শরিয়তসম্মত নয়। সনদের দিক থেকে হাদিসটি যেমন সহিহ নয়, তেমনি অর্থের দিক থেকেও নয়। তাই তা বলা ঠিক হবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক অবগত।

এই কথাগুলো লেখার পর আমি ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যার নিম্নোক্ত আলোচনাটি তথ্যসূত্র সহ পেলাম। তিনি বলেন, 'জনৈক ফকিহ'র বক্তব্য হল, কেউ যদি কসম খায় যে, সে আল্লাহ তায়ালার উত্তম প্রশংসা করবে, তাহলে নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা প্রশংসা করলে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهٗ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهٗ،

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এমন প্রশংসা যা তাঁর নেয়ামতসম এবং নেয়ামতের যাবতীয় হক আদায় করে দেয় এবং তিনি অতিরিক্ত যে নেয়ামত দান করেছেন সেগুলোর শোকর আদায়েও যথেষ্ট হয়ে যায়।

এটি রাসুলের হাদিস নয়। কোনো সাহাবায়ে কেরাম তা বর্ণনা করেননি। বরং এটি আদম আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত একটি ইসরাইলি রেওয়ায়েত। আল্লাহ তায়ালার যে কোনো নেয়ামতের বিপরীতে বান্দার সমস্ত প্রশংসা ও শোকর আদায় যথেষ্ট নয়। সমস্ত নেয়ামত তো দূরের কথা। আর বান্দার যাবতীয় কর্ম ও প্রশংসা অতিরিক্ত নেয়ামতের বিপরীতে যথেষ্ট হওয়াও সম্ভব নয়।' (*উদ্দাতুস সাবিরিন ওয়া যাখিরাতুশ শাকিরিন*, পৃষ্ঠা নং ১১৭।)

তারপর আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ইসরাইলি রেওয়ায়েতের এমন ব্যাখ্যা করেছেন, যা তার উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আমি তা বর্জন করেছি।

আল্লামা সাফফারিনি *গিযাউল আলবাব* গ্রন্থে (১: ১৮) বলেন, ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এই হামদ বাক্যটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এটি কি সবচেয়ে উত্তম হামদ? তখন তিনি বলেন, এটি কোনোভাবেই রাসুলের হাদিস নয়। এটি আবু নাসর তাম্মার এর বর্ণনা, যা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত। আর আবু নাসর ও আদম আলাইহিস সালাম-এর মাঝে কত জন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আবু নাসরের তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাই সহিহ নয়, আদম আলাইহিস সালাম থেকে কীভাবে সহিহ হবে?!

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, ইমাম নববি *রওযা* গ্রন্থে বলেন, এই মাসআলার নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল নেই। এটি একটি মুদাল হাদিস। (আত-তালখিসুল হাবির, ৪:১৭১)

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হামদটির শুদ্ধতা প্রমাণ করতে কৌশল অবলম্বন করে বলেন, শাফেয়িগণ এটিকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সবচেয়ে উত্তম হামদ হচ্ছে এটি,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَ يُكَافِئُ مَزِيْدَهُ،

হাফেয ইবনে তাইমিয়া *মাজমুউল ফাতাওয়া* গ্রন্থে (১:৪১) বলেন, মাখলুকের পক্ষে অসম্ভব আল্লাহ তায়ালার হামদের হক আদায় করা কিংবা তার চেয়ে বেশি করা।

এজন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করার পর এই দোয়া পড়তেন,

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا، طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مَكْفُوْرٍ وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا»

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, পবিত্র বরকতময় অনেক প্রশংসা। হে আমাদের রব, আপনার থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে, বিদায় নিতে পারব না এবং আপনার কাছ থেকে বেপরোয়াও হতে পারব না। (*বুখারি* : ৯: ৫৮, আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস)।

শায়খ ইবনে তাইমিয়ার *ফাতাওয়াল কুবরা* গ্রন্থেও (১:২১৩) এসেছে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُجَازِيًا مُكَافِيًا

যখন তাকে এই হামদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো এটি পড়া জায়েয কি না? এর এরাব কী হবে? এটি হাল কিনা? হাল হলে যুল-হাল কোনটি?

তখন তিনি উত্তর দিলেন, এই হামদটি এমন নির্ভরযোগ্য কোনো সনদে বর্ণিত হয়নি যে, এর ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া যায়। হাঁ, তবে হামদটি সহিহ অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব। তখন নসবযুক্ত শব্দটি আল্লাহ শব্দের হাল হবে। আর হাল ও যুল-হালের আমেল উহ্য শিবহুল ফেয়েল হবে। মূলরূপ হবে এরূপ-

اَلْحَمْدُ مُسْتَقِرٌّ أَوِ اسْتَقَرَّ لِلّٰهِ، فِيْ حَالِ كَوْنِهِ مُجَازِيًا مُكَافِئًا،

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُجَازِيًا مُكَافِيًا

এই হামদ বাক্যটি এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। পূর্বোক্ত হামদ বাক্যটির সঙ্গে মিল থাকায় এটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা আরেকটি বিষয় জানলাম, এই হামদটিও হাদিস নয়।

এতক্ষণ আলোচনার মূল কথা হলো,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَه و يُكَافِئُ مَزِيْدَهٗ،

এই হামদটি হাদিস নয় এবং এর অর্থেও সমস্যা রয়েছে।

তাই উলামায়ে সালাফের মধ্যে কেউ এটি পড়তেন বলে এটিকে হাদিস মনে করা উচিত নয়। এর মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়, নবিগণ একমাত্র মাসুম, ভুল-ত্রুটিমুক্ত, অন্য কেউ নন।

শুধু এই গ্রন্থে নয়, নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতেও এই হামদটির উল্লেখ আছে। যেমন ইবনে আবি হাতেমকৃত *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল* গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতে। হাফেয আবদুল গণি ইবনে সাইদ আযদি মিসরি-মৃত্যু ৪০৯ হিজরি-এর গ্রন্থ *ইযাহুল ইশকাল ফির রুওয়াত* গ্রন্থের শুরুতে। সপ্তম শতাব্দির আলেম শায়খ ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া মাকদিসি সুলামির *ইকদুদ দুরার ফি আখবারিল মুনতাযার* গ্রন্থের শুরুতে। হাফেয ইমাম ইবনে তাইমিয়ার *ইকামাতুদ দালিল আলা ইবতালিত তাহলিল* গ্রন্থের শুরুতে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই রিসালাটি পৃথকভাবে যেমন ছাপা হয়েছে তেমনি *আল-ফাতাওয়াল কুবরা* কিতাবের সঙ্গেও ছাপা হয়েছে। উভয়টিতেই হামদটি রয়েছে। এ সকল ইমাম এবং অন্যান্য আরও অনেকের গ্রন্থে এই হামদটি আছে, তাই বলে তা বিধিসম্মত ও জায়েয হয়ে যাবে এমনটি নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক অবগত।

একা কিংবা সম্মিলিতভাবে উচ্চ আওয়াজে যিকির করার হুকুম

মূল কিতাবে শব্দ করে ও সম্মিলিতভাবে যিকির করার যে আলোচনাটি এসেছে, সেই আলোচনাটিই এখানে দলিল-প্রমাণের আলোকে তুলে ধরা হলো।

কোনো কোনো আলেম একা কিংবা সম্মিলিতভাবে উঁচু শব্দে যিকির করাকে নাজায়েয বলেন, তবে প্রকৃত কথা হলো এটি জায়েয, যেমনটি ইমাম আবদুল হাই লাখনভি র. তার *সিবাহাতুল ফিকর ফিল-জাহরি বিয যিকর* নামক পুস্তিকায় দলিল-প্রমাণের আলোকে তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি যে সকল উলামায়ে কেরাম নাজায়েয বলেন, তাদের দলিলসমূহের জবাব দিয়েছেন। তারপর যারা জায়েয বলেন, তাদের দলিলসমূহও উল্লেখ করেছেন। জায়েযের স্বপক্ষে দলিলের সংখ্যা ৪৮। কখন উচ্চ শব্দে যিকির করতে হয়, কিংবা কখন তা মাকরুহ, এর আদাব ও শর্তসমূহ কী, ইত্যাদি বিষয় তিনি এমনভাবে তুলে ধরেছেন যা ইতোপূর্বে আর কারও আলোচনায় পাওয়া যায়নি।

হিন্দুস্তানে রিসালাটি তার আরও অন্যান্য রিসালার সঙ্গে *মাজমুআয়ে রিসালায়ে সিত্তাহ* নামে একাধিকবার ছাপানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটি নিরীক্ষণ করে ১৪০৮ হিজরিতে বৈরুত থেকে আমার ছাপানোর তৌফিক হয়েছে। আপনি চাইলে সেটি দেখে নিতে পারেন।

এ বিষয়ে ইমাম সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহর একটি চমৎকার রিসালা রয়েছে। নাম *নাতিজাতুল ফিকরি ফিল জাহরি বিয যিকর* । সেখানে তিনি একা কিংবা সম্মিলিতভাবে জোরে জোরে যিকির করাকে জায়েয বলেছেন। রিসালাটি তার *আল-হাবি লিল-ফাতাওয়া* গ্রন্থের সঙ্গে ছাপানো হয়েছে। আলাদাভাবেও ছাপা হয়েছে।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনভি রহিমাহুল্লাহ *সিবাহাতুল ফিকর ফিল-জাহরি বিয যিকর* নামক পুস্তিকায় সশব্দে যিকির জায়েযের মত প্রদানকারীদের যে দলিলগুলো আলোচনা করেছেন, সেগুলো এখানে উল্লেখ করে দেওয়াটা যথাযথ মনে করছি; যাতে মূল রিসালাটি যাদের দেখার সুযোগ হবে না, তারাও দলিলগুলো জেনে নিতে পারে। (- -) হাইফেন চিহ্নের মাঝে যে কথাগুলো আছে, তা আমার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত যুক্ত করা হয়েছে; যাতে বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনভি সেই গ্রন্থের ৬৩-৬৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন, 'যারা জায়েয বলেন, তাদের মধ্যে শায়খ আবদুল হক দেহলভি রহিমাহুল্লাহও রয়েছেন। তিনি তার রিসালা *তাওসিলুল মুরিদ ইলাল মুরাদ, বি-বায়ানি আহকামিল আহযাব ওয়াল আওরাদ*-এ সরবে যিকির জায়েয হওয়ার বিষয়ে ফার্সি ভাষায় দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন। আমি এখানে তা আরবিতে রূপান্তর করে দিচ্ছি:

উচ্চ আওয়াজে কিংবা অন্যদের শুনিয়ে যিকির, তেলাওয়াত, অনুরূপভাবে মসজিদে ও মজলিসে একত্রে বসে যিকির করা জায়েয ও শরিয়তসম্মত। কারণ হাদিসে এসেছে, যে আমাকে মানুষের মজলিসে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। নিম্নোক্ত আয়াতটিকেও প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ

> তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যেভাবে স্মরণ করো কিংবা তার চেয়েও অধিক স্মরণ করো।

সহিহ বুখারিতে রয়েছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كُنَّا لَا نَعْرِفُ اِنْصِرَافَ النَّاسِ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ إِلَّا بِالذِّكْرِ جَهْرًا،

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা লোকদের নামাজ শেষে সশব্দে যিকির করতে করতেই যেতে দেখতাম।

সহিহ বুখারিতে আছে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজ শেষে সশব্দে এই যিকিরটি করতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ...

> (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান।)

কোনো কোনো বর্ণনায় ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর সাহাবায়ে কেরামের এটি পড়ার কথা রয়েছে।

সহিহ মুসলিমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুগিরা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে লিখে পাঠালেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আপনি যা শুনেছেন, তার কিছু আমাকে লিখে জানান। তিনি তার কাছে লিখলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাজ শেষে এই দুআটি পড়তে শুনেছি,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ...،

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোক সকল, আওয়াজ নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখো। কারণ তোমরা কোনো বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না।

হাদিসের পূর্বের অংশ থেকে বোঝা যায়, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে যিকির করতে এ কারণে নিষেধ করেননি যে, তা নাজায়েয। বরং যিকিরের বিষয়টি তাদের কাছে সহজ করার জন্য বলেছেন। অর্থাৎ, ধীরস্থিরতার সঙ্গে স্বাভাবিক আওয়াজে যিকির করা চাই।

অনেক জায়গায় নবিজির সশব্দে দোয়া ও যিকির করার বিষয়টি প্রমাণিত। সালাফে সালেহিনও এগুলোর উপর আমল করেছেন। সহিহ বুখারির জিহাদ অধ্যায়ে যুদ্ধের সময় অবিচল থাকার পরিচ্ছেদে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের জন্য সশব্দে দোয়া করেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন খন্দক যুদ্ধের সময় পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন, ক্ষুধায় তাদের পেট পিঠের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই অবস্থা দেখে বললেন, হে আল্লাহ, পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।

উত্তরে তারা আবৃত্তি করলেন,

আমরাই হচ্ছি সে সকল ব্যক্তি, যারা মুহাম্মাদের হাতে আমৃত্যু জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেছি।

মূলকথা হচ্ছে, বিশেষ জায়গায় ও নির্দিষ্ট সময়ে সশব্দে যিকির করা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। কথা হচ্ছে, বিশেষ অবস্থায় যে হুকুম সাব্যস্ত হয়, তা সাধারণ অবস্থায় সাব্যস্ত করা যাবে কি না? অন্যথায় মতবিরোধকারীরা বলতে পারে, এই জায়গাগুলোয় হয়ত বিশেষ কোনো ফায়েদা রয়েছে, যা অন্য কোথাও নেই। কিংবা তারা বলতে পারে, যেখানে যিকির ও দোয়া একসঙ্গে আছে, সেখানে সশব্দে বলা জায়েয। যেখানে শুধু যিকির কিংবা শুধু দোয়া আছে, সেখানে জায়েয নেই। এই জন্য সাধারণ অবস্থায় সশব্দে যিকির জায়েযের বিষয়টি দলিল প্রমাণের আলোকে তুলে ধরা আবশ্যক।

শুধু যিকিরের জন্য সমবেত হওয়ার বিষয়টি তো বুখারি ও মুসলিমের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফুভাবে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় আল্লাহর বিশেষ কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা পথে ঘুরে ঘুরে যিকিরের হালকা তালাশ করে।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, কয়েকজন মুসলিম কোনো মজলিসে বসে আল্লাহর যিকির করলে ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়, তাদের উপর সাকিনা (বিশেষ রহমত) অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে নেয়। (মুসলিম : ১৭:২১)।

এখানে হাদিসে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। হয়ত দেহলভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফার্সিতে হাদিসটির তরজমা করতে গিয়ে শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন, আর আল্লামা আবদুল হাই লাখনভি রহিমাহুল্লাহ তা অনুসরণ করে আরবিতে ভাষান্তর করেছেন।

হাদিসে উল্লিখিত যিকির শব্দের দ্বারা শুধু ইলমি মুযাকারা কিংবা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ আলোচনা উদ্দেশ্য নেওয়া কঠিন। কারণ কোনো শব্দ শোনা মাত্র যে অর্থ মনে উদয় হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় সেই অর্থটিই গ্রহণ করা শ্রেয়। প্রয়োজন ছাড়া তা গ্রহণ না করা সহিহ নয়।

এখানে এ আপত্তি তোলা যাবে না যে, যিকিরের জন্য সমবেত হওয়ার মানে এই নয় যে, তারা সশব্দে বা উচ্চ আওয়াজে যিকির করার জন্য সমবেত হয়েছে। হতে পারে, তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে মনে মনে যিকির করবে। এর উত্তরে আমরা বলব, এমনটি হলে সমবেত হয়ে যিকিরের উল্লেখযোগ্য কোনো ফায়েদা নেই।

এমনিভাবে শুধু দোয়ার জন্য সমবেত হওয়ার বিষয়টিও ইমাম হাকেমের বর্ণিত একটি মারফু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হাদিসটিকে তিনি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ বলেছেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ، فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ، وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُمْ.

> কিছু লোক সমবেত হয়ে যদি একজন দোয়া করে আর বাকিরা আমিন বলে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া কবুল করেন।

ইমাম হাকেম মুসতাদরাকে (৩: ৩৪৭) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর মান সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে হাদিসের সনদ হাসান পর্যায়ের।

আর তেলাওয়াতের জন্য সমবেত হওয়ার বিষয়টিও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ، وَ يَتَدَارَسُوْنَهُ، إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ.

> 'কিছু মানুষ কোনো ঘরে সমবেত হয়ে যখন কুরআন তেলাওয়াত করে এবং একে অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়, তখন ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেয়।' ইমাম নববি ও অন্যান্য ইমামগণ এই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (*মুসলিম*, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার ফযিলত পরিচ্ছেদ : ১৭:২১)।

যেহেতু এটি *মুসলিম শরিফে*-এর হাদিস, তাই শায়খ আবদুল হক দেহলভি রহিমাহুল্লাহ যে বলেছেন, 'ইমাম নববি ও অন্যান্য ইমামগণ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন', এটি না বললেও হতো।-

এই হাদিসের কারণে উলামায়ে কেরাম মসজিদে ও মজলিসে সমবেত হয়ে ওযিফা ইত্যাদি আদায় করাকে জায়েয বলেন।

ইমাম মালেক ও তার শিষ্যগণ সমবেত হয়ে এসব আমল করাকে মাকরুহ বলেছেন; যেহেতু সালাফরা করেননি। মাকরুহ বলার পেছনে তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বিদআতের রাস্তাসমূহ বন্ধ করা, যাতে ইসলামি

শরিয়তের মধ্যে কোনো অপবৃদ্ধি না ঘটে এবং মানুষ সুস্পষ্ট সত্য থেকে দূরে সরে না যায়। তারা যেগুলোর আশঙ্কা করতেন, বর্তমানে সেগুলোই ঘটছে। (শায়খ আবদুল হক দেহলভি রহিমাহুল্লাহর কথা এখানেই শেষ।)

উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিস,

: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْوِتْرِ، قَالَ:

«سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাজে সালাম ফেরানোর পর পড়তেন,

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

তিনি তা তিনবার পড়তেন এবং তৃতীয়বারের সময় জোরে পড়তেন। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে আবি শাইবা, আহমদ, দারাকুতনি ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

শায়খ দেহলভি রহিমাহুল্লাহ শারহুল মিশকাত নামক গ্রন্থে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদিসটি সশব্দে যিকির জায়েযের সপক্ষে দলিল এবং নিঃসন্দেহে তা শরিয়তে প্রমাণিত। তবে নীরবে যিকির করা উত্তম।

এই হাদিসটি সশব্দে যিকিরের সপক্ষে তেতাল্লিশ নম্বর দলিল। ইমাম আবু দাউদ এটি নামাজ অধ্যায়ে বিতরের নামাজের পর দোয়া অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। সেখানে হাদিসটি এভাবে এসেছে,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ، قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»

ইমাম নাসায়ি কিয়ামুল লাইল অধ্যায়ে তিন রাকাতের বিতরের সালাত কীভাবে আদায় করবে পরিচ্ছেদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হাদিস নং ১৬৯৯। ইমাম আহমদ মুসনাদে (৫:১২৩) এটি উল্লেখ করেছেন।–

মিরকাতে (২:১৫৮) মোল্লা আলি কারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসের ব্যাখ্যাকার থেকে বর্ণনা করে বলেন, এই হাদিস উচ্চ শব্দে যিকির শুধু জায়েয নয়, বরং মুস্তাহাব হওয়ার দলিল, তবে শর্ত হল,

১. রিয়ামুক্ত হতে হবে।
২. দিনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। এছাড়া আরও যেসব উদ্দেশ্য থাকবে,
৩. শ্রোতাদের শিক্ষা দেওয়া।
৪. মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করা।
৫. আওয়াজ যতদূর পৌঁছায়, ততদূর পর্যন্ত যিকিরের বরকত জীব-জন্তু, বৃক্ষরাজি ও জড়বস্তুর নিকট পৌঁছানো।
৬. কল্যাণকাজে অন্যকে অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করা।
৭. এবং কেয়ামতে আল্লাহর যে সমস্ত মাখলুক তার যিকিরের আওয়াজ শুনেছে, তাদের সাক্ষ্য লাভ করা।
৮. কোনো কোনো মাশায়েখ নিঃশব্দে যিকির পছন্দ করেন। কারণ এতে অধিক রিয়ামুক্ত থাকা যায়। আর এর সম্পর্ক নিয়তের সঙ্গে।

প্রসঙ্গ : জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায়

জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় প্রসঙ্গে আমাকে একবার প্রশ্ন করা হলো। আমি জবাব দিলাম, শাফেয়ি ও হাম্বলিগণের নিকট জায়েয। আর অন্যদের নিকট শর্তসাপেক্ষে জায়েয । চার মাযহাবের মত তুলে ধরা হলো:

১. হানাফিদের নিকট সাধারণ নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়া মাকরুহ। আর সাধারণ নফল হচ্ছে, যা পড়ার নির্দিষ্ট সময় নেই এবং ফরজ নামাজের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে পূর্বাহ্নের, আওয়াবিনের এবং রাতের নফল নামাজও জামাতের সঙ্গে পড়া মাকরুহ। আর মাকরুহ তখন হবে, যখন এই নামাজ জামাতে পড়ার জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি করবে এবং সমবেত হতে বলবে। যদি একে অপরকে ডাকাডাকি না করে, তাহলে জামাতে পড়া জায়েয আছে। শর্ত হলো, মুসল্লির সংখ্যা চারজনের বেশি হতে পারবে না। আর দুই ইদ, তারাবি, বৃষ্টি প্রার্থনার ও সূর্যগ্রহণের নামাজ জামাতে পড়া সুন্নত।

২. মালেকিদের নিকট সাধারণ নফল নামাজও জামাতে পড়া জায়েয আছে, যদি তার রাকাত সংখ্যা অল্প হয় এবং কোনো ঘর-বাড়ি কিংবা এমন স্থানে হয়, যেখানে মানুষ দেখলে নফল নামাজকে ফরজ মনে করে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। যেমনটি *আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ*: ১:৪০৮ গ্রন্থে জুমআ, জানাযা এবং নফল নামাজে ইমামতির হুকুম অধ্যায়ে রয়েছে।

৩. শাফেয়িগণের নিকট রাত্রে কিংবা দিনে, যে কোনো সময় সাধারণ নফল জামাতে পড়া জায়েয আছে। কোনো শর্ত ছাড়াই। ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ *রওযা* নামক গ্রন্থে (১: ৩৪০) বলেন, যেসব নফল নামাজ জামাতে পড়া মুস্তাহাব সেগুলো হচ্ছে, দুই ইদের নামাজ, সূর্যগ্রহণের নামাজ, বৃষ্টিপ্রার্থনা ও তারাবির নামাজ। আর যেসব নফল নামাজ জামাতে পড়া মুস্তাহাব না সেগুলো হচ্ছে, পূর্বাহ্নের নামাজ, সালাতুল ইস্তেখারা ও সালাতুল হাজতের দুই রাকাত এবং ওজু করার পর দুই রাকাত নফল নামাজ। এখানে নাজায়েযের কথা বলা হয়নি, মুস্তাহাব ও গায়রে মুস্তাহাবের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি মুস্তাহাব নয় এমন নফল নামাজগুলোও জামাতে পড়ে, জায়েয হবে। মাকরুহ বলা যাবে না। অনেক সহিহ হাদিসের দ্বারা এটি প্রমাণিত।

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলি রহমাতুল্লাহি আলাইহির *আল-মুগনি* গ্রন্থে সালাত অধ্যায়ে (২:১৪২) নামাজের নিষিদ্ধ সময় পরিচ্ছেদের শেষে একটি অনুচ্ছেদে এসেছে, 'নফল নামাজ রাতে কিংবা দিনে একাকী হোক বা জামাতে, উভয়ভাবেই পড়া জায়েয আছে। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ভাবেই পড়েছেন। তবে তিনি বেশিরভাগ নফল নামাজ একাকী পড়তেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে একবার, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে একবার, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার আম্মা এবং এক ইয়াতিমকে নিয়ে একবার। সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ইতবান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে একবার ও রমজান মাসে রাতে তিনবার (জামাতের সঙ্গে পড়েছেন), এ সংক্রান্ত হাদিস সবগুলোই সহিহ, জায়্যিদ'। (ইমাম ইবনে কুদামার আলোচনাটি শেষ হলো)

মূলকথা, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় বিনা শর্তে জায়েয। হানাফি ও মালেকিদের নিকট শর্তসাপেক্ষে জায়েয। অনুসরণীয় এই ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো একজনের নিকট যখন নফল নামাজ জামাতে পড়া জায়েয, তখন একজন মুসলমান কোনোরূপ সংকোচ ছাড়াই তা জামাতে আদায় করতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকিকৃত আল-ইবহায ফি শারহিল মিনহায।

২. মুহাম্মাদ মাদানি রহিমাহুল্লাহকৃত আল-ইতহাফুস সানিয়্যাহ ফিল আহাদিসিল কুদসিয়্যাহ।

৩. ইমাম সুয়ুতি র.কৃত আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন।

৪. আল্লামা লাখনভিকৃত আল-আজবিবাতুল ফাযিলাহ লিল আসইলাতিল আশারাতিল কামিলা।

৫. ইবনে হাজাম র.কৃত আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম। বৈরুতের দারুল আফাক লাইব্রেরী থেকে ১৪০০ হিজরিতে প্রকাশিত।

৬. ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহকৃত ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন।

৭. আল্লামা সিলাফিকৃত মুজামুস সাফার থেকে চয়নকৃত আখবারু ও তারাজিমু আন্দালুসিয়্যা।

৮. নাসিরুদ্দিন তুসিকৃত আদাবুল মুতাআল্লিমিন।

৯. ইবনে মুফলিহ রহিমাহুল্লাহকৃত আল-আদাবুশ শারইয়্যা।

১০. আল্লামা সামআনিকৃত আদাবুল ইমলা ওয়াল ইস্তিমলা।

১১. আল্লামা মাওয়ারদিকৃত আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দিন।

১২. ইবনে মুকাফ্‌ফাকৃত আল-আদাবুল কাবির।

১৩. ইমাম বুখারি র.কৃত আল-আদাবুল মুফরাদ।

১৪. ইমাম নববি র.কৃত আল-আযকার।

১৫. ইমাম নববি র.কৃত আল-আরবাউনান নাবাবিয়্যা।

১৬. ইমাম কাসতাল্লানি র.কৃত ইরশাদুস সারি লি-শারহি সহিহিল বুখারি।

১৭. ইমাম শাওকানি র.কৃত ইশাদুল ফুহুল।

১৮. ইমাম হারাবিকৃত আল-ইশারাত ইলা মারিফাতিয যিয়ারাত।

১৯. আল্লামা মাক্কারি আন্দালুসিকৃত আযহারুর রিয়াদ ফি আখবারি ইয়ায।

২০. উস্তায যাহেদ কাওসারি র.-এর টীকাযুক্ত ইমাম বাইহাকি র.কৃত আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত।

২১. আল্লামা ইবনে হাজার র.কৃত আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা।
২২. উসুলুদ দিন লি-আবদিল কাহির তামিমি।
২৩. ইমাম শাতেবি র.কৃত আল-ইতিসাম।
২৪. আল্লামা খাইরুদ্দিন যারকালি র.কৃত আল-আলাম।
২৫. উমর রেযাকৃত আলামুন নিসা।
২৬. ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা র.কৃত ইলামুল মুয়াক্কিয়িন।
২৭. ইমাম সাখাবি র.কৃত আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মা আহলাত তারিখ।
২৮. ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা র.কৃত ইগাছাতুল লাহফান।
২৯. ইবনে রুশাইদকৃত ইফাদাতুন নাসিহ ফিত তারিফ।
৩০. আল্লামা আবদুল হাই লাখনভি র.কৃত ইকামাতুল হুজ্জাহ আলা আন্নাল ইকসার ফিত তাআব্বুদ লাইসা বি-বিদআহ।
৩১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকৃত ইকামাতুত দালিল আলা ইবতালিত তাহলিল।
৩২. আল্লামা কাযি ইয়াজ র.কৃত আল-ইলমা।
৩৩. শায়খ আবুল হাসান আলি নদভি র.কৃত আল-ইমামুল্লাযি লাম ইওয়াফফা হাক্কাহু মিনাল ইনসাফ ওয়াল ইতিরাফ: আহমাদ ইরফান শহিদ।
৩৪. ইবেন যাফার মাগরিবি র.কৃত আনবাউ নুজাবাইল আবনা।
৩৫. আল্লামা মাহফুজ ইবনে আহমদ কালওয়াযি র.কৃত আল-ইন্তিসার ফি মাসাইলিল কিবার। হস্তলিখিত কপি।
৩৬. ইবনে আবদিল বার র.কৃত আল-ইন্তিকা।
৩৭. ইমাম সামআনি র.কৃত আল-আনসাব।
৩৮. আল্লামা আযদি র.কৃত ইযাহুল ইশকাল। হস্তলিখিত কপি।
৩৯. যাহেজকৃত বুখালা।
৪০. আল্লামা ইবনে কাসির র.কৃত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।
৪১. আল্লামা ফাইরুযাবাদিকৃত বাসাইরু যাবিত তাময়িয।
৪২. আল্লামা ইবনু আবি যামরাহ র.কৃত বাহজাতুন নুফুস।
৪৩. আল্লামা যাবিদি র.কৃত তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস।
৪৪. ইমাম যাহাবি র.কৃত তারিখুল ইসলাম।

৪৫. খতিব বাগদাদি র.কৃত তারিখে বাগদাদ।
৪৬. আল্লামা আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ সানআনি র.কৃত তারিখু মাদিনাতি সানআইল ইয়ামান।
৪৭. ইবনে আসাকির র.কৃত তাবয়িনু কিযবিল মুফতারি।
৪৮. আল্লামা ইরাকি র.কৃত তাখরিজুল ইহইয়া।
৪৯. ইমাম সুয়ুতি র.কৃত তাদরিবুর রাবি।
৫০. ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.কৃত আত-তাদাম্মুরিয়্যাহ।
৫১. ইমামা যাহাবি র.কৃত তাযকিরাতুল হুফফায।
৫২. ইমাম যাহাবি র.কৃত তাহযিবুত তাহযিব।
৫৩. আল্লামা কাযি ইয়াজ র.কৃত তারতিবুল মাদারিক।
৫৪. তারিখে ইবনে আসাকির গ্রন্থ থেকে ইমাম যুহরি র.-এর জীবনী।
৫৫. ইমাম মুনযিরি র.কৃত আত-তারগিব ওয়াত তারহিব।
৫৬. আল্লামা কাযি ইয়ায র.-এর পুত্র মুহাম্মাদ প্রণীত আত-তারিফ বিল কাযি ইয়ায।
৫৭. তাফসিরু ইবনু আবি হাতেম।
৫৮. তাফসিরে ইবনে কাসির।
৫৯. আল্লামা রশিদ রেযার তাফসিরুল মানার।
৬০. তাফসিরুন নাসাফি।
৬১. রাগেব ইস্পাহানীর তাফসিলুন নাশআতাইন ওয়া তাহসিলিস সাআদাতাইন।
৬২. ইবেন আবি হাতেম রাজি র.কৃত তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল।
৬৩. ইমাম তাকি সুবকি ও হাফেয হাইসামি র.কৃত তারতিবু সিকাতিল ইজলি।
৬৪. ইবনে হাজার র.কৃত তাকরিবুত তাহযিব।
৬৫. ইবনে আমি হাজকৃত আত-তাকরির ওয়াত তাহবির।
৬৬. ইবনুল জাওযি র.কৃত তালবিসু ইবলিস।
৬৭. ইবেন হাজার র.কৃত আত-তালখিসুল হাবির।
৬৮. ইমাম যাহাবি র.কৃত তালখিসু মুসতাদরাকে হাকেম।
৬৯. ইবনে আবদিল বারকৃত তামহিদ।
৭০. ইমাম নববি র.কৃত তাহযিবুল আসমা ওয়াস সিফাত।
৭১. আল্লামা ইবনে হাজার র.কৃত তাহযিবুত তাহযিব।

৭২. মুহাম্মাদ আলি মালেকি র.কৃত তাহযিবুল ফুরুক।
৭৩. আল্লামা মুনবিকৃত আত-তাইসির বি-শারহিল জামে সগির।
৭৪. ইবনে আবদিল বারকৃত জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি।
৭৫. তাফসিরে তাবারি।
৭৬. জামে তিরমিযি। আহমেদ শাকের ও অন্যান্যরা তাহকিককৃত।
৭৭. ইমাম সুয়ুতি র.কৃত জামে সগির মাআ ফাইযিল কাদির।
৭৮. ইবনে রজব হাম্বলি র.কৃত জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম।
৭৯. ইবনে আবি যায়দ কাইরুআনিকৃত জামে।
৮০. ইমাম কুরতুবি প্রণীত জামে লি-আহকামিল কুরআন।
৮১. আল্লামা হুমাইদিকৃত জাযওয়াতুল মুকতাবাস ফি যিকরি উলাতুল আন্দালুস।
৮২. শায়খ মুহাব্বিকৃত জানাল জান্নাতাইন ফি তাময়িযি নাওআয়িল মাসানিয়্যিন।
৮৩. ইবনুল জাওযি প্রণীত আল-জাওয়াবুল কাফি।
৮৪. ইমাম সাখাবি র.কৃত আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফি তারজামাতিল হাফিয ইবনে হাজার।
৮৫. হাফেয কুরাশিকৃত জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ।
৮৬. ইমাম সুয়ুতি র.কৃত আল-হাবি লিলফাতাবী।
৮৭. আল্লামা খাল্লাল প্রণীত আল-হাছছু আলাত তিজারাহ ওয়াস সিনাআহ ওয়াল আমাল।
৮৮. আবু নুআইমকৃত হিলয়াতুল আউলিয়া।
৮৯. জাহেজকৃত হায়াওয়ান।
৯০. ইস্পাহানী র.কৃত খারিদাতুর কাসর।
৯১. ইমাম ইবনে হাজার হাইতামিকৃত আল-খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবি আবি হানিফাতান নুমান।
৯২. আলাউদ্দিন হাসকাফির দুররুল মুখতার।
৯৩. আল্লামা ইকবালের দিওয়ানুল আসরার ওয়ার রুমুয।
৯৪. দিওয়ানু নাবিগাতি বানি শাইবান।
৯৫. আবু শামা মাকদিসীর যাইলুর রওযাতাইন।
৯৬. ইবনে রজব হাম্বলির যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ।
৯৭. ইবনে আবেদিনের রদ্দুল মুহতার।

৯৮. শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. তাহকিককৃত ইবনে তাইমিয়া র.-এর রিসালাতুল হালাল ওয়াল হারাম।
৯৯. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুআতুর রাসাইলিল কুবরার অন্তর্গত রিসালাতুন ফিস সামায়ি ওয়ার রাকসি।
১০০. শায়খ ইবরাহিম হানাফির রিসালাতুন ফিস সাইদ ওয়ার রিমায়াহ ওয়াল খাইল।
১০১. রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা।
১০২. ইবনে আব্বাদ নাফাজির রাসায়েলে সুগরা।
১০৩. মুহাসেবির রিআয়া।
১০৪. ইবনে হাজারের রাফউল ইসরি আন উলাতি মিসর।
১০৫. আবদুল হাই লাখনভির আর-রাফয়ু ওয়াত তাকমিল ফিল-জারহি ওয়াত তাদিল।
১০৬. ইবনে আরাবির রুহুল কুদুস ফি মুহাসাবাতিন নাফস।
১০৭. ইবনু কায়্যিমিল জাওযির রুহ।
১০৮. ইবনে হিব্বানের রওযাতুল উকালা।
১০৯. ইমাম নববির রওযা।
১১০. ইবনুল কায়্যিম জাওযির যাদুল মাআদ।
১১১. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের আয-যুহদ।
১১২. ইমাম আহমদের আয-যুহদ।
১১৩. ইমাম বাইহাকির আয-যুহদ।
১১৪. আল্লামা আবদুল হাই লাখনভির সিবাহাতুল ফিকর ফিল জাহরি বিয যিকর।
১১৫. ইমাম বিকায়ির সিররুর রুহ।
১১৬. লালিকায়ির আস-সুন্নাহ।
১১৭. সুনানে ইবনে মাজাহ।
১১৮. সুনানে আবি দাউদ। মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ তাহকিককৃত।
১১৯. সুনানে দারেমি।
১২০. বাইহাকির সুনানে কুবরা।
১২১. ইমাম যাহাবির সিয়ারু আলামিন নুবালা।
১২২. ইবনে ইমাদ হাম্বলির শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাবা।

১২৩. আল্লামা যাবিদির শারহুল ইহইয়া (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন)।
১২৪. ইমাম নববির শারহুল আরবায়িনান নাবাবিয়্যা।
১২৫. আল্লামা তাফতাযানির শারহুল আরবায়িনান নাবাবিয়্যা।
১২৬. শারহুল বাজুরি আলাস সানুসিয়্যা।
১২৭. ইবন রজব হাম্বলির শারহু হাদিসিল ইলম।
১২৮. ইবনে আব্বাদ নাফাযির শারহুল হিকাম
১২৯. ইমাম নববির শারহু সহিহ মুসলিম।
১৩০. আহমদ শাকের তাহকিককৃত ইবনে আবিল ইযয হানাফির শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা।
১৩১. ফুতুহি হাম্বলির শারহু কাওকাবিল মুনির।
১৩২. ফাতহুল বারির সঙ্গে সহিহুল বুখারি।
১৩৩. ইমাম নববির ব্যাখ্যাযুক্ত সহিহ মুসলিম।
১৩৪. আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর সাফাহাতুম মিন সাবরিল উলামা।
১৩৫. ইবনুল জাওযিকৃত সাফওয়াতুস সাফওয়া।
১৩৬. ইবনু আবিদ দুনিয়ার তাহকিকুস সামত।
১৩৭. ইবনুল জাওযির সাইদুল খাতির।
১৩৮. ইবনু আবি ইয়ালা হাম্বলির তাবাকাতুল হানাবিলাহ।
১৩৯. মোল্লা আলি কারীর তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ।
১৪০. তাজুস সুবকির তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা।
১৪১. আবুল আরব কাইরুআনির তাবাকাতু উলামায়ি ইফরিকিয়্যাহ ওয়া তিউনিস।
১৪২. ইবনে সাদের তাবাকাতুল কুবরা।
১৪৩. দাউদির তাবাকাতুল মুফাসসিরীন।
১৪৪. আবদুল হাই লাখনভির যাফারুল আমানি ফি শারহি মুখতাসারিতস সাইয়্যিদ শরিফ জুরজানি।
১৪৫. আবু বকর ইবনুল আরাবির আরিযাতুল আহওয়াযি শারহু সুনানিত তিরমিযি।
১৪৬. ইমাম যাহাবির আল-ইবার ফি খাইরি মান গাবার।
১৪৭. আবদির আল-আফওয়াউ ওয়াল ইতিযার।
১৪৮. ইবনু আবিদ দুনিয়ার আল-আকল ওয়া ফাযলুহু।

১৪৯. আইদারুস হাবশির উকুদুল লাআলি ফি আসানিদির রিজাল।
১৫০. ইমাম আহমদের আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল।
১৫১. আবু খাইসামা নাসায়ির চারটি রিসালার অন্তর্গত আল-ইলম।
১৫২. খলিল ইবনে আহমদ ফারাহিদির আল-আইন।
১৫৩. ইবনে কুতাইবার উয়ুনুল আখবার।
১৫৪. সাফফারিনির গিযাউল আলবাব।
১৫৫. শায়খ হাসনাইন মাখলুফের ভূমিকাসহ ইবনে তাইমিয়ার আল-ফাতাওয়াল কুবরা।
১৫৬. ইবনে হাজারকৃত ফাতহুল বারি।
১৫৭. ইবনে হুমামের ফাতহুম মুবিন।
১৫৮. ইবনে হাজার মাক্কি হাইতামির ফাতহুম মুবিন বিশারহিল আরআঈন।
১৫৯. ইবনে তাইমিয়ার ফাতওয়া হামাবিয়্যাহ।
১৬০. ইবনে মুফলিহ হাম্বলির আল-ফুরু।
১৬১. কারফির আল-ফুরুক।
১৬২. ইবনে হাজামের আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল।
১৬৩. আল্লামা জাযিরীর আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ।
১৬৪. খতিবে বাগদাদির আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ।
১৬৫. আবুল ওফা ইবনে আকিল হাম্বলির আল-ফুনুন।
১৬৬. ইবনুল কায়্যিমের আল-ফাওয়ায়েদ।
১৬৭. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির ফাইযুল বারি আলা সহিহিল বুখারি।
১৬৮. আল্লামা মুনবির ফাইযুল কাদির বি-শারহিল জামে সগির।
১৬৯. তাজুস সুবকির কায়েদা ফিল জারহি ওয়াত তাদিল।
১৭০. ফাইরুযাবাদির কামুসুল মুহিত।
১৭১. ইবনুল জাওযির কুসসাস ওয়াল মুযাক্কিরুন।
১৭২. আরিফ নাকাদির বক্তৃতা কাযা ফিল-ইসলাম।
১৭৩. আশরাফ আলি থানভির কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস।
১৭৪. আবু তালেব মাক্কির কুতুল কুলুব।

১৭৫. আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা।
১৭৬. ইবনু আদির কামিল।
১৭৭. ইবনুল আসিরের কামিল।
১৭৮. যামাখশারির কাশশাফ।
১৭৯. আযলুনির কাশফুল খাফা ওয়া মুযিলুল ইলবাস।
১৮০. মাক্কি কাইসি কাইরুআনির আল-কাশফু আন উযুহিল কিরাআতিস সাবয়ি।
১৮১. ইমাম শারানির কাশফুল গুম্মাহ আন জামিয়িল উম্মাহ।
১৮২. খতিবে বাগদাদির কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ।
১৮৩. ইবনে মুকাফফার কালিলাহ ওয়া দিমনাহ।
১৮৪. মুত্তাকির হিন্দির কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল।
১৮৫. আল্লামা মুনবির আল-কাওয়াকিবুত দুররিয়্যাহ।
১৮৬. ইবেন মানযুরের লিসানুল আরব।
১৮৭. ইবনুল জাওযির আল-লুকাত ফি হিকায়াতিস সালিহিন। হস্তলিখিত কপি।
১৮৮. ইবনুল জাওযির মুতাশাবিহ ফিল কুরআন।
১৮৯. আহমদ ইবনে রেসলান শাফেয়ির মাতনুয যাবাদ।
১৯০. মাইদানির মাজমাউল আমছাল।
১৯১. তাহের ফাত্তানির মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার।
১৯২. নুরুদ্দিন হাইসামির মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ।
১৯৩. আবদুল হাই লাখনভির মাজমুউর রাসাইলিস সিততি।
১৯৪. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুউল ফাতাওয়া।
১৯৫. ইবনু আবিদ দুনিয়ার মাজমুআতু রাসায়েল।
১৯৬. ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যার মাদারিযুস সালেকিন।
১৯৭. শারনুবলালির মারাকিল ফালাহ।
১৯৮. মোল্লা আলি কারির মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ।
১৯৯. আবু দাউদের মাসাইলুল ইমাম আহমাদ।

২০০. আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর মাসআলাতু খালকিল কুরআন...।
২০১. মুসতাদরাকে হাকেম।
২০২. মুসনাদে আবি ইয়ালা।
২০৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।
২০৪. মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ।
২০৫. মুসনাদে দারেমি।
২০৬. দাইলামির মুসনাদে ফেরদাউস।
২০৭. তাইমিয়া পরিবারের মুসাওয়াদাহ আলে তাইমিয়া ফি উসুলিল ফিকহ।
২০৮. ইবনুল জাওযির আল-মিসবাহুল মুযি ফি খিলাফাতিল মুসতাযি।
২০৯. ফাইয়ুমির মিসবাহুল মুনির।
২১০. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক।
২১১. ইবনে হাজারের মাতালিবে আলিয়া।
২১২. গুযুলী দিমাশকির মাতালিয়ুল বুদুর ফি মানাযিলিস সুরুর।
২১৩. আবু যায়েদ দাব্বাগের মাআলিমুল ইমান।
২১৪. ইয়াকুত হামাবির মুজামুল উদাবাহ।
২১৫. সিলাফির মুজামুস সাফার।
২১৬. ইবনুস সালাহের মারিফাতু আনওয়ায়ি ইলমিল হাদিস।
২১৭. ওনশিরিশির আল-মিয়ারুল মুআররাব।
২১৮. মুতাররিযির মুগরিব।
২১৯. ইবনে কুদামার মুগনি।
২২০. ইবনুল কায়্যিমের মিফতাহুস সাআদাহ।
২২১. মুকাদ্দামহ ইবনে খালদুন।
২২২. ইবনু আবি ইয়ালার তাবাকাতুল হানাবিলাহ গ্রন্থের শেষে ছাপানো আবু মুহাম্মাদ তামিমির মুকাদ্দামাহ ফি আকিদাতিল ইমাম আহমাদ।
২২৩. আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর মিন আদাবিল ইসলাম।
২২৪. মুওয়াফফাক খাওয়ারিজমির মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা।
২২৫. ইবনুল জাওযির মানাকিবুল ইমাম আহমদ।

২২৬. বাইহাকির মানাকিবুল ইমাম শাফেয়ি।
২২৭. ইবনুল জাওযির মুনতাযাম।
২২৮. ইবনে তাইমিয়ার মিনহাযুস সুন্নাহ।
২২৯. ইমাম আহমাদ উলাইমির মানহাযুল আহমাদ ফি তারাজিমি আসহাবিল ইমাম আহমাদ।
২৩০. আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুরতাযা ইয়ামানির আল-মুনইয়াতু ওয়াল আমালু ফি শারহি কিতাবিল মিলাল ওয়াত নিহাল।
২৩১. ইমাম শাতেবির মুওয়াফাকাত।
২৩২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক।
২৩৩. ইমাম যাহাবির মিযানুল ইতিদাল।
২৩৪. ইবনে আবদিল বারের নুযহাতুল মাযালিস।
২৩৫. ইবনে হাজার আসকালানির নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ।
২৩৬. হাকিম তিরমিযির নাওয়াদিরুল উসুল।
২৩৭. ইবনুল আসিরের আন-নিহায়াহ।
২৩৮. নাহজুল বালাগাহ।
২৩৯. ইবনে হাজার আসকালানির হাদয়ুস সারি ফি মুকাদ্দামাতি ফাতহিল বারি।
২৪০. মুস্তাফা সিবায়ীর হাকাযা আল্লামাতনিয়াল হায়াত।
২৪১. ইবনুল কায়্যিম জাওযির আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব...।
২৪২. ইমাম রাফেয়ির ওয়াহইয়ুল কলাম।
২৪৩. ইবনে খাল্লিকানের ওফায়াতুল আয়ান।
২৪৪. আল্লামা কিন্দির আল-উলাত ওয়ার কুযাত লি-মিসর।

সমাপ্ত

'রিসালাতুল মুসতারশিদিন' হিজরি তৃতীয় শতাব্দিতে রচিত হেদায়াত অনুসন্ধানীদের পথ ও পাথেয় বিষয়ক একটি অমর গ্রন্থ। লিখেছেন খাইরুল 'কুরুন' বা ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ইমাম হারেস আল মুহাসেবী রহিমাহুল্লাহ। ইলম, ইখলাস, তাকওয়া, পরহেযগারী, আত্মশুদ্ধি, তাসাউউফ ও দুনিয়াবিমুখতায় তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। মানুষের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির কথা চিন্তা করে রচনা করেছেন বহু মূল্যবান গ্রন্থ। 'রিসালাতুল মুসতারশিদিন' তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। উম্মাহর জন্য রেখে যাওয়া এক অমূল্য সম্পদ। এর প্রতি ছত্রে ছত্রে ও পরতে পরতে পাঠক এ কথাটির প্রমাণ পাবে। বইটি পাঠককে শুধু মুগ্ধই না বিমোহিত করবে।

যারা ভয়ংকর এ ফিতনা-ফাসাদের যুগে মুক্তি পথের দিশা পেতে চায়, উত্তম পথ ও পাথেয় অনুসরণ করে নিজেদের গড়ে তুলতে চায়, জীবনকে কল্পনার মতো সুন্দর ও সফল করতে চায়, আত্মার অনাবিলতা ও চিন্তার শুভ্রতা লাভ করে স্রষ্টার প্রেমে বিলীন হতে চায়, তাদের জন্য এই বইটি হতে পারে সর্বোত্তম সহযোগী ও আদর্শ দিশারী। এই বইটি তাদের মাঝে সত্যোপলব্ধি ও শুদ্ধ বোধ সৃষ্টি করবে, তাদের আত্মশুদ্ধি ও পরকালের চিন্তায় ব্যাকুল করে তুলবে।

এটি পড়ে তারা জানতে পারবে একজন মুমিনের জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, নিজেকে সংশোধনের পদ্ধতি কী, চিরস্থায়ী সফলতা ও মুক্তির চাবিকাঠি কী, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় কী?

মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নগুলোরই উত্তর দেওয়া হয়েছে অকৃত্রিম মমতায় ও পরম বিশ্বস্ততায়। বইটির পাতায় পাতায় পূর্ববর্তীদের সুরভিত জীবনের সৌরভও ছিটানো রয়েছে এর মখমলকোমল রচনায়। শব্দের মূর্ছনায়। আবেগের ব্যঞ্জনায়।

তাই ভয়ংকর ফিতনা-ফাসাদের এ যুগে, সর্বত্র চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের রমরমা এ বাজারে, আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো বস্তবাদি চিন্তার দূষিত এ কালে বইটি শুধু একবার দুবার নয়, বারবার পড়ার বিকল্প নেই।

বিখ্যাত ইমাম হারেস মুহাসেবির সুপ্রাচীন এই গ্রন্থটির টীকা সংযোজন করেছেন আলেমগণের কাছে নির্ভরযোগ্য ও সুপরিচিত একজন মুহাক্কিক শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.। যা বইটির উপকারিতা বাড়িয়েছে কয়েক গুণ।

আশা করি বইটি আমাদের জীবনের পরতে পরতে কাজে লাগবে।